

কলি ও কলম

সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক
মাসিক পত্রিকা

ছোটগল্প সংখ্যা

ত্রয়োদশ বর্ষ | পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৩

K. M. L. 1001
2023



বাংলা ছোটগল্প সূচনা থেকেই জীবনলগ্ন। কখনো বিস্তৃত পরিসর ও পটভূমি নিয়ে জীবনের নানা অনুষ্ণ ছোটগল্পে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত ছোটগল্পে মননধর্মিতার সঙ্গে সাধারণ লোকজীবন-উপলব্ধিকে যে প্রসারিত চেতনায় বিস্তৃত করেছিলেন, তা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অনন্য অধ্যায় হয়ে আছে। তিনি বাংলা ছোটগল্পে প্রকরণ ও শৈলী নির্মাণেরও প্রধান পুরুষ। তাঁর মতো করে জীবনের বহুকৌণিক দিক তাঁর সমসাময়িকদের আর কেউ প্রতিফলিত করতে পারেননি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের চেতনাধারায় স্নাত হয়ে গল্পের ভুবন আরো সমৃদ্ধ ও বিচিত্র বৈভবে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে মার্কসবাদী কয়েকজন গল্পকার এমনসব গল্প লিখেছিলেন যা ছিল জীবনচেতনার দিক থেকে অতল এবং নবীন জিজ্ঞাসার বিচ্ছুরণে দীপ্ত।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক থেকে এক অঙ্গীকার নিয়ে প্রান্তিক ও ব্রাত্য মানুষের জীবনসংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার অধিকার ও আর্তি নবীন মাত্রা অর্জন করে। পাশাপাশি, ছোটগল্পে মানবমনের অবচেতন দিকগুলোও উন্মোচিত হতে থাকে। অবচেতন মনের জটিল অলিগলির প্রতিফলন পাঠককে দেয় নতুন ভুবনের সন্ধান, জীবন-উপলব্ধির ক্ষেত্রে অভিনব জিজ্ঞাসারও জন্ম দেয়। বাংলা সাহিত্যে এ হয়ে ওঠে নতুন এক সৌধ।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশের ছোটগল্পও নানাভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশে যেসব ছোটগল্প রচিত হয়েছিল তা ছিল জীবনের উত্তাপলগ্ন। এসব গল্পের মধ্যে গ্রামীণ ও নাগরিক মানুষের বৃহত্তর জীবনসংগ্রাম ও বেঁচে থাকার আর্তি প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রেম, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছিল। এই সময়ে জীবনের নানা অনুষ্ণকে ধারণ করে গল্পকারগণ এক সমৃদ্ধ ভুবননির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। সামরিক শাসন, প্রথার কর্তৃত্ব এবং বৈরী রাজনৈতিক বাস্তবতা কথাসাহিত্যের সৃজনধারাকে ব্যাহত করতে পারেনি। এ-অঞ্চলের নদী, মাটি ও মানুষের সঙ্গে ছোটগল্পকারদের নিবিড় সংযোগের ফলে এবং বোধ ও বুদ্ধির প্রয়োগে ছোটগল্প তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল হতে থাকে।

ষাটের দশকে এই অঞ্চলের বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও বাঙালিত্বের সাধনা যখন স্বদেশনির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল, তখন থেকে ছোটগল্পের স্বরূপও পালটাতে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও জীবনের নানা সূক্ষ্ম সংবেদনশীল দিকের উন্মোচন পাঠকের অভিজ্ঞতার দিগন্তকে বিস্তৃত করে। মনন ও শিল্পের দিক থেকে নতুন বেগ সঞ্চারিত হয় ছোটগল্পে। ছোটগল্পের সৃজনভূমি হয়ে ওঠে জীবন-অভিজ্ঞতার মনোগ্রাহী দলিল।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের ছোটগল্পকারদের মানসভুবনকেও নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করে। মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ছোটগল্প রচিত হয়।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে বর্তমানে নবীন বেশ কয়েকজন গল্পকারের আবির্ভাব আমাদের আশান্বিত করে। সমকালীন জীবনচেতনা ও সংগ্রামও প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁদের সৃষ্টিতে।

কালি ও কলম জন্মলগ্ন থেকে যত্নের সঙ্গে নানা ধারার ছোটগল্পের পরিচর্যা করে আসছে। দেখা যায়, বাংলাদেশের নবীন গল্পকারদের রচনায় জীবনের নানাদিক রূপায়ণের প্রয়াস ছোটগল্পের সম্ভাবনাকেই তুলে ধরছে। আমরা ভালো বোধ করেছি এদেশের ছোটগল্পে একই সঙ্গে উজ্জ্বল শিল্পচেতন্যের বিকাশ দেখে। এ-সংখ্যায় আমরা বাংলাদেশের ছোটগল্পের সেই সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনাকেই ধরে রাখতে চেয়েছি। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করেছি সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করতে। আমরা এ-সংখ্যায় বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছি নবীন ছোটগল্পকারদের রচনার প্রতি।

নবীন ছোটগল্পকারদের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের মধ্যে যে-প্রাণশক্তি, বিশ্বস্ত জীবনচেতনা, সমাজ-অঙ্গীকার ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রমণের ঐকান্তিক প্রয়াস আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা ভাবী গল্পের ভুবনকে সমৃদ্ধ করবে — এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

এই সংখ্যাটি পঞ্চম-ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো।

প্রকাশক
আবুল খায়ের
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আনিসুজ্জামান
সম্পাদক
আবুল হাসনাত
সম্পাদকমণ্ডলী
এ জেড এম আবদুল আলী
রুবী রহমান
লুভা নাহিদ চৌধুরী

কালি ও কলম

সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োদশ বর্ষ : পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা • আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৩ : জুন-জুলাই ২০১৬

প্রচ্ছদ-পরিচিতি



ফুলদানি
শহিদ কবীর, তেলরং, ২০০১
সংগ্রাহক : আবুল খায়ের

f /kaliokalam



আপনার স্মার্টফোনে কিউআর কোড ব্যবহার করতে চাইলে প্রথমেই গুগল প্লেস্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে বিনামূল্যের কিউআর সফটওয়্যার (যেমন : I-NIGMA BARCODE SCANNER) ইনস্টল করুন। এরপর সফটওয়্যারটি চালু করুন এবং আপনার মোবাইল ফোনের ক্যামেরা অন করে কিউআর কোডের ওপর ধরে থাকুন। এর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি কালি ও কলম অ্যাপ ডাউনলোডের ঠিকানায় পৌঁছে যাবেন।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

৭ এখন বাংলা গল্প • হাসান আজিজুল হক

সাক্ষাৎকার

১০ মুখোমুখি হাসান আজিজুল হক • চন্দন আনোয়ার

ছোটগল্প

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ১৮ বুর্জোয়ারা নিপাত যাক
• বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর | ১১০ উড়ন্ত গিরিবাজের ইন্দ্রজাল
• পাপড়ি রহমান |
| ২২ কাঠগড়ায় কদম আলী
• হাসনাত আবদুল হাই | ১১৬ স্মৃতি • আহমাদ মোস্তফা কামাল |
| ২৮ যদি • জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত | ১২০ অন্তর্লীন • প্রশান্ত মৃধা |
| ৩২ হুমোন • বুলবন ওসমান | ১২৬ ছেলেটা আসলে মরতোই
• মহীবুল আজিজ |
| ৩৬ একা দাঁড়িয়ে থাকা • সেলিনা হোসেন | ১৩০ অনন্তকে যে পেয়েছিল আর যে পায়নি
• হুমায়ূন মালিক |
| ৪০ ঘোঁয়ার অন্ধকার • রেজাউর রহমান | ১৩৮ হরবোলার হৃদয়বৃত্তান্ত
• রফিকুর রশীদ |
| ৪৬ ছয় মিটার দূরত্ব • ওয়াসি আহমেদ | ১৪৪ তিমিরের তীরে • মনি হায়দার |
| ৫২ যমুনা • ইমদাদুল হক মিলন | ১৫০ লজ্জিত ঘাস • শাহনাজ মুন্সী |
| ৫৮ সম্মতি • সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম | ১৫৬ সুখস্বপ্নের দিন • চন্দন আনোয়ার |
| ৬৪ বরষ ধরা মাঝে • পূর্ববী বসু | ১৬২ খসড়া উপন্যাসের সম্ভাব্য প্রথম
পরিচ্ছদ... • মালেকা পারভীন |
| ৭০ বুড়ো গাছ নিখিল অন্ধকারে
• সুশান্ত মজুমদার | ১৬৮ শিবানি ও সাপ • রাশেদ রহমান |
| ৭৬ এখানে নয় অন্য কোনোখানে
• জাকির তালুকদার | ১৭৬ একচিলতে আকাশ • মাহবুব রেজা |
| ৮০ চাবি এবং ভালোবাসা
• হরিশংকর জলদাস | ১৮২ অবিশ্বাসের পিনিস
• সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম |
| ৮৪ আলীবাবার বাসায় দুই চোর
• মঈনুল আহসান সাবের | ১৮৬ বর্ণিল ক্যানভাস • ওয়াহিদা নূর আফজা |
| ৯৪ তোমার চরিত্র খারাপ
• আন্দালিব রাশদী | ১৯৪ খনন • নাসিমা আনিস |
| ১০০ স্বপ্নের সারস ওড়ে সুবর্ণপুরাণে
• পারভেজ হোসেন | ১৯৮ মান-সম্মান • ফারুক মঈনউদ্দীন |
| | ২০৪ কলুঞ্চাল • মুর্শিদা জামান |
| | ২০৮ নিশি • মাহবুব আজীজ |
| | ২১২ শেষ ওভার • সাজ্জাদ মারুফ |

লেখা পাঠাবার ও যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, কালি ও কলম, বেঙ্গল সেন্টার, প্লট-২, সিভিল এভিয়েশন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯, বাংলাদেশ।

ফোন : ০৯৬৬৬৭৭৩৩১১, ০৯৬০৬৭৭৩৩১১।

কালি ও কলমে পাঠানো রচনার সঙ্গে ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা গেল।

আইস মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে আবুল খায়ের কর্তৃক কুশল সেন্টার, প্লট ২৯, সেক্টর ৩, উত্তরা আ/এ, ঢাকা-১২৩০ থেকে প্রকাশিত এবং এম কে প্রিন্টার্স অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৮৯/এ তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : বেঙ্গল সেন্টার, প্লট ২, সিভিল এভিয়েশন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

ফোন : +৮৮০ ২। ০৯৬৬৬৭৭৩৩১১, ০৯৬০৬৭৭৩৩১১ ই-মেইল : mail@kaliokalam.com। ওয়েব : www.kaliokalam.com



এখন বাংলা গল্প

হাসান আজিজুল হক

প্রায় সব লিখিত ভাষাতেই সাহিত্য-বৃক্ষের তরুণতম শাখাটি হলো ছোটগল্প। সবচেয়ে পুরনো শাখার বা বৃক্ষটির মূল কাণ্ডই মহাকাব্য ও কাব্য। মহাকাব্যের এই ইতিহাসটা পুরনো হলেও আধুনিক কবিতা দেখা দিয়েছে অনেক পরে। জলমগ্ন চরে জল শুকিয়ে গেলে সেটা সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে পরিণত হয় না। তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডে পরিণত হতে গেলে জলস্রোত তার অনেক আগেই রুদ্ধ হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তারপর ধীরে-ধীরে মাটি, ঘাস, শাখা-প্রশাখাবহুল বৃক্ষের সমাহার। আমাদের সাহিত্যের জমিতেও দেখা যাবে, কবিতাই সবচেয়ে পুরনো এবং তার মূলটি সবচেয়ে গভীরে প্রোথিত আছে। এ হিসেবে একালের ছোটগল্পের ইতিহাস অর্বাচীনকালের বললে ভুল হবে না।

মেঘের গর্জন যেমন কানের মধ্যে গড়িয়ে-গড়িয়ে বাজতেই থাকে, বিদ্যুৎ চমক এক পলকও স্থায়ী হতে চায় না। কিন্তু ওই এক পলকের দ্যুতিই তীব্রতম আলো দিয়ে থাকে। ছোটগল্প সম্পর্কে এই তুলনাটাই এতক্ষণ ধরে মনে-মনে খুঁজছিলাম। সাহিত্যের বিশাল ভারী শরীরে ছোটগল্পের বিদ্যুৎচিকুর বোধে আনার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মানুষের মন, ভাবনা, উপলব্ধি, কল্পনাধারা এতই অস্থির আর বহুমুখী, তাকে কোনোমতেই একসঙ্গে আটকে রাখা যায় না। ছোটগল্পকেও একরকম করে বোঝাতে গিয়ে আর একরকম হয়ে যায়। আবার আরো আরেকরকম করে বোঝাতে গিয়ে আকস্মিকভাবে

ভিন্ন রকম হয়ে দেখা দেয়। অনেকটা পারদের মতো। কোথাও স্থির থাকতে চায় না। এবার মাত্র দুশো-আড়াইশো বছরের পুরনো ছোটগল্প শাখাটি মাথায় আনার চেষ্টা করে দেখুন। কোথাও তাকে মুহূর্তের জন্য স্থির রাখতে পারছেন না। সেই জন্যে যাকে অতি সূক্ষ্ম তারেও বাঁধা যায় না, তাকে মোটা রশিতে বাঁধার চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। কাজেই ছোটগল্প সম্বন্ধে আমার নির্দিষ্ট কোনো কথা নেই। এ কথাহারা হওয়াটাকেই আমি কথার বা ছোটগল্পের একমাত্র সংজ্ঞা বলে মনে করি।

মানুষ চিরকাল গল্প শুনতে চেয়েছে। সে তার মস্তিষ্কের উত্তম গ্রন্থিগঞ্জ দিয়ে মুখে-মুখে গল্প তৈরি করা এবং বলা সম্ভব করে তুলেছে। গল্পেরও কোনো অভাব ঘটেনি, গল্প বলারও কোনো অভাব ঘটেনি। গল্পের পর গল্প, তারপর আবার গল্প, আবার গল্প, তারপর গল্প শেষ। জীবনও আর নেই। অতএব গল্পের অভাব কখনো হয়নি, গল্প বলা এবং শোনার লোকেরও কোনো অভাব হয়নি। মানুষ গল্প দিয়েই তার পৃথিবী রচনা করেছে। গল্প দিয়েই তার পৃথিবী ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। বালির প্রাসাদের মতোই জীবনের গল্প তৈরি করেছে এবং ভেঙেছে। এর মধ্যে হঠাৎ শ-দুই আড়াইশো বছর আগে সাহিত্য-বৃক্ষের একটা তেজস্বী শাখা বেরিয়ে এলো। তার পাতাগুলি সুচিক্ণ, সবুজ; শাখা কমণীয় অথচ ভঙ্গুর নয়। আমরা এরকমভাবে লিখিত সাহিত্যের ভিতর থেকে এই যে শাখাটির উদ্গম লক্ষ্য করি তাকেই ছোটগল্প বলতে চেয়েছি। তাহলে প্রতিদিন সহস্র গল্প নির্মিত

জীবনের টানা প্রবাহের
মধ্যে যদি কিছু
অণু-পরমাণু, কিছু
সুদৃশ্য পাথরকণা বা
হীরককণা হঠাৎ দেখা
দেয় সেটাকে আমরা
দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ
করতে চাই। প্রবহমান
জীবনের এই খণ্ডচিহ্ন
অথচ অনবরত চলমান
স্রোতের ছিন্ন পৃথক
কণাগুলিকে অবলম্বন
করে পূর্ণাঙ্গ কিছু
সৃষ্টি করা ছোটগল্পের
কাজ।

হচ্ছে যার কেউ অল্পপ্রাণ, কেউ ধাতবকঠিন, কেউ প্রাচীন শিলার মতো অক্ষয় ও মৃত্যুহীন। এই সামান্য দুশো-আড়াইশো বছরের মধ্যে এরকম যে-শাখাটি জন্ম নিয়েছে তাকেই কি ছোটগল্প বলতে হবে?

বর্ণনা, বিবরণ পেশ করার চাইতে সরাসরি উদাহরণ সামনে আনলেই বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করা যাবে বলে আমার মনে হয়। কিছু ছোটগল্পের কথা বলি তাহলে। ইতালীয় লেখক ডেকামেননের যে-বইটা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে অনেক ছোট-ছোট কাহিনি ছিল। সরল, সোজা কাহিনি। তবু আমরা ডেকামেননের ‘কথা’গুলোকেই ছোটগল্পের উন্মেষের উদাহরণ বলে মনে করি। কিন্তু আজ ছোটগল্প যে তুঙ্গ স্পর্শ করেছে তাতে ডেকামেননের ‘কথা’গুলোকে আর ছোটগল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় মহাকাব্য না লিখে গীতিকবিতার দিকে কেন গেলেন একটি কবিতার কয়েকটি পঙক্তিতে তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন :

আমি নাব্য, মহাকাব্য
সংরচনে ছিল মনে
কিন্তু তোমার কিনকিনিতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

ছোটগল্পের বেলাতেও এই কথাটা অনেকটা খাটে। অণু-পরমাণু দিয়েই বিশ্ব গড়া। কিন্তু অণু-পরমাণু সহজে চোখে পড়ে না। জীবন যখন একটানা বয়ে চলে, তখন তাতে সম্বিতহারা না হওয়া পর্যন্ত ছেদ চোখে পড়ে না। অথচ এই নিঃশব্দে গভীর প্রবহমান স্রোত কিছ্র বিন্দু-বিন্দু জল দিয়েই সৃষ্টি। জীবনের টানা প্রবাহের মধ্যে যদি কিছু অণু-পরমাণু, কিছু সুদৃশ্য পাথরকণা বা হীরককণা হঠাৎ দেখা দেয় সেটাকে আমরা দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে চাই। প্রবহমান জীবনের এই খণ্ডচিহ্ন অথচ অনবরত চলমান স্রোতের ছিন্ন পৃথক কণাগুলিকে অবলম্বন করে পূর্ণাঙ্গ কিছু সৃষ্টি করা ছোটগল্পের কাজ। একটি অতি দীর্ঘ জীবনকে ছোট্ট একটা রূপের কৌটোয় যদি ভরে নেওয়া যায়, দৈনন্দিন জীবনের ভিতর থেকে হঠাৎ আলোর ঝলকানি বা নিশ্চিন্দ আঁধারের কোনো একটা জমাট মুহূর্ত আমরা যদি ভাষার বাঁধনে চিরস্থায়ী করে আটকাতে পারি, সেটাকে কি ছোটগল্প বলা যাবে? আবার বলি, বর্ণনা-বিশ্লেষণের চাইতে উদাহরণ বেশি কার্যকর। ছোটগল্পের পরিসর খুব ছোট হোক, মাঝারি হোক, দীর্ঘ হোক, তাকে সময়ের জমাটবাঁধা একটা আকার হিসেবে মনে করা যায়।

আমরা এবার দু-একটি ছোটগল্পের কথা বলব। কারণ ওই যে একটু আগেই বললাম, বর্ণনা-বিশ্লেষণের চেয়ে উদাহরণ শ্রেয়। বাংলা ছোটগল্পের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথকে পাই। তার আগে কথাসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্যের পত্তন ভালো করে হলেও, এমনকি আখ্যায়িকা জাতের রচনা কিছু মিললেও বাংলা ভাষার প্রথম ছোটগল্প

লেখক এবং সম্ভবত এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কিছু গল্পের উল্লেখ করি : ‘পোস্টমাস্টার’, ‘সমাপ্তি’, ‘ছুটি’, ‘কঙ্কাল’, ‘ক্ষুধিত পাষণ’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘সম্পত্তি সমর্পণ’, ‘গুপ্তধন’, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’, ‘একরাত্রি’, ‘শান্তি’ ইত্যাদি অনেক গল্পের কথাই আমাদের মনে পড়বে। তাঁর শেষের দিকের গল্প ‘রবিবার’, ‘ল্যাবরেটরি’ তো বটেই, এমনকি ছোট-ছোট উপন্যাসকেও একদিক থেকে ছোটগল্পই বলা যায়। চতুরঙ্গ, চার অধ্যায়, দুই বোন ইত্যাদি ঠিক উপন্যাস নয়, আখ্যায়িকাও নয়। এদের জন্যে সাহিত্যের আলাদা জাঁর খুঁজতে হবে। এইসব গল্প আমাদের সাহিত্যে চিরকালীন সম্পদ। এই একই সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত আলী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এমনসব লেখকের একটি-দুটি গল্প উল্লেখ করা যায় যেগুলো আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে বলে মনে করতে পারি। এই কথাগুলি যখন বলছি তখন মাথায় ঘুরছে ইভান তুর্গেনেভ, আন্তন চেকভ, লেভ তলস্তয়, ফিওদর দস্তয়েভস্কি, ও’হেনরি, গি দ্য মোপাসাঁ, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, উইলিয়াম ফকনার, মার্ক টোয়েন, এডগার অ্যালান পো — এঁদের নাম ও তাঁদের কিছু-কিছু গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। মূল্যবান রত্নের মতো এসব গল্প। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই তালিকাই চূড়ান্ত। পাঠককে মনে না করিয়ে দিলেও তারা এডগার অ্যালান পোর ‘দ্য ফল অব দ্য হাউস অব আশার’, চেকভের ‘দ্য কিস’, একালের চিনুয়া আচিবি ও আরো কিছু আফ্রিকীয় লেখকের অসহনীয় নিষ্ঠুর বাস্তবতার গল্প মনে করবেন। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস খুব বেশি গল্প লেখেননি। তবু তাঁর কিছু গল্প আছে যা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর ‘ইনোসেন্ট’, ‘ইরিন্দ্রা অ্যান্ড হার ড্রুয়েল গ্র্যান্ডমাদার’ কিংবা ‘নো ওয়ান রাইটস টু দ্য কর্নেল’ — এসব নভেলাধর্মী গল্পের তুলনা মেলা ভার। অথচ আমরা খেয়ালই করি না, মার্কেস কিংবা তাঁর চেয়েও সরেস ছোটগল্পকার হুয়ান রুলফো, আলেহো কার্পেস্তিয়ের, বোর্হেস প্রমুখ লাতিন আমেরিকার এই ধরনের অনেক লেখকের গল্প আমরা পেয়েছি যাঁদের লেখা পড়ে মনে হয় ছোটগল্প তার নির্মাণের তুলে পৌছে গেছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের বাংলা ভাষার গল্পের বর্তমান অবস্থাটি কী? এইটুকু বলতে পারি, খুব খারাপ হচ্ছে আমাদের লেখা ছোটগল্প তা ঠিক নয়। গল্প এখন নতুন-নতুন দিকে বাঁক নিয়েছে, সমাজের কাঠামো বদলাচ্ছে, রাষ্ট্রের প্রকৃতিও অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তের বাস্তবতা হাতের তালু বেয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। নগর, শহর, গ্রাম কেমন একটা হতচ্ছাড়া চেহারা নিয়েছে। গল্পও কি তারই মতো ছেঁড়া-খোঁড়া, তালি মারা হয়ে যাবে? গল্পপাঠকরা হয়তো এই দিকেই চেয়ে আছেন। □

আমি যে সমাজে বসবাস করি যে দেশে বসবাস করি
তার সমস্ত কিছুই সঙ্গে আঁঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি।
কাজেই মানুষ যেখানে বসবাস করে, সেটার যে চতুর্পাশ,
মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়,
সেটাকে কোনভাবেই সরানো যায় না,
সেটা সর্বক্ষেত্রেই

আমি কিছুই আবিষ্কার করতে পারি
তৈরি করতে পারি

বলা যায় অভিজ্ঞতা দিয়ে একেবারে ত

মুখোমুখি হাসান আজিজুল হক

চন্দন আনোয়ার



রাঁজশাহী মহানগরের পূর্বদিকের প্রায় শেষ সীমান্তে অর্থাৎ ঢাকা রোডে শহরের প্রবেশমুখে ফল গবেষণা কেন্দ্রের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয় হাউজিং সোসাইটি সংক্ষেপে বিহাসের প্রবেশ গেট দিয়ে ঢুকেই হাতের বাঁয়ে একটি বাড়ি ও একটি নির্মাণাধীন বাড়ির পরের বাড়িটিই বাংলা ছোটগল্পের বরপুত্র, বর্ষীয়ান কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের বাড়ি, নাম 'উজান'। দোতলা বাড়িটির নিচতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের রুমটিই তাঁর লেখার ঘর। রুমের খোলা জানালা দিয়ে যদূর চোখ যায় বিস্তীর্ণ মাঠ, ফসলাদি, কৃষক, গরু-ছাগলের বিচরণ দেখা যায়। বৈশাখের দুপুর, টানা তাপদাহ চলছে, এরই মধ্যে হাজির হই হাসান আজিজুল হকের বাসায়। কালি ও কলমের সম্পাদক মহোদয়ের আস্থানে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে (২২ এপ্রিল ২০১৬) আসার পরে পেয়ে যাই লেখকের বর্তমান নিত্যসঙ্গী, দীর্ঘকালের সহকর্মী প্রফেসর মহেন্দ্রনাথ অধিকারীকে। দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্ণ সময় তিনি উপস্থিত থেকে



যেমন হয়ে

হয়েছে

না, **নির্মান** করতে পারি না।

আমি বড় অদ্ভুতভাবে **মাটিলা** এবং
মাষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

অলংকরণ : অশোক কর্মকার

আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের অন্যতম প্রাণপুরুষ হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-) বাংলা ছোটগল্পের পালাবদলের নায়কদের একজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অসহ্য উত্তাপ থেকে গুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, সাতচল্লিশের দেশভাগ, পাকিস্তানি দুঃশাসন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সব ইতিহাস তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা মোট ৯টি : সমুদ্রের স্বপ্ন : শীতের অরণ্য, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, জীবন ঘষে আগুন, নামহীন গোত্রহীন, পাতালে হাসপাতালে, আমরা অপেক্ষা করছি, রোদে যাবো, মা-মেয়ের সংসার, বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প। সম্প্রতি আগুনপাখি ও সাবিত্রী উপাখ্যান উপন্যাস লিখে ঔপন্যাসিক হিসেবেও খ্যাতি পেয়েছেন। গল্প-উপন্যাসের বাইরে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে বিপুল পরিমাণ মননশীল প্রবন্ধ ও তিন খণ্ডে স্মৃতিকথা লিখেছেন। তাঁর কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক,

আনন্দ পুরস্কারসহ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

চন্দন আনোয়ার : স্যার, বাংলা গল্পের জন্ম এত বিলম্বে কেন? হাসান আজিজুল হক : খুব দেরি আর কই। বাংলা গদ্যই তো অনেক পরের কথা। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রমাণ পাই নবম-দশম শতাব্দীতে। তারপর আর দুশো বছর কোনো খবর নেই। আবার চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে আমরা বাংলা ভাষার সৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ইত্যাদি পেয়েছি। সে অর্থে বাংলা ভাষার ইতিহাসটা এক হাজার বছরের পুরনো বললেও সেটা নিরবচ্ছিন্ন নয়। ক্রমাগত চর্চা হচ্ছে, বদলাচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে, আস্তে আস্তে উন্নতও হচ্ছে। শ্রীচৈতন্যের আমলেই বাংলা ভাষাটা বলা যায় অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

তারপর ব্রিটিশরা এসেছে। তখন তো যাচ্ছেতাই খারাপ অবস্থা। নবাবি আমলের পতন হয়েছে। ব্রিটিশরা তখনই ক্ষমতা নেয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অংশে তারা কেবলমাত্র বসবে-বসবে বসছে। ভারতবর্ষের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে চিন্তা করার সময় পায়নি। বরং এখানকার যে ভাষা-সংস্কৃতি আছে সেগুলো মেনে নেওয়াই

চ. আ : ব্যক্তির মুক্তির কথা বলছেন, কিন্তু আপনার গল্পে প্রধানভাবে সমষ্টির লড়াই দেখি; 'জীবন ঘষে আগুন' এবং আরও বেশ কিছু গল্পে, এমনকি আপনার প্রথম গল্প 'শকুন'-এ সমষ্টির দ্রোহ। সমষ্টির দ্রোহের প্রতি আপনার এত গুরুত্ব কেন? মার্কসবাদী চিন্তা কোনোভাবে সক্রিয় ছিল?

হা. আ. হ : ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়েই না সমষ্টির দ্রোহ সম্ভব। মার্কসবাদ সাদামাটা বললে একেবারেই ঠিক নয়। আমাকে তো খেয়াল করতে হয়েছে, কিছু একটা পালটাতে সমষ্টি লাগবে। আর ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করবে, তার জন্যে সমাজে একটি বিশেষ জায়গা আছে। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিই সর্বসর্বা, সমাজের ধনসম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যায় ব্যক্তির কাছে। সমষ্টি বলতে আমি সমাজটাকে, রাষ্ট্রটাকে, মানবপ্রজাতিকে বোঝাতে চাই। একবারে মাইনরিটি যারা, তাদের নিয়ে লিখব না। ৫% ধনী সম্পদের সিংহভাগ দখল করে আছে কিন্তু ওরা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি বলি, পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন হয় আর পাঁচ বছর করে গণতন্ত্র কুক্ষিগত হয়। আমার স্মৃতির কোথাও নেই জনগণ। কারণ একটি এলাকায় তিন লক্ষ ভোট আছে, আমি সেটা জানি না কে দিয়েছে, আমি পার্লামেন্টে গিয়ে দাবি করব আমি ওই এলাকার প্রতিনিধি, এটা মানতে হবে। তাহলে যেটা প্রতিনিধিত্বশীল, তা ব্যক্তিস্বার্থের ওপরে নির্ভর করে। গণতন্ত্র সেটা ইনসিওর করতে পারে না। যেসব গণতন্ত্র চলছে, এসব দিয়ে কখনই মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। আমরা বড়জোর বলতে পারি যে, যতটা সম্ভব মানুষের মুক্তির কাছাকাছি যাওয়া যায়। ব্যক্তিমানুষ কোনো প্রতিনিধিত্ব করে না, ব্যক্তিগুলির শক্তি যে জমাট বেঁধেছে, এইটুকু বোঝানো যেতে পারে সমষ্টির দ্রোহ দিয়ে। একটা মানুষ প্রতিবাদ করলে কিছু হবে না। তাই সমষ্টিকে গুরুত্ব দেই বেশি।

চ. আ : আপনার 'জীবন ঘষে আগুন' বা 'বিধবাদের কথা' এগুলোকে ছোটগল্পের সংজ্ঞায় ফেলতে গেলে ভীষণ মুশকিল হয়। উপন্যাস ভাবলেই বরং স্বস্তিদায়ক হয়।

হা. আ. হ : আমি তো কোনো সংজ্ঞা মানি না। আমার কোনো দীক্ষা নেই। বিখ্যাত বিখ্যাত গল্পগুলো আমি অনেক পরে পড়েছি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলো ছাড়া মানিক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সতীনাথ এঁদের গল্প আমি অনেক পরে পড়েছি। কাজেই এঁদের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমার ইঞ্জিনে কেউ কয়লা দেবে না, বুঝলে? আমার ইঞ্জিনে যতটুকু গ্যাস আছে সেই গ্যাসেই আমার চলতে হবে। এজন্যেই বলি, আমার গল্পে কারো দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপার তেমন কখনই ঘটেনি।

চ. আ : গল্পই আপনার উপন্যাসের চাহিদা মিটিয়েছে, টানা পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু গল্পই লিখেছেন, জীবনের প্রৌঢ়তায় পৌঁছে উপন্যাস লেখায় মন দিয়েছেন। তাহলে কি গল্প আর আপনার উপন্যাসের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না?

হা. আ. হ : তা নয়। মূল্যটা দুটোরই আলাদা-আলাদা। আপাত মনে হচ্ছে, ছোটগল্প লেখার মধ্যে আমি আর নেই। ঢুকতে পারি কি পারি না, সেটা পরে দেখব। গল্প থেকে সরে এসেছি তা নয়, ওই কারণে যে লিখছি না তা নয়। উপন্যাস উপন্যাসের জায়গায় আছে, ছোটগল্প ছোটগল্পের জায়গায়। আমি গল্প লেখার ইচ্ছা বা চাহিদাকে অস্বীকার করছি না।

চ. আ : আপনার প্রথম গল্প 'শকুন'-এ তরুণ গল্পকারের শৈল্পিক নিরাসক্তি, ব্যক্তিত্বের ওপরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলো পড়েছে, ঠিক বলেছি কি?

হা. আ. হ : ১৯৬০ সালে 'শকুন' লেখার সময় তো আমি মানিকের গল্প পড়িইনি।

চ. আ : কিন্তু প্রতিবাদ রচনার স্টাইল, মহাজন-জোতদারের

প্রতীক চরিত্র শকুনটাকে নিয়ে বালকবাহিনীর যে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা এবং এর মধ্যে যে-প্রতিবাদ রচনা করে, এ-প্রতিবাদের ভাষা, সর্বোপরি সমাজের শোষণশ্রেণির বিরুদ্ধে তরুণ লেখকের যে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর আক্রমণ, সেখানে ভাবলে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-সতীনাথ-কমলকুমার তেমনভাবে কেউ-ই আসেন না, একমাত্র মানিকই সামনে এসে দাঁড়ান এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে দাঁড়ান।

হা. আ. হ : ওটা হচ্ছে না। তোমার এই মূল্যায়নের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। মানিকের গল্পের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য চেনা আছে, নির্মাণের চেয়ে বৈশিষ্ট্য চেনাই বেশি। যেমন, 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' গল্পে সমাজের যে জঘন্য বিধ্বংসী চেহারা আছে, সেখানে মাফ-মার্জনা কোনো কিছুই নেই। আমার গল্পে সেই রকম নেই। আমার গল্পে ছেলেরা ধূলিধূসরিত বাস্তব, উপোষী, ক্ষুধার্ত, যেটা সমাজের বাস্তব চেহারা।

চ. আ : মুসলমান গল্পকার চল্লিশের আগে এলো না কেন?

হা. আ. হ : এর তো সাহিত্যিক ব্যাখ্যা নেই। এর ব্যাখ্যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক। সমাজের দু-ভাগের এক ভাগ যদি সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে থাকে, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, তাহলে হবে কী করে?

চ. আ : হঠাৎ করে চল্লিশের দশকে এসে একদল মেধাবী মুসলমান গল্পকার পেয়ে গেলাম, এর মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতো পাইনিওর পেলাম, যিনি সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তারপর পঞ্চাশ-ষাটের দশকে পেলাম আর একদল মেধাবী গল্পকার; যাদের হাতে বাংলাদেশের ছোটগল্পের সূচনা, বিকাশ ও সমৃদ্ধি; এ-সময়েই মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বা রাষ্ট্রের দাবি উঠেছে, যার প্রেক্ষিতে দেশভাগ হয়েছে; আমার প্রশ্ন হলো, এত অধিক সংখ্যক মুসলমান গল্পকারের প্রায় হঠাৎ আবির্ভাবের ক্ষেত্র কি তৈরি করে দিয়েছে দেশভাগ?

হা. আ. হ : না, ঠিক বলছ না। যে রাষ্ট্রটা হয়েছে, সে রাষ্ট্রটা কে চেয়েছেন? কোন গল্পকার চেয়েছেন, তাঁর নাম বলো আমাকে? তাঁরা তো কেউই পাকিস্তান চাননি, তাহলে তাদের মধ্যে কিসের উদ্দীপনা তৈরি হবে?

এই সময়টায় তো পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবী আলাদা হয়ে গেছে। ব্রিটিশরা যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার কেমন ছিল, ওরা যখন যায় তখন শিক্ষার হার কী রকম ছিল? শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বেড়েছে। পাকিস্তানবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন, বিশেষ করে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ক্রমাগত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশ — এসব হচ্ছে তো।

চ. আ : কাহিনি নির্ভর বক্তব্যপ্রধান গল্পের যে ধারা চার-পাঁচের দশকে বিকাশ লাভ করে, ষাটের দশকের গল্পকাররা সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে গল্পবর্জনের ধারা প্রচলনের চেষ্টা করলেন; কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে দেখা গেল, আপনি এই দুই ধারার মধ্যবর্তী একটি অবস্থান গ্রহণ করলেন। সচেতনভাবেই করেছেন নিশ্চয়?

হা. আ. হ : সচেতনভাবে করিনি। আমি এসব কিছুই ভাবিনি। প্রথম কথা, তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, আমি কখনই কলকাতা বা ঢাকায় বসবাস করিনি। ষাটের দশকে যা কিছু আন্দোলন-টান্ডোলন হচ্ছে সেগুলো সবই ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক। আমি তখন রাজশাহীতে পড়ে আছি। আবদুল মান্নান সৈয়দ বা অন্যরা কী সব ইজম বা থিওরি আমদানি করার চেষ্টা করছেন, ওসবের ধার আমি ধারি না। আমি গভীরভাবে ফিলোসফি পড়েছি। ফিলোসফিতে মাস্টারি করার চেষ্টা করেছি, আর লেখক হওয়ার চেষ্টা করেছি। কোথাও ধার করে আমি ফিলোসফি আনার চেষ্টা করিনি। ওই

ভালো ভেবেছে। সেজন্যে অনেকদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজমই প্রধান চর্চার বিষয় ছিল। ডেভিড কফ বই লিখেছেন। তারপরে বাংলা গদ্যের আবির্ভাব উনিশ শতকের গোড়াতে। বিদ্যাসাগরমশাই বাংলা গদ্যকে রূপ দিয়েছিলেন মাত্র। আমাদের সৌভাগ্য, প্রথম গুরুই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। অর্থাৎ বাংলা গদ্য লেখা শিখিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনিই প্রথম বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য লেখার চেষ্টা করেছেন। যদিও তৎসম শব্দবহুল, কিন্তু কেউ খেয়াল করে না যে, তার মধ্যে প্রচুর দেশি বাংলা শব্দও ব্যবহার হয়েছে। এটা তাঁর আত্মজীবনীতে দেখা যায়।

চ. আ : বাংলা গদ্যের তিনি নব-নির্মিত দিয়েছেন; আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা-সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল; গভীর জীবনবোধ, জাতীয়তাবোধ, বাস্তবতাবোধ, আখ্যান-চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা ইত্যাদি যা-ই বলি না কেন, আধুনিক যে-কোনো কথাশিল্পীর চেয়ে কোনো অংশেই কম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, তিনি গল্প-উপন্যাস লেখার কথা ভাবলেন না কেন? সমাজ সংস্কারের দায় পালন করতে গিয়েই... (বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়নি)

হা. আ. হ : না, না, একথা মোটেই ঠিক না। সমাজ সংস্কারের দায় পালন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর গল্প-উপন্যাসের কথা ভাবেননি একথা মানতে পারছি না। কথাসাহিত্যের আবির্ভাব ওঁর হাতে হয়নি। গ্রিকদের কথাসাহিত্য হলোই না। হলো অনেক পরে। অথচ তাদের গ্রিক ভাষা থেকে মহাকাব্য হলো, গদ্য হলো, কিন্তু তার গল্প বা কথাসাহিত্য হলো না। হেরোডোটাস, থুকিডাইডিস ওঁরা ঐতিহাসিক, গদ্য লিখেছেন, কিন্তু গল্প লেখেননি। কবিতায় দু-একজনের নাম পাওয়া যায় কোনোরকম।

চ. আ : বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপন্যাসই লিখলেন, ইচ্ছে করলে গল্পের ফর্মটাও তিনি তৈরি করতে পারতেন, আমার বিশ্বাস, আপনার কী মত?

হা. আ. হ : কার হাতে কী হবে বলা যায় না। হয়তো তিনি এদিকে মনোযোগ দেননি। তিনি বিশ্বসাহিত্যের গল্প সম্পর্কে জানতেন না, তা তো নয়। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেননি একথা ঠিক, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যেটা আখ্যান, সেটা ছোটগল্পের পত্তনই বটে। যেমন : *রাধারানী*। এরকম আরো দু-একটি আছে। ওর চাইতে সাইজে অনেক বড় গল্প তো লেখা হয়েছে। তবে একথা ঠিক, তাঁর আখ্যানগুলো প্রকৃত ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি।

চ. আ : অবশেষে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক প্রবর্তন ও বিকাশ ঘটে রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের হাতে, ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নিবিড় বলেই কি?

হা. আ. হ : রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলেই তোমরা ‘রোমান্টিক’ শব্দটি বলো কেন? রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন বলে যে, আমি জন্ম রোমান্টিক। রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বাস্তববাদী লেখক তুমি কয়জন দেখেছ? গদ্য লেখাগুলো দেখো, এমনকি কঠিন যে বাস্তবমুখী গল্পগুলি দেখো; ভাইকে বাড়ি রাখতে হবে বলে স্বামী তাকে খুব অপছন্দ করছে, মাঝখানে একটা বউ মারা যাচ্ছে, দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে ছোট বউয়ের ওপরে, দোষ কাঁধে নিয়ে ফাঁসি হচ্ছে — বাস্তববাদী না হলে কি লেখা সম্ভব? শুধুমাত্র রোমান্টিক বলছ কেন? রবীন্দ্রনাথকে এমন এক কথায় একটা জায়গায় আটকে দিচ্ছ কেন? এভাবে লেবেল লাগিয়ে যদি বলো, তাহলে রবীন্দ্রনাথ তোমাকে একশবার বলে দিতে পারেন, আমি রোমান্টিক নই। বরং উলটো। তা না হলে তিনি ‘পোস্টমাস্টার’ লিখতে পারতেন না, তা না হলে তিনি ‘কঙ্কাল’ গল্প লিখতে পারতেন না, ‘সম্পত্তি সমর্পণ’, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’ এ সমস্ত গল্প তিনি লিখতে পারতেন না। লিখেছেন কেন? বাস্তব সমাজজীবনটা দেখতে পেয়েছেন, সেজন্যে।

চ. আ : বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখতে এসেছেন, ততদিনে

মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যের ধারাবাহিকতায় আধুনিক বাংলা কাহিনি গদ্যের ধারা শুরু হয়েছে এবং লেখা হয়েছে *আলালের ঘরের দুলাল* ও *হতোম পাঁচার নকশা* উপন্যাস। কিন্তু দেখা গেল, বাংলা কাহিনিগদ্যের বিকাশকে প্রত্যাখ্যান করে বা অগ্রাহ্য করে সরাসরি ইউরোপীয় উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত মডেলকেই বাংলা উপন্যাসের মডেল হিসেবে গ্রহণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় মডেলই বাংলা উপন্যাসের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল; ফলে বাংলা ভাষায় নিজস্ব ঐতিহ্যে ও নিজস্ব ফর্মে কোনো উপন্যাস লেখা হয়নি। আমার প্রশ্ন হলো, বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব ঐতিহ্য ও ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গেলেন না কেন?

হা. আ. হ : বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকীয় ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সমস্ত মানসকাঠামো ওই শিক্ষাতেই গড়ে উঠেছে। ইংরেজরা আসার পরে দেশের পুরনো শিক্ষার ধারা ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। নতুন শিক্ষাধারার উনি হলেন একজন কৃতবিদ্য পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত নতুন ধারার শিক্ষিত মানুষের জন্যেই লিখেছেন। তাই তিনি উপন্যাসের ইউরোপীয় মডেলটাকেই গ্রহণ করলেন।

চ. আ : তাই বলে, একজন মনীষী লেখক তাঁর স্বজাতির ঐতিহ্যের দিকে তাকাবেন না? আধুনিক কাহিনিগদ্যের যে-ধারার সূচনা হয়েছিল, সেই ধারার কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই ইউরোপীয় মডেল গ্রহণ করলেন। গোড়ায় গলদ ঘটে গেল কিনা?

হা. আ. হ : শোনো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রখর বাস্তববাদী ছিলেন। বিভূতিভূষণ স্বপ্নের জগতের লোক ছিলেন। এগুলো তুমি জোর করে বলতে পারবে? কেন কোনো বিশেষ সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, একজন লেখককে একথা জিজ্ঞেস করা যায় না।

চ. আ : বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব ফর্ম ও ঐতিহ্য গড়ে না ওঠায় দেবেশ রায় দায়ী করেন বঙ্কিমচন্দ্রকেই, কারণ ‘তাঁর কাছে ইউরোপীয় উপন্যাসের মডেলটিই ছিল একমাত্র মডেল। সে-রকমভাবে উপন্যাস লিখলেই বাংলা উপন্যাস হবে, নইলে হবে না — বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ফর্ম সম্পর্কে ছিলেন এমনি স্থিরজ্ঞান এবং স্থির সিদ্ধান্ত’। (দেবেশ রায়, ‘উপন্যাস নিয়ে’)

হা. আ. হ : দেবেশ রায় দায়ী করতে পারেন। আমি কিন্তু অত প্রেম দেখাতে যাব না। ঐতিহ্য বলেই মানতে হবে, আমি এতটা রক্ষণশীল নই।

চ. আ : আমি যদি বলি, আপনি মনোজগতে এখনো রাঢ়ের অধিবাসী। আপনার দুটি উপন্যাস, চার খণ্ড স্মৃতিকথা, বেশ কিছু কালজয়ী গল্প রাঢ়ের ভাষা ও পটভূমিতে লেখা; এমনকি খুলনা বা রাজশাহী অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা গল্পেও রাঢ়ের পরিবেশ ও রাঢ়ের মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন থাকে।

হা. আ. হ : না, মোটেই না। আমি তোমার কথা মানতে পারছি না। আমার লেখায় কি খুলনা পাওনি? আমার গল্পে রাজশাহী পাওনি? সাধারণত হয় কি, যে জায়গার সঙ্গে অভিজ্ঞতার খুব একটা সম্পর্ক থেকে যায়, কিছু লেখার কথা মনে হলেই ওখানে চলে যায় স্মৃতি। সেজন্যে রাঢ় আমার মনোজগৎ অধিকার করে বসে আছে, সেটা ঠিক নয়।

আমি যে-সমাজে বসবাস করি, যে-দেশে বসবাস করি, তার সমস্ত কিছুর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি। কাজেই মানুষ যেখানে বসবাস করে, সেটার যে চতুর্পাশ, যেমন হয়ে মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়, সেটাকে কোনোভাবেই সরানো যায় না, সেটা সর্বক্ষেত্রেই হয়েছে। উইলিয়াম ফকনার দক্ষিণ আমেরিকার মিসিসিপির অধিবাসী ছিলেন, মার্ক টোয়েনকে বলা হয় মিসিসিপির পাড়ের লেখক; হেমিংওয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নিলেও তাঁর বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসের পটভূমি ইউরোপ বা কিউবা।

চ. আ : হোর্হে লুইস বোর্হেস এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, একটি গল্প লেখার আগে চমকপ্রদ সূচনাবিন্দু ও গন্তব্য ঠিক করে ফেলেন, কিন্তু গল্পের মধ্যে কী হবে জানেন না, সেটা আবিষ্কার করেন। একটি গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি কোন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যান?

হা. আ. হ : প্রথমেই আমার আপত্তি, তুমি বোর্হেসের কথা তুললে কেন? বোর্হেস কীভাবে গল্প লিখতেন তাতে আমার কী আসে যায়। সাধারণত কোনো একটা ঘটনা, কোনো একটা মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা, অথবা যে-ঘটনাটি ঘটেনি সমাজে কিন্তু এমন হয়ে আছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে সে ঘটনা ঘটতে পারে, বা অন্যভাবে ঘটছে, এরকমভাবে একটা জিনিস অবলম্বন করে আমি গল্প লিখি। অর্থাৎ আকাশে তাকিয়ে গল্প একটা করে নাজিল হবে, তারপর আমি গল্পটা লিখব, এটা আমার ক্ষেত্রে কোনোদিনই হয়নি। গল্প লেখা আমার কাছে বেশ কষ্টকর কাজ। কষ্টকর এইজন্যে, যখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল, আমি এ-বিষয়টা বা ঘটনাটা নিয়ে গল্প লিখতে চাই, তখন রূপ দেওয়ার ব্যাপারটা কী করে হয় আমি বলতে পারব না। আমি চেষ্টা করি যাতে খুব যথাযথ করা যায়, আমি চেষ্টা করি যেন একটুও বাড়াবাড়ি না হয়, এক শব্দও যেন বেশি না হয়, বরং এক শব্দ কম হয় যেন, টাইট হয় যেন জিনিসটা, বাক্য যেন ব্যঞ্জনাপূর্ণ, ইঙ্গিতপূর্ণ হয়। ভাষাটা যেন একেবারে ডাল না হয়। দৈনন্দিন যে-ভাষাটা, ঠিক সেরকমই ভাষা যদি হয়, দৈনন্দিন ঘটনা যদি ঠিক সেরকমই হয়, তাহলে আমি কেন লিখব? দেখো, পৃথিবীতে যত মানুষই হয়, প্রত্যেকেই কিন্তু আলাদা-আলাদা হয়, কথা বলে আলাদাভাবে। কারো কথা মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়, কারো কথা মনের মধ্যে ঢোকেই না, উড়ে চলে যায়। আমার ছোটগল্প লেখার ব্যাপারটাও কিন্তু তাই। যখন কোনো একটা অভিজ্ঞতার কথা ভাবি তখন আমি ভাবি এ-জায়গাটাতে একশভাগ সৎ থেকে এটা লিখতে চাই। সবসময় যে লিখতে পেরেছি তা নয় কিন্তু। মানুষকে নিজের জায়গা থেকে সরতে হয়, অনেক সময় পারা যায় না।

চ. আ : সমকাল ধরতে না পারলে গল্প-উপন্যাস বাঁচে না, আর সমকালকে ধরেও গল্প-উপন্যাস বাঁচে না, আপনার গল্পবিশ্বের গুটিকয় গল্প ছাড়া প্রায় সবই সমসাময়িক কোনো ঘটনা নিয়ে লেখা। প্রধানভাবে রাজনৈতিক ঘটনা এসেছে। আপনার গল্পের এদিকটা নিয়ে কথা বলুন।

হা. আ. হ : খুব ঠিক কথা। আমি সমকালকে নিয়ে বহু গল্প লিখেছি। সমকালকে সর্বকালের করার দায়িত্ব লেখকেরই। ছোটগল্প তো সেটাই করবে। এটা বিশেষ কিছু ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, কিন্তু আসলে এটা মানবিক অভিজ্ঞতা। এ-অভিজ্ঞতার লেবেলটা তুলে দাও, সর্বমানবীয় হয়ে উঠবে।

এই যে বিশেষকে নির্বিশেষ করে তোলা, চিরন্তন করে তোলা, এটাই লেখার কাজ। তা না হলে তো প্রত্যেকদিন যে যা দেখছি, আমার আর লেখার দরকার কী? তুমি বলবে যে, আমি ওই গ্রাম দেখেছি, আপনি সেই গ্রাম দেখেই লিখেছেন, তাহলে আমি আপনার গল্প পড়ব কেন? মানুষ হিসেবে যেমন আলাদা, নিশ্চিতভাবে আমার দেখা তোমার দেখার চেয়ে আলাদা হবেই। আমি আমার গল্পের মধ্যে, লেখার মধ্যে আমার দেখাটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তুমি সেখানে আকৃষ্ট হবে। তুমি হাজারবার সেই গ্রাম দেখলেও আমার গল্পের দেখা গ্রাম ভিন্ন হবে। তুমি যতবার আমার গল্প পড়বে, ততবারই নতুন করে দেখবে। এটা একদিক থেকে লেখকের দুর্ভাগ্য বটে, একদিক থেকে সৌভাগ্যও বটে। দুর্ভাগ্য কেন, লেখক যা মনে করেছিলেন তা না ভেবে অন্য কিছু ভেবে নিয়েছে পাঠক, লেখকের ভাবনার দিকে গেলই না পাঠক, টেক্সট কিন্তু যেমন-তেমনই পড়ে রইল। আর লেখকের তখন কিছু করারও নেই। তুমি যখন আমার গল্প পড়ছ, তখন তো আর আমি পাশে বসে বলতে পারি না, এভাবে নয়, এরকম। তোমার পাঠ-অভিজ্ঞতা লেখকের কাছাকাছি হতে পারে, দূরে হতে, বহু দূরে হতে পারে।

চ. আ : গল্পের ওপর অধিকার কার বেশি? পাঠকের, না লেখকের?

হা. আ. হ : অবশ্যই পাঠকের। লেখকের কাজ হচ্ছে লিখে ফেলা, তার পরে আর কোনো কাজ নেই। সাধারণত, লেখক আর তাঁর নিজের লেখা পড়েন না। কখনো কখনো ভুলেও যান। নতুন লেখায় মগ্ন হয়ে পড়েন। আমি যেমন কখনই আমার লেখা পড়ি না।

চ. আ : আপনার গল্পের চরিত্ররা পরিস্থিতির ফাঁদে পড়ে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত। এই লড়াইটাকে আপনি কীভাবে নির্মাণ করেন?

হা. আ. হ : যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মানুষকে খুব শক্ত কোনো একটি জায়গায় ফেলতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত লেখাটা দাঁড়াবে না। সেজন্যে যে-গল্পই লিখি না কেন, প্রধান চরিত্র বা অন্য চরিত্র কোনো না কোনো একটা জায়গায় আটকে আছে, সেখান থেকে বের করে আনার জন্যে লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করি। অস্তিত্বের ফাঁদে না পড়লে একটা মানুষকে তো বোঝাও যাবে না, চেনাও যাবে না। সেই কারণে মানুষকে চিনতে হলে, বুঝতে হলে তাকে ফাঁদে ফেলতে হবে। আর তোমার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে, সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া মানুষের জন্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং কাম্য। কিন্তু তা নয় সে, সর্বত্রই ফাঁদে পড়ে আছে। কিছু কিছু জিনিস আছে বাধ্যতামূলক। তার আর কিছুই করার নেই। হয়ে যাবেই। ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পের বৃদ্ধের বা তার কিশোরী কন্যার আর কিছুই করার ছিল না।

সমকালকে সর্বকালের
করার দায়িত্ব
লেখকেরই। ছোটগল্প
তো সেটাই করবে।
এটা বিশেষ কিছু
ব্যক্তির অভিজ্ঞতা,
কিন্তু আসলে এটা
মানবিক অভিজ্ঞতা।
এ-অভিজ্ঞতার
লেবেলটা তুলে
দাও, সর্বমানবীয়
হয়ে উঠবে। এই যে
বিশেষকে নির্বিশেষ
করে তোলা, চিরন্তন
করে তোলা, এটাই
লেখার কাজ।

সময়টায় বুদ্ধদেব বসু একটা ভয়ানক খারাপ কাজ করেছিলেন। বেশ তো, মেঘদূত অনুবাদ করেছ, ভালো কথা, বোদলেয়ার অনুবাদ করতে গেল কেন? বোদলেয়ার অনুবাদ করেই সে কিন্তু মাথাগুলো খেয়ে গেল আর কি। কবিতা খুব উলটাপালটা জায়গায় চলে গেল। তুমি খেয়াল করেছ, এরপরে আর কেউ তিরিশের দশকের কবিতাকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি।

চ. আ : গল্পের মায়ায় বন্দি হয়েছেন কখনো?

হা. আ. হ : আমি কিছুই আবিষ্কার করতে পারি না, তৈরি করতে পারি না, নির্মাণ করতে পারি না। আমি বড় অদ্ভুতভাবে মাটিলগ্ন এবং বলা যায়, অভিজ্ঞতা দিয়ে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেখানে আমি মনে করি, অনেকে আমার লেখা পড়ে বিরক্ত হতে পারে, তেমন গল্প নেই, নতুন চিন্তা নেই, নতুন কায়দা নেই, এ আবার কেমন কথা, সেটা আমার জন্যে বড় আশঙ্কারই কথা।

চ. আ : হঠাৎ আকর্ষণ, গুপ্ত রহস্য এসব গল্পে সাধারণত থাকে, কিন্তু আপনার গল্পে এসব নেই।

হা. আ. হ : আমি এসবের ধারেকাছে নেই।

চ. আ : আপনার গল্পের চরিত্র নির্মাণের কৌশল কেমন?

হা. আ. হ : আমি দেখেছি, অভিজ্ঞতার যাতে খাপ খায়। স্থান-কাল-বিষয়কে তো মাথায় রাখতেই হয় একটি চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে। বেশির ভাগই দেখা, আবছা একটা ধারণা — ওই যে লোকটা বিছানায় শুয়ে আছে, স্কুল কমিটির ভোটে দাঁড়িয়েছি, তাঁর কাছে ভোট চাইতে গেছি, সে বলছে, আমি যাব ভোট দিতে; ওই যে ডাক্তারটা, সে নাকি বিয়ে করেনি, ধবধবে সাদা চুল; উনুনে ফুঁ দিচ্ছে কয়েকটা মেয়ে, দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, সবকিছু মুখ একসঙ্গে দেখা গেল, ঝিলিকের মতো একটা ছবি আসে। বিশেষ কোনো মুহূর্তের এরকম কিছু একটা যদি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে চরিত্রের মধ্যে ব্যবহার করি।

চ. আ : আদিবাসীদের নিয়ে আপনার একটি গল্প আছে, সেখানে দেখা যায়, শহরের অভিজাত মানুষদের অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করে এনে অতিথিসেবার নামে নিষ্ঠুর আক্রমণ করে আদিবাসী যুবক।

হা. আ. হ : ‘দূরবীনের নিকট-দূর’ গল্পটির কথা বলছ। আক্রমণ করাটাই কিন্তু মূল উদ্দেশ্য। দূরবিন নামে আদিবাসী ছেলেটি আগাগোড়া আক্রমণ করে যায়, বলা যায় যে গালিগালাজই করে সম্মানের সঙ্গে। ইচ্ছেকৃতভাবেই আমি এসব করেছি।

চ. আ : একজন কথাশিল্পীকে নিজস্ব একটি গদ্যশৈলী নির্মাণের নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আর তার নির্মিত শৈলী ভেঙে আবার নতুন শৈলী তৈরি করে নিতে হয়। এভাবে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে আপনিও নিশ্চয় গিয়েছেন?

হা. আ. হ : তা বলতে পারব না। প্রথম লাইন আসার পরে ভাষা এমনতেই চলে আসে। তার বড় উদাহরণ হলো, ‘আত্মজা ও একটি করবী’ গাছ গল্পটি। গল্প অনেকটা অংশ লেখার পরে দেখি, আরে, এ তো সমরেশ বসুর গল্প হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিলাম। অনেক দিন পরে কোনো এক শরৎকালে একদিন গল্পটা লিখতে বসি। আমাদের গ্রামের বাড়ির ছাদের সিঁড়িঘরের পাশে একটা আমগাছ আছে, আম ধরে আছে আমার নাকের সামনে; ছোট্ট গোল একটা বেতের চেয়ার ছিল আমার, আর একটা টেবিল ছিল; টেবিলের ওপরে মাথা রেখে আমি হঠাৎ লিখলাম যে, এখন নির্দয় শীতকাল। এটার পরেই ঘামটা মুছে নিলাম। তারপরে কী করে লিখেছি জানি না, ‘অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়।’ শ্রোত গুরু হয়ে গেল। বাক্যগুলো একেবারে যেন মিছিল করে আসছে। একটার পর একটা।

চ. আ : কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা অনেকটাই লেখকের নির্মাণ; যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি*

উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষা মানিকের হাতেই প্রায় সৃষ্টি।

হা. আ. হ : একথাটি তোমাকে কে শেখাল যে মানিকের *পদ্মা নদীর মাঝি*র ভাষা কোথাও নেই।

চ. আ : কিন্তু ওরকম ভাষা হুবহু কোথাও আছে? পদ্মার তীরবর্তী মানুষরা কি এই ভাষায় কথা বলে?

হা. আ. হ : বাস্তবের সঙ্গে এগুলোর যোগ আছে।

চ. আ : আপনার *আগুনপাখি* উপন্যাসে ব্যবহৃত রাঢ়ের আঞ্চলিক ভাষাকে সম্পূর্ণই রাঢ়ের ভাষা বলে দাবি করছেন?

হা. আ. হ : একদম। একদম পরিষ্কার, ওখানে কোনো ফাঁকি নেই। রাঢ়ের শুধু নয়, হিন্দুদের শুধু নয়, মুসলমানদের শুধু নয়, একটু সম্ভ্রান্ত মুসলমান, যে-বাড়ির মেয়েরা দিনের বেলা রাস্তায় বের হয় না, ওই রকম বাড়ির মেয়েদের, বর্ধমানের আমাদের গ্রামের ভাষা। আবার মুরাদপুরে যদি যাই, আমাদের খালাদের বাড়িতে, তাদের আবার আর একটু ভিন্ন ভাষা।

চ. আ : গল্প লেখার সময় চরিত্রের কষ্ট কি আপনাকে আবেগাপ্ত করে, কষ্টের দৃশ্য লেখার সময় চোখের পাতা ভিজে আসে?

হা. আ. হ : নির্মাণের সময় কিছু বোঝা যায় না। সমস্ত মনোযোগ চলে যায় জিনিসটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, চরিত্র, ভাষা এসব দাঁড়াচ্ছে কিনা। লেখার সময় খুব কষ্ট হয়, সেটা পরে বুঝতে পারি।

চ. আ : বহুকাল আগে হায়াৎ মামুদ আপনার গল্প মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন ‘নিষ্ঠুরতান্ত্রিক তিনি’, আপনি কী বলবেন?

হা. আ. হ : খুব কঠিন দুঃখ, কঠিন কষ্ট লেখবার সময় আমার কলম কাঁপে না। সেটা ভিজিয়ে আমি রোমান্টিক করে ফেলি না। একদম কঠোর জিনিসটাকে কঠোর জায়গাতেই রেখে দিয়ে দেখাই। তখন মনে হতে পারে লোকটি তান্ত্রিক নাকি, লোকটা কাপালিক? (হাসি দিয়ে) তোমরা যারা আমাকে দেখছ, সবসময় পাশে থাকো, কী মনে হয় তোমাদের, আমি খুব শক্ত হৃদয়ের মানুষ?

চ. আ : দীর্ঘকাল ধরে লিখছেন, কিন্তু গল্প মাত্র ৬৭টি। আপনি যে আড্ডা-সভা-সেমিনারে এত সময় ব্যয় করেন বা করেছেন, জীবনের এ বেলা এসে কি মনে হয়, আরো দেবার সামর্থ্য ছিল, ঘাটতি রয়ে গেছে কিছু?

হা. আ. হ : কোনো কোনো মুহূর্তে মনে হয়, লেখার পরিমাণ খুবই কম হয়ে গেল। তাত্ত্বিকভাবে মনে হয়। পরক্ষণেই আমি ভুলে যাই। আজকের দিনটা কিছুই লেখা হলো না। আজ প্রায় এক মাস পরে আছে একটা লেখা, পরের লাইনটা লেখা হলো না। প্রত্যেকদিন মনে হচ্ছে আজকেও লেখা হলো না। আর এখন একটু বেশি হচ্ছে। বয়স হয়েছে, অটেল সময় আর পাওয়া যাবে না। বহুকাল বহু লোক আমাকে বুঝিয়েছে, বলেছে, হাসান ভাই, সময় নষ্ট করবেন না। একসময় হঠাৎ দেখবেন যে সময়ের টানাটানি পরে গেছে। স্বভাব তো যাবে না। আমার জ্ঞানোদয়ও হবে না। তবে আমার ইচ্ছেটা এই যে, লেখাটা অনেক বাড়িয়ে দেই।

চ. আ : আপনার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্পগুলোতে দেখা যায়, চরিত্ররা তাদের নিজের শ্রমে-রক্তে-ত্যাগে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে পারেনি। ‘ঘরগেরস্থি’ গল্পের রামশরণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই দেশ হারায় অর্থাৎ নতুন স্বাধীন দেশে তাঁর ঠাই হয় না; ‘কেউ আসেনি’ গল্পে আসফ আলী দেশ স্বাধীনের দিনেই তার কেটে ফেলা ঠ্যাং ফিরে চেয়েছে, আর এক মুক্তিযোদ্ধা গফুরের শরীরে স্বাধীন দেশের রোদ কাঁটা দিয়ে ওঠে; ‘ফেরা’ গল্পের আলেফ অস্ত্র ফেরত না দিয়ে ডোবায় লুকিয়ে ফেলে নতুন যুদ্ধের আশায় — আপনি যেসব আশঙ্কা করেছিলেন এবং যেসব অভিযোগ তুলেছিলেন স্বাধীনতার পরেই, চার দশক পরে কি তার উত্তরণ ঘটেছে?

হা. আ. হ : আমি যেসব আশঙ্কা করেছিলাম অথবা যে সমস্ত অভিযোগ তুলেছিলাম, আজকের বাংলাদেশে তার কোনো মৌলিক

পরিবর্তন হয়নি।

চ. আ : আপনার প্রথম দুটি গল্পগ্ৰন্থে জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, কখনো সরাসরিই ব্যবহার করেছেন। ‘সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার তখন নেমে এসেছে, হেমন্তের আরম্ভে শীত শীত করছে বাতাস’, ‘নিঃশব্দ শিশিরের হিমে স্নান করে বিবর্ণ পাতাগুলো ভিজে’, ‘বৃষ্টির ফোঁটার মতো শিশিরের শব্দ শুনছে’ — এরকম হরহামেশাই দেখি।

হা. আ. হ : জেনে শুনে করেছি এটা আমি বলতে পারব না। জীবনানন্দ দাশ ভালো করে পড়া অনেক পরে। তখনো জীবনানন্দ অল্পই পড়েছিলাম। তবে গল্পে জীবনানন্দ দাশের মতো উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহার করাতে আমার কিন্তু কোনো কষ্ট হয়নি। যেখানে আমারও বাল্যকাল মিলে গেছে, সেখানে দু-একটি উপমা-চিত্রকল্প সরাসরিই মিলে গেছে। আমি কিছুই বাদ দেইনি।

চ. আ : আপনার গল্প বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য, পিএইচডি গবেষণা হয়েছে এবং আরো হচ্ছে, আপনার অনুভূতি কী?

হা. আ. হ : ভালো লাগে। তবে এককাল যে ধারণা ছিল একমাত্র মরা লেখকেরই লেখা পাঠ্য হয়, জীবিত লেখকের পাঠ্য হয় না; আমার লেখা তো অনেকদিন থেকেই নানান জায়গায় পাঠ্য। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিল এন অথর, তাকে পাঠ্য করো। যদি তুমি মনে করো কোনো লেখককে মেরে ফেলবে তাহলে তার শ্রেষ্ঠ লেখাটা পাঠ্য করে দাও।

চ. আ : আপনার কাজের স্বীকৃতিতে আপনি সন্তুষ্ট?

হা. আ. হ : আমার কাজ আর আমার কাজের স্বীকৃতি ও প্রাপ্তি দুটোর মধ্যে আনুপাতিক কোনো মিল নেই। আমি দিয়েছি এক পেয়েছি একশ। সেজন্যে কেউ যদি বলে, লেখক হিসেবে বড় বেশি পেয়ে গেছে এই লোকটা, আমি অন্তত আপত্তি করতে যাব না। যথেষ্ট পেয়েছি।

চ. আ : আশির দশকের বাংলাদেশের ছোটগল্পের সবচেয়ে প্রতিভাধর গল্পকার মামুন হুসাইন আমাদের রাজশাহী শহরেই আছেন, নিভৃতে গল্পচর্চা করে যাচ্ছেন, নিজস্ব একটি গল্পশৈলী ও ভাষাতে লিখছেন, যা সত্তরের দশকের পরে আজ পর্যন্ত শহীদুল জহির ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারণ করা যায় না। তাঁর গল্প নিয়ে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

হা. আ. হ : এখন যারা লিখছে, যাদের বয়স আমার চেয়ে অনেক কম, তাদের সম্বন্ধে সরাসরি মন্তব্য করাটা একদিক থেকে ভালো কাজ হয় না। সেটা আমি করি না। যদি লিখতে হয় লিখি। শহীদুল জহির সম্বন্ধে লিখেছি। যদিইন সে জীবিত ছিল, তার সম্বন্ধে লিখিনি। তার মৃত্যুর পরেই আমি তার গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে লিখেছি। যারা এই মুহূর্তে লিখছেন তাঁদের প্রশংসা বা

ঘাটতি কোনো কিছুতেই আমার সেভাবে কিছু বলার নেই। মামুন হুসাইনের কথা বললে, সে কিন্তু আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক। অথচ তার প্রতি তেমন করে কেউ মনোযোগী হয়নি। মনোযোগী যে হয়নি এটার জন্যে তাকে দোষ দেওয়ার চাইতে বেশি দোষ দিতে হবে পাঠকদের, সাধারণ মান নিয়ে ঠিক এই লেখককে ধরা কঠিন। যাদের প্রতি মনোযোগী হয়েছে তাদের সকলের ওপরে রাখব মামুন হুসাইনকে। বিচিত্রমুখী বিপুল পড়াশোনা রয়েছে তার। মামুন হুসাইনের গল্পের মূল্য আমি অবশ্যই দেই। আমি বলব, তার গল্পে সমস্ত প্রান্তর জুড়ে বহু রত্ন জমে আছে, বহু হিরের টুকরো জমে আছে, চোখ মেলতেই পারছি না এত জ্বলজ্বল করছে আলোতে, কিন্তু সব মিলিয়ে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারটায় এখনো পাইনি বলে আমি মুশকিলে পড়ে যাই। আমি কোনো অভিযোগ করছি না কিন্তু।

চ. আ : সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের ধারা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন?

হা. আ. হ : দু-একজন লেখকের নাম আলাদা আলাদা উচ্চারণ করতে পারছি, তুমি যেমন একজন গল্পকারের নাম বললে, কিন্তু ধারার কথা যদি বলো, আমি খুবই হতাশ হচ্ছি। কারণ পৃথিবীর কোনো লেখার সঙ্গে, গল্পের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের বড় দুর্বলতা হচ্ছে, সমগ্র পৃথিবীতে কী হচ্ছে তার খবর আর নিচ্ছি না। মানিক, বিভূতি, রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান পড়েছেন। পড়াশোনা করতে হবে না? বাংলা গল্প সম্বন্ধে অচেতনতা মারাত্মক। গল্প পড়ে মনে হয় যে, ভালো করে মানিক পড়া থাকলে এই গল্পটা সে লিখত না, কিছুতেই লিখত না। তারাক্ষর পড়া থাকলে লিখতে পারত না। বললে পরে যুবক লেখকদের মনে লাগবে, এখন কেন এই গল্প লেখা হবে? এতদিন পরে কেন এই গল্প লেখা হবে? আমিও তো লিখে গেলাম। আমার পেছন থেকেও হাঁটতে পারে না কেউ, সামনে থেকে হাঁটা ধরছে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গেও একই অবস্থা। অপরিচয়ের ফলে দম্ব এবং আত্মতৃপ্তি বেড়ে যায়। না জানলেই তখন নিজেকে বড় মনে হয়। প্রতিনিয়ত শেষ অবস্থান জানা থাকতে হবে। আমি সেইজন্যে সবসময় চেষ্টা করি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে।

চ. আ : আমাদের বড় লেখক আসার সম্ভাবনা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

হা. আ. হ : নিজের ভেতরে যা আছে তাই নিয়ে লিখব, কিন্তু ভাগুরটা তো পরিপূর্ণ করে নিতে হবে আগে। ভাগুর শূন্য থাকলে বের হবে না কিছু। নিজের ভিতরেই ডবডব করে আওয়াজ ওঠে। সেজন্যে হতাশা প্রকাশ করতেই হচ্ছে। হতাশার একটা কথাই হচ্ছে দীর্ঘকাল হতাশাও থাকে না, আশাও থাকে না। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলে চিরকাল। হতাশা হয়তো স্থায়ী হবে না। তবে এখন খুব বিদিশা অবস্থা। □

গল্পকারদের
কোনো সম্পর্ক
নেই। আমাদের বড়
দুর্বলতা হচ্ছে, সমগ্র
পৃথিবীতে কী হচ্ছে
তার খবর আর নিচ্ছি
না। মানিক, বিভূতি,
রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান
পড়েছেন। পড়াশোনা
করতে হবে না? বাংলা
গল্প সম্বন্ধে অচেতনতা
মারাত্মক।



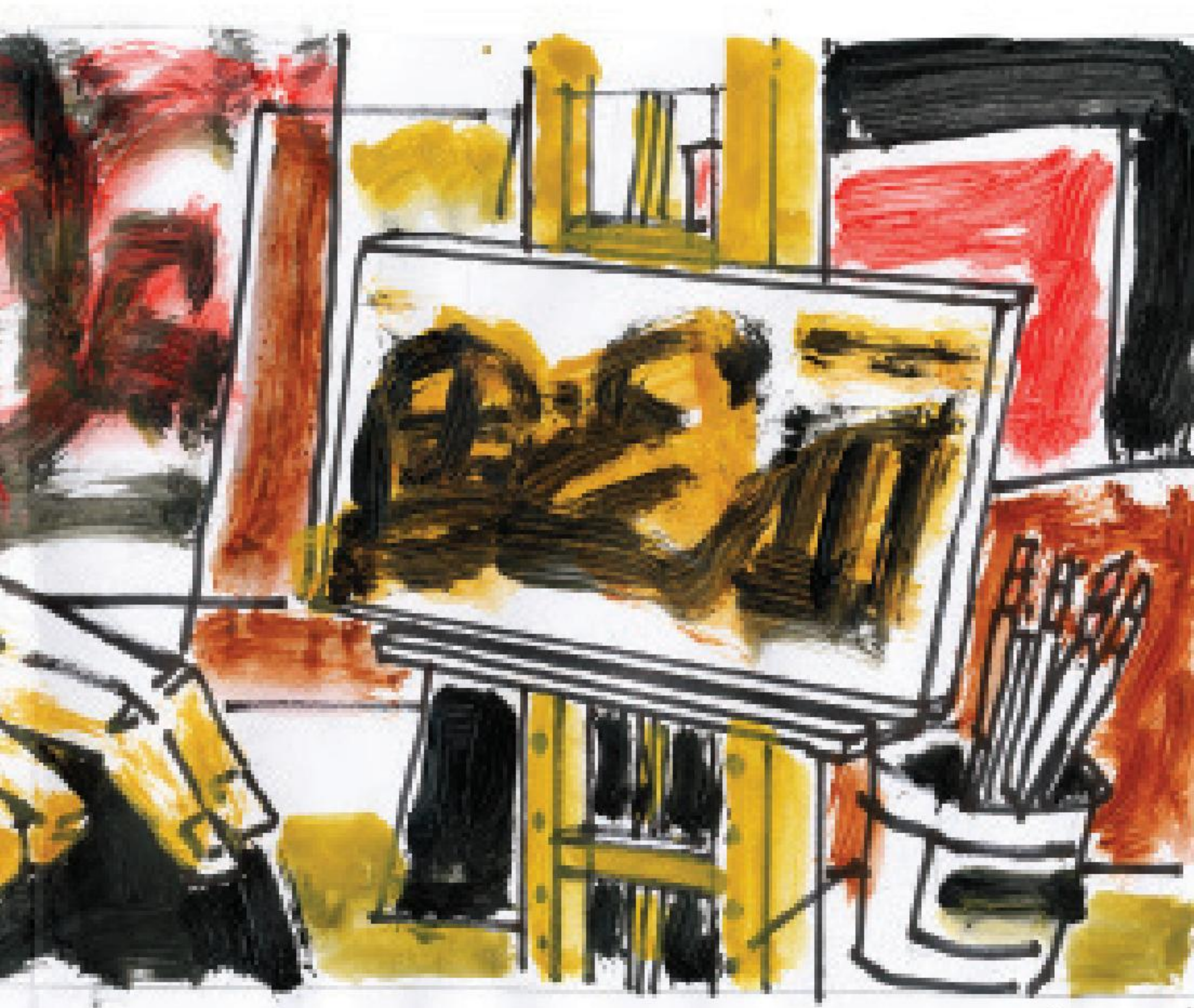
বুর্জোয়ারা নিপাত যাক

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর



দেখতে তো প্রাচীন লাগে না।
কত বয়স হবে?
ষাট পঁয়ষট্টি।

সবই তো শেষ হয়।
মৃত্যু আসে।
পায়ে পায়ে চুপিচুপি।
জানো তো চেনাজানা কত লোক মরে গেছে।



অলংকরণ : রফিকুন নবী

সবকিছুর শেষ হয় ।
তুমি আর আমি রোজ একসঙ্গে কাটাচ্ছি ।
এবং রাত ।
আগামীকাল আমাদের চেনাজানার দু-বছর হবে ।

ভালোবাসা যখন মরে যায় তখন কী থাকে?
বিয়ে ।
বাকি জীবন বিয়ের মধ্যে থাকা যায় না ।
তাহলে ।
জানি না ।

শেক্সপিয়ার পড়েছ?
না ।
শুনবে ।
বলো ।
সত্য নিয়ে মাথা ঘামাই না ।

একজন মানুষ একবারই মরে ।
আমরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী একবার মরার জন্য ।

আমরা ঋণী তাই না ।
আমাদের ঋণ ফুরায় না ।

মৃত্যুর কথা কখনো ভেবেছ?
সবসময় না ।
মাঝেমধ্যে ভাবা ভালো ।
হয়তো ।
এন্ডি ওয়্যারহলের জীবনীটা পড়েছ ।
সবটা পড়িনি ।
এন্ডির বাবা যখন মারা যান, সেই অংশটা ।
সেই অংশটা পড়েছি ।
ওরা তো গ্রিক ক্যাথলিক । তাই না?
বাবার শব তিনদিন ধরে বাড়িতে রাখা ।

এন্ডি ভয়ে বাড়ি ছেড়েছে।

ভয়?

মৃত্যুর ভয়।

মানুষ তো খুব নিঃসঙ্গ।

তা ঠিক।

নিঃসঙ্গতার একটা কথা বলি।

বলো।

আমার একটা বেড়াল আছে।

জানি।

বেড়ালটা খুব নিঃসঙ্গ।

প্রেমে পড়ে আমি বুঝেছি জীবনটা কত একঘেয়ে।

কথাটা কি আমার দিকে তাক করা।

তা নয়।

একেবারে অস্বীকার করা কি সম্ভব।

আমি পেইন্টিং করি, তুমি ডিজাইন করো।

তা দিয়ে কি কিছু প্রমাণ করা যায়।

হয়তো যায় না।

তবু।

একই জিনিস রোজই দেখি। এসব ঐকে আমি বুঝি জীবন
কতো বোরিং।

তা ঠিক।

সংস্কৃতির মধ্যে আমার জায়গা এখানেই।

আমি তাই বুঝি। রকেটের আমি যেমন অংশ,

তেমনি আমি এই সময়ের অংশ।

একঘেয়ে। সব একঘেয়ে।

আমার তাই মনে হয়। সব একঘেয়ে। সব একঘেয়ে।

জীবন তো যথেষ্ট আছে। একটু মৃত্যু দরকার।

আমার তাই মনে হয়।

তাহলে আর্ট ও কমার্সের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচে যাবে।

দূরত্ব কমানো দরকার।

পেইন্টিং ও ডিজাইন আসলে একটাই।

আমি পেইন্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে ডিজাইন খুঁজে পাই।

আমি সকল দূরত্ব মুছে ফেলতে চাই।

দূরত্ব বুর্জোয়ারা চায়।

আমি বুর্জোয়া হতে চাই না।

বুর্জোয়ারা নিপাত যাক।

আমি শাহীনের হাত ধরে যেতে চাই।

জানো শাহীন।

বলো।

আমি চোখের সঙ্গে চোখ যোগ করতে চাই।

অনেক চোখ অজস্র চোখ।

তাই হচ্ছে শিল্প।

শাহীন কি ফ্যাশন ডিজাইনার ক্রিস্টিয়ান ডিওর হতে চায়?
কিংবা পেইন্টার। কিংবা দুই-ই।

আমি নিজের কথা ভাবি। কী হতে চাই আমি। আমি কি অ্যাবসট্রাক্ট

এক্সপ্রেশনিজম কনসলিডেট করার জন্য সাহায্য করতে চাই।

ছবি বিক্রির সঙ্গে ভাগ্যের খুব সম্ভব সম্পর্ক আছে। এন্ডি
ওয়্যারহল তার ক্যাম্পবেল স্যুপ ক্যান বিক্রি করতে চেয়েছে এক
হাজার ডলারে। চৌত্রিশ বছর পর ওই ক্যান মিউজিয়াম অব মডার্ন
আর্টে বিক্রি হয়েছে পনেরো মিলিয়ন ডলারে।

শাহীন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর আমি শাহীনের
চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি চিৎকার করে বলি : চোখের
সঙ্গে চোখ যোগ করতে চাই। শাহীনও চিৎকার করে : তাই হচ্ছে
শিল্প।

১৯৫৮।

মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট ভবনে নিউ আমেরিকান পেইন্টিং প্রদর্শিত
হচ্ছে। একটা বড় মিউজিয়াম এই প্রথম অ্যাবসট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম
এনডার্স করেছে। তারপর মমা এই প্রদর্শনী ইউরোপ ভ্রমণে পাঠিয়েছে।
এ এক দারুণ ঘটনা। ইউরোপিয়ানরা একবার যখন মেনে নিয়েছে
তখন আমেরিকান সাংস্কৃতিক এস্টাবলিশমেন্ট হইহই করে উঠেছে।
আমেরিকান সাংস্কৃতিক এস্টাবলিশমেন্ট ইউরোপকে অনুকরণ করে
রুচির ক্ষেত্রে জায়গা করে দিয়েছে অ্যাবসট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমকে
মিউজিয়ামে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, রোববারের সংবাদপত্রে।

জয়ধ্বনি সবক্ষেত্রে।

এই জয়কে হারানো যায় না।

শাহীন।

বলো।

সর্বনাশের মানবিক অবস্থানটা তোমার জানা আছে?

হয়তো জানি।

কেন আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই সর্বনাশ থেকে?

শুধু জানি তোমার হাত ধরে বেঁচে থাকতে চাই।

একদিন, ভালোবাসার পর, আমি আর শাহীন, হঠাৎ ঠিক করি,
বিছানায় শুয়ে-শুয়ে, আমরা একটা কবিতা তৈরি করব।

কীভাবে।

প্রথম লাইনটা তুমি বলবে।

দ্বিতীয় লাইনটা আমি।

তাহলে শুরু করা যাক।

তোমার আঙুলগুলো আমার মুখে

তোমার বুকদুটো আমার হাতে

সবকিছুর একটা দাম আছে

ভালোবাসার দাম কত

শাহীন এবং আমি শেষ দুটো লাইন একসঙ্গে বলি :

তোমার আঙুলগুলো

তোমার বুক দুটো

আমাকে তুমি দিয়েছ

ভালোবাসার পর এই কবিতার তুলনা হয় না।

যতক্ষণ আমি শাহীনের সঙ্গে থাকি, আমি আন্ডারগ্রাউন্ড ফিল্ম এবং
আন্ডারগ্রাউন্ড পেইন্টিং হয়ে যাই। রুমের মধ্যে নীল মেঘ ঘুরে বেড়ায়
ঈশ্বরের মতো। একটা নীল মেঘ আমি ধরতে থাকি।

এভাবে আভারখাউন্ড পেইন্টিং তৈরি হয়ে যায়।

শাহীন আমার নুনের দিকে চোখ রেখে বলে, দেখেছ কত বড়।
আমি বলি, দুলছে পতাকার মতো।
শাহীন ওর বুকের দিকে চোখ রেখে বলে, পছন্দ?
হ্যাঁ। খোলা বুক আমার সঙ্গী।

আভারখাউন্ড ফিল্মে নুন বিশাল হয়ে যায়। খোলা
দুধ মুখের কাছে এসে যায়।
শাহীনকে আমি বলি পেইন্টিং করতে।
আর শাহীন আমাকে বলে কবিতা লিখতে।

নীল মেঘের পতাকা তুলে আমরা একসঙ্গে বের হয়ে যাই। নীল
মেঘ ছড়িয়ে-ছড়িয়ে আমরা ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াই। শান্তি শান্তি।

সময় পেলেই আমি অজস্র বই পড়ি। শাহীনও অজস্র বই পড়ে। বইপড়া
নিজেদের মধ্যে সাহস তৈরি করে। যে-ধরনের জীবনযাপন করি, সাহস
কমে যায়। সাহস না থাকলে জীবনযাপনের বীরত্ব থাকে না।

এ-কথাটা জাঁ পল সার্জে স্পষ্ট করে বুঝেছেন। তাই না শাহীন :
আমরা কাপুরুষ বলেই বীরের ভূমিকায় অভিনয় করি। সন্তের ভূমিকা
আমরা পালন করি বদমাশ বলেই। হত্যাকারীর ভূমিকা পালন করি
অজস্র মানুষ খুন করি বলেই। জীবনযাপন করি জন্মের পর থেকেই
মিথ্যাবাদী বলেই।

শাহীন শাহীন : আগাগোড়া আমরা মিথ্যুক, কাপুরুষ, বদমাশ এবং খুনি।
আমাদের খুন থেকে উদ্ধার করার কেউ নেই। সেজন্য তুমি পেইন্টিং
করো, আমি কবিতা লিখি।
ছবিতে রক্তের দাগ মুছতে পারি না। কবিতার স্তবকে রক্তের দাগ
লেগে থাকে।

রক্ত এবং রক্ত এবং রক্ত।

আমরা যা কিছু করি সবই অ্যাবসার্ড। বাস্তব অ্যাবসার্ড। অ্যাবসট্রাক্ট
এক্সপ্রেশনিজম অ্যাবসার্ড।

পেইন্টিং অ্যাবসার্ড। ডিজাইন অ্যাবসার্ড। আমরা চোখ মেলে অথবা
চোখ বন্ধ করে জীবন সংগ্রহ করি।

শাহীন অন্ধকার পৃথিবীতে তোমার পেইন্টিং সেক্সজুয়ালাইড
মেলোড্রামা।

আমার কবিতা উজ্জ্বল এক শাদা স্পেসে শব্দের মাতামাতি।
বিভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে আমরা কীভাবে নেভিগেট করছি। এসব
ভাবি, এসব প্রশ্ন করি; কেন এসব ভাবি, কেন এসব প্রশ্ন করি,
জানি না।

আমি শিল্প ও ভালোবাসা সংগ্রহ করি।

এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে : শাহীন তুমি। আর ভালোবাসা।

জীবন এমনই : সুন্দর ও ভয়ানক। বুর্জোয়ারা তার মধ্যে ভায়োলেস
টুকিয়ে রেখেছে। ভায়োলেস বিদায় দিয়ে যদি সুন্দরের কাছে
ভয়ে-ভয়ে যাই, জীবন অন্যরকম হয়ে ওঠে।

শাহীন কদিন থেকে জেগে উঠে নান্দনিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এই
সিদ্ধান্তগুলি নান্দনিক চিন্তা। এই চিন্তার কেন্দ্র ভিত্তিমূল হচ্ছে : আমি
বুর্জোয়া হতে চাই না।

শাহীন ও আমি শরীরের সব জোর একত্র করে চিৎকার করি, চিৎকার
করি শেষ পর্যন্ত : বুর্জোয়ারা নিপাত যাক।

শাহীন : শিল্প হচ্ছে ভালোবাসা। আমাদের কাজ হচ্ছে ভালোবাসা
সংগ্রহ করা।

ভালোবাসার সংগ্রহ থেকে শিল্প উঠে আসে।

বুর্জোয়ারা নিপাত যাক। নিপাত যাক। □

বেঙ্গল
পাবলিকেশন্স-এর
সদ্য প্রকাশিত
চারটি গ্রন্থ

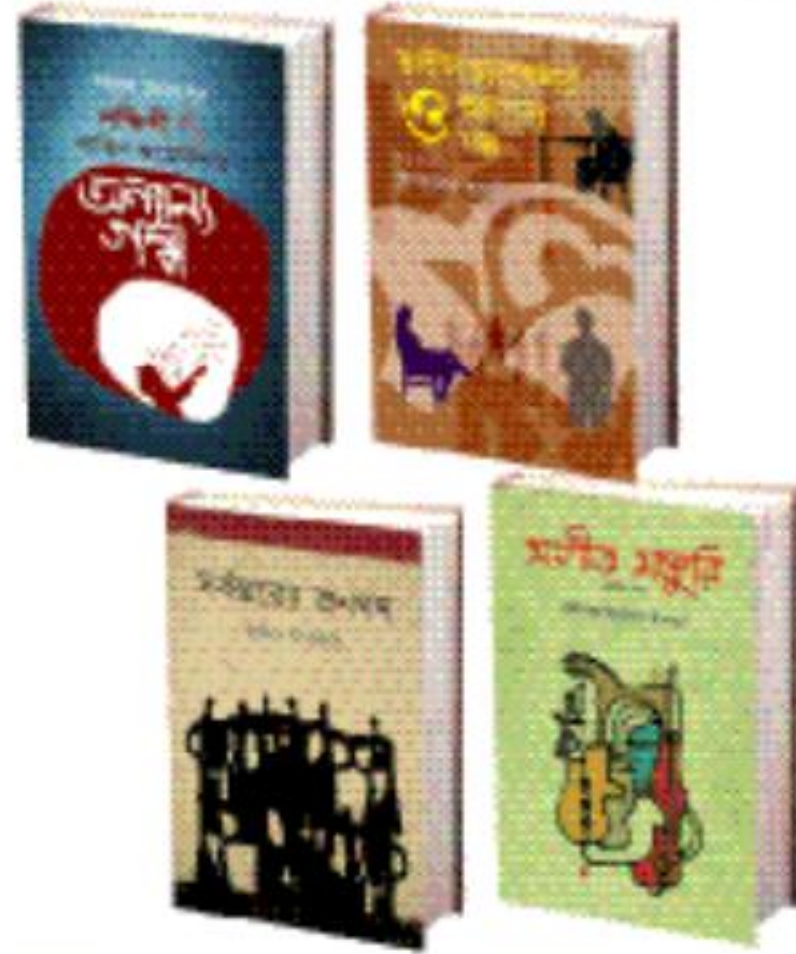
বেঙ্গল
পাবলিকেশন্স

বেঙ্গল সেন্টার
প্লট-২, সিভিল এভিয়েশন,
নিউ এরায়ণেট রোড, বিলকেত,
ঢাকা-১২২৯, বাংলাদেশ
ফোন : ০১৫৫১৮৮৮১১১, ০১৫৫১৮৮৮০০০
www.bengalpublications.com f/bengalpublications

প্রতিষ্ঠান : **বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস**
Bengal Gallery of Fine Arts

অনলাইনে অর্ডার করুন : **বুকমারি** ই-বুক : **পেপার**

সদ্য প্রকাশিত ৪টি





কাঠগড়ায় কদম আলি

হাসনাত আবদুল হাই



ঘরভর্তি লোক, দাঁড়াবার জায়গা নেই, এত মানুষের ভিড়, তার মধ্যেই গায়ে গা লাগিয়ে, ঠেসাঠেসি করে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন, ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যেতে পারত অনেকেই, কিন্তু শরীরের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে থাকায় কেউ পড়ছে না, বেশ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন একে অন্যকে ধরে আছে দুহাত দিয়ে, বুক আর পিঠ লাগিয়ে। এমন ঘরে কখনো আসেনি কদম আলি। সে বেশ হতভম্বের মতো হয়ে গিয়েছে, মুখে কথা নেই, কোনো সাড়াও বের হচ্ছে না। শুধু জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আরো অনেকেই জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছে। যেন হাঁফাচ্ছে সবাই। খুব মেন্নত করলে যেমন হয়। ঘামে গায়ের জামা-কাপড় লেপ্টে আছে, ঘামের ঝাঁঝালো গন্ধে ঘর ভরে যাচ্ছে। একটা ফ্যান ঘুরছে ঘড়ঘড় শব্দ করে, গরম বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরের চারকোণায়, ধুলো



অলংকরণ : সমরজিৎ রায় চৌধুরী

উড়ছে পাতলা ময়দার মতো। নানারকমের শব্দ হচ্ছে ঘরটায়, মুখের কথা, গলার কাশি, পায়ের জুতোর ঘসটানি। বেশ একটা কান বুজিয়ে দেওয়া ঝড়ো হাওয়ার মতো কোলাহল। উত্তেজিত, অধৈর্য, ত্রুষ্ক, মারমুখী, হতাশ, বেপরোয়া, বিস্ফোরক সব ধরনের শব্দ মিশে তৈরি একটা শব্দের বোমা।

হঠাৎ শব্দটা মিইয়ে আসে, কোলাহলের-গলা কেউ চেপে ধরে। অস্ফুটে ঘড়ঘড় শব্দ বের হয়। একটু পর স্পষ্ট স্বরে কেউ হাঁক দিয়ে কথা বলে। সবাইকে সতর্ক করে দেয় প্রায় ছুঁকায় দিয়ে। সিলিং ফ্যানের ঘড়ঘড় শব্দ জোরে-জোরে বাজে। কদম আলি ঘরভর্তি মানুষ দেখে। লম্বা ঢোলা কালো পোশাকই বেশি। চকচক করে কালো পোশাকের পিঠ। হাতের কালো কাপড় ঝিলিক দিয়ে ওঠে শূন্যে ঝুলে থাকা ইলেকট্রিক বাব্বের আলোয়। মুখের, গলায় বসে সেই কাপড় চকচক করে। কালো পোশাকের মানুষগুলো সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঠেলাঠেলি হয়, ধাক্কা লাগে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। কাপড়ে ঘষা খেয়ে সরাৎ-সরাৎ শব্দ হয়। চাপাস্বরে। উত্তেজিত হয়ে কথা বলে কেউ-কেউ। জমাটবাঁধা মানুষের শরীরগুলো এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। জায়গা করে নিয়ে এগোতে চায়।

অনেকক্ষণ পর, কতক্ষণ মনে নেই, কদম আলির ডাক আসে। তার নাম ধরে ডাকে একজন। প্রথমটায় চমকে ওঠে সে। এতগুলো লোকের সামনে,

ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে কদম আলি দেখল রেস্টোরাঁ, সবজির দোকান, পান-সিগারেটের দোকান, মস্ত বড় আড়ত, সব মেশিনের গাড়ি দিয়ে ভাঙা হচ্ছে। রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে রুটি, ভাঙা ডিম, সবজি, সিগারেটের প্যাকেট, কাঠের তক্তা।

অনেক মানুষের ভিড়ে তার নাম ডাকার জন্য সে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করে। তখন নিজেকে খুব সাধারণ একজন বলে মনে হয় না। সে বেশ ধীরে-সুস্থে সামনে এগিয়ে যায়। চৌকোনা কাঠের খোপের ভেতর দাঁড়ায়। কোমর পর্যন্ত কাঠের নিচের ভেতর থাকে, ওপরটা খোলা। সে তার দুহাত লম্বা করে রাখা কাঠের ওপর রাখে। বেশ পুরনো কাঠ, রংচটা, মানুষের হাত লেগে চকচক করছে। কাঠ না, নরম কিছু মনে হচ্ছে। কদম আলিকে যা বলা হয় সে তাই বলে। যাহা বলিব সত্য বলিব। এই কথা সে তিনবার বলে। তারপর তাকে বলা হয়, তুমি কী অপরাধ করেছো তা জানো?

জি।

এই অপরাধ শাস্তিযোগ্য তা তুমি জানো?

জি।

সেদিন আর কোনো কথা হয় না। প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কদম আলি চারদিকে তাকায়। দু-একজন তার দিকে তাকাচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু তাতে সে হতাশ হয় না। মন খারাপ করে না একটুও। তার যা বলার সে বলতে পেরেছে। এতেই সে খুশি। কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় সে কিছুক্ষণ চারদিক দেখে। ঘরভর্তি কালো পোশাকের মানুষ ব্যস্ত হয়ে নড়ছে, চড়ছে। সে তাদের দিকে হাসিমুখে তাকায়। তার দিকে বেশিক্ষণ তাকানোর কারো সময় নেই। তাতে তার কিছু আসে-যায় না। সে তার কথা বলতে পেরেছে। একটু পর তার কোমরের দড়িতে টান পড়ে। সে কাঠগড়া থেকে নেমে আসে। একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে, মুখের চোয়ালের ব্যথাটা চনমন করে ওঠে। যে-লোকটা দড়ি টানছিল সে হাঁক দিয়ে বলে, এই ব্যাটা জোরে পা চালা। এখানেই দিন কাবাড় করবি নাকি? বলে সে তার হাঁটুতে একটা লাথি মেরে বারান্দায় যায়। সেখানে ভিড় একটু কম। কদম আলি খাকি লেবাসপরা লোকটাকে দেখে। দয়ামায়াহীন, কাঠখোঁট্টা মানুষ। সে তার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসে। লোকটা তার হাসি দেখে খেঁকিয়ে ওঠে। আরেকটা লাথি মারার জন্য পা তোলে। তুলুক। এই একদিনে হাত-পায়ের মার খাওয়া তার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। সে পেটে হাত দেয় একবার, কারো চোখে না পড়ে সেইভাবে। পেটে হাতের স্পর্শ তাকে আরাম দেয়। সে বড় সুখ বোধ করে। পেটটা এখনো ভরা।

এক

বড় ছেলে কদিন রেখেছিল তার সংসারে। তারপর টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গেলে বলেছিল, যাও। পথ দেখো গিয়া। আমি তোমারে বহায়া-বহায়া খাওয়াইতে পারুম না।

শুনে কদম আলি চোখে অন্ধকার দেখে। ঠোঁট ভিজিয়ে বলে, আমি তোর বাপ। এই বুড়া বয়সে কই যামু?

কই যাইবা সে তুমিই তা জানো। আমার এখানে থাকতে পারবা না। দেখছো তো আমার অবস্থা। নিজেরই চলে না।

আমার সব টাকা দিলাম। অফিস থেকে যা পালাম সবই দিলাম তোরে। তুই ব্যবসা করবি কইলি। তার কী হইলো?

কিছু হইলো না। ব্যবসা ফেইল। লোকসান। তোমার টাকা কোনো কাজে লাগলো না। ব্যবসা কী সোজা কথা। অ্যাহন পথ দেহো।

কই যামু বাপ?

সে তুমিই জানো। আমার এখানে জায়গা নাই। বুঝল। তারপর বললো, মমিনার বাড়ি যাও। সে থাকবার দিতেও পারে।

মাইয়ার কাছে যামু? এইডা কেমন দেখাইবো বাপ?

ঠেলায় পড়লে সবই ঠিক দেখাইবো। বড় ছেলে বলে। যাও সেহানে। দেহ কী কয়? না হইলে কালুর বাড়ি যাও।

কালু তার ছোট ছেলে। দুই বউ নিয়ে থাকে। কদম আলি বলে, তার বড় সংসার। এমনিতেই চলে না। আমারে থাকতে দিবো ক্যামনে?

গিয়াই দেহো না। আগে থাকতেই এসব কইয়া কাম কী? যাও, বেলা থাকতি বার হইয়া পড়ো। বড় ছেলে তাকে প্রায় ঠেলে বার করে দেয়।

মমিনার বাড়ি যায় কদম আলি। থাকার কথা বলতে বেশ লজ্জা পায়। বগলে কাপড়ের পুঁটলিটা ঠেসে ধরে বলে, তোরে দেখতে আইলাম। কেমন আছিস মা?

মমিনা কাছে এসে পা ধরে সালাম করে। তারপর বলে, কদিন থাকো। বেড়ায়া যাও। কতদিন পর আইছো। বুড়া হইয়া গেছো একেবারে।

কদম আলি মুখের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, হ্যাঁ বুড়া হইয়া গেছি। পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি করলাম। কম সময় তো না। মমিনা বলে, কী করবা অ্যাহন, কোথায় থাকবা ঠিক করছো?

শুনে চমকে যাবার মতো হয় কদম আলির। তারপর হেসে বলে, কিছু ঠিক করি নাই। তোদের দেইখা যাই। তারপর দেখা যাইবো কী করি। নাতি-নাতনিদের ডাক। দেহি তাদের। কতদিন পর আইলাম।

রাতের বেলা মমিনার স্বামী বলে, কতদিন থাকবো কইছে কিছু বুড়া?

কয়েকদিন থাকবো। দেখতে আইছে।

হ। দেহো কয়দিন য্যান কয় মাসে গিয়া না ঠেকে।

মমিনা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, আমার বাপ হেই রকমের মানুষ না। কারো বোঝা হইয়া থাকবো না।

মেয়ের বাড়ি থাকতেই কদম আলির অফিসের স্যারের কথা মনে পড়ে। সে ওই স্যারের পিয়ন ছিল অনেক দিন। তিনি রিটায়ারে যান তার তিন বছর আগে। যাওয়ার আগে বলেছিলেন, কদম আলি, এই নাও আমার ঠিকানা। দরকার পড়লে এসো।

ঠিকানা নিয়ে শহরে স্যারের বাড়ি খুঁজে বার করে কদম আলি। যে-লোকটা দরজা খুলে সামনে দাঁড়ায় তাকে দেখে চিনতে পারে না সে। দারুণ বাজখাই চেহারা। হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করেন, কী চাই?

কদম আলি হাতের কাগজটা দেখিয়ে বলে, স্যার দিছিলেন। তিনি নাই?

লোকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাগজটা দেখে নিয়ে বলে, না নাই।

কোথায় গেলেন? এইটা তো তার ঠিকানা। আমি আগে একবার আইছিলাম।

লোকটা এবার রেগে যায়। জ্রুজ্রুস্বরে বলে, বললাম এখানে নাই, তারপরও কথা বলছো। তুমি তো বেশ বেয়াড়া লোক দেখছি। এত কথা বলার সময় আছে নাকি আমার? অ্যা?

তখন ভেতর থেকে এক মহিলার গলার স্বর শোনা যায়। কার সঙ্গে কথা বলছো?

লোকটা ভেতরের দিকে না তাকিয়ে বলে, আর বলো না। সাতসকালে এসে বিরক্ত করছে।

কে? কী চায়? বলতে-বলতে মহিলা দরজার কাছে এসে দাঁড়ান। তাকে দেখে কদম আলির মুখ হাসিতে ভরে যায়, যেন তার পা মাটিতে দাঁড়াবার জায়গা পায়। সে বেশ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, খালাম্মা আমাকে চিনছেন? আমি কদম আলি। স্যারের পিয়ন ছিলাম। তিনি আইতে কইছিলেন।

তার কথা শুনে মহিলার মুখ কালো হয়ে যায়। তিনি শুকনো গলায় বলেন, এ-বাড়িতে ওই নামে কেউ থাকে না। তুমি ভুল ঠিকানায় এসেছো। বলে তিনি দরজা বন্ধ করে দেন।

কদম আলি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে

অনেকক্ষণ থেকে দেখছিল পাশের পান-সিগারেটের দোকানের মালিক। সে দরজার সামনে থেকে সরে আসার পর ডাক দিলো। সব শুনে বলল, সে লম্বা কেচ্ছা। কেলেঙ্কারি কইতে পারো। ওই লোকটা তোমার স্যারের বউরে ভাগায়া বিয়ে করছে। অ্যাহন বউয়ের বাড়িতেই থাকে। বউ তোমার স্যারেরে দিয়া বাড়িটা লিখায়া নিছিল। বজ্জাত মাইয়া মানুষ।

স্যারের ছেলেমেয়ে, হেরা কই? তারা কিছু কয় না? কদম আলির চোখের পলক পড়ে না।

পান দোকানের মালিক বলে, সব বিদেশ। কোনো খবর নেয় না।

আর স্যার? স্যার গেল কই?

পানের দোকানদার বলে, ছনছি বুড়াদের আশ্রমে থাকে। তেজকুনিপাড়া। খোঁজ নিয়া দেখতে পারো। বড় ভালা মানুষ ছিলেন। কোনোদিন কর্জ করেন নাই। এমুন মানুষটারে কষ্ট দিলো বউটা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মানুষ চেনা ভার। দুর্দিনেই মানুষ চেনা যায়। নাও, একটা পান নিয়া যাও। একটা বনরুটি দিমু? মুখ দেইখা মনে হয় সকাল থিকা কিছু খাও নাই। থাক-থাক। পয়সা দিতে হইবো না। কি কইলা নাম? কদম আলি। যাও কদম ভাই তেজকুনিপাড়ায় গিয়া খোঁজ করো।

দুই

ভাঙা, পলস্তারা-ওঠা একতলা দালানের বারান্দায় বসে স্যার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাকে দেখে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন। উঠে এসে বুক জড়িয়ে ধরে বললেন, কদম আলি। এই ঠিকানা বার করলা কেমন করে?

কদম আলি বলল, আপনার বাড়ির ঠিকানায় গেছিলাম। পাড়ার পান-সিগারেটের দোকানদার ঠিকানা দিলো। শুনে স্যার বললেন, হ। সবই তাহলে শুনেছো।

কদম আলি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

স্যার বললেন, কপাল। বুঝলা কদম আলি, সবই কপাল। শেষ জীবনে এমন হবে তা কি ভাবতে পেরেছি? কদম আলি চারিদিকে তাকিয়ে বলে, এখানে কেমন আছেন স্যার? কোনো অসুবিধা হয় না তো?

শুনে হঠাৎ উদাস হয়ে যান তার স্যার। বলেন, আছি এক রকম। দিন কেটে যাচ্ছে। অন্য বোর্ডারদেরও কমবেশি আমার মতো অবস্থা। আত্মীয়-স্বজন দেখাশোনা করে না। শেষ জীবনের সম্বল দিয়ে কোনো রকমে চলছে। তারপর হাসিমুখে বলেন, আমাদের মধ্যে বেশ একটা ভাব হয়ে গিয়েছে। গল্পগুজব করে সময় কেটে যায়। শুধু অসুখ হলেই বিপদে পড়ি। তা তোমার কথা বলো দেখি। রিটারারের পর কী করছো? কোথায় থাকছো?

সব শুনে তিনি লজ্জায় পড়ে যান। তারপর বলেন, তোমাকে সাহায্য করি তেমন অবস্থা নেই আমার। দেখতেই পাচ্ছে নিজ চোখে। নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হলো। একা-একা থাকছি। পুরনো কানেকশন সব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তোমাকে যে কারো কাছে পাঠাব তার উপায় নেই। তারপর কী ভেবে বললেন, এখানে একজন পিয়ন ছিল। বাপের অসুখের কথা শুনে গ্রামে গিয়েছে। সে যে পর্যন্ত না আসে তুমি তার জায়গায় কাজ করতে পারো। খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কদম আলি সেই থেকে তেজকুনিপাড়ায় বৃদ্ধাশ্রমে পিয়নের কাজ করছে। রোজ সকালে চা-নাশতা দিয়ে স্যারকে খবরের কাগজ পড়তে দেয়। পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, আজকের খবর কী স্যার? স্যার মুখ তুলে তাকান তার দিকে। কাগজে কী লিখছে?

স্যার বলেন, আজকের হেডলাইন খবর হলো জাপানে বড়

রকমের ভূমিকম্প হয়েছে। অনেকে মারা গিয়েছে।

কদম আলি বলে, আমাদের দেশেও সেদিন হইয়া গেল। তবে মানুষ মরে নাই।

স্যার বলেন, খুব চিন্তার কথা। ঘন-ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে। কবে যে কী হয়।

আরেকদিন সকালে কদম আলি বলে, আজ কাগজে কী লিখছে স্যার?

পহেলা বৈশাখের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ইলিশ মাছের দাম আকাশছোঁয়া। এক কেজি দুই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা।

এত দাম দিয়ে কারা কেনে? কদম আলি প্রশ্ন করে। স্যার বলেন, যাদের টাকা আছে। এদেশে অনেকের হাতে টাকা আছে কদম আলি। আরেকদিন সকালে নাশতা পরিবেশন শেষ করে কদম আলি এসে দাঁড়ায় স্যারের পাশে। জিজ্ঞেস করে, আজকের খবর কী স্যার?

স্যার বলেন, তাপপ্রবাহে শিশুদের অসুখ বাড়ছে। হাসপাতালে ভিড়।

কদম আলি বলে, হ্যাঁ স্যার কদিন থেইকা খুব গরম পড়ছে।

আজকের খবর কী স্যার?

আজকের খবর হলো নতুন জেলখানা উদ্বোধন হচ্ছে।

নতুন কেন? পুরানটার কী হইলো? কদম আলি প্রশ্ন করে।

পুরনোটার জায়গা হচ্ছিল না। চার হাজার কয়েদির জায়গায় রাখা হচ্ছিল আট হাজারের ওপর। নতুনটায় আট হাজার বন্দি রাখা যাবে।

কারা যাইবো নতুনটায়?

যারা হাজতি-কয়েদি, যারা শাস্তি ভোগ করছে তারা।

কদম আলি খবরের কাগজে ছবি দেখে বলে, খুব নতুন বিল্ডিং দেখা যায়।

স্যার বলেন, হ্যাঁ। নতুনই তো। মাত্র শেষ হলো।

কদম আলি বলে, কয়েদিদের আর থাকনের কষ্ট হবে না।

তাদের খাবারের কী ব্যবস্থা হবে?

স্যার অন্য খবর পড়ছিলেন। অন্যমনস্কের মতো বললেন, জেলে কাজ করাবে শাস্তি অনুযায়ী। কয়েদিরা ফ্রি খাওয়া পাবে।

কয়েকদিন পর পুরনো পিয়ন এসে গেল। স্যার কদম আলিকে ডেকে বললেন, তোমার তো আর এখানে থাকা-খাওয়া চলবে না। পুরনো লোক এসে গিয়েছে। কদম আলি মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, স্যার, আমি কোথায় যামু?

আমি কী করে বলব, আমার তো জানাশোনা কেউ নেই। তুমি চেষ্টা করে দেখো। এরপর ভেবে বলেন, কিছুদিন এখানে থাকতে হয়তো পারবা। লুকিয়ে-লুকিয়ে। কিন্তু খেতে পারবে না। খাবার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

তিন

কারওয়ান বাজারে এক রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে পরিচয় ছিল কদম আলির। সেখানে একটা কিছু কাজ পাওয়া যাবে, কাজ না পাওয়া গেলেও বাকিতে কিছুদিন খাওয়া যাবে ভেবে গেল সে সেখানে। তখন দুপুরবেলা। গিয়ে দেখে অনেক মানুষের ভিড়। হইচই। পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে কদম আলি দেখল রেস্তোরাঁ, সবজির দোকান, পান-সিগারেটের দোকান, মস্ত বড় আড়ত, সব মেশিনের গাড়ি দিয়ে ভাঙা হচ্ছে। রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে রুটি, ভাঙা ডিম, সবজি, সিগারেটের প্যাকেট, কাঠের তক্তা। মালিক যারা দুহাত তুলে মাফ চাইছে, মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধ করতে বলছে। ঘড়ঘড় শব্দে মেশিনের গাড়ি চলছে। লোকজন দাঁড়িয়ে দেখছে, টেলিভিশন থেকে ছবি তোলা হচ্ছে। খবরের কাগজের

লোক ছবি তুলছে, কাগজে ঝটপট লিখছে। কদম আলি রেস্তোরাঁর মালিককে দেখে চিনতে পারল। সে হাউমাউ করে কাঁদছে। দেখে তারও কান্না পেল। শুনল লোকজন বলাবলি করছে, বেআইনিভাবে তৈরি দোকানপাট। তাই ভাঙা হচ্ছে। এখানে পাকা দালান উঠবে। কদম আলি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। পুলিশ এসে ধমক দিয়ে সরে যেতে বলল। লোকজন যাচ্ছে না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে। এমন কাণ্ড তো হরহামেশা হয় না। এত দিনের পুরনো দোকানপাট। হঠাৎ করে ভাঙা হবে তা কেউ ভাবতে পারেনি।

কদম আলি পাশের লোককে বলে, এরা অ্যাহন যাইব কই?

লোকটা তার দিকে না তাকিয়ে বলে, হ্যারাই জানে।

কদম আলি বলে, হ্যাদের নাকি অন্য জায়গা দেওয়া হইছে?

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে, কইতে পারি না।

কদম আলি রাস্তায় পড়ে থাকা ভাত, ডাল, মাছ, মাংসের তরকারি দেখে বলে, আহা! এত খাওয়া নষ্ট হইলো। কত লোকে খাইতে পারত।

শুনে পাশের লোকটা কিছু বলে না। মেশিনের গাড়িটা তাদের দিকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ায়। বস্তির ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে হইচই করে। তারা মেশিন গাড়ির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। গল্পে শোনা দৈত্যের মতো মনে হয়। সামনের অংশটা যখন ওঠে-নামে মনে হয় গিলে খাবে। অথবা তছনছ করে

মানুষ। খাতির করেই খাওয়াতো সে। অফিসে চাকরির সময় সে তার একটা ছোটখাটো উপকার করেছিল। সে-কথা ভোলে নাই। কিন্তু সে এখন রাস্তার ফকির। নিজেই দুবেলা খাবে কী তার ঠিক নেই। ভাবতে-ভাবতে কদম আলি হাঁটতে থাকে। একটি গাড়ি এসে চাপা দিতে দিতে চলে যায়।

রাস্তার পাশে রেস্তোরাঁটা দেখে সে থেমে যায়। মাঝারি আকারের। বেশ খন্দের যাওয়া-আসা করছে। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে ভাত-তরকারির বড়-বড় হাঁড়ি। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তিন-চারজন ছোকরা খাবারের থালা, বাটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। দূর থেকেও তরকারির গন্ধ পাচ্ছে সে। গন্ধটা নাকে যেতেই তার ভেতরের খিদেটা বেড়ে গেল। সে ধীরপায়ে রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকল। তার চেহারা আর পোশাক দেখে মালিক বলল, কী চাই? তার স্বরে তাচ্ছিল্য। সে ভেতরে যেতে-যেতে বলল, ভাত খামু।

শুনে মালিক অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর একটা বেয়ারাকে ডেকে বলল, দ্যাখ তো কী চায়?

কদম আলি একটা খালি টেবিল দেখে বসল। হাতদুটো রাখল টেবিলের ওপর। শার্টের কোনা দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। কাজের ছেলেটা কাছে এলে সে গম্ভীর স্বরে বলল, ভাত দে।

কী কইলা? মুখ সামলাইয়া কথা কও। ভাত দে। কথার কী ছিরি। চাকর পাইছো নাহি। ছেলেটা মুখ খিঁচিয়ে বলে।

পঁয়ত্রিশ বছরের বিয়ে করা বউ। তার মনে যে এমন ছিল কী করে বুঝব? বুঝতে দেয় নাই। আর বন্ধুটারেও চিনতে পারি নাই। মুখে এত মিষ্টি কথা। মনে হয়েছে আপনজন।

দেবে লোহার তৈরি হাত দিয়ে। দুপুরের গনগনে রোদে লোকজন ঘামে আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দোকানপাট ভাঙার দৃশ্য দেখে।

চার

কদম আলি তার স্যারকে বলে, বাড়ি ছাইড়া আইলেন ক্যান? নিজের বাড়ি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্যার বলেন, সে বড় লম্বা ইতিহাস। তুমি শুনে কী করবা?

কদম আলি বলে, নিজের বাড়ি থুইয়া এইহানে ভাঙা বাড়িতে পইড়া আছেন কেমন দ্যাহায়। আমার খারাপ লাগতছে।

হু। কদম আলি, সংসারটা অদ্ভুত জায়গা। বোঝা যায় না। এতদিনের বউ। পুরনো বন্ধু। তারাই যে শত্রু হয়ে যাবে তা জানতে পারি নাই।

কিছুই টের পান নাই?

না। সরল মনে বিশ্বাস করেছি। নিজের স্ত্রী। পঁয়ত্রিশ বছরের বিয়ে করা বউ। তার মনে যে এমন ছিল কী করে বুঝব? বুঝতে দেয় নাই। আর বন্ধুটারেও চিনতে পারি নাই। মুখে এত মিষ্টি কথা। মনে হয়েছে আপনজন।

কদম আলি স্যারের পিঠ টিপতে-টিপতে বলে, আপনি বড় সরল।

হ্যাঁ। সরল। আর বোকা। এমন মানুষের সংসারে জায়গা নেই। বুঝা কদম আলি।

পাঁচ

কদম আলির খুব খিদে পেয়েছে। কারওয়ানবাজারে দোকান-পাট ভাঙার পর সে খাবারের দোকানের খোঁজে হেঁটেছে। মনমতো কোনো দোকান চোখে পড়েনি। তার চেনা কমিরদ্বির রেস্তোরাঁ থাকলে এতক্ষণ বাকিতে খাওয়া হয়ে যেত। তার দেশের

কদম আলি শান্ত হয়ে বলে, ভাত দাও। ভাত খাব। ছেলেটা বলে, ভাতের লগে কী খাইবা?

কদম আলি কিছু না ভেবে মুখস্থের মতো বলে, ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, যা-যা আছে সব।

আরবি বাবা। জবর ক্ষুধা নিয়া আইছো দেহি। লগে টাহা আছে তো?

কদম আলি বলে, যা কইলাম শুনছো তো? অ্যাহন প্যাঁচাল না পাইরা খাবার আনো। দেরি কইরো না। বুঝতেই পারছো জবর ক্ষিধা পাইছে। হু। যাও।

ছেলেটা অর্ডার দেওয়া সব খাবার নিয়ে আসে। কদম আলি চেটেপুটে খায়। অনেকেই তার খাওয়া দেখে। সে কারো তোয়াক্কা করে না। একমনে খেয়ে যায়।

ছেলেটা বিল নিয়ে এলে সে টেকুর তুলে বলে, টাকা নাই।

টাকা নাই? হালার পুতে কয় কী? হুনছেন ওস্তাদ? পেট পুইরা খাইয়া অ্যাহনে কয় টাহা নাই।

শুনে মালিকসহ বয়-বেয়ারা ছুটে আসে তার দিকে। সবাই মিলে বেধড়ক কিল-ঘুষি দিতে থাকে। মালিক দুই হাত দিয়ে বেধঃ থেকে টেনে তোলে তাকে। পুরনো জামা ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর চলতে থাকে কিল-ঘুষি, লাথি, থাপ্পড়। মার খেতে-খেতে কদম আলি মাটিতে পড়ে যায়। তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। নাক দিয়েও রক্ত বেরিয়ে আসছে গলগল করে।

দোকানের খন্দেররা খাবার বন্ধ করে কদম আলির মার-খাওয়া দেখতে থাকে। বাইরে থেকে লোকজন এসে জড়ো হয়। সবাই বলাবলি করে, চোর ধরা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পুলিশ আসে। কদম আলির তখন মূর্মূষ অবস্থা। পায়ের শব্দ শুনে সে চোখ খোলে। পুলিশ দেখে তার মুখে হাসি ফোটে। এখন কোনো চিন্তা নেই কদম আলির। □



যদি

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

এক

জ্যো

শ্রুতার রাত্রি এখন নয়। ঘষা কাচের আকাশে যে আলোর আভাস তাতে রাত্রির সীমানা বোঝা যায় না। সাবধানী কেউ হয়তো ওই সময়কেই গভীর রাত্রি ভেবে পথ থেকে সরে যাবেন।

সুহৃদবর্গ আমাকে ওইরকম কথাই বলেছিলেন। ‘দ্যাখো কিছু বলা তো যায় না, রাত্রির রাস্তায় না-ইবা চলাফেরা করলে।’

আমি হেসে বলি, ‘দিনের রাস্তায়ই-কি হেঁটে বেড়ানোর সুবিধে খুব?’

‘না, তা নয়। তবুও দ্যাখো কোনোমতে দিনযাপনের কাজকর্ম সেরে এই যে এসে ঘরে ঢুকি আর বেরোই না। দরজাও বন্ধই থাকে।’





অলংকরণ : শেখ আফজাল

আমি বলি, ‘বন্ধ দরজা খোলা খুব কঠিন কাজ নয়, সে তো জানোই।’
তাদের মুখে আর কোনো কথা আসে না।
‘অপছন্দের কারো ঘরে ঢোকা যদি আটকাতে না-পারো তাহলে দরজা দিয়ে
লাভ কী?’ বলে আমি না-আলো না-আঁধারের ওই পথে নেমে যাই।
কিছু যায়-আসে না।

দুই

বেঁচে থাকতেই হয়। আর সেজন্যে যা করা দরকার তা না-করলে চলবে কেন।
আর তাই এক সময়ের উঁচু গলা নিচু করতেই হয়। কালি শুকানো কলমে যদি
লেখা না-পড়ে, না-পড়ুক, নতুন কলম আর কেনা হয় না। এসব কথা খুব
সাদামাটা।

তিন

কোনোমতে আমি তাঁর চোখে পড়ি না। অনেক রকম চেষ্টা করেও নয়। তাই
তিনি যদি আমাকে দেখেন সেই চেষ্টা।

লেজটাকে কি দুপায়ের ফাঁকে লুকবো না নাড়তে থাকবো, তাঁর সামনে
দাঁড়িয়ে, ভাবার পুরো সময় মিলল না। আমি ততোক্ষণে তার সামনে। বসবো

এক সময়ের উঁচু গলা নিচু
করতেই হয়। কালি শুকানো
কলমে যদি লেখা না-পড়ে,
না-পড়ুক, নতুন কলম আর
কেনা হয় না। এসব কথা খুব
সাদামাটা।

নাকি বসবো না। তিনি কিছু লিখছেন। একটু বাকলে দেখতে পেতাম তিনি কী লিখছেন। তা মনে হলো এ-রকম করা অভদ্রতা।

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সামনের পায়ের থাবা তুলে নাক-টাক চুলকোলাম খানিক। একটা বড়ো নীল রঙের মাছি আমার লেজটাকে কামড়াবে বলে ক্রমাগত মহড়া দিচ্ছে, আমি লেজটাকে একটু-একটু নাড়তে থাকি। এতে বিনয়প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে মাছিটাকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট করার আনন্দ পাওয়া যায়।

লেখা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে গেল। আমি ফটাফট শব্দ করে লেজ নাড়তে থাকি। এরকম করে লেজ নেড়ে নাকি অনেকেরই মোক্ষ মিলেছে, তাই আমিও অনেক ঠকে অবশেষে সনাতন পদ্ধতি নিলাম।

আরে বসুন, বসুন, বলে তিনি বেশ ব্যস্ত হয়ে ক্রিঃ করলেন। দু-কাপ চা দিতে বলো, এই যে সিগারেট চলে তো, অনেকদিন আপনাকে দেখিনি, এইসব কথা আমাকে বলে তিনি আমার ভবিষ্যৎ কর্মাবলির একটি বিস্তৃত বিবরণ চাইলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে, আপনার কাছেই এসেছি, আমার চিঠি মানে দরখাস্ত পেয়েছেন তো, বলে সমস্ত আবেগ গলায় ঢেলে দিই।

ও হ্যাঁ, তা দেখুন আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আসলে আপনি অনেক বেশি যোগ্য, আমাদের জন্যে ঠিক — আর তাছাড়া এই ব্যাপারটা একটু অন্যরকম আর কি।

আমি বেশ শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে লেজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে দু-চার টান দিয়ে বেশ খানিকটা কেশে নিয়ে বললাম, মানে এই রকম সিগারেট খেয়ে অভ্যেস নেই তো। আচ্ছা তাহলে আসি।

তিনি আবার হাসলেন।

আমি উঠে হাত বাড়িয়ে বললাম, বড়ো ভুল হচ্ছে আপনার, আমার হাতটায় নাড়া দিলেন না।

তিনি তাড়াতাড়ি আমার হাতটা ধরলে আমি বললাম, আরো একটা ভুল হচ্ছে, বলবেন তো যে, আমাকে কাজটা দিতে না-পেরে আপনি কী ভীষণ দুঃখিত।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই তো, ভয়ানক দুঃখিত।

আমি বললাম, আবার, কই বললেন না যে, যে-কোনো প্রয়োজন হলেই যেন আপনার কাছে আসি।

অবশ্যই আসবেন, অবশ্যই আসবেন বলে তিনি একটু উঁকিঝুঁকি দিলেন এই জন্যে না-কি যে, লেজটাকে এখনো রেখেছি কিনা। আমি উঠে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে বললাম, কী দেখছেন, ওটা ফেলে দিয়েছি। ওটার আর দরকার নেই।

কিন্তু কিছুকাল পরেই বুঝি, বড় বেশি কথা বলে ফেলেছি।

নতুন কলম কিনে কাগজের পৃষ্ঠা ভরালেও দেখি কারো নজরে পড়ে না। নিজের ভেতরে যে-আগুন আছে তা দিয়েই সবাইকে জ্বালানো ভেবে আগুনের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সে-সব কোনকালে নিভে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই আবার তাদের কাছে গেলাম। এবার লেজটাকে অনেক লম্বা করে নিই। অনেক দূর থেকে সেটিকে নিশানের মতো উঁচু করে তুলে ধরে নাড়তে থাকি।

তারপর ঘরের ভেতরে না-চুকে বাইরের দরজায় ঘুরঘুর করি। ভেতরে খুব খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল। আমি দরজার বাইরে বসে সামনের দু-পায়ের থাবা একত্র করে ঘষতে থাকি আর গলার মধ্যে বেশ একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলি। তারপরে বেশ মার্জিত, রুচিমাফিক পদ্ধতিতে মাথা নিচু করে লেজটাকে নাড়তে-নাড়তে ঘরে ঢুকলে একটা হাড় ঠক করে মেঝেতে পড়ে যায়। আমার হুমড়ি খেয়ে পড়া কাতর মুখ দেখে তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনি যখন এতো করে বলছেন, তাছাড়া আপনার ব্যবহার খুবই প্রশংসাযোগ্য। সুযোগটা না-হয় আপনাকে দেওয়াই যাক।

তিনি তখন ভালো করে চারদিক দেখার জন্যে চোখ টান করলে আমি ভয়ানক হেসে গলে যাই। দু-চারবার সারা মেঝেতে গড়াগড়ি

দিয়ে শেষে বলি, না, না। ভুলিনি। এই যে দেখুন কতো বড় লেজ। আর দেখুন, কী সুন্দর করে নাড়তে পারি। আর যদি দয়া করে মাথার রোয়ার মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিতেন তাহলে দেখতে পেতেন গলার ঘড়ঘড় আওয়াজটাকেও কতো মিঠে করে তৈরি করে রেখেছি।

চার

এই আর কি! এইভাবেই দিন কেটে যায়; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এমনি করেই কাটিয়ে দিই।

গরমে বেশি কষ্ট পাই না। যতোক্ষণ অফিসে থাকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র চলতেই থাকে। রাতে শোবার সময়ও পাখা ঘোরে বিছানার ওপরে।

বর্ষায় বর্ষাতি গায়ে দিই। ছাতাও আছে। তাছাড়া অফিসের গাড়িতে যাতায়াত। রোদে-বাদলে বেশি ছোটোছুটি করতে হয় না। অফিস-সময়ের বাইরে কোথাও যেতে হলে রিকশা কি সিএনজি কোনোটিই দুর্লভ নয়। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে রিকশাওয়ালা পর্দা বের করে দেয়। সেটিতে যদি খানিক ছেঁড়াও থাকে মোটে বিরক্ত হই না।

শীতের সময় গায়ে লেপ দিতে পারি। তোশক যথারীতি বিছানো থাকে। নারকেলি ছোবড়ার জাজিম এখন অনেক দূরের কথা। স্প্রিংয়ের জাজিম চালু আজকাল।

বাজারে মাছ-আনাজপাতি পাওয়া যায় ভালোই। শহরজুড়ে সুপারশপের ছড়াছড়ি। বাজারের মাছে গুনি ফরমালিন। সুপারশপের কাঁচাবাজারের মাল সব খাঁটি, এই গুনি।

ফলমূলও অমনই। দিব্যি রসে ভরা টকটকে, নানারকম ফল। দেশি-বিদেশি। অবশ্য গুনি নানারকম স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থে ডোবানো সেসব। গুনি শতশত মণ ফল ইত্যাদি নষ্টও করে ফেলা হয় এই জন্যে। সেসব তো আর চোখে দেখা যায় না। তাই যেমন ভালো মনে হয় কিনি ফলমূল, আনাজপাতি — ঘরে ভালো করে ধুয়ে নিই।

কেবল বসন্তটা ঠিক তেমন করে উপভোগ করা যায় না। মানে লেপটেপ গায়ে দিতে হয় না, প্রথম রাতে একটু গরমই লাগে, শেষরাতে শীত-শীত করে। অবশ্য কোকিলের ডাক এই সময়ের একটি নির্বাচিত বিষয় — তা পার্কের দিকে গেলে হয়তো সেটি শোনাও যায়। তবে গুনি আজকাল নাকি বর্ষাকালেও ওই নচ্ছার পাখি ডাকাডাকি করে।

যেদিন বাসায় যেতে ভালো লাগে না, সেদিন চীনে রেস্টোরাঁয় চুকে পড়ি। গুনি সব দেশেই চীনে রেস্টোরাঁ আছে আর ওইসব রেস্টোরাঁর খাবার নাকি ওই দেশের স্বাদ মেটানোর মতো করেই তৈরি হয়। আমরা এতো ভাবি না। বাইরে খাওয়াটাই বড় কথা।

টেলিভিশনের বাজার বড় রমরমা। হাজারো চ্যানেল আর অনুষ্ঠানের ভিড়ে ভালোটি খুঁজে নেওয়া বড় শক্ত — সকলেই এমন বলেন। তাই টেলিভিশন তেমন দেখি না। ভিডিও ইত্যাদি দেখবার নানারকম যন্ত্র আজকাল। সিনেমা হলে গিয়ে তাই আর ছবি দেখা হয় না। মাঝে মাঝে নানারকম ফিল্ম সোসাইটি ইত্যাদি বিদেশি দুঁদে পরিচালকের ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করলে সেখানে যাই।

গান শোনার অভ্যাস আছে। নানা যান্ত্রিক মাধ্যম আছে সেসব শোনবার। সারা বছরজুড়েই যেন নানা সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয় শহরে। সেসব জায়গায় মাঝে মাঝে যাই।

বই পড়ি। যদিও আগের মতো নয়। তবুও হালফিল পশ্চিমা সাহিত্যের খবর রাখি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেসব নিয়ে কথাবার্তাও বলি।

লেখাটেখার চর্চা একসময় ছিল। এখনো একেবারে ছাড়িনি। কিছু-কিছু লেখা মাঝে-মাঝে ছাপাও হয়। কিছু সাহিত্যিকের সঙ্গে মুখচেনা আলাপও আছে। দু-চারজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও আছে। মাঝে-মাঝে দেখা হলে কে কেমন লিখছে এইসব মতামতের বিনিময় হয়।

এই আর কী। বেশ ভালোই আছি। কেবল মাঝে-মাঝে বাইরে

গোলযোগ হলে, কি মিটিং-মিছিল হলে নানা জায়গায় নানা রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ি কি রিকশা কি সিএনজি ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য পথ দিয়ে যেতে হয়। অথবা যানবাহন ছেড়ে দিয়ে ঘরেই ফিরে আসি আবার।

নানারকম বন্ধ হয় শহরে, এই যাকে ‘হরতাল’ ইত্যাদি বলা হয়। এইসব সময়ে গাড়ি-বাস ইত্যাদি কম চলে, অথবা কখনো কখনো চলেও না। সিএনজি কি রিকশা অবশ্য সর্বদাই পাওয়া যায়। যাতায়াতের অসুবিধা খুব একটা হয় না। অবশ্য চোখ খোলা রাখতে হয়। বেশি ঝুঁকির অঞ্চল দিয়ে চলাফেরা করা ঠিক নয় বুঝে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করি।

রাজনৈতিক, সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের কথা জানি। কাগজেও পড়ি সেসব। এক সময়ে সেসবে আগ্রহ ছিল। যাতায়াতও ছিল নানা সভা কি সেমিনারে। এখন আর সেসবে যাই না।

বন্ধুবান্ধব একসময়ে যারা খুব কাছাকাছি ছিল, এখন নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। নিকটতম শহরটি থেকে সাগর-পার অবধি। চিঠিপত্র লেখার চল আজকাল নেই। ই-মেইল কি সরাসরি টেলিফোন করলে যোগাযোগ হয়। ঘনিষ্ঠ দু-চার বন্ধু এখনো আছে শহরে। তাদের সঙ্গেই কিছু-কিছু সময় কাটে এখনো।

বন্ধুরা স্ত্রীসঙ্গে অভ্যস্ত। নিজেও আমি এমন কিছু অনভ্যস্ত নই। তবুও পাকাপাকি কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। বিবাহকে মোহমুদগর এবং শক্তিশেল এই উভয়বিধ আখ্যায় ভূষিত করে সুহৃদজন নিয়মিত নানা পরামর্শ দেয়। সবই শুনি আমি।

পাঁচ

সারাদিন ঘরে বসে থাকা বড় সুখের নয়। সাপ্তাহিক ছুটির দিন দুটি হলেও কখনো-কখনো কর্মস্থলে যাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়ে। অফিসের গাড়ি না এলে অন্য কোনোভাবে যাওয়ার চেষ্টা করি। যাওয়া অসম্ভব হয় না প্রায় কখনোই।

আজ অমন কিছু নয়। ছুটির দিনই। তাই সারাদিন ঘরে বসে না থেকে কোথাও যাওয়া যাক ভেবে রাস্তায় নামি।

কিন্তু যাবো কোথায়? রাস্তায় নেমে তাই কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকি। সময় কাটানোর নানা পথের কথা তো জানা আছেই, কিন্তু সেসবে আর মন টানে না। অন্তত এই মুহূর্তে নয়।

আর তখনই সাংসারিক জীবনের কথা মনে আসে। বিবাহের প্রস্তাবটি আবারো সামনে আসে। এখনো প্রৌঢ় নই — একেবারে

খারাপ দেখাবে না। অনেককাল ধরেই আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সে। স্বামীগৃহে সুখী জীবন কাটাচ্ছে, দেখতে চায় তার অগ্রজ। তাকেও কিছু একটা বলা প্রয়োজন।

কিন্তু ওইসব কোনো কিছুই দুরূহ সমস্যা নয়। হ্যাঁ বা না যে-কোনো দিকেই যাওয়া চলে। তাই এই মুহূর্তে মন থেকে সে-চিন্তাও সরিয়ে দিই।

কী করা তাহলে এখন?

আকাশে সারাদিন মেঘ ছিল আজ। ঘন, কালো মেঘই ছিল আজ সারাদিন। বেরোনোর আগে একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল মনে এলেও আর ঘরে ফিরে যেতে চাই না। বৃষ্টির আয়োজন স্পষ্ট বুঝেও।

সামনে একটি রিকশা পেয়ে তাতেই উঠে বসি এবং কোথাও যাওয়ার নেই বুঝে কাছেই যে বন্ধুর বাসা সেদিকেই যেতে বলি রিকশাকে। রিকশাওয়ালা চেনা ঠিকানায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। আকাশে তখন মেঘ আরো ঘন, কালো। হাওয়া উঠে আসে। বৃষ্টির দু-চারটি ফোঁটাও বুঝি পড়ে।

বন্ধুর বাসায় কেউ ছিল না। রাস্তায় আবার নামার মুখে বৃষ্টির কয়েকটি বড় ফোঁটা বুঝি মাথায়ও পড়ে। রাস্তায় নেমে কাছাকাছি কোনো রিকশা চোখে পড়ে না। সিএনজিও নয়। এই জন্যেই বুঝি সবাই গাড়ি কেনে, ভাবি। একটা গাড়ি হয়তো কেনাও যায়। অতো টাকা হাতে নেই। তবুও হয়ে যাবে একরকম করে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে বৃষ্টির ধারায় যখন বেগ এসেছে প্রায় তখন কাছের দোকানে আশ্রয় নিই ভাবতেই একটি রিকশা পেয়ে যাই।

খানিকদূর যেতেই বৃষ্টির ধারা প্রবল হয়। রিকশাওয়ালা বৃষ্টির ধারা সহিতে না-পেরে একটি গাছের নিচে রিকশা থামিয়ে তাড়াতাড়ি গাছের গোড়ায় চলে যায়।

আমি রিকশায়ই বসে থাকি। প্লাস্টিকের পর্দায় ঢাকা যদিও, তবু শরীরের দুপাশ, পোশাক সমেত, বৃষ্টির ধারায় ভিজ়ে যেতে থাকে। আমি বসে থাকি। নির্লিপ্ত মুখে কোনো রেখা দেখা যায় না, সম্ভবত। ভাবি, এমন তো নয় যে, এই পোশাক ভিজ়ে গেলে কোনো অসুবিধে হবে। তাহলে বৃথা উদ্বেগ কিসের জন্যে।

বৃষ্টির বেগ কমে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি, আর তখনই হঠাৎ মনে হয়, যদি বৃষ্টির বেগ না-কমে? যদি বৃষ্টি না থামে! □



হুনমোন

বুলবন ওসমান

এঁমে পৌছতে-পৌছতে বেশ বেলা হয়ে গেল। অটোটা রায়মনির ডাঙ্গার পাশে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ওপর থেকে অপেক্ষমাণ সবাই হুড়মুড় করে নেমে আসে। বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি কাইয়ুমভাই বললেন, আমরা কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। সে ঘণ্টা দেড়েকের ওপরে হবে... ভাই...

রাস্তার যা অবস্থা... বারেক পেটে ভাত ছিল না... বলে ফজল, অটোচালকের পাওনা মিটিয়ে দিতে-দিতে। ততক্ষণে তার সুটকেসটা একজন হাতে উঠিয়ে নিয়েছে।

গাড়িতে আমি একা... ঝাঁকুনি খাবার হাত থেকে বাঁচার জন্য অন্য প্যাসেঞ্জার পর্যন্ত নিয়েছি... তারা সব নেমে গেছে রাজহাটিতে। এদিকের রাস্তাটা অবশ্য অনেকটা ভালো... মোরাম বেশ বসে গেছে। পাকা হবে কবে? সবলসিংহপুর খুব ধীরে এগোচ্ছে।

কথা চলছে দু-বছর ধরে। কাজের কাজ কিছু হয়নি। নতুন পুকুরের পাড় ধরে তারা মেহেদি





অলংকরণ : রোকেয়া সুলতানা

মহল্লার ভিটেয় ওঠে। দুটি বাড়ি ছাড়িয়ে একতলা পাকা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে। এটা ফজলের বড় ভাগ্নে নাজিরের। দোতলাটা করতে পারেনি। একতলায় দুটো কামরা। বেশ বড়। গাঁথুনিও ভালো। বারান্দার বাঁদিকে ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি। সিঁড়ির নিচে রান্নাঘর করে নিয়েছে। বেশ ভালো ব্যবহার করেছে স্পেসটা। ঘরদোরের রংও করেছে সুন্দর। একটা রুটির পরিচয় আছে।

ফজলের আগমনের জন্যে নাজিরের স্কুলপড়ুয়া ছেলেটি কামরাচ্যুত। বেডটা ডাবল, ধোয়া চাদর মোড়া। বালিশের ওয়াড়ও পরিচ্ছন্ন। আছে এক্সট্রা চাদর, ভাঁজ করে রাখা। সব ব্যবস্থা সুচারু।

ভাই, জুতো খুলে পা উঠিয়ে বসুন।

কামরায় একটা প্লাস্টিকের চেয়ার ছিল, ফজল চেয়ার টেনে ওটার ওপর বসে জুতো খোলে।

ভাই, খাবার দিয়ে দেব? কাইয়ুমের প্রশ্ন।

তৈরি করতে থাকুক। আমি ততক্ষণ হাত-মুখ ধুয়ে নিই।

ঠিক আছে। ছোট ভাইদের একবার দেশে আসতে বলবেন না? কাইয়ুম কথা চালিয়ে যায়।

বলব। ওরা সবাই কাজে ব্যস্ত। আমি অবসরপ্রাপ্ত বলে ইচ্ছা করলেই আসতে পারব।

তা ঠিক। চাকরি-জীবন বাঁধা-জীবন। ইচ্ছা করলেই দেশ-বিদেশে যাওয়া যায় না। বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্ডিয়ার সম্পর্ক ভালো হওয়া সত্ত্বেও এখনো ভিসা করাটা বড় ঝামেলার। আপনাকে সশরীরে হাজির হতে হবে। বুড়ো-হাবড়া যা-ই হোন।

ফজল ঘর থেকে বেরিয়ে রকে বসে হাত-পা ধুয়ে নেয়। চাপকলের জলটা ঠান্ডা। বেশ আরাম পায়।

এরই মধ্যে বিছানায় দস্তরখান বিছিয়ে ভাত-তরকারি রাখা হয়ে গেছে।

ছোটবেলায় দাদির হাতের রান্নার কথা মনে পড়ে ফজলের। পুঁইশাক-কচু-কুঁচোচিংড়ির রান্নাটা তার খুব প্রিয় ছিল। সামনে তা পেয়ে সে খুব খুশি।

শুধু ডাল আর শাক দিয়েই খাচ্ছে দেখে ভগ্নিপতি বলে, মাছ-মাংস কিছু ধরছেন না যে?

শাকটা খুব ভালো লাগছে। আর কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। তা বললে কী হয়! কষ্ট করে আপনার বউমা সব রান্না করেছে।

সত্য বলতে কি কাইয়ুমভাই, মাছ-মাংসে এখন অরুচি ধরে গেছে।

তা রোজ খেলে হতে পারে।

খাওয়া শেষে ফজল এবার বিছানায় গা রাখবে।

কাইয়ুমভাই, একটু গড়িয়ে নিই, বিকেলে তখন গ্রামে রৌদ দিতে বেরোব।

বিকেল হতে আর কতক্ষণ। আপনি বিশ্রাম নিন, সময়মতো আমি ডাক দেব।

ভাদ্র মাস। ভ্যাপসা গরম। পাখাটা ফুল দমে ছাড়তে হলো। সব জানালা বন্ধ করে, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে কাইয়ুম বেরিয়ে যায়। ছোটদের নির্দেশ দেয়, কেউ যেন গোলমাল না করে।

মিনিট পনেরো-বিশ পর ফজলের চোখজোড়া সবে লেগে এসেছে, এমন সময় মাথার কাছে গলিতে দুড়দাড় শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারে, অনেক জোড়া পায়ের আওয়াজ। একবারে যে থেমে গেল তা-ও নয়, থেকে-থেকে জোড়ায়-জোড়ায় চলেছে। এবার হইচইও শুনতে পেল।

এই সময় তার দরজার সামনে একটি বালিকার তীব্র কণ্ঠস্বর কানে এলো। বেশ ক্ষুব্ধস্বরে বলছে, শালা ছনমোন, তোর পোঁদে গরম সিক ঢুকিয়ে দিলে তবে মজাটা বুঝবি...

চমকে ওঠে ফজল। মনে হলো, সে যেন ষাট-পঁয়ষাট বছর আগের ছুগলির সবলসিংহপুরে ফেরত গেছে। তখন এই গ্রামে অনেক হনুমান ছিল। এরা দল বেঁধে থাকত। দলের সর্দারটাকে বলা হতো বীর হনুমান। অবশ্য গ্রামের লোক হনুমান বলত না, বলত ছনমোন। সেই ছনমোন শব্দ এখনো চলে আসছে!

ঘুমের বারোটা বেজে যাওয়ায় উঠে পড়ে। দরজা খুলে দেখে, পাঁচ বছরের মেয়েটি পুকুরের পুবপাড়ের দিকে চেয়ে। ওদিকে দৃষ্টি চালিয়ে ফজল একটি খেঁড়ে হনুমান দেখতে পেল। বড় একটা বাস্তববাদাম গাছের ডগায় বসে। আর নিচ থেকে ছেলে-ছোকরার দল ঢিল মেরে চলেছে। হনুমানের ভাগ্য ভালো, ঢিল অন্দুর পৌঁছোচ্ছে না।

কে একজন চিৎকার করে বলে ওঠে, এই ছনমোনটাকে মারার জন্যে একটা বন্দুক দরকার। হারামিটা বড় জ্বালাচ্ছে। আমাদের দুটো লাউ ছিঁড়েছে!

আর একজন বললে, আমাদের কলার কাঁদিটা সাবাড়।

এই আপদটাকে শেষ করতে হবে বলে ওঠে আর একজন।

বন্দুক কথাটা ফজলের কানে বেশ শব্দ করে বাজতে থাকে। আবার সে অতীতে পৌঁছে যায়। মনে পড়ে সেই ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের কথা। তার বয়স তখন পাঁচ-ছয়, তারা আছে গ্রামে। এদিকে বাবা-চাচার সবাই কলকাতায়। শুরু হয়েছে হিন্দু-মুসলমানে ইতিহাসখ্যাত গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। পাকিস্তান-আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এই সময়ের ঘটনা। বেশ কয়েকটা দলছুট হনুমান গ্রাম সবলসিংহপুর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষের ফলমূল সাবাড় করছে। দাঙ্গার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে যুবকরা সবাই গ্রামে। তারা এই হনুমান নিধনের জন্যে উঠেপড়ে লাগে। একদিন সকালে সবাই মিলে দলটাকে তাড়া করল। হনুমানগুলো এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া, কিন্তু গ্রাম ছাড়ছে না। এই গ্রাম ছেড়ে যাবেই বা কোথায়! অন্য গ্রামে খাবার-দাবার না পেয়েই তো তারা এখানে আস্তানা গেড়েছে। হনুমানকুল এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এমন করতে-করতে ওরা মেহেদিমহল্লার একটা বড় কদমগাছে আশ্রয় নেয়। গাছটা বেশ উঁচু। ঢিল মেরে কাবু করা যায় না। তবু চারদিক থেকে ঢিল ছোড়া হচ্ছে। ছোটরা পাটকেলগুলো কুড়িয়ে এনে বড়দের হাতে তুলে দিচ্ছে। ছেলেরা ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এবার বন্দুক জোগাড় করবে।

গ্রামে একমাত্র তিনতলা পাকাবাড়ি কাজী খিলাফত হোসেনের। তাদের আছে বন্দুক। সবাই মিলে কাজী সাহেবদের বাড়িতে হাজির। তাদের জোয়ান ছেলেদেরও কোনো কাজ ছিল না। তারা সানন্দে বন্দুকে টোটা ভরে সজ্জা নেয়। সবাই কদমগাছতলায় পৌঁছে দেখে শুধু বীর হনুমানটা আছে। হঠাৎ দলবেঁধে সবাইকে আসতে দেখে হনুমানটা

চঞ্চল হয়ে ওঠে। হয়তো ভাবছে এবার কী করবে। তার দল অন্যদিকে চলে গেছে। সে একা।

কাজীদের ছোট ছেলে জালালের হাতে বন্দুক। সে হনুমানটাকে তাক করে। কী অদ্ভুত, সবাইকে অবাক করে দিয়ে হনুমানটা জোড়হাত করে। ঠিক মানুষের মতো মাফ চাচ্ছে। কিন্তু তার শত্রু মানবকুলের মনে কোনো রকম করুণার উদ্রেক হলো না। তারা আরো বিদ্রোপে ফেটে পড়ে।

হারামি, এখন জোড়হাত করা হচ্ছে!

তখন দু-একজন বললে, জালালভাই, একটা ফাঁকা আওয়াজ করে তাড়িয়ে দিন।

কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেশিরভাগ ছেলেপিলে হনুমান নিধনের পক্ষে।

জালাল কোনোরকম আর কালবিলম্ব করে না। ফায়ার।

অব্যর্থ তাক। গুলির মূল ছররাগুলো বুক বিদ্ধ হয়।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধপাস করে হনুমানটা মাটিতে এসে পড়ে।

দুবার হাত-পা খিঁচিয়ে স্থির হয়ে গেল।

ছেলের দল গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ফজলের মনে পড়ে, সে পেছন থেকে দেখছিল। সামনে যেতে ভয় লাগছিল। এতটুকু মানুষ রক্ত দেখে ভয় পাওয়ারই কথা।

এই সময় পেছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসে, এ্যাঁই, তোরা কী করছিস ওখানে!

সবাই লোকটির দিকে চেয়ে দে ছুট।

ফজল পালাতে পারল না। দেখল লোকটা তার বাবা, তখন তার পেছনে চলে এসেছে।

ফজল, ঘরে যাও। বাবা ধমক দিলো। চলে যেতে-যেতে সে ফিরে দেখে, বাবা তখন হনুমানটার সামনে বসে চেয়ে থাকা চোখদুটো বন্ধ করে দিচ্ছে।

এখনো পরিষ্কার মনে আছে, বাবা বাড়িতে ঢুকে রাগারাগি করতে লাগল দু-দাদার ওপর।

আপনারা সব ঘরে বসে আছেন, ওদিকে ছেলেরা বন্দুক দিয়ে হনুমান শিকার করছে। এদিকে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে হত্যা করছে। গ্রামে ফিরেও যদি শান্তি না পাই, এখানেও যদি হত্যাকাণ্ড দেখতে হয়... তা-ও নিরীহ প্রাণী...

পরে বাবা কয়েকজনকে ডেকে চাটাইয়ে তুলে হনুমানটাকে কবরস্থানের পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় মাটি খুঁড়ে কবর দেয়।

কাঁচাঘুম ভেঙে গিয়েছিল ফজলের, তবু নিজেকে শান্ত করে এগিয়ে চলে পুকুরপাড়ের দিকে। কাছে গিয়ে ছেলেদের বলে, সবাই এদিকে এসো। তোমাদের একটা গল্প বলি। আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগের ঘটনা।

সবাই তার সামনে এসে গোল করে ঘিরে দাঁড়ায়।

ফজল পুরো ঘটনাটা বলে চলে।

তারপর জিজ্ঞেস করে, তোমরা জানো, সেই লোকটা কে? লোকটা যে তার বাবা, এই কথাটা সে ছেলেদের সামনে চেপে যায়।

পনেরো-ষোলো বছরের এক যুবক বললে, জানি, তিনি আমাদের গ্রামের একজন নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন। আমরা প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে তাঁর জন্মদিন পালন করি। ফজলের পরিচয় সে তখনো জানে না।

ফজল এবার পরিচয় দেয়। তারপর বলে, তোমরা এই হনুমানটাকে মেরো না। খাবার না পেয়ে এদিকে দলছুট হয়ে চলে এসেছে। চলো, আমরা সেই বন্দুকের গুলি খাওয়া হনুমানটার কবর দেখতে যাই।

ফজলের পিছু-পিছু ছেলের দল এগিয়ে চলে হনুমানের কবর দর্শনে। □



একা দাঁড়িয়ে থাকা

সেলিনা হোসেন



তিন বছর বয়সে রূপশ্রী বাবাকে হারিয়েছে। ও এখন একুশ বছর বয়সের তরুণী। লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
বাবার কোনো স্মৃতি ওর নেই। মা বলেছে, ওর নামটি বাবা রেখেছে। ওর জন্য এটুকু একটি সম্বল। নিজেকে ফিরে দেখার সময় এই সম্বল সহযোগিতা করে। বিশেষ করে সম্পর্কের ভালো-মন্দের হিসেবে। রূপশ্রীর বেড়ে ওঠা এই সূত্র ধরে এগোয়। রূপশ্রী মনে করে, নাম রাখার সম্বল ওর দিনযাপনের খুঁটিনাটিতে সঞ্চার মাত্র।
সার্টিফিকেটে বাবার নাম ব্যবহার ওর পরিচয়। সৈয়দ সিকান্দার শাজাহান বর্তমানে ওর কাছে এই পরিচয়ই মাত্র। যার অনুভব জীবনের কোনো জায়গা আলোকিত করে না, তাকে আর নাম দিয়ে কত স্মরণে রাখা যায়। এই ভাবনায় রূপশ্রী দমে থাকে। বুঝে নেয় মৃত্যুর কাছে পরাজিত



অলংকরণ : রফিকুন নবী

মানুষ ও। এই ভাবনা ওকে বিষণ্ণ করে রাখে। বাবা ওর স্মৃতিতে নেই, এটা ও আর ভাবতে পারে না। ওর এখন কান্না পায়।

বান্ধবী কণা প্রায়ই বলে, এভাবে বেঁচে থাকা জটিল করার দরকার কী? খালাম্মাকে বলব তোকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে।

খালাম্মা! মানে আমার মা!

বাঁধভাঙা হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে ও কণাকে বলে, প্রতিদিনের দেখা মায়ের চেহারাও আমার কাছে অস্পষ্ট।

অস্পষ্ট! চেষ্টা করে ওঠে কণা। আসলে তোকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতেই হবে। খালাম্মাকে আজই বলব।

না। চেষ্টা করে ওঠে রূপশ্রী। একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমার জীবনে বাবার আড়াল হয়ে যাওয়া একরকম, মায়ের আড়াল হয়ে থাকা আর একরকম।

কণা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তোর মতো এমন মেয়ে আমি দুটো দেখিনি। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যাদের কারো বাবা নেই, কারো মা। তারা তোর মতো কথা বলে না।

ওরা ভাবতে শেখেনি।

বুঝেছি, তুই কি গল্প লিখবি, নাকি কবিতা? ওই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা

যার অনুভব জীবনের কোনো জায়গা আলোকিত করে না, তাকে আর নাম দিয়ে কত স্মরণে রাখা যায়। এই ভাবনায় রূপশ্রী দমে থাকে। বুঝে নেয় মৃত্যুর কাছে পরাজিত মানুষ ও। এই ভাবনা ওকে বিষণ্ণ করে রাখে।

ঘামাস কেন?

বুঝবি না। এসবই অভিজ্ঞতা। আমার দুনিয়া নিয়ে আমিই তো মাথা ঘামাব, নাকি অন্যরা ঘামাবে?

কণা হাল ছেড়ে দেওয়া স্বরে বলে, জানি না বাপু। এও বুঝি না যে, এত সম্পর্ক আবিষ্কারের ধান্দা কেন তোর মধ্যে।

ধান্দা? বাজে কথা বলবি না কণা।

আমি বলি, এসব ভাবনা ছাড়। আমাদের এখন অনেক কিছু করতে হবে। এসব ভাবনায় তলিয়ে গেলে উঠে দাঁড়াতে পারবি না।

তুই দেখি আমার সঙ্গে ভালোই মাস্টারি করছিস।

আমি তোর বান্ধবী, টিচার না। যা বলার তা তোর ভালোর জন্য বলছি। আমি যা ভাবি তা আমি ছাড়তে পারব না। তোর আর আমার জীবন একই রেললাইনে ছোটো না। তোর রেললাইন আলাদা, আমার রেললাইন আলাদা।

বুঝেছি, গল্প লিখবি। লিখ, লিখে ধন্য হ।

কণা ওকে ভেংচি কেটেছিল। তারপর খিলখিল হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এখন আমাদের প্রেম করার সময়। এসব আজো বাজে ভাবনার সময় নয়।

রূপশ্রী চোখে আগুন ছড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল। কণা হাসতে-হাসতে বলেছিল, চোখ রাঙাস না। তোর কাউকে পছন্দ হয়নি রূপশ্রী?

ও আগুন-চোখেই বলেছিল, হয়েছে।

সত্যি? বলিসনি তো।

এটা ঢোল পিটিয়ে বলার জিনিস নয়।

বাব্বা, তুই দেখছি সেয়ানা মেয়ে। অবশ্যই, সেয়ানা তো হবিই। এতকিছু যার মাথায়, সে সেয়ানা হবে না তো কী হবে।

রূপশ্রীর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে কণা নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তড়িঘড়ি বলে, যাই। রেগে আছিস। এরপর মার লাগাবি।

চলে যায় কণা।

বাড়ির দরজায় চুপচাপ বসে থাকে রূপশ্রী।

তিনতলা এই বাড়িটি বানিয়েছে ওর নানা। ওর জন্মের আগে বানানো হয়েছিল। রূপশ্রীর মনে হয় এই বাড়ির মধ্যে মাটির মায়া আছে। সামনে ছোট্ট একটি বাগান আছে। বাগানে কয়েক রঙের জবা ফুলের গাছ আছে। কামিনী ফুলের ঝাড় আছে। মৌসুমি ফুল লাগানো হয়। ওর বেশি ভালো লাগে, যখন লাল রঙের তরুলতা ফুল ফোটে। মাঝে-মাঝে ছোট ফুলগুলো গুচ্ছ বানিয়ে চুলে গুঁজে রাখে।

এই বাগানটি রূপশ্রীর নানা-নানির শখ। এই বয়সেও দুজন বেশ খুনসুটি করে। বাগানে দাঁড়িয়ে ওর নানা লাল জবা ফুল নানির খোঁপায় গুঁজে দেয়। ও বেশ মজা পায়। দুজনের বয়সের কথা মনে হয় ওর। একদিন নানাকে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, আমার বয়স ছিয়াত্তর। তোর নানির বয়স একাত্তর।

ও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলেছিল, তোমাদের এত বয়স হয়েছে। তোমরা কিন্তু বুড়ো হওনি।

হইনি? বেশ বলেছিস।

মোহসিন মিয়া নাতনির দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসে। রূপশ্রী তার দুহাত জড়িয়ে ধরে বলে, তোমরা কি প্রেম করে বিয়ে করেছিলে নানা?

আমরা কি তোদের মতো খোলা হাওয়ায় বড় হয়েছি যে প্রেম করে বিয়ে করব?

বুঝেছি, বলেই হাসতে থাকে রূপশ্রী।

কী বুঝেছিস, বল?

বুঝেছি, তখন প্রেম করা হয়নি বলে তোমরা এখন প্রেম করছ।

মেয়েটা একটা পাক্কুবড়ি।

ঠিক বলেছি কিনা বলো?

বলেছিস।

এরপর শুরু হয় নানা-নাতনির হাসি। পরে হাসিতে যোগ দিয়েছিল নানি হানুফা বেগম। এরপর খালা দিলরুবা। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। থাকলে হয়তো তারাও হাসিতে যোগ দিত। এমন একটি হাসির সময় কখনো-কখনো রূপশ্রীকে সম্পর্কের সূত্রের বাইরে নিয়ে যায়। ও তখন বুঝতে পারে, নানা-নানি ওর কাছে আড়াল হয়ে থাকে না। নানা-নানি ওর জীবনে আলো।

ও গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে ওর স্বপ্নের বাগানে এসে দাঁড়ায় রূপক। ওর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের সূচনা হয়েছে। রূপক বলেছে, আমাদের ভালোবাসায় খাদ থাকবে না। আমাদের ভালোবাসা হবে ভরাট জমিন।

রূপশ্রী চোখ উজ্জ্বল করে বলেছিল, জমিন? জমিন কি খোলা প্রান্তর থাকবে? শূন্য? ধুলোয় ভরা?

মোটাই না। জমিনে ভালোবাসার সরোবর থাকবে। সেখানে পদ্মফুল ফুটবে।

আর?

প্রেমের খুনসুটি পাখি থাকবে।

আর?

অভিমানের পোকামাকড় থাকবে।

আর?

বিরহের কাঁকড়া-কাছিম থাকবে।

আর?

দুঃখের বৃষ্টি থাকবে।

আর?

সন্তানের গাছগাছালি থাকবে।

এটুকু বলার পরই হা-হা হো-হো করে হেসেছিল দুজনে। রূপশ্রীর ভীষণ ভালো লেগেছিল সে-মুহূর্তের রূপককে। ও ভেবে দেখেছিল, সম্পর্কের ওই গিটু যদি শক্ত হয় তাহলে রূপকের চেহারা ওর সামনে অস্পষ্ট হবে না। ও প্রতিদিনের জীবনে থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু যাবে-আসবে না। রূপশ্রী একা-একা খুশিতে ভরে ওঠে। দুই লাফে তরুলতার ফুলের লতার কাছে যায়। লতাগাছটিতে অনেক ফুল ফুটে আছে। কয়েকটি ফুল ছিঁড়ে গুচ্ছ বানিয়ে নিজের চুলের ক্লিপের সঙ্গে গোঁথে রাখে। খুশিতে ওর চঞ্চলতা বাড়ে। বেশ লাগে ভাবতে যে, ওরা চাইলে অল্প সময়ের মধ্যে বিয়ে করতে পারবে। শুরু হবে সংসার। নতুন জীবন। রূপকের চাকরি হয়েছে একটি বিদেশি এয়ারলাইন্সে। ও নিজে চুকবে কোথাও। আপাতত যা পাওয়া যায় সেখানে, তারপর পছন্দমতো কোথাও ঢোকান চেষ্টা করবে। ওর পছন্দ শিক্ষকতা। কোনো কিন্ডারগার্টেনে শিশুদের সঙ্গে দিন কাটাবে। পড়ালেখা শেখানো আর ওদের হাসিমুখ দেখা। এভাবে নিজের শৈশব দেখা নিশ্চিত হবে, যে-শৈশবের স্মৃতি সবচেয়ে বেশি নানা-নানির সঙ্গে সম্পর্কের গিটু।

রূপশ্রী আবার দরজায় এসে বসে।

মৃদু বাতাস ওর শরীরে পরশ বুলায়। বদলে যায় ওর ভাবনার জগৎ। প্রবল ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে মনে করে কত-কত বছর পরে এমন একটি দিন ওকে আনন্দ দিচ্ছে। শৈশবে নিয়ে গেল ওকে। আহ, এভাবে একটা দিন আর একটা দিনের ভেতরে প্রবেশ করে। এভাবে এক জীবন অন্য জীবন হয়ে যায়। আনন্দের রং বদলায়। অন্ধকারও রঙিন হয়। মায়ের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার চিন্তা যে নিগূঢ় অন্ধকার হয়, সেখান থেকে এভাবেই বেরিয়ে আসা হয়। ছোটবেলায় নানা-নানি ওকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছিল। হাতের পিঠে উঠিয়েছিল। মাহুতকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল হাতের পিঠে। চিড়িয়াখানার বড় গাছগুলোর নিচে ঘুরতে-ঘুরতে অনেক পাখি দেখেছিল। হাতের সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে থাকা নানা-নানির হাসিমুখ দেখেছিল। সেদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ার কথা ভুলে গিয়েছিল ও। হাঁ করে তাকিয়ে ছিল গাছের ডালে বসে থাকা দশ-বারোটা

কাকের দিকে। তখন ওর বয়স ছিল ছয়, নানি মাঝে-মাঝে বলে, ছয় বছর বয়সে তোকে আমরা হাতির পিঠে উঠিয়েছিলাম। হাতির পিঠে বসে থাকা সোনামণিকে একটি পরির মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল এফুনি বুঝি ডানা মেলে উড়ে যাবে। এমন স্মৃতি মায়ের সঙ্গে নেই। ওর কোনো কিছুতে মাকে ও বিরক্ত হতে দেখেছে। সেই চোখ কোঁচকানো, ভুরু কোঁচকানো চেহারা ও ক্রমাগত ওর সামনে থেকে সরিয়েছে। আড়াল হয়েছে মায়ের চেহারা। মাঝে-মাঝে মনে হয়, এই বাড়িতে যখন ও থাকবে না, তখন ও মাকে চিনতে পারবে না। প্রতিদিন দেখার পরও তো মা আড়াল হয়ে যায়, প্রতিদিন না দেখলে সেটা মুছে যাবে — এমন ভাবনা নিয়ে রূপশ্রী বিষণ্ণ হয়ে যায়। যে আনন্দ একটু আগে উৎসব মনে হয়েছিল সেটুকু এখন শ্মশান। দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন এবং পুড়ছে।

মুহূর্তে টুনটুন শব্দ হলে তাকিয়ে দেখে সাদা জবাফুলের গাছটার ডালে লাফাচ্ছে টুনটুনি পাখি। কোথাও কোনো পাখি নেই। ও ঘাড় উঁচু করে আকাশ দেখে। সময়টা পড়ন্ত বিকেল।

গেট খুলে ওর মা ঢোকে। হাসনা বেগম।

টোকার পরে গেট বন্ধ করে। সারাদিন অফিস করার পরে চেহারায় ক্লান্তি। হাতে একগাদা কাগজপত্র। কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ। গুটিগুটি পায়ে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। একদম মেয়ের মুখোমুখি। রূপশ্রী দরজা ছেড়ে নড়ে না। হাসনা বেগম পাশের জায়গা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারবে। যদিও লম্বায় খাটো মোটাসোটা এই মহিলার চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়; কিন্তু কষ্টের ঝাঁজ চড়া।

প্রথম প্রশ্ন করে, এভাবে বসে রয়েছিস যে?

রূপশ্রী কথা বলে না। তার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকায়।

কথা বলছিস না যে?

ইচ্ছে করছে না।

চুলে ফুল গুঁজেছিস কেন?

আমার খুশি।

এই ফুলের যা ছিরি, তাও আবার তোর ভালো লাগে? ছিঃ —

তোমার গোলাপ পছন্দ। ওই ফুল আমার সহ্য হয় না। ওই ফুলকে পরপর লাগে। আপন মনে হয় না।

তোর কাছে আপন হওয়া কঠিন।

হাসনা বেগম ওর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। রূপশ্রী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। ড্রইংরুম পেরিয়ে নিজের ঘরে গেল হাসনা বেগম। এটা রূপশ্রীরও ঘর। নানাবাড়িতে ওকে আলাদা একটি ঘর দেওয়ার মতো ঘর আর নেই। বাড়ির কোথাও ওর বাবার ছবি নেই। ওর মা রাখতে দেয়নি। বলে, কোনো লুচার ছবি দেয়ালে ঝুলবে না। ছোটবেলা থেকে এসব শব্দ শুনতে-শুনতে বড় হয়েছে। বড় হয়ে জেনেছে, ওর মাকে রেখে ওর বাবা আর একটি বিয়ে করেছিল।

রূপশ্রী দরজা ছেড়ে বাগানে নেমে আসে। ভাবে, রূপক ওকে যেভাবে প্রেমের কথা বলে, ওর মা কি এমন প্রেমের কথা শোনেনি?

নিশ্চয় শুনেছে কিংবা শোনেনি। দুটোই হতে পারে। নানি বলেছে, মাকে কোনো একজন প্রেমের কথা বলেছিল। একটি মেয়ে আছে জেনে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। বলেছে, পরের মেয়ের বোঝা ঘাড়ে নিতে পারবে না। মায়ের ভাষায় এই লোকটিও লুচা। রূপশ্রী সাদা রঙের জবা ফুল ছিঁড়ে চুলে গোঁজে। কণা জিজ্ঞেস করেছিল, তোর সামনে থাকা মা আড়াল হয় কী করে? সে তো তোর বেঁচে থাকার সঙ্গী।

সঙ্গী? চোখের দেখা দেখলেই কি সঙ্গী হয়? মনের দেখাও লাগে।

মা তো তোকে বড় করেছে।

আমি নানা-নানির কাছে বড় হয়েছি। নানা আমাকে স্কুলে নিয়ে যেত। নিয়ে আসত। নানি টিফিন বক্সে খাবার দিত। ঘরের পড়াশোনা করাত; মা আমার স্মৃতির মানুষ না।

ঘুমপাড়ানি গান শুনিসনি?

জানি না। ও ধমক দিয়ে বলেছিল, আমার স্মৃতি নেই।

কণা তাকিয়ে থেকে বলেছিল, এভাবে বেঁচে থাকা খুব কষ্টের।

কষ্ট! রূপশ্রী শব্দটা উচ্চারণ করে।

বাগানে সন্ধ্যা নেমেছে। দিনের আলো ফুরিয়েছে। ওর নানি ঘরের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাগানে আলো-আঁধারির ধূপছায়া। রূপশ্রী হেঁটে গেটের কাছে আসে। গেট খুলে রাস্তায় দাঁড়ায়। মানুষ চলাচল করছে। দু-চারটে রিকশা যাচ্ছে। ও অন্যমনস্ক স্বরে বলে, কষ্ট! দিন দশেক ধরে রূপক ঢাকায় নেই। ও এয়ারলাইন্সের কাজে সিঙ্গাপুরে গেছে। নিঃসঙ্গতার কষ্ট ওর বুকের ভেতরে ঘুরপাক খায়। ও বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা দেখে ভেতরে ঢোকে। সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পরে রূপক ওকে একবারও ফোন করেনি। ওখানকার ফোন নম্বর না জানার কারণে রূপশ্রী নিজেও যোগাযোগ করতে পারেনি। প্রবল মন খারাপ নিয়ে ও বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

তখন বেজে ওঠে ফোন।

কে ফোন করেছে সেটা দেখার আগ্রহ প্রকাশ না করে ও ফোন ধরে।

হ্যালো।

আমি রূপক সোনারবরু।

ওহ রূপক! তোমার খবর না পেয়ে আমি তো মরেই যাচ্ছিলাম।

ওপাশ থেকে শোনা যায় হা-হা হাসি।

রূপ সোনারবরু, মরণ কি এতই সহজ!

তুমি কেমন আছো রূপক?

ভালো আছি, খুব ভালো আছি। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন অফিস — সব মিলিয়ে আনন্দে আছি।

আমাকে মিস করোনি?

মিস করার সময়ই তো পাইনি। রাতে ঘরে ফিরে কী খাব এসব নিয়ে ব্যস্ত থেকে, অনেক রাতে ঘরে ফিরে ঢাকা আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

ও তাই। রূপশ্রীর বিষণ্ণ কণ্ঠ ওর নিজের কাছেই বেমানান শোনায়। রূপক দূরে আছে, যোগাযোগ করেনি ভাবতে ওর চোখ ভিজে যায়।

ভেসে আসে রূপকের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ। রূপশ্রীর বিষণ্ণ কণ্ঠ উপেক্ষা করে এই হাসির তোড় ওর মন আরো খারাপ করে দেয়।

তোমাকে একটি জরুরি কথা বলার জন্য ফোন করেছি সোনারবরু। তুমি এখন কী করছ?

বাগানে দাঁড়িয়ে আছি।

সন্ধ্যা হয়েছে না? তোমার সঙ্গে আর কে আছে?

কেউ নেই। আমি একা।

ভালোই হয়েছে।

তোমার জরুরি কথা কী?

আমার এই অফিসে পোস্টিং হয়েছে। আমি ঠিক করেছি এখানেই থেকে যাব। আপাতত কয়েক বছর দেশে ফিরব না।

দেশে ফিরবে না? তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না? তুমি আমাকে মিস করবে না?

আবার হা-হা হাসি। হাসির তোড় ছড়িয়ে যায় রূপশ্রীর পুরো শরীরে। ও ভয়ে-আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে। রূপককে অচেনা মনে হয় ওর। হাসি থামিয়ে কথা বলে রূপক।

তোমার সঙ্গে আমার প্রেমের স্মৃতি আমার বুকে সোনার খনি হয়ে থাকবে রূপশ্রী সোনারবরু। আমি তোমাকে মিস করছি না। সামনে আমার নতুন জীবন।

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফোনের লাইন। রূপশ্রীর সামনে থেকে আড়াল হয়ে যায় রূপক। ও আকাশে উড়িয়ে দেয় একটি শব্দ, লুচা। □



ধোয়ার অন্ধকার

রেজাউর রহমান



দুপুরের আগেভাগে স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-ড্রাইভারদের ভিড়ভাট্টা কমে যেতে তেমন সময় লাগে না। তা এক ধরনের তাড়াহুড়োর মধ্যেই ঘটে যেতে থাকে। অবশ্য প্রতিদিন এক রকম যায় না। ধানমন্ডির আবাসিক এলাকার ছোট মাপের স্কুল। কোনো কোনোদিন মাঝারি ধরনের গলিপথ ভেঙে লোকজনের মেইন রোডে উঠে যেতে বিশেষ করে রিকশা-স্কুটার-গাড়ির যানজটের ঘোরপ্যাচ ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতাটা জটিল আকার ধারণ করলে ব্যাপার হয় অন্যরকম। কিছুক্ষণের জন্য হলেও পথ চলাচলে স্থবিরতা আসে, যা নগরবাসীর অভ্যাস হয়ে গেছে।

মুনীরের এসবে কিছু আসে-যায় না। কোনো কোনোদিন তাঁর স্কুল ছেড়ে বেরোতে ৪টা-৫টা বেজে যায়। তিনি বসে-বসে দিনের খাতাগুলো চেক করে ফেলেন। অনেকটাই নির্ভর হয়ে বাড়ি



অলংকরণ : শেখ আফজাল

ফেরেন। তখন নিজের ঘরের শোয়ার চৌকিটা তাঁকে বেশ আকর্ষণ করে এবং তিনি কাপড় ছেড়ে হালকা হয়ে কিছুটা সময় গড়িয়ে কাটিয়ে দেন। নিরিবিলি, নির্বাকুটি।

কয়েকদিন থেকে মুনীর লক্ষ করছেন, টিচার্স রুমের লম্বা টেবিলের উলটোদিকে নিবিষ্ট হয়ে মাথায় হাত রেখে খাতা দেখেন সুনীতা স্যান্নাল। তিনি নিচের দিকে ক্রাস নেন। কিছুদিন হয় তিনি এ-স্কুলে জয়েন করেছেন।

নিয়মিত সময়ে রোকেয়া বুয়া আসেন। তাঁর হাতে ন্যাপকিন-ঢাকা ট্রে। তাতে তিনি তাঁর সাধ্যমতো মুনীর স্যারের জন্য দুপুরের খাবার জোগাড় করে নিয়ে আসেন। কোনো-কোনোদিন তিনি তা জোগাড় করে রাখেন সকালের স্কুলক্যান্টিন থেকে। আলুর চপ, তেহারি বা পাস্তা। তাতে সুবিধা না হলে বুয়া অন্য ব্যবস্থা করেন। স্কুলগেট বরাবর রাস্তার অপর পাড়ে একটা ছাপরা রেস্তোরাঁ রয়েছে। সেখান থেকে দুপুরের খাবারের মতো কিছু একটা জোগাড় করে ফেলতে তেমন অসুবিধা হয় না।

মুনীর স্যারের সামনে বুয়া আজকের খাবার সাজিয়ে দেন। প্লেটের পাশে রাখেন চামচ, কাঁটা-চামচ, পরিষ্কার গ্লাস। গ্লাসের পাশে বোতলভরা ঠান্ডা জল। বুয়া এ-কাজটা যত্নসহকারে করেন। মাসের শেষে মুনীর তাঁকে কোনো উছিলায় সামান্য কিছু টাকা দেন। সবার অগোচরে।

সপ্তাহ দেড়েকের স্কুল ছুটির পর
সুনীতা মুনীরের একত্রে খাবারের
পর্বটা আগের মতোই চলতে
থাকে। রোকেয়া বুয়া
মোটামুটি প্লেট-গ্লাস গুছিয়ে
দিয়ে গেলেও সুনীতা তা আবার
নিজের মতো করে সাজিয়ে
নেন। চায়ের আয়োজনটাও
তাঁরই।

রোকেয়া বুয়া খাবার গুছিয়ে দিয়ে ঘুরে চলে যাওয়ার সময় টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে সুনীতা তাঁকে মৃদু স্বরে ডাকেন, ‘এই যে আপা, একটু শুনুন।’

রোকেয়া বিরক্ত হলেও তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়। ‘বলছিলাম কি... আমি এখানে নতুন, ব্যাপার-সাপার ভালো জানি না। ক্ষুধাও পেয়েছে। সকালে নাস্তা খেয়ে আসতে পারিনি...।’

‘এখন কোথায় খাবার পাবো। স্যারের খাবার তো সকালে উঠিয়ে রেখেছিলাম।’

মুনীর চামচ হাতে খেতে শুরু করেন।

রোকেয়া বুয়া গজগজ করতে-করতে তাঁর পাশ দিয়ে চলে যেতে-যেতে বলেন, ‘দেখেন তো স্যার... এখন খাবার কোথায় পাবো? সবাই মনে করে অর্ডার দিলেই...।’

মুনীর খাবার হাতে অস্বস্তিতে পড়ে যান। একজন ক্ষুধার্ত মানুষ সামনে রেখে কীভাবে খাওয়া যায়? আবার অপরিচিত নতুন মানুষ। তাঁর জন্য কীভাবে কী করা যায় তাও তো ভেবে পান না তিনি। আবার, কিছু একটা করতেও হয়।

‘দেখুন আপনি নতুন জয়েন করেছেন?’

‘জি আমি সুনীতা। মাত্র কয়েকদিন হয় জয়েন করেছি... এখানকার নিয়মকানুন তো আমার তেমন জানা নেই।’

‘আপনি খাবারের কথা বলেছিলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু এখন তো স্কুলক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গেছে।’

সুনীতা বিরতি টানার চেষ্টা করেন।

‘আচ্ছা থাক। কাল থেকে না হয়...।’

মুনীর হালকা হাসার চেষ্টা করেন।

‘কিন্তু আজ?... আপনি বরং এক কাজ করুন। আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা বরং খাবারটা শেয়ার করতে পারি।’

সুনীতা লাজনম্র হয়ে উঠে দাঁড়ান।

‘আমি যথেষ্ট ক্ষুধার্ত।’

‘তবে আপনার প্লেটে যে সামান্য খাবার। একজনের...।’

‘তা ঠিক। তবে একজনের খাবার দুজনে শেয়ার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।’

সুনীতা হাসেন।

‘মহাভারত টেনে আনলেন? আচ্ছা...।’

মুনীর সুনীতার প্লেটে আধাআধি খাবার তুলে দেন।

পানি খেয়ে মুনীর উঠে দাঁড়ান।

‘এক কাপ চা হলে মন্দ হয় না। কী বলেন?’

সুনীতা টিটার্স রুমের পূর্ব কোণায় রাখা চায়ের সাধারণ আয়োজন দেখতে পান। ইলেকট্রিক কেটলি, কাপ-পিরিচ-চামচ।

সুনীতা বিনীত হয়ে এগিয়ে যান।

‘এ-পর্বটা আমার ওপর ছেড়ে দেন। আমি কেটলিতে পানি চড়িয়ে দিচ্ছি।’

‘দিন।’ বসে পড়েন মুনীর।

চা খেতে-খেতে তাঁরা সহজ-স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

‘স্কুলটা কেমন লাগছে?’

‘আমি বরাবরই নিচের ক্লাসের শিশুদের পড়াতে ভালোবাসি। তাদের কাছে গেলে যেমন আনন্দ পাই, আবার তেমনি মনটাও আনচান করে।’

‘সে তো ভালো কথা। শিশুদের ভালোবাসেন। কিন্তু মন আনচান করা কেন?’

সুনীতা তার মনের অবস্থাটা চেপে রাখতে গিয়ে বলে ফেলেন।

‘বিয়ের পর থেকে সারাক্ষণের স্বপ্ন ছিল কোলজুড়ে জেকে

বসে থাকবে ফুটফুটে শিশু। কোলের শিশুর দেহজুড়ে ছড়িয়ে থাকে কেমনতর নেশাধরা এক মিষ্টিমধুর গন্ধ, যা আমাকে উদ্ভাসিত করে রাখতে পারত সারাক্ষণ। কিন্তু তা আর হলো কই?’

এ-পরিস্থিতিতে তাঁকে কী বলা যায় ভেবে পায় না মুনীর। তারপরও তাঁকে কিছু বলতে হয়।

‘তা তো প্রাকৃতিক নিয়মেই এসে যাবে একদিন। এতো চিন্তার কী আছে?’

সুনীতা চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপেন।

‘অবিনাশের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে ন-বছর।’

মুনীর তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা করে সুবিধা করতে পারেননি।

সুনীতা তাঁর বসার জায়গায় চলে যান। টেবিলে একটু বেশি ঝুঁকে খাতা দেখায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু খাতা দেখা তাঁর এগোয় না। একসময় বাস্তবতা তাঁকে কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আগামীকাল হোমওয়ার্কের খাতাগুলো ছাত্রদের দিতে হবে। সামনে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা। বাড়ি ফিরলে তো এসব গুছিয়ে তোলার সময় কম থাকে। শাওড়ির হাঁটুতে ব্যথা। হাঁটুতে তাঁর অসুবিধা হয়। এর ওপর খালা-শাওড়ি এসেছেন। দেশ থেকে। তাঁর মুখের-দাঁতের নানা সমস্যা। খেতে পারেন না। তাঁর জন্য ঝাল ছাড়া রাঁধতে হয়। অবিনাশ থাকলেও না-হয় একটা কথা ছিল। সে গেছে ফিলিপাইন। দেড় মাসের জন্য। এনজিওর চাকরি।

আজকাল প্রায়শ এমনটা হয় সুনীতার। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। তখন নানা ধরনের ভাবনা-চিন্তা তাঁকে ঘিরে রাখে। স্কুলটা তাঁর মন্দ লাগছে না। টিচাররা মোটামুটি সিরিয়াস, প্রফেশনাল। স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ইলোনা মিস তাঁকে বেশ পছন্দ করেন। এছাড়া সিনিয়র-জুনিয়র বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়েছে। বন্ধুত্ব হয়েছে। এর মধ্যে মুনীর স্যার তো খুব ভালো মানুষ। সিধা-সরল। বিশেষ করে, গত দুপুরে মুনীরের নিরাবেগ আমন্ত্রণ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তখন তাঁর মনে হলো, তাঁর জন্য ঘরে বানানো কোনো একটা কিছু, নাস্তা জাতীয় বানিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

যথারীতি স্কুল ছুটির পর রোকেয়া বুয়া মুনীরের খাবার সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুনীতার তা চোখে পড়ে। এদিকে মুনীর তাঁর দিকে খানিকটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে হাসেন।

সুনীতা মুনীরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখান।

‘দাঁড়ান আমি আসছি।’

সুনীতা সুন্দর একটা টিফিন-বক্স তাঁর সামনে খুলে ধরেন।

‘আমি নিজে হাতে বানিয়েছি। সবজি-পোলাও...।’

‘বাহু চমৎকার।’

সুনীতা দেখেন, মুনীরের প্লেটে পরোটা ও বুটের ডাল। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বুয়া বাইরের হোটেল থেকে এসব এনেছেন আজ।

‘হোটেলের খাবার কেন খান? ভাবি সকাল-সকাল একটা কিছু তৈরি করে দিতে পারেন না?’

‘থাকলে, পারতেন হয়তো।’

‘মানে?’

‘মানে... মানে... আমার বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রী চলে গেছেন।’

সুনীতা হোঁচট খেয়ে থেমে যান।

তাঁরা খাবার শেয়ার করেন। চা নিয়ে বসেন। কথাবার্তা খুব একটা জমেনি। সেদিনের মতো তাঁরা যাঁর-যাঁর কাজে ফিরে যান। কিন্তু মুনীরের বিয়ের ব্যাপারটা সুনীতাকে কেমনতর এক ধাঁধায় ফেলে রাখে।

সুনীতা ভাবেন, মুনীর তাঁর বিয়ের প্রসঙ্গে যা বললেন তাও হয়তো এক বাস্তবতা। বিয়ে হয়ে গেলেই যে জীবনে পরিপূর্ণতা এসে গেল, তাও তো নয়। অবিনাশের সঙ্গে বিয়ে হলেও অনেক কিছু যে তাঁর পাওয়া বাকি রয়ে গেছে। নিয়মমাফিক তাঁর জীবনে কোলভরে শিশু আসার কথা ছিল। তা তো হয়নি। ডাক্তার-বদ্যি কম করা হলো না। তাঁরা কলকাতাও ঘুরে এসেছেন। সন্তান না হওয়ার কারণ হিসেবে দেখা গেল, সমস্যাটা অবিনাশের। শুক্রকীট স্বল্পতা (অ্যাজিওস্পার্মিয়া)। তারপরও ডাক্তার তাঁদের আশা দিয়েছেন। এ-অবস্থার পরিবর্তন হয়। হঠাৎ করে আবার ঠিকও হয়ে যায়।

মুনীরের স্কুলের চাকরি নিয়ে অনেকের মতো তাঁর কোনো আক্ষেপ ছিল না। বরং তিনি বরাবরই ভাবেন, তিনি ভালো আছেন। শিক্ষকতা নিয়েই তিনি থাকবেন। এর আগে মুনীর সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের একজন মাঝারি পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর বাড়ি ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গায়। তাঁর বাবা-মা দুজনই সুস্থ- সবল গৃহস্থ। তাঁরা বছর ধরে যথেষ্ট কৃষিপণ্য ঘরে তোলেন। সংসারে কোনো অভাব নেই। একমাত্র ছেলে মুনীরকে তাঁরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। হোস্টেলে রেখে। মুনীর সময়মতো অর্থনীতিতে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তালিকাভুক্ত হন।

মাধ্যমিক বোর্ডের একজন কর্মকর্তা হিসেবে মুনীর কাজ শিখে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। এমন একসময় অফিসের প্রধান কর্মকর্তা তাঁকে ডেকে পাঠান। এবং তাঁকে নির্দেশ দেন, ‘হবিগঞ্জের উদিরচর হাই স্কুলটা ভালো চলছে না। সরকারি অনুদানে বিলম্ব হচ্ছে। ফাইলটা দেখে ছেড়ে দেন।’

রুমে এসে ফাইলটা দেখেন মুনীর। সেখানকার লোকজনও গতকাল তাঁকে সুপারিশ করে গেছে। তারা জানিয়ে যায়, তাদের এ-অফিস থেকে নিয়ে মন্ত্রী পর্যন্ত অবাধ যাতায়াত। ততক্ষণে অফিসের অ্যাকাউন্টস সেকশনের হেড মুনীরের সামনের চেয়ারে এসে বসেন।

‘মুনীর সাহেব... ওই ফাইলটা?’

‘কোনটা?’

‘এক্ষুনি বড় সাহেব না আপনাকে বললেন?’

মুনীর বিব্রতবোধ করেন।

‘দেখুন ওই স্কুলের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস বড় ক্রটিপূর্ণ। আর আমার প্রাথমিক অনুসন্ধানে মনে হলো, এই নামের কোনো স্কুল আদৌ আছে কি-না?’

অ্যাকাউন্টসের হেড হেসে ফেলেন।

‘আছে।’ বলে পকেটে হাত দেন।

‘এই নেন।’ টাকার প্যাকেটটা মুনীরের সামনে রেখে চলে যান তিনি।

মুনীর তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডাকেন।

‘টাকার প্যাকেটটা হেড-অ্যাকাউন্টসকে ফিরিয়ে দিয়ে আসো।’

অ্যাসিস্ট্যান্ট ঘাবড়ে যান।

‘এটা কেমন করে হয়? এতে যে অফিসের ওপরতলার কর্মকর্তারা... সবাই জড়িত। আপনার বিপদ হবে... বড় বিপদ।’

আর কথা না বাড়িয়ে সেদিন রাগে-ঘৃণায় অফিস থেকে বেরিয়ে যান মুনীর।

পরের দিন তিনি অফিসে যাননি। এর পরের দিন মুনীর রেজিগনেশন লেটার জমা দিয়ে দেশে চলে যান।

বেশ কিছুদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে তাঁর বাবা-মা আনন্দিত হন। মা শহরে থাকা ছেলের দিনের অভ্যাস রুটিন জেনে নিয়েছেন। তিনি সকাল-সকাল এক কাপ ঘরের দুধের চা-মুড়ি নিয়ে

এসে ছেলের মাথার কাছে বসেন। ঘরসংসারের এ-কথা-সে-কথায় ভালো সময় কাটে তাঁদের।

বাবাও তাঁর সকাল-রাত কাবাড়ে জমিজিরাত বেচাকেনার লাগাতার ডিউটি কমিয়ে দেন। বাজার থেকে দেখে শুনে সকলের সেরাটা কেনেন। দুপুরে একসঙ্গে খান।

গত কয়েকদিন মুনীর মায়ের সঙ্গে চায়ের আয়োজন শেষ করে তাঁদের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেন। এর দক্ষিণমুখী খোলা বারান্দায় একবার গিয়ে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না তাঁর। সামনে তাঁর দিগন্তজোড়া বাড়ন্ত ফসলের ক্ষেত। তাঁর গায়ে এসে লাগে শিরশিরে সকালি ঠান্ডা বাতাস। তখন ছেড়ে আসা চাকরির যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা আর মনে পড়ে না তাঁর।

সকালে চা খেতে-খেতে মায়ের প্রস্তাবটা নিয়ে খানিকটা ভাবলু হন মুনীর। তিনি ভাবেন, জীবনকে ভাগাভাগির মুখোমুখি দাঁড় করালে ‘বিবাহ’ নামক একটা পর্ব যে অনিবার্যভাবেই আসবে। কাজেই তাঁর বিয়েতে আপত্তি নেই জানিয়ে দিলে মা আহ্লাদিত হয়ে বলেন, ‘তোমার বাবারও এমনি একটা ইচ্ছা। দেখা যাক...।’

এর মাসেক পরে মুনীর পত্রিকার অ্যাড ধরে ঢাকায় এসে স্কুলের এই চাকরিটা নেন।

সপ্তাহ দেড়েকের স্কুল ছুটির পর সুনীতা মুনীরের একত্রে খাবারের পর্বটা আগের মতোই চলতে থাকে। রোকেয়া বুয়া মোটামুটি প্লেট-গ্লাস গুছিয়ে দিয়ে গেলেও সুনীতা তা আবার নিজের মতো করে সাজিয়ে নেন। চায়ের আয়োজনটাও তাঁরই। আজকাল তাঁদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আগের মতো টেবিলের দু-মাথায় দুজন আর বসেন না। বসেন কাছাকাছি। খাতা দেখার ফাঁকে-ফাঁকে টুকটাক কথাবার্তা হয় তাঁদের। সুনীতা জানান, অবিনাশ এসেছে বিদেশ থেকে। মুনীর কৌতূহল প্রকাশ করেন।

‘কী আনল আপনার জন্য?’

‘তেমন কিছু না। এই গতানুগতিক কেনাকাটা। শিফন-সিনথেটিক শাড়ি। হাতঘড়ি... এই তো।’

মুনীরকে যে-কথাটা একাধিকবার জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করে বলতে পারেননি সুনীতা, আজ তা সরাসরি বলে ফেলেন।

‘কথায়-কথায় আপনি একবার বলেছিলেন — বউ চলে গেছে। সেই গল্পটা মাঝে-মাঝে বড় গুনতে ইচ্ছে হয়। কেন এমন একটা ভালো মানুষের...?’

‘আমার যে বলতে ইচ্ছে হয় না। বউ চলে গেছে... তা তো সুখের কোনো কথা নয়। তারপরও আপনি যখন নাছোড়বান্দা, বলতে হয়।’

‘স্কুলে জয়েন করার কিছুদিনের মধ্যে বাবা আমাকে জরুরি তলব করেন। সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে চলে আসো। আমরা তোমার বিয়ের অনেকদূর এগিয়েছি। বাকিটা তুমি এলে...। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তোমার। আমি বাড়ি যাই। বিয়েও হয়ে যায়। গোল বাধে তখনই।’

সুনীতা আত্মহী হয়।

‘সেটা আবার কেমন?’

‘ফুলশয্যার রাতে ঘরে ঢুকতেই আমার সদ্যবিবাহিত স্ত্রী সোমা আমার পায়ে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আপনি আমাকে বাঁচান। আমি কিছু বুঝতে না পেরে তাকে মাটি থেকে ওঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হই।’

‘সোমা কথা বলতে পারছে না। কান্নায় তার হেঁচকি উঠে গেছে। সে তার ডান হাতের বন্ধমুঠি দেখায় আমাকে।’

‘এটা আমার বিয়ের রাতের উপহার — বিষ।’

আমার মুখ দিয়ে নিদারুণ ভয়ের এক অস্ফুট শব্দ বের হয়।

‘বিষ... বিষ... কিন্তু কেন?’

‘আমি বাঁচতে চাই না।’

‘কিন্তু কেন?’ আমি তাকে শাস্ত করার চেষ্টা করি। আপনি থামুন। খুলে বলুন... কী হয়েছে?’

‘শোনার কিছু নেই। আমি এ-বিষয়ে করতে চাইনি। বাবা-মা জোর করে...। আমি দিদারকে ভালোবাসি। ছোটবেলা থেকে। সেও আমার মতো হাতে বিষ নিয়ে বসে আছে। আমরা একত্রে আত্মহত্যা করব।’

‘না, তা করতে হবে না। আমি আপনাদের বাঁচিয়ে রাখব... মরতে দেব না। প্লিজ, বাথরুমে গিয়ে ওই বিষটা ফেলে দিন। দিদারকে ফোন করুন। আগামীকালই তার কাছে আপনাকে পৌঁছে দেব।’

‘কেমন করে? সোমার চোখে মুখে বিভ্রান্তি। সে ভাবে, এমন প্রস্তাব কি বিশ্বাস করা যায়? সোমা দিদারকে ফোন করে। কথা বলি আমিও। আমার ঢাকার ঠিকানাটা তাকে জানিয়ে দিই।’

‘আমি সকাল-সকাল বাবা-মাকে জানিয়ে দিই, স্কুল থেকে জরুরি তলব এসেছে। আজই ঢাকা যেতে হবে আমাদের। তাড়াহুড়া করে নাস্তা সেয়েই রওনা হয়ে যাই। রেন্ট-এ করে।’

বিকেলে সোমা-আমি ঢাকা এসে পৌঁছাই। সোমা দিদারকে ফোন দেয়। সে আমার শ্যামলীর বাসার কাছাকাছিই ছিল। তারা তাদের প্রথম সাক্ষাতে কাঁদতে শুরু করে।

আমি তাদের সাবধান করি।

এখন কাঁদার সময় নয়। যত তাড়াতাড়ি পারো ভেগে যাও। সোমা তাড়াতাড়ি করে তার সারা গায়ের গহনা খুলে পৌঁটলা করে আমার হাতে তুলে দেয়। আমি তা ফিরিয়ে দিই। তোমাদের লাগবে। সঙ্গে নিয়ে যাও।

গহনার পৌঁটলা সোমা ব্যাগে ভরে আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বেরিয়ে যায়। দিদারের হাত ধরে।’

‘তারপর?’ সুনীতা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

‘তারপর আর কী? আমি দেশে যেতে পারি না। সোমার বাবা রামদা নিয়ে আমাকে খোঁজেন।’

সুনীতা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

‘এমন একটা ভয়ংকর ঝুঁকি মানুষ নেয়?’

‘নিলাম... দুটি প্রাণ চলে যাবে? তা কেমন করে হয়? আমাকে যে দাঁড়াতেই হতো। তাদের পাশে।’

সুনীতা মুনীরের চোখে চোখ রেখে অনেকক্ষণ সরাসরি চেয়ে থেকে প্রসঙ্গ পালটান।

‘দুপুরের খাবার তো সারলেন। রাতে...?’

‘একটা কিছু করে নেব।’

‘কেমন?’

‘এই ধরেন... ভাতের সঙ্গে আলু-ডিম চড়িয়ে দিই।’

‘প্রতিদিন তাই খান?’

মুনীর হাসেন।

‘অনেকটা তাই।’

‘ঠিক আছে, আজ আমি আপনার সঙ্গে যাবো।’

‘আমার সঙ্গে!’

‘কেন?’

‘আমি আপনার প্রতিদিনকার মেনুটা অন্যভাবে করে দেব আজ।’

মুনীর আর কথা বাড়াতে পারেন না। আকস্মিক এক সংকোচে নিজের মধ্যে নিজে জড়িয়ে যান। সুনীতার চোখমুখে তখন মায়াময় রহস্যের এক বিরল হাসি।

মুনীরের শ্যামলীর বাসায় গিয়ে সুনীতা কিছুটা অপ্রস্তুত হন। এত

অগোছালো সব! মুনীর ঘর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

‘সারাদিন তো বাইরে কাটাই। কাজের মানুষ যে রাখবো... তাকে আবার দেখবে কে? তাই বন্ধের দিন আমিই যেটুকু পারি...।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। আজ আমি আপনার কাজের মানুষ। দেখভাল করেন। কিছু না খোয়া যায় আবার?’

সুনীতা মুনীরের চোখ বরাবর চেয়ে মিটিমিটি হাসেন।

দু-রুমের ছোট বাসা। আধাখানা কিচেন। ছয়তলার আধলা ফ্ল্যাট বলে ভাড়াও কম। তবে দুপুরে ছাদ গরম হয়ে যায়। ছুটির দিনে ঘুমিয়ে নিতে গেলে তেমন আরাম হয় না। ফ্যানের বাতাসও গরম হয়ে ওঠে।

সুনীতা প্রথমে চুলায় গরম পানি বসান। তারপর কোমর বেঁধে লেগে যান ঘর গোছাতে।

দুকাপ চা নিয়ে টেবিলে রাখেন। মুখোমুখি বসেন দুজন।

‘বিবাহিত বধূয়াকে তুলে দিলেন ওই যুবকের সঙ্গে... এরপর আর কি কোনো মেয়ের দেখা পেলেন না?’

‘খুঁজিনি।’

ততক্ষণে সুনীতা মুনীরকে প্রায় কোলে টেনে নেন। চুমোয়-চুমোয় ভরে দেন। তাঁকে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়েন।

একসময় তাঁরা উঠে বসেন। মুনীর এমন একটা পরিস্থিতির কথা ভাবতে পারেননি। তিনি অপ্রস্তুত হতে থেকেও উপচেপড়া নারীসঙ্গ তাঁর মন্দ লাগেনি।

‘চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল?’

সুনীতা সরাসরি তাঁর চোখের দিকে চেয়ে হাসেন।

‘এমন অবস্থার পরই তো চা মুখে রুচে বেশি। তা ঠান্ডাই হোক আর গরমই হোক।’

সুনীতা তাঁর শাড়ি-কাপড় গোছাতে-গোছাতে বলেন, ‘এবার আমার রান্নার পালা। আজ হবে খিচুড়ি-আন্ডাকারি।’

মুনীর সরাসরি সুনীতার দিকে চাইতে লজ্জা পেলেও তাঁর দেহসৌষ্ঠবের রূপ অনুভব করে বিস্মিত হন। ভরা নারীদেহের ভাঁজে-ভাঁজে যে এত রূপ-সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি তা তাঁর জানা ছিল না। মুনীর প্রসঙ্গ পালটাতে সচেষ্ট হন।

‘তোমার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে না? অবিনাশ তো দেশে ফিরেছে।’

‘হ্যাঁ, তো কী হয়েছে? রাত ৯টার আগে সে ফেরে না।’

ঘন্টাখানেকের মধ্যে সুনীতা আন্ডাকারি, আলুর দম, খিচুড়ি, পোড়া শুকনো মরিচ-পেঁয়াজ কুচি, শর্ষে তেলের ভর্তার আয়োজন গুছিয়ে ফেলেন। তাঁরা খেতে বসেন।

মুনীর বিস্মিত হয়ে সুনীতার দিকে চেয়ে থাকেন।

‘কী দেখছো?’

‘দেখছি তোমাকে।’

খাওয়া শেষে হাঁড়ি, বাসন-কোসন ধোয়া-পাকলি করে। মুনীরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে তাঁর ঠোঁটে আলতো চুমু খেয়ে সুনীতা বলেন, ‘এবার আমাকে এগিয়ে দাও। আজ থেকে আর আপনি নয়, তুমি।’

প্রায় মাস-দেড়েক সময় ধরে সুনীতা-মুনীরের এই রুটিন অভিসার চলতে থাকে। ছুটি হলে খাতা দেখার সেশন সংক্ষিপ্ত করে তাঁরা মুনীরের বাসায় চলে যান। আজকাল মুনীর মাঝে-সাজে বাজারসওদা করেন। মাছ-তরকারি কেনেন। কেনেন মুরগিও। সুনীতার মুরগি খুব পছন্দ। তা তিনি রাঁধেনও ভালো।

প্রথম-প্রথম এ-পরিস্থিতিটা মুনীরের কিছুটা বাধো-বাধো লাগলেও এখন পুরো পরিস্থিতিটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

আনন্দঘন হয়ে উঠেছে।

মাস দুই পর একদিন সকাল থেকে সুনীতা যতবার মুনীরের সামনে পড়েন, ততবারই সামান্য সলজ্জ হয়ে দাঁড়ান। আলতো হাসেন। এবং বলেন, ‘কথা আছে।’

‘কী কথা?’

‘সময় এলে শুনবে।’ বলে পাশ কাটিয়ে চলে যান। আবার ঘুরে এসে সামনে পড়েন। লাজনম্র হয়ে হাসেন সুনীতা।

‘একটা খবর আছে।’

সেই রহস্য উদ্ঘাটন হয় যখন তাঁরা খালি টিচার রুমে খিন টি নিয়ে বসেন।

মুখমণ্ডলে প্রশান্ত সুখের এক অভিনব আমেজ ফুটিয়ে সুনীতা বলেন, ‘আমি অন্তঃসত্ত্বা। আমি গতকাল অবিনাশকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। শরীরটা কদিন থেকে কেমন-কেমন লাগছিল। পাড়ার ডাক্তার তাৎক্ষণিক টেস্ট করেন এবং একজন ভালো গাইনোকোলজিস্টের তত্ত্বাবধানে থাকার উপদেশ দেন। আর প্রথম মাসতিনেক সাবধানে চলাফেরা করতে বলেন। অনেকদিন পরে কনসিভ করেছি কি-না।’

মুনীর চা খাওয়া রেখে সটান সুনীতার দিকে চেয়ে থাকেন। তিনি

মুনীর চিন্তিত হন।

‘একজন গাইনোকোলজিস্টের সঙ্গে কথা বলে নাও না। নির্ভর হওয়া যায়।’

‘আমি জ্ঞান নিয়ে কোনো রকম রিস্ক নিতে চাই না। অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কী দরকার? দু-একদিন দেখি না। হয়তো এমনি সেরে যাবে।’

‘তাও হতে পারে... দেখো।’

পরের দিনও সুনীতা স্কুলে আসেননি।

এর পরের দিনের সকাল-সকাল খবরটা সবার মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সুনীতা মিস গতরাতে মারা গেছেন। তিনি নাকি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

মুনীর খবরটা শুনে সেখানে দাঁড়াতে পারেননি। তাঁর মন তখন হাহাকার করে ওঠে। ‘...কী শুনলাম ...এও কি সম্ভব!’ তাঁর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে নামে। খবরটা তাঁর বিশ্বাস হতে চায় না। টিফিন ব্রেকে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম স্কুল ছুটির ঘোষণা দেন। আর ঘণ্টাখানেক পরে সব শিক্ষককে তাঁর রুমে ডাকেন।

সময়মতো শিক্ষকরা প্রিন্সিপাল ম্যাডামের রুমে এসে জড়ো হন। মুনীরের আসতে একটু দেরি হয়। ভাইস প্রিন্সিপাল ইলোনা মিস ততক্ষণে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি অত্যন্ত

মুনীর স্কুলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা ঠাকুরগাঁওয়ের বাসস্ট্যান্ডের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকেন। ঢাকা শহরে আর এক মুহূর্ত নয়। একটু পরেই যে এই শহরের কোনো এক শ্মশানঘাটে গর্ভবতী সুনীতার হিমশীতল দেহে আগুন জ্বলে উঠবে। আর তাঁদের দেহ-পোড়া ছাইভস্ম বাতাসে উড়বে।

দেখেন, তাঁর চোখেমুখে এক অভিনব পরিপূর্ণতার আভাস। এতদিন ধরে তিনি যেন এ-মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। এ-সুখটুকু পাওয়ার আশা নিয়ে কাটিয়েছেন কতটা বছর।

সুনীতা স্বচ্ছন্দ হয়ে মুনীরের চোখ বরাবর চেয়ে বলেন, ‘তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা বোধ করি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।’

পরের সপ্তাহে সুনীতা স্কুলে আসেননি। দুপুরে খাবার নিয়ে বসে মুনীর তাঁকে ফোন করেন।

‘আমি তো ভেবেছিলাম, আমার জীবনে একাকী খাওয়ার পাট চুকে গেছে। আজ যে আসেনি?’

‘আর বলো না... গতকাল গোসল করতে গিয়ে কলের নিচে মাথা রেখে ঠান্ডা পানির আরাম উপভোগ করছিলাম। মাথার ওপরকার স্টিলের কলটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মাথা তুলতে গেলে মাথায় শক্ত আঘাত পাই। মাথার খুলিটা ফেটেই গেল নাকি?’

‘নাহ্... এ আর এমন কী? সেরে যাবে।’

‘স্থানীয় ডাক্তার দেখালাম। তিনি ড্রেসিং করে জানালেন, আঘাতটা গভীর। ব্যথা হবে। কয়েকটা সিটামল খান। উপশম না হলে মাইন্ড একটা অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দিলাম। আশা করি কাজ হবে।’

একটু ভেবে ডাক্তার সাহেব আবার বলেন, ‘দেখেন... আপনি যেহেতু অন্তঃসত্ত্বা...। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারে সংযত বা সিলেকটিভ হওয়া ভালো। এক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে নিলে ভালো হয়।’

আক্ষেপের সুরে সুনীতার মৃত্যুসংবাদটা আবার দেন। তিনি বলেন, মেয়েটার সন্তানের বড় শখ ছিল। এরপর তিনি মৃতের আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে সবাইকে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা অবলম্বন করার অনুরোধ জানান।

প্রিন্সিপাল ম্যাডামের বক্তব্যের পর্বে তিনি শিক্ষক হিসেবে, মানুষ হিসেবে সুনীতার অনেক গুণগান করেন এবং সংক্ষেপে সবার দায়দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘কেউ মরে গেলে আমাদের তেমন কিছু করার থাকে না। প্রথমত আমরা মৃতের জন্য দোয়া করতে পারি। আর দুঃখী পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারি। তাদের সমস্যাকী হওয়ার চেষ্টা করা যায়। আমাদের দুটো মাইজেনবাস রেডি। আমরা সুনীতার বাড়ি যাবো। তাদের সাত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর বিশেষ করে, পুরুষ সহকর্মীদের আমি অনুরোধ করব, তাঁরা যেন সুনীতার সম্মানার্থে শ্মশানঘাটেও যাওয়ার চেষ্টা করেন। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অ্যাটেন্ড করাও জরুরি। এতে পরিবারে বল-ভরসা বাড়ে।’

মিটিং শেষ হয়। সবাই সুনীতাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য রেডি হতে থাকেন। আর এদিকে মুনীর স্কুলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা ঠাকুরগাঁওয়ের বাসস্ট্যান্ডের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকেন। ঢাকা শহরে আর এক মুহূর্ত নয়। একটু পরেই যে এই শহরের কোনো এক শ্মশানঘাটে গর্ভবতী সুনীতার হিমশীতল দেহে আগুন জ্বলে উঠবে। আর তাঁদের দেহ-পোড়া ছাইভস্ম বাতাসে উড়বে। উতলা-বেতলা হয়ে। ধোঁয়ার অন্ধকারে ছেয়ে যাবে চারিদিক। □



ছয় মিটার দূরত্ব

ওয়াসি আহমেদ



অনেকটা উঁচু, ৩০-৩৫ তলা থেকে লাফালে পতনের আগে শূন্যে ভাসমান অবস্থায়ই দেড় থেকে দুই সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু ঘটে যাওয়ার কথা। ল্যান্ডিংয়ের জায়গাটা পাথুরে বা কংক্রিট-মোড়া না হলেও চলে। নিচে শক্তসমর্থ জাল বা স্তূপাকার ফোমের বিছানা পেতে হাড়-মাংসসহ গোটা শরীরকে আঁচড়হীন রাখা গেলেও মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব নয়।

রাজন এরকমই জানত। বইপত্র, ইন্টারনেট ঘেঁটে খুঁটিনাটি নানা তথ্যের মধ্যে কৌতূহলকর আর যা পেয়েছিল তা এরকম : মৃত্যুটা ঘটে মাটি বা কংক্রিট যা-ই হোক তা থেকে অন্তত ছয় মিটার ওপরে থাকা অবস্থায়। লাইফ এন্ডস পিসফুলি সিল্ল মিটারস বিফোর ইমপ্যাক্ট উইথ দ্য গ্রাউন্ড।

রাজনের বেলা যা ঘটেছে তা ব্যতিক্রমী। বিস্ময়করও বটে। যতদূর মনে পড়ে, সে লাফ দিয়েছিল একটা কুড়ি-একুশতলা বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে। ঢাকা শহরেরই কোনো বিল্ডিং হয়তো।



অলংকরণ : আবদুস শাকুর

ঢাকারই হবে। অতো উঁচু ঢাকার বাইরে কোথায়! এছাড়া যেটুকু মনে আছে, নিচে গাড়ি-টাড়ির ভিড়ভাট্টায় জায়গাটা ঢাকার মতিঝিল হওয়াই স্বাভাবিক, তবে কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ বা গুলশানও হতে পারে। যাই হোক, বিল্ডিং বা ভবনটা কুড়ি-একুশ তলা হলে মাটি থেকে উচ্চতা কমপক্ষে ষাট-বাষট্টি মিটার, লাফানোর জন্য খুবই সিকিওর উচ্চতা। রাজনের ওজন ৭৫ কেজির এদিক-ওদিক, লাফানোর পর প্রতি সেকেন্ডে ৩৪ মিটার বা ঘণ্টায় ১২২.৪ কিলোমিটার ভেলোসিটিতে তার ধেয়ে নামার কথা। তাছাড়া ইমপ্যাক্টের অন্তত ছয় মিটার দূরত্বে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় সে রাজন আর রাজন থাকার কথা নয়। মাটিতে বা কংক্রিটে হাড়-মাংস পিও পাকানোর আগেই সে তার শরীর থেকে বেরিয়ে পড়বে। তার পর সেই ছয় মিটার উচ্চতায়ই ভেসে থাকবে কিনা এ নিয়ে অবশ্য কোনো তথ্য কোথাও পায়নি। মোদা কথা, ঘাড়-কোমর বা খুলি চুরমার হওয়ার বীভৎসতা তাকে ছুঁবে না, ব্যথা-যন্ত্রণা তো না-ই।

লাফানোর মুহূর্তে এসব মাথায় এলেও সে মনোযোগী ছিল একটা নিটোল, ক্রিন লাফ দেওয়ায়। দিয়েও ছিল। সময়টা তখন সকাল না বিকেল এ নিয়ে অবশ্য খটকা রয়ে গেছে। কিন্তু লাফানোর পরপরই, সেকেন্ডে ৩৪ মিটার বা সামান্য কম-বেশি ভেলোসিটিতে তার পতনের বিষয়টা মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, রাজন খেয়াল করল সে শূন্যে ভাসছে। সম্ভবত দশ-এগারো বা বারো তলা সবে পার হয়েছে তখনি ঘটনাটা ঘটল। রাজন পরিষ্কার লক্ষ করল, সে

এতদূর এসে রাজনের মনে হলো
গত রাতে সে নিজেকে দশতলা
নয়, কমপক্ষে কুড়ি বা একুশতলা
একটা ভবনের ছাদ থেকে
লাফাতে দেখেছে। সকালে গালে
ফোম লাগানোর সময় এক ঝলক
দৃশ্যটা মাথায় উঁকি দিয়েছিল,
এবার খুঁটিনাটিসহ পরিষ্কার
দেখতে পাচ্ছে।

আর নিচে নামছে না, হাওয়ায় ভাসছে। হাতদুটো ছড়ানো, পাগুলোও টানটান। যদিও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে নিয়ম হলো লাফানোর সময় ঘাড়-মাথা খাড়া না রেখে সুইমিংপুলে বা উঁচু পাড় থেকে খালে বা পুকুরে ঝাঁপানোর মতো অন্তত ৩০-৩৫ ডিগ্রিতে সামনে ঝুঁকিয়ে রাখা। গুরুত্বপূর্ণ এ-বিষয়টা মনে রাখেনি বলেই কি প্রয়োজনীয় ভেলোসিটির অভাবে আটকে আছে — হাওয়ায়?

প্রশ্নটা মাথায় টোকা দিতে সে ভাবল কোথাও কিছু গোলমালে ঘটে গেছে, আর তখনি তাকে চমকে দিয়ে কানে এলো মোবাইলের টানা রিংটোন। আশপাশে কোথাও বাজছে। বেশ মিহি আর সুরেলা। তার নিজের মোবাইলের রিংটোন বেশ কয়েকবার বদলানোর পরও ঝাঁঝালো। ভলিউম কমিয়েও ঝাঁঝটুকু দমাতে পারেনি। কিন্তু শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় সুরেলা বা বেসুরো কোনো রিংটোনই যে কানে পৌঁছার কথা নয়, এ-যুক্তিটুকু তার মাথায় এলো না। সে বরং ভাবল তার নিজের মোবাইলটা কোথায় রেখে এসেছে? ভাবতে না ভাবতেই শুনল মিহি-সুরেলা নয়, বাজছে তার নিজের বদমেজাজি মোবাইল। আর সেটা তার হাতেই। মোবাইল হাতে নিয়ে কোন আক্কেলে লাফ দিয়েছিল এ-প্রশ্নটাও অবাস্তব মনে হলো। কিন্তু বোতাম টিপতে গিয়ে মুশকিলে পড়ল, বুড়ো আঙুলের চ্যাপ্টা ডগা কিছুতেই ঠিক বোতামে রাখতে পারছে না। পিছলে যাচ্ছে, নয়তো একটার বদলে দু-তিনটা বোতামে ডগাটা চেপে বসে যাচ্ছে। এদিকে শরীরটা পেছনদিকে বেকে যাচ্ছে, হাতদুটো ভারি, হাত তো নয় যেন লোহার দুটো চওড়া নল কাঁধ ফুঁড়ে মাথার ওপরে উঠে যাচ্ছে। আর মোবাইলটা গেল কোথায়? ঝাঁঝালো গলায় বেজেই চলেছে।

পুরো বৃত্তান্ত ঠিক এভাবে না হলেও ছাড়াছাড়াভাবে রাজনের মনে পড়ল, সকালে বাথরুমে সবে ডান গালে শেভিং ফোম লাগিয়েছে তখন। তাড়াহুড়োর সময়। অন্য গালে, থুতনিত, গলায় দ্রুত দেদার ফোম ছড়িয়ে সে একটুখানি হাসল। ফোমে ফেনাবন্দি বিমূর্ত হাসিটা ঝটিতে ফকফকে তরঙ্গ তুলল চৌকোনো ঘোলা আয়নায়। রাজন দেখল হাসি না, এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল পারদ-ওঠা পুরনো আয়নায়।

রাতের ঘটনা বা আয়নার চকিত বিদ্যুৎ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে সে যখন তার আজিমপুরের দেড় কামরা ভাড়া বাসা ছেড়ে রাস্তায়, নভেম্বরের আকাশে এলোমেলো ইতস্তত মেঘ, সূর্যটা আছি-আছি করেও পুরোপুরি জেগে উঠবে কিনা দোটানায়। বারকয়েক আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, নাহ, সূর্য দোটানায় নেই মোটেও, মেঘই চেপে ধরে আছে রোদকে, এলোমেলো ভঙ্গিটা আঁটসাঁট হচ্ছে — পারে তো সদ্য তরুণীর গালের এই আছে এই নেই লালচে আভার মতো সূর্যের নিভু-নিভু আঁচটাকে এক ফুঁ-তে নিভিয়ে দেয়। রাজন ভাবছে আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা অটোরিকশা খুঁজছে, তখনি মনে হলো মেঘ যা করার করে ফেলেছে, রোদকে গিলে কালচে পোঁচে আকাশ ছেয়ে ফেলছে। এবার ঝামঝামিয়ে নামবে।

জামাকাপড়ে বৃষ্টির ছাঁট নিয়ে সে যখন পল্টনে তার অফিসে পৌঁছল, লিফটের দরজায় দেখা ইভনিং শিফটের আবদুল্লাহর সঙ্গে। বয়সে বড়, মূল নামটা লম্বা — এ জেড এম আবদুল্লাহ। এ সময় অফিসে কেন জানতে চাইলে পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই, নামের সঙ্গে বেমানান বেঁটেখাটো আবদুল্লাহ বলল, ‘খবর শোনোনি, আরেফিনভাই নেই।’

‘নেই?’

‘সুইসাইড, গতরাতে।’

রাজনকে খতমতো খাওয়ার সুযোগ দিয়ে আবদুল্লাহ বলল, ‘রাত তখন বেশি না, এগারোটা হয় কি-না, গলিতে লোক চলাচল ছিল, পড়ন্ত অবস্থায় তাকে উল্টোদিকের বিল্ডিংয়ের দারোয়ানরা দেখেছে। একটু হলে একটা চলন্ত রিকশার ওপরে পড়তেন। বলতে গেলে লোকজনের চোখের সামনে। দশতলা থেকে কংক্রিট-ঢালাই ম্যানহোলের ঢাকনির ওপর — পড়ার পরও জান ছিল, মগজ-টগজ বেরিয়ে যা তা, তারপরও। হাসপাতালে নিতে নিতে সারা।’

‘পড়ার পরও ছিল?’

‘কী?’

‘বললেন না জান। ছিল?’

রাজন এমনভাবে প্রশ্নটা করল, আবদুল্লাহ কিছুটা বিরক্তি নিয়ে একনজর তার দিকে তাকিয়ে জানালো, বাদ জোহর জানাজার জন্য লাশ আসবে প্রেস ক্লাবে।

লিফটের দরজা ফাঁক হতে আবদুল্লাহকে ঢুকতে ইশারা করে রাজন দাঁড়িয়ে থাকল। শিফট-ইন-চার্জ আরেফিন হাসানের রাত এগারোটা বা তারও বেশি সময় পর্যন্ত অফিসেই থাকার কথা। তার মানে রীতিমতো প্ল্যান করে আগেভাগে, শরীর খারাপ বা অন্য কোনো ছুতায় বাসায় চলে গিয়েছিলেন। হতে পারে বেশ আগেই চলে গিয়েছিলেন। বাসায় পৌঁছে কি জামাকাপড় বদলেছিলেন? মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়েছিলেন? রাতের খাবার? নাকি বাসায় ঢুকেনইনি, লিফটে সোজা দশ তলায় উঠে ছাদের কার্নিশে গিয়ে নিচে গলির রাস্তায় তাকিয়েছিলেন। লাফ দেওয়ার আগে নিশ্চয় তাকিয়েছিলেন, কোথায় পড়বেন এ নিয়ে চিন্তা-দুশ্চিন্তা না থাকলেও একবার অন্তত ল্যান্ডিংটা তাকিয়ে দেখা স্বাভাবিক।

এতদূর এসে রাজনের মনে হলো গত রাতে সে নিজেকে দশতলা নয়, কমপক্ষে কুড়ি বা একুশতলা একটা ভবনের ছাদ থেকে লাফাতে দেখেছে। সকালে গালে ফোম লাগানোর সময় এক ঝলক দৃশ্যটা মাথায় উঁকি দিয়েছিল, এবার খুঁটিনাটিসহ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে, সঙ্গে হাওয়া। অফিসে হাজিরা দিয়ে তার যাওয়ার কথা এক বিরোধীদলীয় নেতা-কাম-ব্যবসায়ীর বাসায়। ভদ্রলোক সরকারি দল করতেন, মন্ত্রীও ছিলেন এক দফা, গত বছর সিটি করপোরেশন ইলেকশনে নাকি খোদ ঢাকার মেয়র নমিনেশন পাওয়া প্রায় ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ষড়যন্ত্রকারীদের কারসাজিতে পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিতে তিনি বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে ইলেকশন করে গো-হারা হারলেও বিদ্রোহী ইমেজকে শক্তপোক্ত করতে পাঁচ-সাতজন সাগরেদসহ গাঁদা ফুলের মস্ত তোড়া নিয়ে বিরোধী দলে যোগ দিয়েছেন। বিরোধী দল প্রথমে নাচানাচি করলেও এখন আর তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। মানববন্ধন-টঙ্কন জাতীয় কর্মসূচিতে প্রেসক্লাবের কড়ইগাছের ঢালাও ছায়ায় মাইক্রোফোনে গলা ঝাড়ার সুযোগ দিলেও দলীয় প্রধানের ধারেকাছে ঘেঁষার মওকা দিচ্ছে না। ফলে দলবদলের আগে সরকারি দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে তার অবস্থান ঘোরতর অনিশ্চয়তার মুখে। এ নিয়ে তার মধ্যে আবার বিদ্রোহ দানা বাঁধব-বাঁধব করছে। এক টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে এরকমই কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন দিন কয়েক আগে। দ্বিতীয় দফা বিদ্রোহে তিনি কতটা লাভবান হবেন বা আদৌ তার বর্তমান মনোভাবকে বিদ্রোহ বলা যাবে, নাকি তা দীর্ঘদিনের পুরনো দলের প্রতি আকুল আনুগত্য এসব নিয়ে নিউজ এডিটরের কাছ থেকে একটা ব্রিফিং নিয়ে রাজন যাবে সেই বারিধারায়। এতদূর, তার ওপর বৃষ্টি, তার ওপর আরেফিন হাসানের গত রাতে দশতলা থেকে...

দুই-তিনবার লিফট ছেড়ে দেওয়ার পর ওপরে ওঠা ছাড়া আর কিছু করার না পেয়ে রাজন ছয়তলায় তার টেবিলে পৌঁছে দেখল এদিকে-ওদিকে ডেস্কটপ মনিটরগুলো জ্বলজ্বল করছে, চোখ গোঁথে যে যার কাজে মশগুল।

ব্রিফিং বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু না, নিউজ এডিটর শুধু মনে করিয়ে দিলেন লোকটা ইডিয়ট টাইপের, কায়দা করে জেরা করলে উল্টাপাল্টা বকবে, সরকারি দলের এক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ, ত্যাগী নেতা এসব বলে-টলে গোঁথে ফেলতে পারলে রসালো স্টোরি হবে, ঠিকমতো তেল-মশলায় বাগাড় দিলে সেকেন্ড লিড করা যেতে পারে। পাঠকরা পলিটিশিয়ানদের বদমায়েশির খবরাখবর নিয়ে আর মাথা ঘামায় না, বরং এই লোকের মতো একটা সিনিয়র ক্লাউনকে নিয়ে কিছুটা মজা পেতে পারে। ‘তোমার রোলটা হবে সিমপেথাইজারের’ বলে ফাজিল

হাসি-হেসে সঙ্গে-সঙ্গে চাপা দিতে রাজন মাথা দুলিয়ে চেয়ার ছেড়ে 'আরেফিনভাই এটা কী করলেন' বলে দাঁড়াল।

'তুমি কি অফিসে এসে গুলে?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'রাতে, অফিসেই খবর পেলাম। ভদ্রলোকের নানা ঝামেলা ছিল, দেখতে না সারাদিন অফিসে পড়ে থাকতেন, ফ্যামিলি লাইফ বলতে কিছু ছিল না। এ অবস্থায় ধুঁকে-ধুঁকে মরার চেয়ে এক লাফে সব শেষ, ভালো না? স্যরি, ইনডালজ করলাম, সবে মারা গেছেন। কনডোলেস মিটিং কাল, পারলে থেকো।'

'কিন্তু লাফ দেওয়ার পরও নাকি বেঁচেছিলেন, মাথা খেঁতলে মগজ-টগজ ছিটকে বেরনোর পরও।'

'দশতলা থেকে জাম্প করলে তোমার কি ধারণা মাথা ইন-টেস্ট থাকার কথা!'

'তা না। বললেন না, এক লাফে সব শেষ, তা কিন্তু নয়। পড়ার পরও টিকেছিলেন, জান যায়নি, আবদুল্লাহভাই বললেন।'

'কোন আবদুল্লাহ?'

'এ জেড এম। ইভনিং শিফটের।'

'ও কি তখন ছিল নাকি কাছে যে জানবে! সেটা কথা নয়, আমি ভাবছি অন্য কথা। আরেফিনভাইয়ের পায়ে গাউট ছিল, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে খুব কষ্টে হাঁটাচলা করতেন, এক অর্থে পঙ্গুই, সেই মানুষ এমন একটা অ্যাডভেনচারের সিদ্ধান্ত নিলেন! এক লাফে পগারপার।'

'কিন্তু পড়ার পরও যদি বেঁচে থাকেন তাহলে এক লাফে ঘটনা শেষ হয়নি, পিসফুলি মারা যাননি, কষ্ট পেয়ে...'

'এ-গবেষণা তোমার পরে করলেও চলবে, এখন কাজে যাও, যেমন বললাম সেভাবে কেয়ারফুলি এগোবে।'

নিজের স্বপ্নের সঙ্গে না মিললেও একই রাতে তার দেখা স্বপ্নের এমন মর্মাস্তিক কিন্তু সফল পরিণতিকে রাজন কী বলবে! অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, সে এমনি-এমনি স্বপ্নটা দেখেনি। বছর দুয়েক আগে মাত্র অল্পদিনের ব্যবধানে দিনাজপুরের এক দুর্গম গ্রামে বেশ কয়েকটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে যেতে পত্র-পত্রিকায় যা-ই লেখা হোক, তার মনে হয়েছিল আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে সে-সময় একটা ঘোর কাজ করেছিল। সবসুদ্ধ সাতটা ঘটনা, যার মধ্যে তিনটা একই পাড়ার গা-ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িঘরে। আর সবকটাই ছিল সেই সনাতন দড়ি বা শাড়ি-গামছা গলায় পেঁচিয়ে উঠানে আম-কাঁঠালের শঙ্কপোক্ত ডাল নয়তো ঘরের কড়ি-বর্গায় ঝোলে। ঘোর ভেবেছিল এজন্য যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি, মামলা-মোকদ্দমায় হার, প্রেমে ব্যর্থতার মতো ঘটনাগুলোকে তখন পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতারা যত গুরুত্ব দিয়েই বয়ান করুক না কেন, রাজনের বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল, আত্মহত্যাকারীরা একে অন্যেরও কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই শাড়ি-গামছা বা দড়ির শরণাপন্ন হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংগোপনে, হতে পারে নিজেদের অজান্তেই তারা প্ররোচিত হয়েছে আর সময়-সুযোগমতো যার যার কাজ করে ফেলেছে।

এ নিয়ে যত ভেবেছে, এক ধরনের বলা যেতে পারে স্ব-উদ্ভাবিত উপসংহারের দিকে সে এগিয়েছে। কখনো-কখনো মনে হয়েছে, প্ররোচনাটা তার মধ্যেও কাজ করেছে। আত্মহত্যা নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টদের কেস হিস্ট্রি পড়ায় মন দিয়েছে, আর আশ্চর্য হয়ে দেখেছে সে যাকে ঘোর বলে ধরে নিয়েছিল তাকে তারা কেউ-কেউ সোজাসাপটাভাবে বলেছেন মোটিভেশন, জীবন শেষ করে দেওয়ার অদম্য ইচ্ছা আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক মনে হলেও দুর্ভোগহীন মৃত্যু-আকাক্ষার কারণে মোটিভেশনটা ভিকটিমদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেল্ফ ডিফেন্সিভই নয়, ইতিবাচকও। দুর্ভোগহীন, নিরাপদ মৃত্যু। তবে সব আত্মহত্যাকারীর জানার কথা নয়, কোন পছন্টা সবচেয়ে নিরুপদ্রব। মফস্বলের দিকে লাফিয়ে পড়তে নানা অসুবিধা, যথেষ্ট

উঁচু বাড়িঘর কোথায়! নিরাপদ উচ্চতার অভাবে কড়িবর্গা নয়তো আম-কাঁঠালের ডালকে ভরসা করা তাদের দিকে থেকে যৌক্তিকই বলা যায়।

তবে লাফিয়ে পড়ার বাপারটা একদম আলাদা। অবশ্যই নিরাপদ উচ্চতা থেকে। কারণ অন্য কিছু না : লাইফ এন্ডস পিসফুলি সিক্স মিটারস বিফোর ইমপ্যাক্ট উইথ দ্য গ্রাউন্ড। রাজন এমনই জেনে এসেছে। আর মোহেও পড়েছে। ফলে গত রাতে সে যখন নিজেকে কুড়ি-একুশতলা একটা ভবন থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখল, সেই মোহটাই তাকে তখন আচ্ছন্ন করেছিল। যদিও লাফানোর পরপরই একটা ভজঘটে আটকে শেষটুকু আর দেখা হয়ে ওঠেনি। নিজেকে নিয়ে মাত্র গত রাতেই সে-স্বপ্নটা দেখল, তবে প্রায় রাতেই কাউকে না কাউকে সে লাফাতে দেখে। দিনের বেলা ছিন্নভিন্ন স্মৃতি মাথায় আসে। সবদিন যে আসে তা না।

মোট কথা, ব্যাপারটা যত অন্যরকমই মনে হোক, রাজন এ নিয়ে বেশি কিছু ভাবতে যায় না। এ এমন বাস্তবতা, যাকে নিয়ে তাকে চলতে হবে, ব্যথিত হওয়ার কারণ নেই, মজা পাওয়ার তো নেই। মানুষ লাফাচ্ছে, উঁচু-উঁচু দর-দালানের ছাদের কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাচ্ছে, লাফ দেওয়ার আগে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ চোখ থেকে চশমা খুলছে, কেউ ঘড়ি খুলে কার্নিশের ওপর বেশ যত্নে পড়ে না যায় এমনভাবে, আবার কেউ মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন বের করে একই কায়দায় — যেন একটা রিচুয়াল — সাবধানে গচ্ছিত রেখে তৈরি হচ্ছে। যেন কারো জানতে বাকি নেই বাতাস কেটে প্রবল বেগে ধেয়ে নামতে-নামতে মাটি ছোঁয়ার নিরাপদ দূরত্বে, ছয় মিটার আগেই শরীর থেকে নিজেদের তারা বন্ধনহীন, মুক্ত করে ফেলবে।

পাক্সা দেড় ঘণ্টা ধরে একের পর এক ট্রাফিকজ্যাম ঠেলে সরকারি দলের সাবেক ও সদ্য বিরোধীদলীয় নেতার ঠান্ডা বসার ঘরে বসে রাজন নিজেকে গোছগাছ করতে গিয়ে খানিকটা বিপাকে পড়ল। তেমন কিছু না ভেবেই এসে পড়েছে, প্রশ্ন-ট প্রশ্নগুলো মাথায় থাকলেও কীভাবে এগোবে, সিমপেথাইজারের ভূমিকায়ই-বা কীভাবে অভিনয় চালাবে এনিয়ো নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ফাঁকে লক্ষ করল, নেতা লোকটা বেশ সজ্জন। গরমে ঘেমে-টেমে তার দুরবস্থা খেয়াল করে, 'আরে আপনার তো মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হওয়া দরকার' বলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে দিলেন। ফিরে এসে দেখল বরফকুচি ভাসা লেবুর শরবতের গ্লাস তার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজনকে গ্লাসে চুমুক দেওয়ার সুযোগ দিয়ে কথাবার্তা নেতাই আরম্ভ করলেন, আর তা সবকিছু ছেড়ে মার্চের গুরুত্বই গরমটা কী সাংঘাতিক, শীত তো এ-বছর পড়লই না, ক্লাইমেট চেঞ্জের এসব কেবল মামুলি লক্ষণ, আসল বিপদ কিন্তু সামনে — এসব দিয়ে।

এ-প্রসঙ্গ-সে-প্রসঙ্গ ধরে কথাবার্তা এগোতে নিউজ এডিটরের মুখে লোকটা ইডিয়ট টাইপের শুনে যেমন মনে হয়েছিল, বাস্তবে তার মিল না পেয়ে সে তার ধারণায় অটল থাকল — লোকটা সজ্জন, আর হয়তো সে-কারণে বেশ সরলও। সরল বলেই কি ইডিয়ট — সোজা বাংলায় বেয়াকুফ? সরল লোকদের জন্য বাংলায় আরেকটা লাগসই শব্দ নিরীহ। শোনামাত্র ভালো-মন্দের হিসাবে না গিয়ে ডাগর চোখের জাবরকাটা আনমনা গরুর মুখ ভেসে ওঠে। তবে রাজনের সমস্যা হলো, সারা জীবন রাজনীতি করা এ-লোককে সজ্জন বলে যদি মেনে নেওয়া যায়, সরল বলে কীভাবে সম্ভব! নাকি নিউজ এডিটরের কথাই ঠিক, সরল বলেই ইডিয়ট! একজন সজ্জন ইডিয়টকে নিয়ে খেলতে তার মোটেও ইচ্ছা করল না।

ভদ্রলোক বললেন একটা বড় ভুল করে ফেলেছেন। গোঁথে ফেলার মোক্ষম সুযোগ পেয়েও রাজন কাজে লাগাল না। আরো বললেন, রাগের মাথায় নিজের এত বছরের দল ছেড়ে আসা উচিত হয়নি। আফটার অল, রাজনীতির হাতেখড়ি তো এ-দলেই সেই

স্টুডেন্ট লাইফ থেকে। তবে ফিরে আর যাচ্ছেন না, দল আর দল নেই। বিরোধী দলেও থাকছেন না, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন অবসর নেবেন, অনেক তো হলো। ব্যস, কথাবার্তার এখানেই মাথা মুড়িয়ে রাজন কবে থেকে পত্রিকায় কাজ করছে, জব সেটিসফিকেশন কি আছে, নতুন ওয়েজবোর্ডের কী খবর, বাড়ি কোন জেলায়, বিয়ে কি করেছে এসব ভ্যাজরভ্যাজরে চলে যেতে সে হঠাৎ চমকে উঠল, এই সজ্জন বেয়াকুবের সামনে বসে কী করছে! লোকটা জীবনভর রাজনীতিই করেছে, অন্য কিছু না, একবার মন্ত্রীও হয়েছে পশুপালন না কী এক মন্ত্রণালয়ের, এবার বলছে অবসরে যাবে, আর এদিকে সে আরো বড় বেয়াকুফের মতো এসব শুনছে। কেন শুনছে? লোকটা যদি বলত রাজনীতি ছেড়ে ইন্টার ডিস্ট্রিক ট্রাক চালাবে তাতেও কি তার কিছু যেত-আসত? এমন খবর যদি কাগজে ছাপা হয়, তাহলেই-বা কার কী! পাঠককে এমন ফালতু মজা দিয়ে তার কী লাভ!

মজা! মজা পেতেই মানুষ বাঁচে, আর যখন নিশ্চিত হয়ে যায় মজার আশা-টাশা বরবাদ, তখন অবসরে যায়, অসুখে পড়ে, মৃত্যুর অপেক্ষা করে বা নিজে নিজেই ডেকে আনে মৃত্যুকে। নতুন করে মজা পাওয়ার আশা নেই, তাই মুক্তির ব্যাপারটা তখন কারো কারো মধ্যে লাগামছুট হওয়া বিচিত্র নয়। তারা তখন উদ্যোগী হয়ে মৃত্যু আহ্বান করে। এ লোকটার জীবন থেকে বোঝাই যাচ্ছে মজাটজা উবে গেছে। কিন্তু অবসরে কেন যাবে, খামোকা সময় নষ্ট। প্রশ্নটা না চাইতেই করে ফেলতে রাজন নিজেই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। কিন্তু জবাব যা শুনল তা একজন প্রথম শ্রেণির বেয়াকুফের মুখেই মানায়। লোকটা এবার ধর্ম-কর্মে মন দেবে, এতদিন তো এসব করা হয়নি, দান-খয়রাত করবে, নিজের গ্রামে মরহুম মায়ের নামে এতিমখানা-কাম-মাদ্রাসা করবে, স্ত্রীকে নিয়ে মক্কা-মদিনা ঘুরে আসবে।

রাজন অনুভব করল, তার হঠাৎ অস্থির-অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে তার অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ছিল। ঠান্ডা ঘরে বরফকুচি-মেশানো লেবুর শরবতের পর শরীরমানে যে প্রশান্তি নেমে আসার কথা তেমন হচ্ছে না। সে উঠল, নোটপ্যাড ডটপেন ব্যাগে ঢুকিয়ে লোকটাকে খানিকটা চমকে দিয়ে আরেক দিন এসে অবসরের পরিকল্পনা শুনে যাবে বলে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় নেমে কোথায় যে যাওয়ার কিছুতেই মাথায় এলো না। চাকরিটা যাব-যাব করছিল, এবার হয়তো ঠেকানো যাবে না। একটা অটোরিকশা ধরে দোনোমনা করে বলল প্রেসক্লাব। কিন্তু প্রেসক্লাব কেন? ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল অফিসে লিফটের সামনে এ জেড এম আবদুল্লাহর মুখে শুনেছিল বাদজোহর ওখানে আরেফিন হাসানের লাশ আসবে। সে কি শেষবারের মতো আরেফিন হাসানের মুখ — মরা, ঠান্ডা, থেঁতলানো মুখ দেখতে যাচ্ছে? লাশ দাফনের আগে আপনজনেরা কাজটা করে, আরেফিন হাসান তার আপনজন ছিলেন না। এক জায়গায় কাজ করত বলে মুখচেনা, বার কয়েক কথা হয়েছে, এ পর্যন্তই। একটা চালু দৈনিক থেকে রিটায়ার করেছিলেন বেশ ক-বছর আগে, বয়স হয়েছিল, তবে প্রায় অচল পায়ের জন্য বলতে গেলে পঙ্গুই ছিলেন। অনেক বয়স্ক সাংবাদিকের মতো তিনিও চুক্তিভিত্তিতে কাজ করতেন। তবে যতক্ষণ অফিসে থাকার কথা, তিনি থাকতেন তারচেয়ে অনেক বেশি। কারণ নাকি ফ্যামিলি লাইফ, সেখান থেকে দূরে থাকতেই। কী হতে পারে, অশান্তি না হয় বোঝা গেল, কেমন অশান্তি? আরেফিন হাসান তাহলে শান্তি পেতে খোঁড়া পা সত্ত্বেও লাফটা দিয়েছিলেন। দশতলা উচ্চতাকে তার নিরাপদ মনে হয়েছিল, নাকি এসব নিয়ে রাজন যেমন ভাবে, ভেবে ভেবে একটা পাকাপোক্ত ধারণায় এমনকি বিশ্বাসেও পৌঁছে গেছে, তিনি তেমন ভাবাবিধিতে যাননি?

প্রেসক্লাবে পৌঁছতে-পৌঁছতে ঘড়িতে তিনটা পার। লাশ দাফনের জন্য আজিমপুর গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটা লম্বা মানববন্ধন চলছে প্রেসক্লাবের দেয়ালের ওপারে টানা ফুটপাত জুড়ে। মাইকে

বক্তৃতা চলছে, তবে আশপাশের বেদম ক্যাচমেচে কথাগুলো বাড়ি খেয়ে ঠিকঠাক বেরোনার পথ করতে পারছে না। ভাসা-ভাসা যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, কার যেন মুক্তির দাবি জানাচ্ছে। মানববন্ধন সাধারণত সকালের দিকে হয়ে থাকে। এরা নিশ্চয় সকালে ফুটপাতের দখল পায়নি, কিন্তু অসময়ে এই গরমের মধ্যে গায়ে গা-ঘেঁষে ঘাম-জবজব হাত ধরাধরি করে অন্যের মুক্তির দাবিতে কিসের জ্বালা মেটাচ্ছে!

গেটের ভেতরে খোলা চত্বরে টুপি-মাথায় জনাচারেক লোক। এদেরই একজন, ময়লা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গিপরা কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোফের কর্মচারী গোছের লোক আরেফিন হাসানের লাশ গোরস্তানে নিয়ে যাওয়ার খবর দিলো। বলল, লাশের লরিতে জায়গা হয়নি বলে সে যেতে পারেনি, তাকে একা ফেলে বাকিরা চলে গেছে। পথঘাট চেনে না, ফিরে যে যাবে কী করে বুঝতে পারছে না, দূর তো কম না, সেই কল্যাণপুর। তবে ফেরা সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যেও জানাল সে সাম্বাদিক ছারের বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকার। আল্লাহ ছারের বেহেশত নসিব করুক বলে বিড়বিড় করে কী যেন বলল, খুব সম্ভবত যারা তাকে ফেলে চলে গেছে তাদের উদ্দেশ্যে।

লোকটা মাথা থেকে টুপি খুলে দলামচা করে পাঞ্জাবির পকেটে ভরে কল্যাণপুরের বাস এখানে কোথায় পাবে জানতে চাইলে রাজন হঠাৎ সম্মত ফিরে পেল। জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, দশতলার ওপর থেকে যখন নিচে পড়লেন, আপনি কাছাকাছি ছিলেন?’

‘চিল্পাপাল্লা শুইন্যা বাইরে আসলাম, রাইত তো কম না, শুইয়া পড়ছিলাম।’

‘কাদের চিল্পাপাল্লা? যারা রাস্তায় ছিল তারা চিল্পাছিল?’

‘রাস্তায় মানুষজন ছিল না। আশপাশের বিল্ডিংয়ের সিকিউরিটিরাই চিল্পাচিল্পি করছে আর সাম্বাদিক ছারও ...।’

‘বলেন কী! উনি চিল্পাছিলেন আপনি নিজের কানে শুনেছেন?’

‘নিজের কানে না শুনলে কই ক্যামনে! নিজের কানে শুনছি, কথা বুজবার পারি নাই।’

‘তার পর?’

‘সে বড় খারাপ অবস্থা ছার, আমরা কয়জন মিল্যা উনারে ধরতে কী কবো, রক্ত তো না, মনে হইছে ফুটানো পানি, আর কল্লাডা তো ছারখার। এর বাদেও গলার আওয়াজ থামে নাই, কী যে কইতেছিলেন কিছু বুজি নাই, আর হাত-পাও এ কী খিচাখিচি! কইল্যাণপুরের বাস কি ছার এইখানে পামু?’

লোকটাকে বাসে তুলে দিয়ে ভাড়া আছে কি-না জানতে চাইলে সে জোরে মাথা নেড়ে জানাল আছে। বাস ছেড়ে যেতে রাজন কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে নিজেকে বলল, এবার?

লাইফ এন্ডস পিসফুলি সিক্স মিটারস বিফোর... এমন একটা বানোয়াট কথা সে বিশ্বাস করে আসছে ভাবতে গিয়ে মনে হলো এত দিনের খাঁচাবন্দি চিন্তাভাবনাগুলো মাথায় হাজারটা পোকা হয়ে ছটোপুটি জুড়ে দিয়েছে। একটা মিথ্যাকে লাই দিয়ে সে তার ভাবনাচিন্তার জগৎকে পাণ্টে ফেলতে চেয়েছিল। খুব যে মুক্তি-মুক্তি করত — মানে মনে মনে — স্বপ্নে দেখত উঁচু-উঁচু দালানের কার্নিশে বুক-পেট চেপে লাফাবে বলে বাঁধা-বন্ধনহীন মুক্তি কামনায় মানুষ তৈরি হচ্ছে, সে তো ভুয়া। লাফিয়ে পড়ে মানুষ মারা গেছে শুনে শুধরে বলত, মরে নাকি আবার, হাড়গোড় চুরমার হওয়ার আগেই শান্তিতে, পিসফুলি...

কিন্তু এত সহজে রাজন দমে কী করে! শান্তিতে, পিসফুলি যদি না হয়, মৃত্যু যখন অনিবার্য — সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে হলেও — মুক্তি অধরা থেকে যায়!

খটকাটা মাথায় পুরে সে গুটিয়ে যাওয়া শেষ বিকেলের আলো দেখল। বৃষ্টির পর আকাশে চনমনে বাদামি রোদ, ছিন্ন মেঘ।

গত রাতের স্বপ্নটা যদি আজ রাতে আবার ফেরে? নিজেকে নিয়ে না দেখলেও চেনা-অচেনা অন্য কাউকে নিয়ে দেখা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এতদিনের অভ্যাস। চারপাশে এত এত মুক্তিপাগল! □



যমুনা

ইমদাদুল হক মিলন



খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে হঠাৎই চোখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি ফ্ল্যাটের দরজায় একটি শিশু দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েশিশু। রোগা, ফর্সা, মাথায় লালচে ধরনের পাতলা চুল। শরীরের তুলনায় মাথাটা যেন একটু বড়। মুখটা মিষ্টি, চোখদুটো ডাগর।

নটার মতো বাজে। আমার সামনে কাচের সেন্টার টেবিল। তার ওপর একগাদা দৈনিক পত্রিকা। নামকরা কাগজগুলো ধরে-ধরে আমি চেক করছি। কোন কাগজ কী লিড করলো, কোন জরুরি নিউজ আমাদের কাগজ মিস করলো ইত্যাদি দেখছি। পায়ের কাছে এক লিটারের পানির বোতল। আটটার দিকে কাগজ নিয়ে বসেছি এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ধীরে-ধীরে পানিটাও খেয়েছি। বোতল প্রায় শেষ। এখন অর্ধেকটা এমারিল খাবো। দশ মিনিট পর খাবো একটা গ্যালভাস। তার দশ মিনিট পর নাশতা। টেবিলে জাহাঙ্গীর সব রেডি করে রেখেছে।



অলংকরণ : ঢালী আল মামুন

বাচ্চাটা কে?

দেখে বোঝা যায় ফ্ল্যাট-বাসিন্দাদের কারো বাচ্চা না। চেহারা-পোশাকে দারিদ্র্যের ছাপ। কোনো ফ্ল্যাটের বুয়াদের বাচ্চা হবে।

আমার ধারণাই ঠিক।

পাশের ফ্ল্যাটের গেট খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। মলিন সালোয়ার-কামিজ পরা। ফর্সা মুখ ঘামে ভেজা, রোগা এবং বিষণ্ণ। কাজের মেয়ে বোঝা যায়। আমার দরজায় শিশুটিকে দেখে তার হাত ধরলো। মুখে বিরক্তির চিহ্ন। বেরিয়েছিস কেন? আমি কি কাজ করবো না তোকে আগলাবো? আর যদি দরজা খুলে বেরিয়েছিস!

বিব্রত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো। আমি পাশের ফ্ল্যাটে কাজ করি সাহেব। আমার মেয়ে কোন ফাঁকে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।

না, না মনে করার কী আছে? বাচ্চার নাম কী?

মেয়েটি তার বাচ্চার দিকে তাকালো। নাম বলো।

পাখির মতো মিষ্টি গলায় শিশুটি বললো, জয়া।

বাহ! খুব সুন্দর নাম। দাঁড়াও-দাঁড়াও।

ফ্রিজে কিছু ক্যান্ডি আমি সবসময়ই রাখি। ফ্লিকার মার্স, সাফারির ওয়েফার।

সানজিকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম। 'সানজির গল্প'। সেই গল্প পড়ে ফোনে প্রব এষ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। খুবই আবেগপ্রবণ, নরম হৃদয়ের মানুষ।

সন্ধ্যার দিকে মাঝে-মাঝে সুগার কমে যায়। তখন খাই। সুগার না কমলেও কখনো-কখনো খাই। ডায়াবেটিসদের যা হয় আর কি! মিষ্টিজাতীয় জিনিস দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে।

একটা ফ্লিকার এনে জয়ার হাতে দিলাম।

এই ফ্লিকার দেওয়া থেকেই শুরু হলো ঘটনা।

এখন বলি, দিনটা শুরু করি কীভাবে?

ঘুম ভাঙে ভোর পাঁচটায়। উঠেই ওয়াশরুমে গিয়ে মুখটা ভালো করে ধুই। তারপর চলে যাই লেখার রুমে। একটানা তিন ঘণ্টা লিখি। সাতটার দিকে উঠে জাহাঙ্গীর লেগে যায় তার কাজে। অর্থাৎ আমার নাশতা তৈরি করা। এক বাটি সবজি, দুখানা মাঝারি সাইজের আটার রুটি, বড় লেবুর এক টুকরা লেবু, দুখানা ফুল বয়েলড ডিম, দশ-বারো টুকরা পাকা থাই পঁপে, এই আমার নাশতা। ডিমদুটোর শুধু সাদা অংশ প্রতিদিনই খাই। সপ্তাহে তিনদিন খাই একটা করে কুসুমসহ ডিম। ডাইনিং টেবিলের পাশে ওষুধের ব্যাগ। নাশতার বিশ মিনিট আগে হাফ এমারিল, দশ মিনিট আগে একটা গ্যালভাস। দেশের তৈরি গ্যালভাস খাই না। আমারটা সুইজারল্যান্ডের তৈরি। দুটোই ডায়াবেটিসের ওষুধ।

নাশতার সর্বশেষ আইটেম পাকা পঁপে। তার আগে একটা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট আর একটা এ টু জেড ভিটামিন ট্যাবলেট। নাশতার মিনিট দশেক পর প্রেশারের ওষুধ এমডোকল একটা আর কার্ডিওকর একটা। বছর পাঁচেক ধরে এই নিয়মে চলছি।

আমার দেখভালের দায়িত্ব জাহাঙ্গীরের। বছর পঁয়ত্রিশের যুবক। প্রথম স্ত্রী সানজি নামের বছর চারেক বয়সের একটি মেয়ে রেখে জাহাঙ্গীরকে ছেড়ে চলে যায়। জাহাঙ্গীর তারপর আবার বিয়ে করে। সৎমা এসে সানজির সঙ্গে সৎমায়ের মতোই আচরণ শুরু করে। সানজিকে ঠিকঠাকমতো খেতে দেয় না। মারধর করে। এই দেখে মেয়েটিকে বুকে তুলে নেয় জাহাঙ্গীরের বড় বোন নূরজাহান।

নূরজাহান বহু বছর ধরে কাজ করে আমার মগবাজারের ফ্ল্যাটে। আমার স্ত্রীর দিক থেকে পরিচিত। ওদের বাড়ির কাছেই, লুপ্ত হয়ে-যাওয়া ধোলাইখালের পশ্চিম পাশে বহুকালের পুরনো একটা মন্দির। মন্দির-আঙিনায় ঘর তুলে থাকে কয়েকটি পরিবার। নূরজাহানরা থাকতো ওখানে।

জায়গাটা গেভারিয়াতে। মন্দিরের জায়গাটা পড়েছে কলুটোলায়। ওদের পরিবারের অনেকেই আমার শ্বশুরবাড়িতে কাজ করতো। পরে নূরজাহান চলে আসে আমার সংসারে। দীর্ঘদিনের কাজের লোকদের সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। মালিকদের কাছে কাজের লোকদের অধিকারবোধ জন্মায়। নূরজাহানের তেমন এক অধিকারবোধ জন্মেছে আমাদের ওপর।

সানজিকে নিয়ে একদিন সে আমাদের ফ্ল্যাটে এলো। আমার স্ত্রীকে খুলে বললো সব ঘটনা। সানজিকে সে তার সঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটেই রাখতে চায়। মেয়েটির মায়াবী মুখ দেখে নূরজাহানের কথা আমরা ফেলতে পারিনি। সানজি আমাদের সংসারে থেকে গেল।

নূরজাহানের স্বামী একসময় কোনো এক ফ্যাক্টরিতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করত। তিনটি ছেলেমেয়ে তাদের। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে বরিশালে। তার অবস্থা ভালোই। মেজোটা ছেলে। সে বাংলাবাজার এলাকায় ব্লক তৈরির কাজ করে। ছোট মেয়েটার নাম বর্ষা। সে ফাইভে না সিক্সে যেন পড়ে।

স্বামীর সঙ্গে নূরজাহানের বয়সের ব্যবধান অনেক। লোকটা এখন আর কিছু করে না। বউ ছেলের রোজগারে বসে-বসে খায়। বড় মেয়েও সাহায্য করে। সপ্তাহ দশদিন পর এক বেলার জন্য নূরজাহান স্বামী-ছেলেমেয়ে দেখতে যায়। তবে মোবাইলে খবর নেয় রোজই একবার-দুবার।

নূরজাহানের রান্নার হাত অসাধারণ। তার হাতের ছোঁয়ায় অতিসামান্য খাবারও অসামান্য হয়ে যায়। নূরজাহানের রান্নায় আমরা তো বটেই আমাদের চারপাশের আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত মুগ্ধ।

আমার স্ত্রী সানজিকে একসময় স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ভালো খাওয়া-দাওয়া আর জামা-কাপড়ে মেয়েটির রূপ খুলতে লাগল। সানজির রূপে আমাদের ফ্ল্যাট আলোকিত হয়ে উঠল। মাঝে-মাঝে সে নূরজাহানের সঙ্গে গেভারিয়ায় গিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করে আসে। বাবার জন্য ব্যাপক টান।

এই মেয়েটি অদ্ভুত এক দুর্ঘটনায় মারা গেল।

সকালবেলা স্কুল থেকে ফিরছে, সঙ্গে আমাদের আরেকজন বুয়া। রাস্তার ধারের এক বাড়ির লোহার গেট ভেঙে পড়ল সানজির ওপর। বুয়া আর সে একসঙ্গেই হাঁটছিল। বুয়ার কিছুই হলো না, চাপা পড়লো সানজি। লোকজন কোলে করে তাকে আদ-দ্বীন হাসপাতালে নিয়ে গেল। বুয়া কাঁদতে-কাঁদতে এসে আমাদেরকে খবর দিলো। আমি সেদিন বাসায়। ছুটে গেলাম হাসপাতালে। ডাক্তাররা বললেন বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল নিয়ে যেতে। নিয়ে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর সানজি মারা গেল।

সানজিকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম। ‘সানজির গল্প’। সেই গল্প পড়ে ফোনে প্রব এম হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। খুবই আবেগপ্রবণ, নরম হৃদয়ের মানুষ। ও যে-মাপের রংতুলির শিল্পী, ছোটদের লেখায় একেবারেই ভিন্ন মাত্রার এক লেখক, ওর তো এমনই হওয়ার কথা। দেখতেও সাধুসন্তের মতো। প্রবকে আমি খুবই ভালোবাসি।

সানজির মৃত্যু আমাদের পরিবারে গভীর ছায়া ফেলেছিল।

এই ঘটনার তিন-চার বছর পর জাহাঙ্গীরের আবির্ভাব। সে একসময় চায়ের দোকানদার ছিল। বাংলাবাজার এলাকার ফুটপাথে বসে চা বিক্রি করতো। সানজির মা খুব সুন্দরী ছিল। সে চলে যাওয়ার পর, সানজির মৃত্যুর পর ধস নেমে গেল জাহাঙ্গীরের জীবনে। চা বিক্রির টাকায় সংসার চলে না। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে একটি মেয়ে জন্মেছে। তাদের নিয়ে দুর্বিষহ কষ্টের দিন।

এ সময় আমার জীবন বাঁক নিয়েছে অন্য দিকে। দেশের বৃহত্তম শিল্প গোষ্ঠী ‘বসুন্ধরা গ্রুপের’ কালের কণ্ঠ পত্রিকায় আমি জয়েন করেছিলাম জয়েন্ট এডিটর হিসেবে। তেমন কোনো কাজ নেই। যখন ইচ্ছা অফিসে আসি, যখন ইচ্ছা চলে যাই। অফিস থেকে গাড়ি দেওয়া হয়েছে। ওই নিয়ে ঘুরে বেড়াই। মাঝে-মাঝে ঢাকার বাইরে যাই পত্রিকার কাজে। পত্রিকা-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে বেড়াই সারা দেশে। আমাকে নেওয়াও হয়েছিল এসব কাজের জন্যই।

বছর দেড়েকের মাথায় সম্পাদক চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন। গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং এমডি আমাকে ডেকে নিয়ে সম্পাদকের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। এত বড় দায়িত্ব পড়লো মাথায়, আমি খুবই দিশেহারা। অফিস বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায়। প্রথমেই মনে হলো মগবাজার থেকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কালের কণ্ঠ অফিসে আসতে-যেতে দুঘণ্টা-দুঘণ্টা চার ঘণ্টা সময় চলে যাবে। তাহলে? সম্পাদকের কাজ তো চব্বিশ ঘণ্টার! ম্যানেজ করবো কী করে?

চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম, এমডি সাহেবকে বললাম। শুনে তাঁরা আমাকে তিন হাজার স্কয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে দিতে চাইলেন অফিসের কাছে। ভাড়া ষাট হাজার টাকা, অফিস দেবে। ফ্ল্যাট সাজাতে যা-যা লাগে তাও দেবে। শুনে আমার স্ত্রী বললেন, আমরা মগবাজারেই থাকি, তুমি গিয়ে ওই ফ্ল্যাটে থাকো। প্রতি শুক্রবারে এসে আমাদের সঙ্গে থেকে যেও।

ঠাট্টা করে বললেন, তোমার এখন পঞ্চাশ বছর বয়স, আমিও পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে দুজন দুদিকে থাকলে অসুবিধা কী?

কদিন পর বড়মেয়ের বিয়ে দেব। দু-তিন বছর পর দেব ছোটটার। ছেলে এখনো ছোট। তুমি তোমার মতো থাকো, আমি থাকি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার মতো। মাঝে-মাঝে দেখা হবে, এই যথেষ্ট।

আইডিয়া মন্দ লাগলো না। মনে পড়লো আমার বাবার কথা।

বাবাকে আমরা ডাকতাম আব্বা। ষাটের দশকের গোড়ার দিককার কথা। আমার বয়স পাঁচ-ছ বছর। বিক্রমপুরের মেদেনীমণ্ডল গ্রামে নানাবাড়িতে থাকি। আব্বা চাকরি করেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে। স্ত্রী-সন্তানসন্ততি রেখেছেন শ্বশুরবাড়িতে। তখনকার দিনে শনিবারে হাফ অফিস, রোববারে ছুটি। শনিবার অফিসে হাজিরা দিয়েই সদরঘাটে গিয়ে লঞ্চ চড়তেন আব্বা। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসটা ছিল লক্ষ্মীবাজারে। সেখান থেকে সদরঘাট কয়েক মিনিটের হাঁটা রাস্তা।

শেষ বিকেল কিংবা গোখুলি বেলায় আব্বা গিয়ে হাজির হতেন আমার নানাবাড়িতে। কাঁধে একটা রেজিনের ব্যাগ, দুহাতে দুটা চটের ব্যাগ। আয়-রোজগারের সাধ্যানুযায়ী আমাদের জন্য পাউরুটি বিস্কুট সাগরকলা ইত্যাদি-ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। শনিবার আর রোববার রাত আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার ফজরের লঞ্চ ঢাকায় রওনা দিতেন।

আমিও কি আব্বার সেই পথ ধরবো? ঢাকায় থেকেও ঢাকা-বিক্রমপুরের জীবন! ষাটের দশকের মতো।

ধরলাম পথটা। ঠিক আছে, সপ্তাহে ছদিন থাকি বসুন্ধরায়।

সব। একটা লেখার রুম, আরেকটা রুম ফাঁকা। ওই রুমে আমার দেখাশোনার লোক থাকবে।

দেখাশোনার লোক হিসেবে জাহাঙ্গীরের আগমন।

বসুন্ধরায় ফ্ল্যাট রেডি হয়েছে শুনে স্ত্রী চিন্তিত হলেন। আমার দেখভালের জন্য কাকে দেবেন ওই ফ্ল্যাটে। ছোট্ট একটা পরিবার হলে ভালো হয়। ফাঁকা রুমটায় থাকবে। চলার মতো বেতন দেওয়া হবে। শুনে নূরজাহান বলল জাহাঙ্গীরের কথা। বেকার, সংসার চালাতে পারে না। তিন বছরের একটা মাত্র মেয়ে। সেই মেয়েও চুপচাপ ধরনের। আমার কোনো ডিস্টার্ব হবে না। জাহাঙ্গীর খুবই কর্মঠ যুবক। হাজার বারো টাকা বেতন দিলেই হবে।

জাহাঙ্গীর এসে যুক্ত হলো আমার সঙ্গে।

সবই ঠিক ছিল। জাহাঙ্গীরের বউর পেটে যে আরেকটি বাচ্চা এই কথাটা নূরজাহান এবং জাহাঙ্গীর দুজনেই আমাদের কাছে চেপে গিয়েছিল। মাস দুয়ের মধ্যে যখন জানলাম তখন আর কী করা! জাহাঙ্গীর অনেকখানি মানিয়ে নিয়েছে আমার সঙ্গে।

যথাসময়ে তাদের একটা পুত্রসন্তান হলো। হাসপাতাল ইত্যাদির খরচ আমিই দিলাম। সমস্যা দেখা দিলো নবজাতকটিকে নিয়ে। সারাদিন তার কোনো আওয়াজ নেই। আমি রাতে বাসায় ফেরার পরেই সে ত্রাহি ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। রাত বারোটার দিকে গুরু করে ভোর চারটা পর্যন্ত একটানা কাঁদে। আমার খুবই ডিস্টার্ব হয়।

এক্ষেত্রেও সহায়ক হলেন স্ত্রী। জাহাঙ্গীরকে বললেন তিন-চার

জাহাঙ্গীর সত্যিই করিৎকর্মা। দিন পনেরোর মধ্যেই সেভাবে সব গুছিয়ে ফেলল। টেনাম্যান্ট হাউসের ফ্ল্যাটে শুরু হলো দুই বিবাহিত ব্যাচেলরের জীবন। সপ্তাহে ছয়দিন আর পাঁচ রাত্রির জীবন।

শুক্রবার ডে-অফ। বৃহস্পতিবার রাতে মগবাজারে এসে শনিবার সকালে ফিরে গেলেই হলো।

কিন্তু তিন হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট দিয়ে কী করবো? এতবড় ফ্ল্যাটে একা একজন লোক থাকে কী করে?

আমার ছোটমেয়েটি ঠাট্টাপ্রিয়। সে বলল, বাবা, তুমি একটা বিয়ে করে নাও!

আমি হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকালাম। তুমি কী বলো?

আমার কোনো আপত্তি নেই। এই বয়সে তোমার মতো পচা চেহারার লোককে কেউ বিয়ে করবে না। আমি নিশ্চিত।

কিন্তু তিন হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট!

আমার কিঞ্চিৎ ভূতের ভয় আছে। একা ঘরে থাকতে পারি না। বিদেশে গেলে হোটেলের রুমে সারারাত লাইট জ্বালিয়ে রাখি। ঢাকার বাইরে গেলেও একই অবস্থা। একা ঘরে মনে হয় চোখ মেললেই দেখবো আজদাহা কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে কেউ। বুকের ওপর চেপে বসেছে অশরীরী আত্মা।

না, এতবড় ফ্ল্যাটের দরকার নেই। কোম্পানির টাকা নষ্ট হবে, আমারও সেভাবে থাকা হবে না। চেয়ারম্যান সাহেবকে খুলে বললাম সব। শুনে তিনি আমাকে ট্যানামেন্ট হাউসের দশটা বিল্ডিংয়ের একটাতে এগারো-বারোশো স্কয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলেন। ছোট পরিবার থাকার জন্য চমৎকার ফ্ল্যাট। কোম্পানির নিজস্ব ফ্ল্যাট। ভাড়ার বালাই নেই। মাঝারি সাইজের তিনটা বেডরুম। মোটামুটি প্রশস্ত ড্রয়িং-ডাইনিং। সোফা ফ্রিজ ডাইনিং টেবিল, তিন-চারটা বুক শেলফ, বেডরুমে যা-যা লাগে

হাজারের মধ্যে কাছাকাছি কোথাও একটা রুম ভাড়া করে বউ-বাচ্চা রাখতে। দিনেরবেলা সে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে আসবে রাতেরবেলা আমার সঙ্গে এসে ফ্ল্যাটে থাকবে। রুম ভাড়ার টাকাটা আমরা দিয়ে দেবো।

জাহাঙ্গীর সত্যিই করিৎকর্মা। দিন পনেরোর মধ্যেই সেভাবে সব গুছিয়ে ফেলল। টেনাম্যান্ট হাউসের ফ্ল্যাটে শুরু হলো দুই বিবাহিত ব্যাচেলরের জীবন। সপ্তাহে ছয়দিন আর পাঁচ রাত্রির জীবন।

দিনে-দিনে এই জীবনে আমরা দুজনই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমি আর জাহাঙ্গীর।

সাড়ে নটার দিকে আমি নাশতা করতে বসি। জাহাঙ্গীর এক মগ চা আর তিনখানা রুটি নিয়ে চলে যায় তার রুমে। চায়ে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে রুটি খায়। এই তার নাশতা।

ওষুধ খাওয়া শেষ করে খানিক পায়চারি করি আমি। ফোনে স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে কথা বলি। ইতোমধ্যে বড়মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক বছর আমেরিকায় কাটিয়ে মেয়ে মেয়ের জামাই দুজনেই দেশে ফিরেছে। জামাই একটা ইউনিভার্সিটির লেকচারার। মেয়ে ব্যাংকে চাকরি করে। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মোহাম্মদপুরে থাকে। ভালোই আছে। ছোটমেয়ে নর্থ সাউথে বিবিএ পড়ছে। আমার অফিসের কাছেই তার ক্যাম্পাস। ইউনিভার্সিটিতে আসতে-যেতে দুঘণ্টা করে চার ঘণ্টা সময় যাচ্ছে তাতে, তার কিছুই যেন আসছে যাচ্ছে না। দু-একবার বলেছি, আমার বসুন্ধরার ফ্ল্যাটে থাক। তাতে কষ্ট কম হবে। সে থাকবে না। মগবাজারের ফ্ল্যাটে নিজের রুম ছাড়া নাকি ঘুম হবে না।

আর আমার হয়েছে উলটো। মগবাজারের ফ্ল্যাটেই আমার ঘুম আসতে চায় না। বসুন্ধরার নিরিবিলি ফ্ল্যাটে চুপচাপ জীবনটা আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

সকাল দশটার মধ্যে গোসল-টোসল সেরে আমি একদম ফ্রি। অফিসে যাই সাড়ে এগারোটায়। হাতে দেড় ঘণ্টা সময়। এই সময়টায় গান শুনি কিংবা বই পড়ি। কোনো-কোনো দিন জরুরি মিটিং থাকে। অফিসের বাইরে নানারকম কাজ থাকে। ওসবেও ছুটতে হয়। ওই ধরনের কাজ না থাকলে সাড়ে এগারোটায় অফিসে গিয়ে একটানা সাড়ে ছটা পর্যন্ত থাকি।

আগে মগবাজারের বাসা থেকে ড্রাইভারের সঙ্গে খাবার পাঠিয়ে দিতেন স্ত্রী। ড্রাইভারের নাম মতিন। ছোটমেয়েকে ইউনিভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে আসতো অফিসে। দুপুরের খাওয়া শেষ হলে হটপট তুলে রাখতো গাড়িতে। পরদিন আবার নিয়ে আসতো দুপুরের খাবার। রাতে খাই রুটি-সবজি। ওসব জাহাঙ্গীরই করতে পারে।

স্ত্রীকে বললাম, শুক্রবার শুক্রবার জাহাঙ্গীরকে মগবাজারে ডাকো। মাছ-মাংস ভালো রান্না করতে শেখাও। দুপুরের খাবার নিয়ে তাহলে আর কোনো ঝামেলা থাকে না।

দু-তিন শুক্রবারের ট্রেনিংয়ে জাহাঙ্গীর পাকা রাঁধুনি হয়ে গেল। তার মানে আমি একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মগবাজারের ওপর আর নির্ভরই করতে হয় না।

সাড়ে ছয়টার দিকে ফ্ল্যাটে ফিরে আধঘণ্টা খানিক রেস্ট নিয়ে পঁয়তালিশ-পঞ্চাশ মিনিট এক্সারসাইজ করি। হালকা গরম পানিতে গোসল করে ডিনার সেরে নটার দিকে আবার অফিস। ফাস্ট এডিশন শেষ করে ফ্ল্যাটে ফিরতে-ফিরতে পৌনে এগারোটো-এগারোটো।

কোনো-কোনো সন্ধ্যায়ও থাকে নানা ধরনের অনুষ্ঠান। ডিনারে যেতে হয় দামি-দামি জায়গায়। সব মিলিয়ে এই হচ্ছে আমার এখনকার জীবন।

শুক্রবার দিনটা পরিবারের জন্য। ভাইবোন-বন্ধুবান্ধব, বিয়েশাদি ইত্যাদি। কোনো-কোনো প্রকাশক আসেন শুক্রবার সকালের দিকে। বইপত্রের খবরাখবর, রয়্যালিটির হিসাব, আগামী ফেব্রুয়ারিতে কী কী বই লিখবো সেসব পরিকল্পনা। যদিও এসবই সামলায় শাহীন। তারপরও নিজে মাঝে-মাঝে প্রকাশকদের সঙ্গে বসি।

শাহীন শুধু বইপত্র আর প্রকাশকই সামলায় না, আমার পুরো সংসারই সামলায়। আমার হাতের লেখা সে ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। নিচতলার ফ্ল্যাটের একটা রুমে তার অফিস করে দিয়েছি। প্রতিদিন যতটা লিখি ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিই তাকে। সে কম্পোজ করে। আমি কম্পিউটার কম্পোজ পারি না। সাবেকি আমলের হাতের লেখাই চালিয়ে যাচ্ছি।

শাহীন গত কুড়ি বছর ধরে আমার সঙ্গে। দিনে-দিনে আমার পরিবারের অংশ হয়ে উঠেছে। সংসারে হেন কাজ নেই, যা সে না করে। আমরা প্রত্যেকেই তার ওপর খুব নির্ভরশীল। শাহীনের মতো সৎ-নির্লোভ মানুষ আজকালকার দিনে পাওয়া যাবে না। মাটির মানুষ বলতে যা বোঝায় শাহীন হচ্ছে তাই। ফাঁকিঝুঁকি-মিথ্যাচার কাকে বলে শাহীন জানে না।

সব মিলিয়ে এই হচ্ছে আমার এখনকার জীবন। এই জীবনে এসে ঢুকলো ওই তিন বছরের মেয়েটি। জয়া। সঙ্গে ওর মা যমুনা।

জয়াকে প্রথমদিন আমি ক্যান্ডি দেওয়ার ফলে শিশুটির ভালোরকম একটা লোভ জন্মালো। মায়ের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই নটার সময় সে আসে। যমুনা তার কাজের ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজায়। আর জয়া এসে দাঁড়ায় আমার ফ্ল্যাটের খোলা দরজায়। বুঝতে পারি শিশুটি কেন দাঁড়িয়েছে। আর এমন মিষ্টি করে হাসে, মুখের দিকে তাকালেই মায়া লাগে।

প্রতিদিনই আমি তাকে কিছু না কিছু দিতে লাগলাম। কোনোদিন

একটা ক্যান্ডি, কোনোদিন একটা কমলা বা আপেল, কোনোদিন একটা কলা। এক প্যাকেট বিস্কুট ছিল টেবিলের ওপর। খাওয়াই হচ্ছিল না। পুরো প্যাকেটটা একদিন দিয়ে দিলাম জয়াকে। একদিন দুটো মিষ্টি দিলাম। একদিন দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না, একশটা টাকা দিলাম। যা ইচ্ছে হয়, কিনে খাও গিয়ে।

জয়া যে কী খুশি! কী আনন্দিত। তার এই আনন্দিত মুখ দেখার জন্যই নটা বেজে গেলেও ফ্ল্যাটের দরজা আমি বন্ধ করি না। মায়ের হাত ধরে মেয়েটির আসতে দেরি হলে, নাশতা করতে বসেও দরজার দিকে তাকাই। জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞেস করে খোঁজখবর নেই।

জয়ার জন্য আমার যে একটা বিশেষ মমতা তৈরি হয়েছে এটা যমুনা তো টের পেয়েছেই, জাহাঙ্গীরও খুব ভালোভাবেই বুঝেছে। ওদের খবরাখবর জাহাঙ্গীর রাখে। এর মধ্যে দিন সাতেক জয়াকে দেখি না। যমুনাও আসে না। কাজ ছেড়ে দিলো নাকি?

পাকিস্তানি পরিবারটির সঙ্গে আমি কথা বলি না। তাদের ছোট-ছোট দুটি মেয়ে নিজেদের মতো চলাফেরা করে। খোলা দরজা কিংবা জানালা দিয়ে কখনো-কখনো আমার ফ্ল্যাটে উঁকি দেয়। এটুকুই। আমি দুয়েকদিন ডেকেছি। কি রকম লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়। হাজব্যান্ড-ওয়াইফ আর দুই বাচ্চা নিয়ে তাদের সংসার। ভদ্রলোক কোনো একটা টেক্সটাইল মিলে কাজ করেন। একটু মোটা ধাঁচের নিরীহ চেহারা। খুবই অর্ডিনারি প্যান্ট-শার্ট আর জুতো পরে কাজে যান। মাথায় অ্যাশ কালারের একটা গোল টুপি। আমার খোলা দরজার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় গোলাপপানি টাইপের একটা পারফিউমের গন্ধ আসে। কখনো মুখোমুখি দেখা হলে সে আমাকে সালাম দেয়। সালাম বিনিময় ছাড়া কোনো কথা হয় না।

ভদ্রমহিলাকেও দু-চারবার দেখেছি। ঘর থেকে তেমন বের হয় না। অথবা আমি যখন ফ্ল্যাটে থাকি না তখন বোধহয় বের হয়। ফ্ল্যাটের দরজা-জানালা দিয়ে আড়চোখে আমার দিকে তাকায়। ধবধবে ফর্সা, ভালোই মোটা। সিনথেটিকের সালায়ার-কামিজ পরে থাকে, মাথায় ওড়নার ঘোমটা।

জাহাঙ্গীর একটু-একটু উর্দু জানে। আলাপি টাইপের মানুষ। তার সঙ্গে বোধহয় পাকিস্তানি পরিবারটির কথাবার্তা হয়।

জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞেস করলাম, যমুনা আর জয়ার খবর কী বলো তো? বেশ কয়েকদিন দেখি না!

জাহাঙ্গীর বলল, সেও কয়েকদিন ধরে দেখে না।

খবর নিয়ে দেখো তো। কাজ ছেড়ে দিয়ে গেল কি না?

জাহাঙ্গীর খবর নেওয়ার আগেই, পরদিন নটার দিকে দেখি জয়ার হাত ধরে যমুনা কাজে এসেছে। মেয়ের মাথা ন্যাড়া, মায়ের মুখে-হাতে শুকিয়ে আসা গোটাগাটি।

যমুনা, কী হয়েছে তোমার?

জলবসন্ত হয়েছিল স্যার।

জয়াকে একটা আপেল দিলাম। কিছুক্ষণ পর সেই আপেল হাতে ফিরে এলো মেয়েটি। আপেল পচা।

খুবই লজ্জা পেলাম। দেওয়ার সময় খেয়াল করিনি। পচা আপেল ফেলে দিয়ে দুটো তাজা আপেল ধরিয়ে দিলাম।

কদিন পর পাশের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যমুনা আমার ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে জয়া আছে। আজ তাকে একটা ক্যান্ডি দিলাম। তখন সাড়ে দশটার মতো বাজে। সোফায় বসে আমি চা খাচ্ছি। নটার দিকে একটা কমলা দিয়েছিলাম জয়াকে। তারপর আবার এলো কেন?

যমুনা বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবো।

বলো।

আমার হাজব্যান্ড একটা এনজিওতে কাজ করতো। বেতন পেতো পনেরো হাজার টাকা। বাচ্চাটাকে নিয়ে আমরা ভালোই

যাদের কারণে
একাত্তর সালে ত্রিশ
লাখ বাঙালি মারা
গেছে, দু-তিন লাখ
মা-বোন ইজ্জত
হারিয়েছেন, সেই
পাকিস্তানিদের বাড়ির
কাজের বুয়া হয়েছে
একজন মুক্তিযোদ্ধার
মেয়ে? এ-কথা
শোনার আগে আমার
মরে যাওয়া উচিত
ছিল।

চলতাম। মাস দুয়েক হলো চাকরি নেই। খুবই কষ্টে আছি স্যার। আমার হাজব্যান্ড বিএ পাস। আপনি যদি তাকে একটা চাকরি দেন, তাহলে আমার স্যার বুয়ার কাজটা করতে হয় না। আমি লেখাপড়া জানা মেয়ে। এসএসসি পাস করেছিলাম। অভাবের সংসার, বাবা কলেজে পড়াতে পারেননি। বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি স্যার দয়া করে...

আমি অবাক। তাইতো বলি, এতো সুন্দর ভাষায় কথা বলা মেয়ে, উচ্চারণ-টুচ্চারণ সুন্দর, তার তো কাজের বুয়া হওয়ার কথা না!

তোমাদের বাড়ি কোথায়?

বাগেরহাটে। আমার বাবা স্যার একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা তিন বোন। বাংলাদেশের তিনটা নদীর নামে আমাদের নাম রেখেছিলেন বাবা। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা স্লোগান ছিল 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা' এই জন্য বাবা তার তিন মেয়ের নাম রেখেছিলেন পদ্মা মেঘনা যমুনা। বড় দুবোনের বিয়ে হয়েছে মোটামুটি ভালো ঘরে। টাকাপয়সা নেই কিন্তু ভদ্র পরিবার। আমার স্বশ্রবণবাড়িরও একই অবস্থা। ও ঢাকায় চাকরি নিয়ে এলো। একটা পরিবারের সঙ্গে তিন হাজার টাকায় সাবলেট থাকি। ভালোই চলছিলাম। হঠাৎ চাকরিটা স্যার চলে গেল।

এ সময় পাকিস্তানি পরিবারের ছোট মেয়েটি এসে আমার ফ্ল্যাটে একটু উঁকি দিয়েই চলে গেল।

যমুনা বলল, আমাকে দেখে গেল স্যার। বুয়ার কাজটাও যায় কিনা।

কেন? তুমি কী অন্যায় করেছো?

এরা চায় না তাদের বাড়ির কাজের বুয়া কারো সঙ্গে কথা বলুক। জয়াকে আপনি খাবার-টাবার দেন এটাও পছন্দ করে না।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, বেতন কত দেয় তোমাকে?

দুহাজার টাকা।

যদি কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়, মাসের গুরু দিকে এসে আমার কাছ থেকে দুহাজার টাকা নিয়ে যাবে।

যমুনার চোখদুটো ছলছল করে উঠল। আমি যে বুয়ার কাজ করি এটা আমাদের বাড়ির কেউ জানে না। কাজ করা খারাপ না। পেটের দায়ে মানুষ তো কাজ করবেই। কিন্তু স্যার, আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা ভাতায় আমাদের সংসার চলে। বাবার শরীরটা ভালো না। প্রায়ই বিছানায় পড়ে থাকেন। আমি বুয়ার কাজ করছি এটা শুনে তিনি কতটা রাগ করবেন আমি জানি না। তবে যদি শোনে আমি একটা পাকিস্তানি পরিবারের কাজের বুয়া তাহলে প্রচণ্ড রাগ করবেন। বলবেন, যাদের কারণে একাত্তর সালে ত্রিশ লাখ বাঙালি মারা গেছে, দু-তিন লাখ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছেন, সেই পাকিস্তানিদের বাড়ির কাজের বুয়া হয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধার

মেয়ে? এ-কথা শোনার আগে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। এই মুহূর্তে তুই ওই কাজ ছেড়ে দে। দরকার হলে না খেয়ে মরে যাবি, তাও পাকিস্তানিদের বাড়িতে কাজ করতে পারবি না।

যমুনার কথা শুনতে-শুনতে আমার ভেতরটা একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেছে। যমুনার বাবার জায়গায় নিজেকে যেন দেখতে পাই আমি। মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে বুয়ার কাজ করছে পাকিস্তানিদের ফ্ল্যাটে!

গম্ভীর গলায় বললাম, যমুনা, এই মুহূর্তে কাজটা তুমি ছেড়ে দেবে। তোমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে কাল সকালে আমার এখানে আসো। একটা সিঁড়ি নিয়ে আসতে বলবে।

যমুনার চোখে পানি এসে গেছে। চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল।

আমার খুব বড় ভরসার জায়গা ফরিদুর রেজা সাগর। 'ইমপ্রেস' গ্রুপের মালিকদের একজন। চ্যানেল আইয়ের এমডি। ফোন করে বললাম সাগরকে, বলল কালই পাঠিয়ে দাও।

যমুনার হাজব্যান্ডের নাম ফখরুল। ছোটখাটো দেহের অত্যন্ত নম্র-বিনয়ী ছেলে। সাগর তাকে আঠারো হাজার টাকা বেতনের একটা চাকরি দিলো। চাকরি পেয়ে জয়াকে নিয়ে ওরা দুজন এসে খুবই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল আমাকে।

যমুনাকে বললাম, কুড়িলের ওইদিকে আমার এক বন্ধু একটা স্কুল করেছে। আমি বলে দিচ্ছি। ওই স্কুলে তোমার একটা আয়ার চাকরি হবে। জয়াকেও ওই স্কুলে ভর্তি করে দিও। বেতন লাগবে না।

সাত মাস পরের কথা।

শনিবারের এক সকালে স্বামী-সন্তান নিয়ে যমুনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। এই সাত মাসে একেবারেই বদলে গেছে তার চেহারা। ফখরুল এবং তাদের দুজনেরই শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। পোশাকআশাক সুন্দর। জয়ার পরনে সুন্দর জামা। মাথার চুল বেশ বড় হয়েছে। দেখতে খুবই ভালো লাগছে বাচ্চাটিকে।

যমুনা বলল, আমরা খুব ভালো আছি স্যার। দুজনে মিলে পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার টাকা পাই। ছয় হাজার টাকা দিয়ে ছোট্ট একটা বাসা নিয়েছি। জয়া আমার সঙ্গে স্কুলে যায়, আমার সঙ্গেই ফিরে আসে। আমরা খুব ভালো আছি।

শুনে ভালো লাগল। ফ্রিজ থেকে একটা ক্যান্ডি বের করে জয়ার হাতে দিলাম।

জয়া বলল, আমি একটা গান শিখেছি। শুনবে? মাত্র একটা লাইন পারি।

মজা লাগল, বললাম, শোনাও।

জয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাখির মতো মিষ্টি কণ্ঠে গাইলো 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।

আমি মুগ্ধ হয়ে শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। □



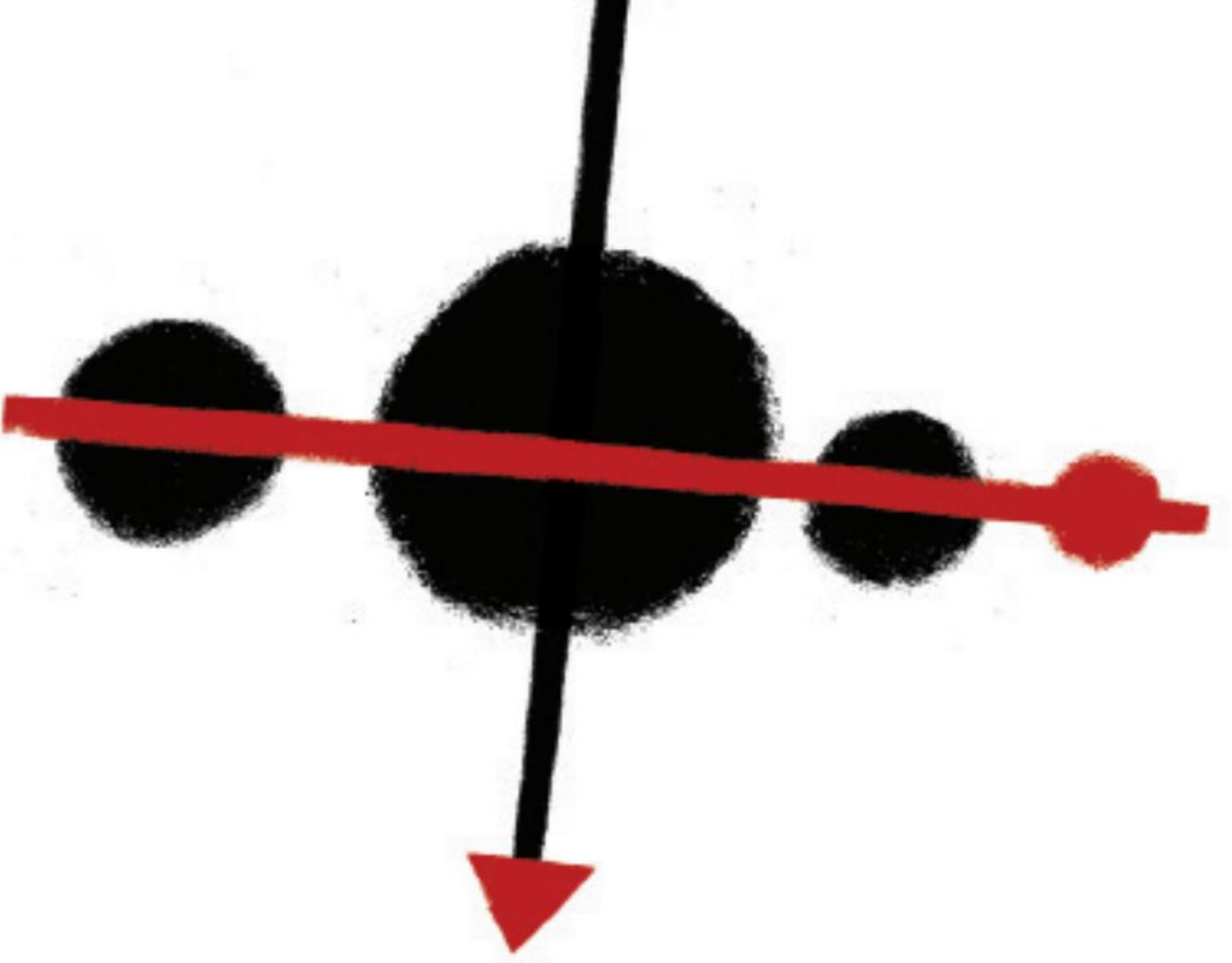
সম্মতি

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম



আসিফের ঘুম ভাঙল জানালার বাইরে মানুষের হইচই আর চিংকারের শব্দে। অনেক রাতে বিছানায় গেছে সে, শুয়ে-শুয়ে একটা সিগারেট খেয়েছে, ইয়ারফোন লাগিয়ে মোবাইলে গান শুনেছে, আর চোখের পাতা ভারী হওয়ার আগ পর্যন্ত পুলকিত মনে সন্ধ্যার ঘটনাগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করেছে। সন্ধ্যায় ইদ্রিস হাওলাদারের বাড়িতে দশজন মুরব্বির সামনে মেয়ে রোজিনার সঙ্গে আসিফের বিয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তিনি কথা দিয়েছেন ঈদের পরই অনুষ্ঠানটি সারবেন এবং দু-একদিনের মধ্যেই মেয়েকে মামাবাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনবেন। সবাইকে হাওলাদার আশ্বস্ত করেছেন, মেয়ে অসুস্থ মামিকে দেখতেই শুধু নবীনগর গিয়েছে; মেয়ে এই বিয়েতে সম্মত, এবং মেয়ের মন কাউকে কখনো দেয়নি, দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

হাওলাদারের দরজার বাইরে আসিফের দুই বন্ধু দাঁড়িয়েছিল, তাদের ডাকা হলেও ভেতরে যায়নি, যেমন বাড়িতেই ঢোকেনি গেটের বাইরে মোটরসাইকেলে বসা আরো দুই বন্ধু। তারা কথাবার্তায় অংশ



নিতে আসেনি, তাতে উৎসাহ পাওয়ার কথাও তাদের নয়। তাদের অভ্যাস আসিফের হয়ে অন্যের সম্মতি আদায় করা — যে-কোনো কিছুতে, যে-কোনো উপায়ে। আসিফের বাবা খোকন চেয়ারম্যান যাতে সম্মত, আসিফও তাতে সম্মত। তার চার বন্ধুও। এবং অন্যরা যাতে এই সম্মতির সঙ্গে গলা মেলায় সে-ব্যবস্থা করা তাদের অভ্যাস।

হাওলাদার তা জানেন। তিনি সম্মতি দিয়েছেন। তারপর বাড়ির অন্দরে খবর পাঠিয়েছেন মেহমানদের, মুরব্বিদের আপ্যায়নের আয়োজন শুরু করতে। আসিফ অবশ্য হাওলাদারের সম্মতিকেই যথেষ্ট আপ্যায়ন ভেবে মুরব্বিদের কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে। মুরব্বিরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছেন; তাদের কেউ-কেউ হাওলাদারের কষ্ট আর অপমানকে নিজেদের দীর্ঘস্থাসে একটা জায়গা করে দিয়েছেন। তারা জানেন সন্ধ্যাটা রোজিনার জন্য একটা বিভীষিকা হয়ে থাকবে। তাদের দুজন জানেন, রোজিনা তার মন দিয়ে রেখেছে কিসলুর করকমলে। কিসলু সুদর্শন ছেলে, গ্রামের একমাত্র এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার, যদিও তার চাকরি জেলা হাসপাতালে। তার সমস্যা তার বাবা। পেশায় জেলে ছিলেন। মাছ মারতে গিয়ে এক বিকেলে বাজ খেয়ে মরে গেলেন, কিসলু আর তার তিন বোনকে পথে বসিয়ে।

ও, এদের সঙ্গে কিসলুর মা-ও ছিলেন, তবে তার থাকা না-থাকায় পার্থক্য খুব একটা নেই, যেহেতু চার বছর আগে কোমর ভেঙে তিনি বিছানাতেই থাকেন।

তাহলে কিসলু ডাক্তার হলো কী করে, জিজ্ঞেস করলেন? আপনাদের বলি,

অলংকরণ : সব্যসাচী হাজরা

রোজিনা থামল। না, ভয়ে নয়,
মানুষের একটা ভয়াবহ ত্রুষ্ক দল
একজন মানুষকে পাঁজাকোলা করে
ছুটে আসছে পথ দখল করে।
সেজন্য। সে পথ থেকে একটু
নেমে জায়গা করে দিলো।

ইচ্ছাশক্তিটা যার থাকে কিসলুর মতো, সে ডাক্তার কেন, রকেটবিজ্ঞানীও হতে পারে। তবে তারাকাটা ইউনিয়নে রকেটবিজ্ঞানী হয়েও খুব একটা নিরাপদ কেউ থাকতে পারবে না, যদি না খোকন চেয়ারম্যানের সকল সম্মতিকে নিজের সম্মতি বলে সে মেনে নেয়। মাস তিনেক আগে চেয়ারম্যান শুনেছেন ইদ্রিস হাওলাদারের মেয়েকে ছেলে মনে ধরেছে। হাওলাদারের জমিজমা, টাকাপয়সা আছে, তবে মানুষের সম্মতি আদায়ে পারদর্শী লোকজন নেই। আসিফের পছন্দ চেয়ারম্যানেরও মনে ধরেছে। তবে তাতে সম্মত হয়নি রোজিনা আর কিসলু। রোজিনার বাবা যেহেতু জানেন, সম্মত না হলে মেয়ের (এবং তার নিজের) কপালে কী থাকতে পারে, তিনি মেয়েকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে চেয়ারম্যানকে সম্মতি জানিয়েছেন। আর মামাবাড়ি পাঠানোর আগে কাতরকণ্ঠে মেয়েকে বুঝিয়েছেন, সম্মতি না দেওয়ার পরিণাম কী হতে পারে।

তার চোখে পানি দেখে মেয়ে চুপ থেকেছে। তারপর মামাবাড়ি গেছে।

কিসলুর অবশ্য বাবা নেই যে তার হয়ে তিনি কিছু একটা করবেন। থাকলেও জেলে বাবার হাত কতটাই আর শক্ত, যে অসম্মতির বিপদ তিনি সামলাবেন? নদী আর বিলের বিপন্ন মাছগুলির বিপদ ডেকে আনা ছাড়া তার দুই হাত কারো গায়ে একটা টোকাও তো দিতে পারত না। কিসলু তার অসম্মতি নিয়ে জেলা শহরেই থেকে গেছে। তার পক্ষে গ্রামে আসা এখন ট্রেন আসার আগে রেললাইনে শুয়ে পড়ার মতো।

ভাগ্যিস তিনটি বোনের বিয়ে হয়েছে; তারা অন্য গ্রামে, অন্য ঠিকানায় আছে। বড় বোনটি মাকে নিয়ে রেখেছে তার ঠিকানায়, যেখান থেকে কিসলু তাকে উদ্ধার করে তার শহরের বাসায় নিয়ে যাবে। কিসলুর অবশ্য আরেক বিপদ। রোজিনার ব্যাপারটাতে চেয়ারম্যানের সম্মতির বাইরে গিয়ে সে না হয় ফেরারি, কিন্তু আসিফের এবং চেয়ারম্যানের চোখ যদি রোজিনার ওপর না-ও পড়ত, তাহলেও ইদ্রিস হাওলাদারের সম্মতিটাও সে হয়তো শেষ পর্যন্ত পেত না। কারণ তার বাবা। আরো নির্দিষ্ট করে, বাবার পেশা। তবে তাতে বিপদ খুব একটা হতো না। রোজিনা তো পা বাড়িয়েই আছে। দিনক্ষণ ঠিক হলে তার মামাতো ভাই আলিফকে নিয়ে শহরে কাজির অফিসে গিয়ে বিয়েটা সেয়ে নেয়া যাবে। তারপর অনন্তকালের মধ্যে নিশ্চয় হাওলাদারের মন মেয়ের জন্য নরম হবে, তার সম্মতিও মিলবে। সেই অনন্তকাল পর্যন্ত তারা জেলা শহরেই না হয় থেকে যাবে। তারাকাটায় না হয় না-ই যাবে।

মামাত ভাই আলিফ বলেছে রোজিনাকে, আপু, কিসলু ভাইয়াকে যেদিন দুলাভাই বলে ডাকব, সেদিন আমার মনটা শান্ত হবে। রোজিনা খুশি হয়ে তাকে একটা স্মার্টফোন কেনার পয়সা দিয়েছে।

স্মার্টফোনের কথায় মনে পড়ল, স্মার্টফোন রোজিনাও একটা কিনেছে, তাতে নতুন সিমকার্ড লাগানো। এই নাম্বারটি শুধু কিসলু জানে। আসিফ জানে না। কিসলুকে বলেছে রোজিনা, এই ফোনটাই তোমার-আমার মাঝখানের একটা সেতু। রোজিনা ঘর থেকে বের হয় না, জেলা শহরে যাওয়া তো দূরের কথা, যেহেতু বাড়ির বাইরে আসিফের সম্মতি আদায়কারী বন্ধুরা পাহারায় থাকে। তাই কিসলু যে বলেছে আলিফকে নিয়ে চলে আসো, বাকিটা ওপরওয়ালার হাতে, রোজিনা যায় কীভাবে?

ইদ্রিস হাওলাদারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসিফ গেছে তারাকাটা বাজারে। সেখানে শিপনের ওষুধের দোকানের পেছনে বসে তারা ডাইল খেয়েছে। সঙ্গে মার্লবরো সিগারেট। তারাকাটায় নতুন এসেছে এই সিগারেট, দামটাও চড়া। তাতে অবশ্য আসিফের কিছু যায় আসে না। আসিফকে বলেছে তার এক বন্ধু, জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করলে কেমন হয়?

বন্ধুটির মাথায় অপারেশন নবীনগর নামের একটা সিনেমা সক্রিয় হয়েছে, যার নায়ক, অবাক কাণ্ড, সে, আসিফ না। আসিফ বরং তার কৃপাপ্রার্থী।

আসিফ বলেছে, ইডিয়টের মতো কথা বলিস না। বাবা সেটা পছন্দ করবেন না। আমিও না। সে আমার জীবনসঙ্গী হবে, তার ওপর জোর

খাটাব না।

জোর খাটানো নয়, তবে সম্মতিটা আদায় করতে হবে। জোর যদি না খাটানোই গেল, তাহলে কীভাবে তা অসম্ভব?

বিছানায় শুয়ে আসিফের ভারী চোখেও একটা সিনেমার ছবি ভেসে উঠেছে, সিনেমাটার নাম তুমি আমার, যেখানে রোজিনার বাড়িতে আগুন লেগেছে, আর রোজিনা ঘরে আটকা পড়েছে, আসিফ দৌড়ে এসে তাকে উদ্ধার করেছে, পঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এসেছে। বাইরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় আসিফের গায়ে লেপ্টে থাকা রোজিনা বাতাবি লেবুর মতো চাঁদটির দিকে তাকিয়ে বলেছে, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ঘরের বাইরে হইচই, কোলাহল। আসিফ অবাক হলো, ঠিক শুনছে তো? এত সকালে এত শব্দ? এত মানুষ? সে বিছানার পাশের জানালাটা খুলল। জানালার বাইরে বাগান, ফুলের, ফলের। একটু দূরে পাঁচিল। পাঁচিলের বাইরে হল্লা। পাঁচিলের ভেতরে, বাগানের মাঝখান দিয়ে বসানো সিমেন্টের রাস্তায় কাজের লোকজন, পাইক-পেয়াদা। যে-কোনো দিন চেয়ারম্যানের বাড়িতে দশ-পনেরো জোয়ান থাকে। এরাও চিৎকার করছে।

আসিফ উঠল। দুহাতে লুঙ্গিতে গিট্টু মেরে, চুল সমান করতে করতে সে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু চেয়ারম্যানের দুই খাস লোকের একজন, বদি, তাকে আটকালো। বদি বলল, গ্রামে পুলিশ এসেছে।

পুলিশ? আসিফ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। পুলিশকে সে পছন্দ করে না, ভয়ই পায় বরং।

বদি তাকে বলল, পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য জমি দখল নিতে পুলিশ এসেছে। এখন যাকে দেখবে, ধরে নিয়ে যাবে।

আসিফ বুঝল, বিপদ। সে পাওয়ার প্ল্যান্টের ইতিহাসটা জানে। দুই বছর আগে তারাকাটার উত্তরে আশি একর খাস জমি লিজ নেয় হিরো কোল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়াও লাগিয়েছিল। আট-দশ ইউনিফর্ম পরা পাহারাদারেরও ব্যবস্থা করেছিল। তারপর আর কোনো খবর নেই। মাসদুয়েক আগে হঠাৎ এক জরিপের দল এসে হাজির। তারা নানা মাপজোখ করল। তারপর একদিন চেয়ারম্যানকে ডেকে নিয়ে গেল।

রাতে খেতে বসে চেয়ারম্যান তার তিন ছেলে আর দুই মেয়ে জামাইকে জানালেন, কোম্পানির জন্য আরো চল্লিশ একর জমি চাই। এই চল্লিশ একরের সবটাই তারাপুর ইউনিয়নের — তারাপুর আর মূলত ইন্দুয়া গ্রামের। কোম্পানি কিনতে চেয়েছে। চেয়ারম্যান জানালেন, তিনি সম্মতি দেননি। ওই চল্লিশ একরের তিন একর তারও কিনা।

আসিফের বড় ভাই আরিফ বলেছে, সম্মতি না দিলে তারা কি তা মানবে?

চেয়ারম্যান বলেছেন, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু তিনি সম্মতি দেবেন না, তার ইউনিয়নের কোনো মানুষও না।

সপ্তাহখানেক আগে চেয়ারম্যানকে থানায় ডেকেছে। তিনি সকালে গিয়ে দুপুরে ফিরে এসেছেন হাসিমুখে। বলেছেন, তার অসম্মতি বিবেচনা করে কোম্পানি চল্লিশের বদলে ত্রিশ একর কিনবে। ওই ত্রিশ একরে তার তিন একর নেই।

আসিফ অবাক হয়েছে, কোম্পানি-পুলিশের মতো ক্ষমতাবানদেরও বাবার সম্মতিতে মাথা দোলাতে হয়েছে।

বদি তাকে ঘরে থাকতে বলে বেরিয়ে গেছে। বদি উত্তেজিত। পুলিশের এক বাহিনী এসে কোনো সময় না দিয়ে মানুষজনকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। যারা বাধা দিয়েছে, তাদের পিটিয়েছে। কাজটা শুরু করেছে সাতসকালে, যখন মানুষ দিনের জন্য তৈরি হয়।

এক মহাবিপর্ষয়।

চেয়ারম্যান গেছেন বিষয়টার সুরাহা করতে। কিন্তু বদি শুনেছে, তাকে পুলিশ আটকে রেখেছে। কথাগুলি বলতে না বলতে বদির ফোন বেজেছে। ফোনে সে চিৎকার করেছে; তার চিৎকারে বাগানের আশপাশ

দিয়ে ঘুরতে থাকা দুই মোরগ কক কক করে উঠেছে। বদি উত্তেজিত গলায় বলেছে আসিফকে, আমার বউটাকে বাসা থেকে বের করে জিনিসপত্র ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। বদির ধারণা ছিল, সে শক্তিশালী। তাকে, তার পরিবারকে কেউ ছোঁবে না। বদি অবশ্য বোঝেনি, তারাকাটার কেউকেটাদের পুলিশ পরোয়া করে না। পুলিশের দুনিয়াটা তারাকাটা থেকে যেহেতু অনেকটা বড়।

দুই

খোকন চেয়ারম্যানকে থানায় নেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাকে বোঝানো হলো, আজ শুধু পুলিশ ভয় দেখিয়ে গেল। তাকে হুগা দুয়েক সময় দেওয়া হলো, তিনি যেন তারাকাটা-ইন্ডুয়ার মানুষজনকে বোঝান, কোম্পানি যে-দাম দেবে, মানুষ যেন তা মেনে নিয়ে জায়গা ছেড়ে দেয়। তা না হলে জমি যাবে, কিন্তু পয়সা পাওয়া হবে না।

আমও যাবে, ছালাও যাবে, থানার ওসি বললেন, এবং হাসলেন। হাসিটা বুকে বাজল চেয়ারম্যানের। এই হাসি তাকে বলছে, কোম্পানির কথা শোনো, কোম্পানির সম্মতি মাথায় নিয়ে গ্রামে যাও। কাজে নামো। কাজ হলে ভালো, না হলে দেখা যাবে।

রাতের খাবার খেতে বসে তিনি কথাটা তুললেন। বড় ছেলে আরিফ বলল, তাই হোক বাবা। আপনি মানুষকে বোঝান।

মেজ ছেলে আতিফ ঢাকায় থাকে। আবহাওয়া অফিসে চাকরি করে। তার আলাদা থাকতে, চাকরি করতে, তারাকাটায় না থাকতে, বউ-ছেলে নিয়ে নিউ মার্কেটে বাজার করতে ভালো লাগে। বাবাকে তার ভালো লাগে, যদিও তার অনেক কিছুই তার অপছন্দ। সে বলল, বাবা আমার সঙ্গে ঢাকা চলেন। তারাকাটা আপনার জন্য নিরাপদ নয়।

চেয়ারম্যান হাসলেন। বললেন, মানুষগুলা জমি ছেড়ে দিলে যাবে কোথায়?

তিন ছেলেই অবাক হলো। কথাগুলো বাবা বলছেন? খোকন চেয়ারম্যান বলছেন? মানুষকে জমি ছাড়া করে যিনি ওই তিন একরসহ পাঁচ একরের মালিক হয়েছেন? আসিফ বুঝল, বাবার কথায় আর পুলিশ বা কোম্পানি কেউ সম্মতি জানাচ্ছে না, এজন্য তার গলা নরম হয়ে গেছে। বাবার রাজত্বের দিন কি তাহলে শেষ? সে দেখেছে বদির মতো কঠিন মানুষও মিইয়ে গেছে। আসিফকে বদি অনুরোধ করেছে, চেয়ারম্যান সাহেবকে বলে যেন এক টুকরা জমির বন্দোবস্ত করে দেয়। ঘর সে নিজেই তুলবে।

অর্থাৎ পুলিশের লাঠির বাড়িতে বদির সাহস এতটাই গেছে, চেয়ারম্যানকে এই অনুরোধটাও নিজে সে করতে পারছে না।

তিনদিন পর কোম্পানির লোকজন এলো। মানুষের সঙ্গে কথা বলল। চেয়ারম্যানের বাড়িতে এসে জানাল, মানুষজনকে বাজারদর থেকে বেশিই দর দেবে জমির জন্য। তবে দেরি করলে চলবে না। পাওয়ার প্লান্টের কাজ দ্রুতই শুরু হবে। চীন থেকে ইঞ্জিনিয়াররা আসবে। তাদের জন্য দালান ওঠাতে হবে।

আসিফ দেখল, সকাল থেকে মানুষ এসে ভিড় করে, চেয়ারম্যানের কাছে ফরিয়াদ জানায়। চেয়ারম্যান একদিন তাদের বলেছেন, এমপি সাহেব কোম্পানির সঙ্গে আছেন, এমপি সাহেবের ছেলেও আছে, যেহেতু সে একটা বড় কাজ পেয়েছে। এখন তার কিছুই করার নেই।

এখন ওপরওয়ালা যদি দয়া করেন, খোকন চেয়ারম্যান বলেছেন।

আসিফের মনটা খারাপ হয়ে গেল। না, মানুষের দুগুণে না, তার মন খারাপ হলো বাবার অসহায় মুখটা দেখে। বাবাকে সে জন্ম থেকে দেখেছে উঁচুমাথার মানুষ। একসময় তারাকাটা বাজারে আড়ত ছিল তার। কৃষিজমি ছিল। বরাবরই অবস্থাপন্ন, সে-কারণে মাথাটা উঁচু রাখতে পারতেন। তারপর ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বর হলেন, চেয়ারম্যান হলেন, মাথাটা উঁচুতেই রেখে দেওয়ার অবস্থা তৈরি হলো। আসিফ স্কুল-কলেজ পাশ করেছে, বিএ পর্যন্ত পড়েছে। তারপর পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে বাজারের আড়ত আর অন্যান্য ব্যবসায় আরিফের সঙ্গী হয়েছে। কিন্তু আরিফ যেখানে শুধু ব্যবসাপাতি ইত্যাদি নিয়ে থাকে,

আসিফ সেখানে রাজনীতিতেও নেমেছে। বাবার রাজনীতি সেও করে। আরিফ আপত্তি করেনি, সে জানে, পরিবারের একজনকে বাবার সঙ্গে থাকতে হবে। থাকটা জরুরি। কিন্তু আরিফ খেয়াল করেনি, বাবার মতো অন্যের সম্মতি আদায় করাটা আসিফেরও একটা নেশা হয়ে গেছে।

একদিন আতিফ বলেছে আরিফকে, যদি তারাকাটায় বাবার শক্ত কোনো প্রতিপক্ষ থাকত, তার যেমন বিপদ হতো, আসিফেরও হতো। হয়তো বেশিই হতো। তাদের কপাল ভালো, তারাকাটায় বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই।

এজন্য ইদ্রিস হাওলাদারের মতো মানুষরাও খোকন চেয়ারম্যানের সকল কথায় মাথা নাড়েন; কিন্তু এরকম কি সারাজীবন থাকবে?

রোজিনার সঙ্গে যেদিন বিয়ের কথাবার্তা পাকা হলো ইদ্রিস হাওলাদারের বাড়িতে, আতিফ ইচ্ছা করেই তাতে যোগ দেয়নি। যদিও সেদিনই ঢাকা থেকে এসেছিল সে। মাথাব্যথার দোহাই দিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল। আরিফ ফিরে এসে যা বলেছিল, তাতে আতিফের খুব খারাপই লেগেছিল। সে বলেছিল আরিফকে, বিশেষাদিতে জোর খাটানো কি ঠিক ভাইয়া?

আরিফ নিচু গলায় বলেছিল, বাবার ইচ্ছা।

আতিফ ঢাকা ফিরে যাওয়ার আগে আসিফকে শুধু বলেছিল, মেয়েটা যদি নিজ থেকে রাজি না হয়, আমি তোর বিয়েতে আসব না।

আসিফ হেসে বলেছিল, যদি না হয় মানে কি, সে তো এখনই রাজি।

কথাগুলো বলতে-বলতেই আসিফ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, রোজিনার সঙ্গে সে নবীনগর গিয়ে দেখা করবে। কোনো জোর খাটাবে না, শুধু রোজিনাকে সম্মত করাবে। আর একটা ফোন দিয়ে বলবে, আমি প্রতিদিন দুই বেলা ফোন করব, ফোনটা ধরবে। কথা বলব।

তাতেও সম্মত করাবে রোজিনাকে।

ফোনটা সে আগেই কিনে রেখেছে। স্মার্টফোন।

তিন

কিন্তু তারাপুরের ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকল। এক দুপুরে কোম্পানির লোকজনের ওপর হামলা হলো। পুলিশ এসে প্রথমে ধরপাকড় করল, পরে লাঠি চালাল, আরো পরে টিয়ারগ্যাস আর গুলি মারল। সোবহান মাঝি গুলিতে মরল। সোবহান মাঝির বয়স ৭২, মুখে একটাও দাঁত নেই। মাথায় একটাও চুল নেই, শুধু সাদা দাড়ি বুক সমান।

এবার খবরের কাগজের আর বড়-বড় ক্যামেরা কাঁধে টেলিভিশনের লোকজন এসে হাজির হলো। এদের দেখে তারাকাটার মানুষ ক্ষিপ্ত হলো। তারা ঘোষণা দিলো, জান দেবে, জমি দেবে না। মানুষ আশা করেছিল খোকন চেয়ারম্যান তাদের সঙ্গে থাকবেন, কিন্তু চেয়ারম্যান অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে থাকলেন। মানুষ দুদিন তার অসুস্থতা মেনে নিল, কিন্তু তৃতীয় দিন বাড়ি গিয়ে তাকে সাদা লুঙ্গি-গোঞ্জি পরে ঘরের বারান্দায় বসে হুঁকা খেতে দেখে মানুষ গেল ইদ্রিস হাওলাদারের কাছে। হাওলাদারের কিছু জমি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তার বেরিয়ে আসার কারণ সেটি নয়, কারণ রোজিনা। রোজিনা তাকে বলেছে, প্রতিবাদ করতে হবে বাবা। বসে থাকলে চলবে না।

আপনাদের বলা হয়নি, পুলিশ গ্রামে হামলে পড়ার পরদিনই রোজিনা ফিরে এসেছে। কিসলুকে ফোন করে বলেছে, টিভিতে দেখেছি, এই পাওয়ার প্লান্ট বসলে তারাপুর ইউনিয়নের সব কৃষিজমি নষ্ট হবে। পানির ঘাটতি হবে, আমাদের বিলসা নদী তো শুকিয়ে কবেই বুড়ো হয়ে গেছে।

রোজিনা কিসলুকে আরো খোঁজখবর নিতে বলেছে। তৈরি হয়ে আসতে বলেছে।

কিসলু অবশ্য তৈরিও হয়নি, তারাকাটাতেও আসেনি। তার ডাক্তারি কাজ তাকে এক মিনিট বাড়তি সময় দেয় না। এমনকি টিভি দেখার সময়টাও সে পায় না। আর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যে কথা বলবে, কার সঙ্গে? সে কাউকে চেনে না। পরিবেশ দূষণ ব্যাপারটা নিয়েও সে ভাবেনি। তাছাড়া, তারাকাটা গেলে আসিফের লোকজন তাকে কতটা কী করবে, সে-হিসাবটাও মাথায় রাখতে হয়। সে ফোনে এই তো, আসছি,

ইত্যাদি বলে সময় কাটায়।

কিন্তু কাটাবার জন্য সময় বসে থাকে না। তারাকাটায় সময় ঘোড়ার মতো চলছে। এক সকালে পাঁচ হাজারের মতো মানুষ ঘিরে ফেলল হিরো কোল থারমাল কোম্পানির জমি। যে দশ-বারো পুলিশ ও পাহারাদার ছিল, তারা ভয়ে পালাল। মানুষ হিরো কোম্পানির যা সামনে পেল — পাকা দালান হলে পাকা দালান, কাঁটাতারের বেড়া হলে কাঁটাতারের বেড়া, সব গুঁড়িয়ে দিলো।

খবরের কাগজ, টিভি এলো, পরিবেশবাদীরা সেই ঢাকা থেকে এলেন, তারাকাটা থেকে লাইভ শো হলো টিভিতে। পরিবেশবাদীরা বললেন, কিছুতেই পাওয়ার প্লান্ট বসানো চলবে না, পরিবেশের তাতে বারোটা বাজবে, জমি নষ্ট হবে। ইত্যাদি। ইদ্রিস হাওলাদারকে প্রশ্ন করলেন সম্ভবলক। হাওলাদার বললেন পরিবেশ-টরিবেশ বুঝি না, মানুষের জমি নেওয়া চলবে না। সরকার চাইলে খাস জমিতে বসাক পাওয়ার প্লান্ট, কিন্তু মানুষের জমিতে নয়।

সম্ভবলক বললেন, আপনি তো প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা। আপনি কেন পাওয়ার প্লান্ট চাইবেন, এমনকি সরকারের জমিতেও?

হাওলাদার বোকার মতো তাকালেন। আমি নেতা হব কেন? আমি তো এই মানুষদের একজন।

বাবাকে বোকা বনতে দেখে রোজিনা এগিয়ে এলো। সে বলল, আমার বাবা নেতা নন, এখানে কেউ নেতা নন। এখানে যারা তারা সবাই ভুক্তভোগী। বাবা শুধু মানুষের প্রতিবাদের ভাষাটাই প্রতিধ্বনিত করছেন।

সম্ভবলক পুলকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি আছেন এই প্রতিরোধ-আন্দোলনে?

রোজিনা বলল, আপনিও আছেন, আপনাকেও থাকতে হবে, যেহেতু এটি আমাদের সকলের জীবন-মরণ সমস্যা।

সম্ভবলক বিমোহিত হয়ে বললেন, আমাদের দর্শকদের জন্য একটু কি বুঝিয়ে বলবেন?

উৎসাহ পেয়ে রোজিনা পরিবেশ চিন্তার ওপর একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে দিলো। কিসলুর ‘আসছি আসব, দিচ্ছি দিব’ তাকে বিরক্ত করেছে। সে তার স্মার্টফোনে গুগল আর পরিবেশবাদীদের নানা লেখালেখি ঘেঁটে যা জেনেছে, সহজ করে তাই বলল। ডিগ্রিওয়ালা পরিবেশবিদদের অপেক্ষায় রেখে রোজিনাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সম্ভবলক। তার প্রত্যয় জন্মাল, এই মেয়েটি তার টিআরপি রেটিং বাড়িয়ে দেবে।

একটু দূরে থেকে রোজিনার কথা শুনছিল আসিফ। এই কদিন, সত্যি বলতে কি, রোজিনাকে সে ভুলেই গিয়েছিল। বাবাকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা — এক সময়ের পরাক্রমশালী বাবা ঘরে বসে থাকেন, অসুস্থতার ভান করে। বিষয়টা আসিফকে পীড়া দেয়। সে অবশ্য বোঝে, বাবার পরাক্রমের দিন শেষ। এমপির ছেলে নাইমুল এখন বাবাকে গিলে খেতে পারে। আসিফ আরো ব্যতিব্যস্ত বদির কারণে — বদির মাথাটা খারাপ হয়েছে, আবোল-তাবোল বকে। তার চার বন্ধুর দুই বন্ধুকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল নাইমুল, সেই নাইমুলের বাড়ি শিমুলিয়া। ওরা এখন নাইমুলের সঙ্গেই আছে।

মাত্র কয়েকটা দিন, আসিফ ভাবে, অথচ চেনা দুনিয়াটা কীভাবে পালটে গেল। যেন ভোজবাজি।

রোজিনার কথা শুনতে-শুনতে তার মনে হলো, এরকম করে কথা বলতে কাউকে সে শোনেনি। তার মা হয়তো বলতেন, কিন্তু মাকে এখন মনে পড়ে একটা দূরের অস্পষ্ট ছবির মতো। ছোটবোন সেলিমা হওয়ার সময় তিনি চলে গেলেন। সে কতদিনের কথা।

মা থাকলে তাকে কী বলতেন, হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন তার মনে এলো। কেন, সে বলতে পারবে না। অনেক ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিল, রোজিনার সঙ্গে একটু কথা বলবে। মায়ের কথাটা বলবে। জোর খাটানো মা পছন্দ করতেন না; এবং মা চাইতেন, মানুষ তার কথা শুনুক। কারণ তিনি সবার মঙ্গলের জন্য কথা বলেন।

এই চিন্তা ধক্কে ফেলল আসিফকে, কারণ মা তাকে এসব বলেননি। কাকে বলেছিলেন তাহলে? কে তাকে বলল? তার মনে পড়ল আরিফ

তাকে একদিন বলেছিল, মা চাইতেন, সবাই যেন পড়ালেখা করে মানুষ হয়। সে যে পড়ালেখা তেমন করতে পারেনি, তা তাকে কষ্ট দেয়। সেজন্য আরিফ মানুষ হতে চেষ্টা করেছে। সেজন্য বাবার মতো রাজনীতি করতে নামেনি।

চার

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রোজিনা টের পেল, কেউ তার পেছন-পেছন হাঁটছে। সে থামল। থেমে পেছনে না তাকিয়ে বলল, আমার পেছন নিয়েছেন কেন?

রোজিনা বুঝেছে, কে তার পেছন নিতে পারে।

পা চালিয়ে রোজিনার পাশে এসে দাঁড়াল আসিফ, বলল, একটা কথা বলব, শুনবে?

রোজিনা চুপ করে রইল।

আসিফ বলল, শুনেছ নিশ্চয়, তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম? তোমার বাবা তো রাজি হয়েছেন।

রোজিনা হাসল, বলল, বিয়েটা তো বাবা করছেন না। তাই না?

আসিফ একটু থেমে বলল, জানি তোমার আপত্তি থাকবে, কারণটাও জানি; কিন্তু একটু ভাববে কি?

আপনি যদি আমার আপত্তির কারণটাই জানেন, এ-ও নিশ্চয় জানেন, এখানে ভাবাভাবির কিছু নেই। আপনার বাবা আমার বাবাকে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করেছেন, আপনিও গুল্লা লাগিয়ে রেখেছেন, এসব কি ঠিক?

আসিফ হাসল। জোর খাটাব না, কিন্তু তুমি রাজি হবে, আমার বিশ্বাস।

রোজিনাও হাসল, কারণ তার হঠাৎ মনে হয়েছে লোকটা শুধু বদই না, মোটা মাথারও। না হলে এরকম কথা কেউ বলে?

রোজিনা হঠাৎ বলল, শুনুন, আমি যদি বলি আপনি আমার কথাতে রাজি হবেন, আমি জোর খাটাব না। তাহলে কথাটা কেমন শোনাবে?

কোন কথা? আসিফ জিজ্ঞেস করল।

রোজিনা হাসল। লোকটা সত্যি মোটা মাথার। বাংলাও বোঝে না। তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। কয়েক সেকেন্ড ভেবে সে বলল, যেমন ধরুন এই পাওয়ার প্লান্ট যাতে না হয়, সেজন্য কাজ করুন, প্রতিরোধ আন্দোলনে নাম লেখান।

রোজিনার কথাগুলো একটা বাচ্চা মেয়ের কথার মতো শোনালা আসিফের কাছে। সে মুখে হাসি ধরে রেখেই বলল, যদি তোমার কথায় রাজি হই, তুমি রাজি হবে আমার কথায়?

রোজিনার ধৈর্য চলে গেল। আপনি আসলেই মোটা মাথার একটা লোক, সে বলল, আর বদ। আপনার মতো মানুষের সঙ্গে কথা বলাটাও সময়ের বাজে খরচ।

আসিফের মাথায় রাগ চড়ে এলো। কিন্তু সে নিজেকে সংবৃত্ত করল। তার মনে হলো, কথা বলাটা তার জন্যও সময়ের অপচয়।

খোকন চেয়ারম্যান নিস্তেজ হয়ে যেতে পারেন, আসিফ মিয়াজি নিস্তেজ হওয়ার মানুষ না।

সে নিজেকে বলল, আর কটা দিন। পাওয়ার প্ল্যান্টের ঝামেলাটা মিটুক। তারপর দেখা যাবে।

পাঁচ

বাড়ি ফিরে রোজিনা তার বাবার সঙ্গে বসল। হাওলাদার মাত্র ফিরেছেন, ঘামছেন। প্রতিরোধ-আন্দোলনের নেতা বনে যাওয়াটা তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু তার কোনো উপায় ছিল না, ইউনিয়নের মানুষ ঠেলে তাকে সামনে এনেছে। তারপর তিনি পড়েছেন মিডিয়ার হাতে। এখন ঢাকা থেকে ফোন করে পত্রিকা তার সাক্ষাৎকার চায়। বিবিসি রেডিও নিতে চায় তার এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। এটা ঠিক কী, বুঝতে না পেরে তিনি বলেছেন সন্ধ্যায় যোগাযোগ করতে।

মেয়ের সঙ্গে তারও কথা বলতে হবে। এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউটা কী, এটি মেয়ে হয়তো বলতে পারবে। ভীষণ পড়ুয়া তার মেয়ে।

রোজিনা প্রশ্ন করল আগে। জিজ্ঞেস করল, কেন তিনি চেয়ারম্যানকে বললেন না, কিসলুর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

হাওলাদার অবাক হলেন।

চোখে বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলেন বিয়ে ঠিক হয়ে আছে?

রোজিনা মাথা নাড়ল।

এ বিয়েতে তো আমি সম্মতি দেব না, মা, তিনি বললেন।

কেন?

হাওলাদার চুপ করে থাকলেন।

কিসলুর বাবা মাছুয়া ছিলেন, সেজন্য? গলায় শ্লেষ ঢেলে জিজ্ঞেস করল রোজিনা।

কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে গেলেন হাওলাদার। তার বিরক্তি হলো। মেয়ে বেয়াদব হচ্ছে, জেলের ছেলে কিসলুটাই লাই পাচ্ছে। আর, ধুলুরি, এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউটা কী জিনিস, জানা হলো না।

ছয়

জানার প্রয়োজনও হলো না, কারণ সন্ধ্যায় গ্রামে পুলিশ নামল। হাওলাদারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল। তবে তার সঙ্গে ব্যবহারটা খারাপ করল না। খারাপ ব্যবহারের শিকার হলো বদি। সে এত মার খেল যে, তাকে পুলিশকেই ভ্যান জোগাড় করে হাসপাতালে পাঠাতে হলো।

যদি জানতে চান, বদি তার স্ত্রীকে প্রথম দিন পুলিশ গালিগালাজ করায় আজ তার বদলা নেওয়ার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করতে গিয়েছিল।

যদি আরো জানতে চান, বদি পথেই ভ্যান গাড়িতে মারা গিয়েছিল। মারা যাওয়ার মুহূর্তে বদি দেখেছে, স্ত্রী তার মাথার পাশে বসে তাকে আদর করছে, পানি খাওয়াচ্ছে। বদির তাই মনে হলো না যে সে মারা যাচ্ছে। এজন্য কিনা, ময়নাতদন্তওয়ালা ডাক্তার তার মুখে একটা হাসি দেখে চমকে উঠেছিলেন।

বদির মৃত্যু, অথবা হাওলাদারের গ্রেফতার, অথবা কোম্পানির পালিয়ে যাওয়া পাহারাদারদের পুলিশ পাহারায় ফিরে এসে বদলা নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা, কারণ যা-ই অথবা যতটা হোক, একটা বিস্ফোরণের বারুদ হিসেবে কাজ করল এর সবই। ছোটবেলা আমি, এই অধম গল্পকার, অবাক হয়ে দেখতাম, মা রান্নাঘরের একখানে মাছ কেটে রেখেছেন, অন্যখানে রেখেছেন কাটা সবজি, বাটা মসলা। ক্ষিধা নিয়ে তাকাইতাম, আর ভাবতাম, এসব একখানে করে কীভাবে একটা তরকারি হবে। মনে হতো অসম্ভব। কিন্তু মা ক্ষিপ্ত হাতে রান্না চড়াতে। তাতে পেঁয়াজের সময় পেঁয়াজ, নুনের সময় নুন, মাছের সময় মাছ কড়াইতে পড়ত। আধাঘণ্টা পর সুগন্ধ ছড়ানো, জিবে জল নিয়ে আসা নিটোল তরকারি আমাকে ডাকত। বলত, আমি তৈরি। আমার মনে হতো, মার কুশলতাটা এক অপার্থিব রসায়নবিদ্যা।

তারাকাটাতেও আলাদা-আলাদা উপাদানগুলি কখন একখানে হয়ে যে একটা রসায়নের সূত্রপাত করল! আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, চল্লিশ ঘণ্টার কম সময়ে একটা বিপ্লব হয়ে গেল।

বিপ্লবের দিন সকালেও হইচই-চৈচামেচিতে ঘুম ভাঙল আসিফের। তবে, আজ সে লাফ দিয়ে উঠল। গত রাতে বাবার সঙ্গে তার তর্ক হয়েছে। জীবনের প্রথম তর্ক, কিন্তু তর্কটা যেন অবধারিত ছিল। রাতে খেতে বসে আসিফ শুধু বলেছিল, বাবা, আপনি একটু বেরোন না, মানুষ আপনাকে চায়।

চেয়ারম্যান ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আমি অসুস্থ।

একথা শুনে আসিফ নিশ্চয় একটু হেসেছিল।

তাতেই চেয়ারম্যানের গলা বাজের শব্দে ফাটল। বেয়াদব, তিনি বললেন, এখন শ্বশুর অ্যারেস্ট হয়েছে বলে আমাকে মাঠে নামাচ্ছ? আমার অসুস্থ শরীর নিয়ে ওই ল্যাংড়াটাকে ছাড়িয়ে আনতে যাব?

ল্যাংড়াটা মানে হাওলাদার, যদি জানতে চান। তিনি একটু পা টেনে হাঁটেন, গাছ থেকে পড়ে সেই কবে একটা পা যাচ্ছেতাই জখম হয়েছিল কিনা, সে জন্য।

আসিফ সিদ্ধান্ত নিল, সে বেরোবে। তার চার বন্ধুর শেষ দুই বন্ধুও মোটরসাইকেলসমেত নাইমুলের দলে যোগ দিয়েছে। এতে আসিফের বুকে হাহাকার বাজছে।

সাত

রোজিনা ফোন করেছে — ফোনের পর ফোন করেছে, এবং কিসলুকে আকুল আহ্বান জানিয়েছে তারাকাটাতে আসতে। পুরো ইউনিয়ন জ্বলছে, সে বলেছে, এখন জেগে ওঠার সময়। পাওয়ার প্লান্ট সব শেষ করে দেবে, একে রুখতে হবে। কিন্তু কিসলুর ওই একই কথা, ‘আসছি।’ অথবা ‘এসে পড়লাম বলে’। হাওলাদার গ্রেফতার হওয়ার রাতে সে জানাল, তিনদিনের সেমিনারে ঢাকার পিজি হাসপাতালে তাকে যেতে হবে। এ এক বিরল সৌভাগ্য! সিভিল সার্জন স্যার যাচ্ছেন!

উদ্বেজনা তার গলা কাঁপল।

রাতটা খুব ফাঁকা মনে হলো রোজিনার।

সকাল দশটায় ঘরে বসেই বন্দুকের গুলির শব্দ শুনল রোজিনা। সারারাত প্রায় জেগেই ছিল সে। বাবা রাতে ফিরেননি, তাকে থানায় নেওয়া হয়েছে। জেগে-জেগে ভোরের দিকে ঘুমিয়েছিল। গুলির শব্দের আগেই অবশ্য ঘুম ভেঙেছে। করিমা বুয়া উদ্বেজিত গলায় তাকে জাগিয়ে বলেছে, গ্রামের মানুষ কোম্পানির জায়গা ঘেরাও করতে গেছে। সে শুনেছে এক ট্রাক পুলিশ এসেছে।

কাপড় বদলে রোজিনা ছুটল কোম্পানির দিকে।

মানুষ ছুটছে। সামনে, পেছনে, ডানে, বাঁয়ে। মানুষ আতঙ্কিত, জ্বুন্ধ। তীব্র হইচই। উন্মত্ত চিৎকার, ভয়াব্র চিৎকার। পুলিশ পাহারাদারের গর্জন। গুলির শব্দ। কোনটা ফাঁকা, কোনটা ভরাট, জানার উপায় নেই।

অনেক লোক বলেছে রোজিনাকে, ওই দিকে যাবে না/ যাবেন না। খবরদার, ওরা শেষ করে দেবে।

রোজিনা থামল। না, ভয়ে নয়, মানুষের একটা ভয়াব্র জ্বুন্ধ দল একজন মানুষকে পঁজাকোলা করে ছুটে আসছে পথ দখল করে। সেজন্য। সে পথ থেকে একটু নেমে জায়গা করে দিলো। একজনকে জিজ্ঞেস করল। কে মানুষটা?

আসিফভাই।

আসিফ!

কী হয়েছিল?

আমাদের সামনে ছিল, আমাদের হয়ে চিৎকার করছিল। গুলি বুকে লেগেছে।

লোকগুলোর সঙ্গে রোজিনাও ছুটল।

একটা বাড়ির টুঙ্গিঘরে ঢুকে পড়ল মানুষ। বাড়ির লোকজন ছুটে এলো। তারা প্রথমে ভয় পেয়েছিল, পরে রক্তাক্ত আসিফকে দেখে কর্তব্যবোধ জাগল তাদের। একটা খাট পাতা ছিল, তাতে শোয়ানো হলো আসিফকে। বাড়ির লোকজন ছুটল পানি, গামছা এসবের ব্যবস্থা করতে।

আসিফের বুক ভেজা রক্তে। জামাটা কেন জানি ছেঁড়া, তাতে বুকের ক্ষতের উঁকিটা দেখা যায়। তার চোখ বোজা। বোঝাই যাচ্ছে, সময় শেষ হয়ে আসছে তার।

আসিফের বোজা চোখ দেখে কান্না পেল রোজিনার। সে বিছানার পাশে বসে তার কপালে হাত রাখল। আসিফ, আস্তে করে সে ডাকল।

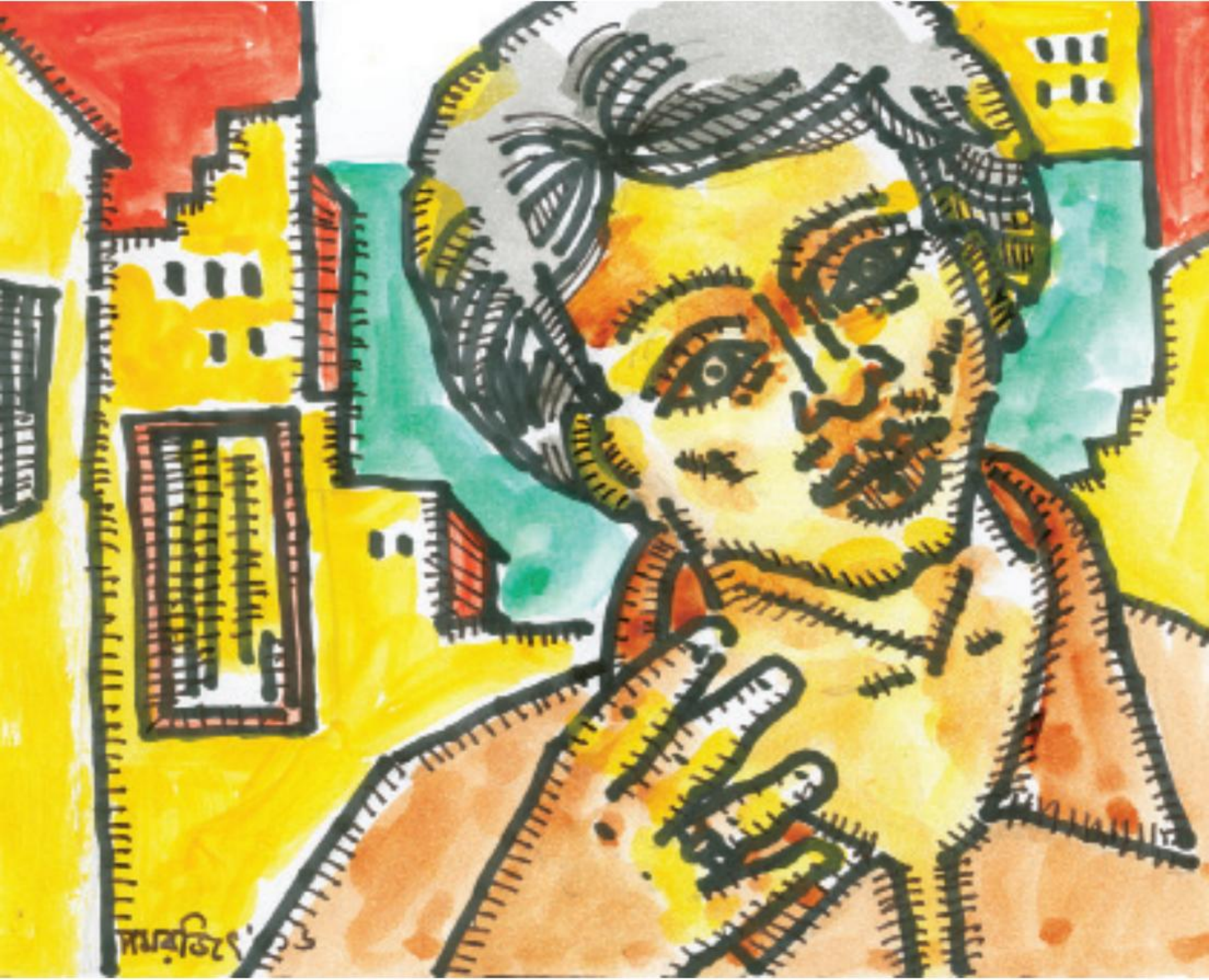
দুবার ডাকার পর আসিফের চোখটা নড়ল। একটা ঝিলিমিলি দেখা গেল বোজা চোখে — সে-দুটো অঙ্গ খুলল, যেন অনেক কষ্টে কেউ বাড়ির বাইরে ডাকতে আসা বসন্তের ভোরটাকে দেখার জন্য বন্ধ জানালা খুলছে।

রোজিনাকে দেখল সে দুই নরম চোখ। তাতে ওই দুই চোখের ঝিলিমিলিটা আরেকটু হয়তো বাড়ল। রোজিনার দিকে তাকিয়ে এবার শরীরের শেষ শক্তি বিন্দুগুলি এক আজলা পানির মতো তুলে সে বলল, আমাকে তোমার কথায় রাজি হতে বলেছিলে, রোজিনা, আমি তো রাজি।

আসিফের চোখ বন্ধ হওয়ার আগে তার একটা হাত তার হাতে নিয়ে একটুখানি চাপ দিলো রোজিনা। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে একটা কিছু বলল, যা শুনে চোখে ঝিলিমিলি নিয়েই ঘুমাতে গেল আসিফ।

রোজিনা কী বলেছিল মানুষের শব্দে তা শোনা মুশকিল ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হলো, রোজিনা বলছে, আমিও রাজি, আসিফ। বা এই রকম কিছু।

যাই হোক। □



বরষ ধরা মাঝে

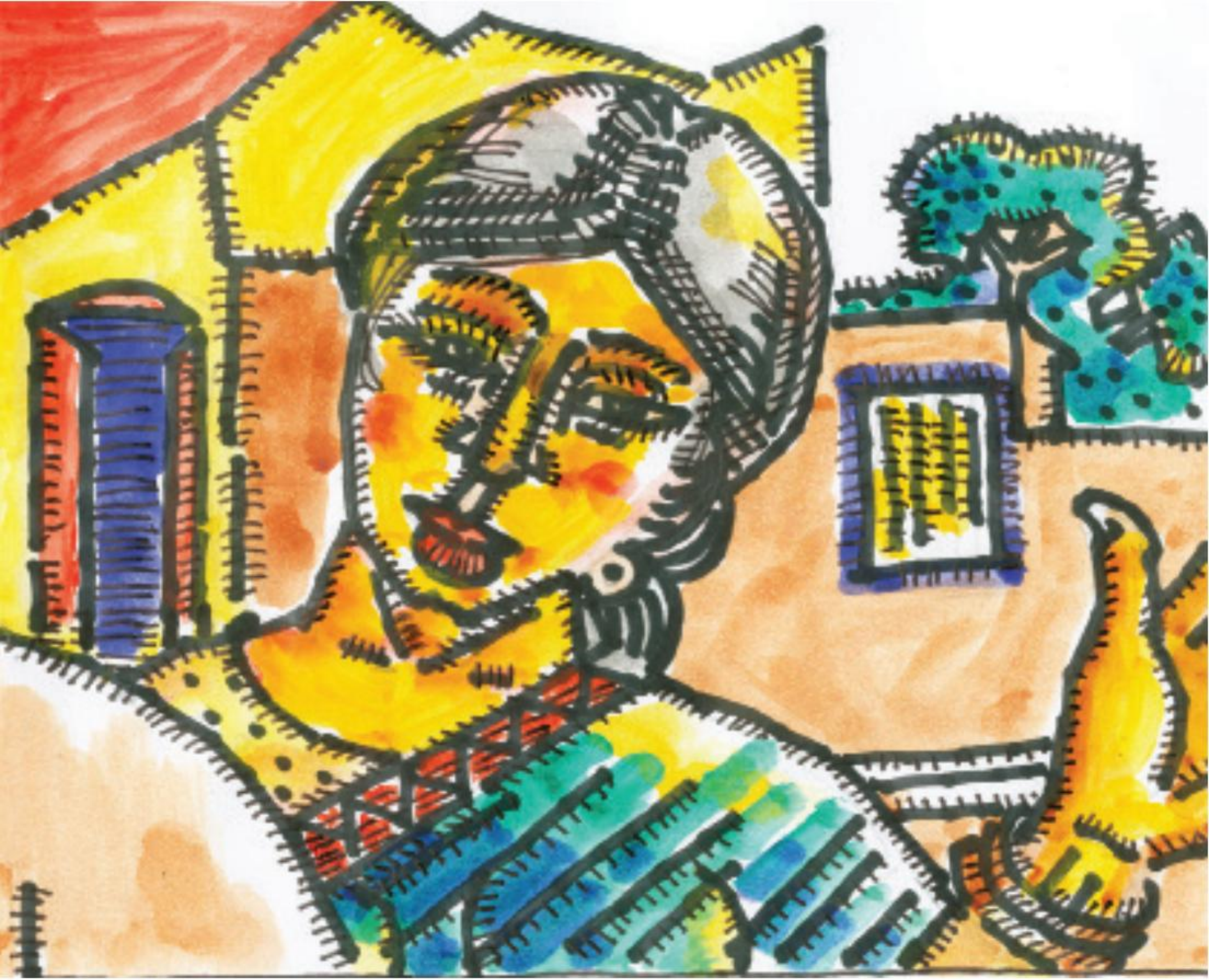
পূরবী বসু



মানিকের আকাশের সবকটি তারা একসঙ্গে দপ করে নিভে গেল।
দুহাত দিয়ে ঘোর আঁধার হাতড়িয়েও মানিক দিশা পায় না। ঠাহর করতে পারে না
সামনের দরজাটা ঠিক কোন দিকে। খুঁজে না পেয়ে একরকম ব্যর্থ হয়েই যেন বাইরে
বেরোবার বদলে আবার ঘরের ভেতরেই ফিরে আসে মানিক।

মাঘ মাসের বিকেল চারটা। ঝকঝকে রোদ্দুরে চোখে কিছুটা ধাক্কা লাগে বুঝি তার। চেনাজানা
পৃথিবীটা হঠাৎ কেমন অপরিচিত ঠেকে। সবকিছুই নতুন মনে হয়। কিষ্কিৎ ধোঁয়াশেও বটে। তবে
এইসব কোনো কিছুর ভেতরেই আজ, অন্যদিনের মতো, আনন্দের কিছু কণা চিকমিক করে জ্বলে ওঠে না।

ঝিলপাড়ার এই অতিচেনা ঘরখানা মুহূর্তের জন্যে একবার দুলে উঠেছিল মানিকের চোখের সামনে।
কিন্তু ভালো করে চারদিকে লক্ষ করার পর সে নিশ্চিত হয়, সবকিছুই স্বস্থানে রয়েছে। ঘরের প্রতিটি
জিনিসের অনড় অবস্থান আর সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ প্রশান্ত মুখাবয়ব নিয়ে সালমা বানুর ঘরের মাঝখানটাতে



অলংকরণ : সমরজিৎ রায় চৌধুরী

ওভাবে সটান দাঁড়িয়ে থাকা মানিককে আশ্বস্ত করে, এটা ভূমিকম্প ছিল না। তবু কেন জানি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

তুমি ঠিক আছো তো মানিক?

সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়ে মানিকের মুখের দিকে ভালো করে নজর দেন সালমা বানু। উদ্ভিন্ন কণ্ঠে জানতে চান সবকিছু ঠিক আছে কিনা।

হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। একদিকে ঘাড় কাত করে নিজেকেই যেন নিজে বোঝাতে চেষ্টা করে মানিক যে, সে ভালো আছে।

মানিক সোজা হয়ে বসে চেয়ারটিতে। পিঠটা হেলান দিয়ে। হাসার চেষ্টা করে একটু; কিন্তু তার মুখভঙ্গি ঠিক হাসির রূপ নেয় না। অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঠোটদুটো কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক নড়াচড়া, কাঁপাকাঁপি করে আবার যথাস্থানে ফিরে এসে স্থির হয়ে বসে থাকে।

টিভির ঠিক সামনে রাখা চেয়ারটিতেই বসেছে মানিক। এ-বাসায় এলে কেন জানি এখানেই বসে সে, সর্বদা। বিনা নির্দেশে, বিশেষ কোনো আকর্ষণ বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়া। অকারণে। এর শুরু আর পরম্পরা আজ আর মনে নেই। তবে এভাবেই চলে আসছে বরাবর। কেমন অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে।

সামনে খোলা টিভির সম্পূর্ণ পর্দা জুড়ে এখন ভারতীয় বাংলা সিরিয়ালের কুটিল দুই নারীচরিত্রের রূপদানকারী অভিনেত্রীর মুখমণ্ডল। চোখমুখের অতি অভিনয় আর নাচনাচি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, কোনো এক বিশেষ কুকর্মে ভীষণভাবে ব্যস্ত তারা।

কোনো সমস্যা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই
একটা সমাধান বাতলে দিতে
হুমড়ি খেয়ে পড়ে না মানিক।
সহজে উত্তেজিতও হয় না। তার
পরিণত মানসিকতা দেখে মাঝে
মাঝে বিস্মিতই হন সালমা বানু।
সারাজীবন সংসার না করেও
গৃহস্থালির খুঁটিনাটি এত ভালো
বোঝে, জানে মানিক!

নির্ঘাত তাদেরই কোনো নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দুজনই। এগুলো দিনের পর দিন বসে বসে দেখে লোকে। দেখে মানে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে গেলে। আর আশ্চর্য, হজমও করে ফেলে ঠিকঠাকমতোই। এগুলো এতটাই জনপ্রিয় যে, এদের কাহিনি বা চরিত্রের কোনো বিচ্যুতি বা অসঙ্গতি, কিংবা কোনোরকম অসামঞ্জস্য-ই কারো চোখে পড়ে না।

এই একটু আগেই সালমা বানু ওই বিস্ফোরক কথাটা উচ্চারণ করলেন।

অতি সহজে দৈনন্দিন সাধারণ কথাবার্তার মতোই ভূমিকাহীন কথাটা বলে ফেলেন। শান্ত, অনুভূজিত কণ্ঠস্বর সালমার, যা সবসময়ে প্রায় একই লয়ে থাকে। সালমা বানুর গলার আওয়াজে কোনো ওঠানামা নেই, আবেগে মথিত হয়ে ওঠে না তা কোনো কালেই।

মানিক এলে প্রতিদিনই তার সঙ্গে টুকটাক এটা-ওটা কথা হয় সালমা বানুর। সংসারের কতরকম খুঁটিনাটি কথা, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো জটিলতার কথা। আশা ও আশাভঙ্গের কথা। মানিকের কাছে বলার জন্যই বুঝি সারাদিন ধরে কথাগুলো জমতে থাকে সালমার কণ্ঠের কোনো অদৃশ্য ভাঁজে, জিবের তলানিতে, কিংবা ঠোঁটের ভেতরটায় চিবুতে থাকা দুই পাটি দাঁতের মাঝখানে, পানের রসে কিংবা ছ্যাবড়ায় সিক্ত হয়ে। আসলে তো ওসব কিছুই নয়। গোটা দিন ধরেই কথাগুলোর অনুরণন চলে সালমার মস্তিষ্কে। একবার সে-কথা মানিককে বলে ফেললেই তিনি মুক্ত। এক ধরনের শান্তি ও স্বস্তি বোধ করেন। মানিক এত ঠান্ডাথকৃতির মানুষ, এত কম কথা বলে সে যে, তাকে কিছু বলতে এখন আর দ্বিধা বা সংকোচ হয় না সালমা বানুর। অনেক সহজ হয়ে এসেছে তার কথা বলা। এর কারণ বোধহয় কোনো সমস্যা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই একটা সমাধান বাতলে দিতে ছমড়ি খেয়ে পড়ে না মানিক। সহজে উত্তেজিতও হয় না। তার পরিণত মানসিকতা দেখে মাঝে মাঝে বিস্মিতই হন সালমা বানু। সারাজীবন সংসার না করেও গৃহস্থালির খুঁটিনাটি এত ভালো বোঝে, জানে মানিক! সেসব সন্তোষ ও সংসারের কোনো মালিন্য, ক্ষুদ্রতাই যেন তাকে স্পর্শ করে না। অতি সহজে মানুষকে ক্ষমা করতে পারে মানিক। এছাড়া কারো জন্যে কিছু করতে পারলে বড় খুশি হয়। অথচ বয়সে সে সালমা বানুর চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোটই হবে।

মানিক ভাবে, ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত সালমা বানুর আজকের কথাগুলোর দ্যোতনা কি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি? বা এখনো পারছেন? মনে হয় না। তাহলে এত সহজে কথাটা তাকে বলতে পারতেন না। আর বলার পরেও এত স্বাভাবিক আচরণ করতে পারতেন না।

তোমাকে আর কষ্ট করে আমার জন্যে এতটা দূর থেকে রোজ রোজ পানি নিয়ে আসতে হবে না মানিক! এই যে দেখছ জিনিসটা! এটা জবা, মানে চারতলার হানিফের বড় মেয়ে, যে ব্র্যাকে কাজ করে, তুমি তাকে চেন, ও এনে দিলো। বলে...

বাকি কথা আর কানে ঢোকে না মানিকের। সালমা বানু তবু বলে চলেছেন, এই বিশেষ ধরনের ফিল্টার করা পানির অন্যরকম এক স্বাদের কথা, যা টিউবওয়েলের পানির মতো না হলেও যথেষ্ট সুস্বাদু। এনজিওগুলোর এই নতুন ফিল্টার বিতরণের ইতিহাস শোনার ধৈর্য বা আগ্রহ ছিল না মানিকের তখন। মানিক ভালো করে তাই বস্তুটার দিকে তাকিয়েও দেখেনি একবার। শোনেও নি তাই এ-ব্যাপারে ঠিক কী বলছিলেন সালমা।

কিন্তু এখন টিভির কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে সে তাকায় ঘরের উল্টোদিকে। দেখে, একটা ছোট কাঠের টুলের ওপরে সযত্নে রক্ষিত স্তরে স্তরে সাজানো কাচের পাত্রসমেত ওই বিশেষ বস্তুটা। মানিকের ঘাড়ে এখনো ঝুলছে তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী নীল রঙের কাপড়ের ব্যাগটা। মেঝেতে চোখ পড়লে দেখে, পায়ের কাছে পড়ে আছে শূন্য ছোট পিতলের কলসিখানা আর মাঝারি সাইজের তামার একটা জগ। দুটোতেই ভরে নিয়ে এসেছিল, আর কিছু নয়, টলটলে জল, রোজকার মতোই।

সালমা বানু অতি আগ্রহের সঙ্গে সেই পরম আরাধ্য ডিপ টিউবওয়েলের সুস্বাদু পানি নিজের হাতে তার মাটির কলসিতে ঢেলে

রাখেন। তারপর খালি কলসি ও কাঁসার ঘটি কিংবা পিতলের জগটি, যেদিন যেটা আসে, যথারীতি ফেরত দেন মানিককে। প্রতিদিন। আজো তাই দিয়েছিলেন।

দুই পাত্র ভরা পানি নিয়ে মানিককে ঘরে ঢুকতে দেখলেই সালমা বানু এমন একখানা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে মানিকের ডান হাত থেকে ঘটি বা জগখানা তুলে নেন যে, মনে হয় কী যেন কোনো অমৃতের অপেক্ষায় এতক্ষণ ধরে বসে ছিলেন তিনি। মানিকের এই দুই কিলোমিটার হেঁটে ডিপ টিউবওয়েলের কাছে আসা, আবার সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে আরো প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে এ-বাড়িতে তা পৌঁছে দেবার সমস্ত ক্লান্তি মুহূর্তে দূর হয়ে যেত সালমা বানুর এই নিঃশব্দ, সহাস্য সম্ভাষণে।

মানিক কক্ষনো সালমা বানুকে জানতে দেয়নি, এখান থেকে আসলেই ঠিক কতটা দূরে তার বাসস্থান। ধারণা দিয়েছিল, যা মোটেও সত্য নয়, সে যেখানে থাকে সে-বাসাটা ওই সবুজ ডিপ টিউবওয়েলটার ঠিক পাশেই। আরো বলেছিল, রোজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার শেষে তাকে একবার করে ব্যাংকে যেতে হয় বাড়ির মালিকের দোকানের টাকা জমা দিতে। আর সেই ব্যাংকটা সালমা বানুর বাসা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরেই! প্রকৃত ঘটনা হলো, দুপুরের খাবারের পর ঘণ্টা তিনেক বিশ্রামের জন্যে ছুটি পায় মানিক। তবে এটুকু মিথ্যা সালমা বানুকে না বললে, মানিক বুঝতে পেরেছিল তিনি তার বাড়িতে এসে মানিকের এই জল দিয়ে যাবার প্রস্তাব কখনো গ্রহণ করতেন না।

এতকিছু বলার পরেও কি সহজে রাজি হয়েছিলেন তিনি? অনেক সাধ্য-সাধনার পর একটা শর্তে অবশেষে তিনি রাজি হন। সপ্তাহে অন্তত একদিন, তা বেলা করে হলেও, মানিক সালমা বানুর সঙ্গে তাঁর নিজের হাতে রান্না করা দুপুরের খাবার খাবে।

রাজি হয়েছিল মানিক। সে জানে, তা না হলে সালমা বানুকে তার ঈঙ্গিত জল দিয়ে যাবার সুযোগ কোনোমতেই সে পাবে না। মানিক কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলেছিল, ভালোই হবে সেটা। সপ্তাহে একদিন অন্তত রাহেলার মায়ের একঘেয়ে রান্নার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ওই বাড়িতে মানিকের মতো ঘরনিবিহীন গৃহী যে-কয়জন রয়েছে তাদের জন্যে প্রতিদিন একত্রে রান্না করে দিয়ে যায় রাহেলার মা।

সালমা বানুর সঙ্গে মানিকের অলিখিত এব্যবস্থাটা প্রথমে কেবল সাময়িক, মানে মাস কয়েকের জন্যে, একটা ব্যাপার ভাবা গিয়েছিল। কিন্তু সেই কয়েক মাস এখন আড়াই বছর গড়িয়ে তিন বছরে পড়তে শুরু করেছে। আর আশ্চর্য, এই তিন বছরের মধ্যে খোলা সদর রাস্তায় দাঁড়ানো এই জলের কল, যাকে সারাদিন রাতে কত মানুষ কতরকমভাবে ব্যবহার করে, একদিনের জন্যেও বিকল হয়নি।

এই সবুজ রঙের (সবুজ রং মানে আর্সেনিকমুক্ত) টিউবওয়েলকে কেন্দ্র করে সালমা বানুর সঙ্গে মানিকের পরিচয়ের ঘটনাটা ভাবতে গেলে মনে হয় সেদিনের কথা। বাড়িওয়ালার হয়ে মিউনিসিপালটির ট্যাক্সটা দিতে মানিককেই যেতে হয়। প্রতিবছরই। এবারো ব্যতিক্রম হয়নি। ট্যাক্স দিয়ে ঘরে ফিরেছিল মানিক। হেঁটেই। এই পথ ধরে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে চার রাস্তার সংযোগস্থলে যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক উল্টোদিকের সবুজ রং-মাখানো ডিপ টিউবওয়েলের হাতলটি ধরে দুহাত দিয়ে পাম্প করে সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেই ডান হাতখানা হাতল থেকে সরিয়ে নৌকোর আদলে বাঁকা করে সেই নিষ্কাশিত জলটি ধরার দুরূহ চেষ্টা করে যাচ্ছেন মধ্যবয়সী এক নারী। তাঁর হাত ছাপিয়েও আঙুলের ফোকরফাকর দিয়ে পড়েটুড়ে গিয়ে যে সামান্য একটু জল থাকছে হাতে, সেটুকুই যেন অমৃতের মতো চেটেপুটে পান করছেন তিনি। সামনেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৈশোর ছাড়িছাড়ি বয়সের অল্পঅল্প নরম দাড়িভর্তি ফর্সামতন একটি ছেলে। ছিপছিপে লম্বা, প্যান্টশার্ট পরা ছেলেটি ঘটনার আকস্মিকতায় কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন। এমন সদর রাস্তার ওপরে খোলা জায়গায় নিজ হাতে কল পাম্প করে কোনো ভদ্রঘরের ঘাটোখর্ষ নারীর খালি হাতে করে জল পান করার ঘটনা রোজ তো ঘটে না। সে যেন তখন কী বলছিল প্রৌঢ়াকে — হয়তো নিজে পাম্প করে দেবার অনুমতি চাইছিল, অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পানি পান

করার ব্যাপারে তার মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে ঘা খাচ্ছে সেটাই সরাসরি অথবা ইনিয়-বিনিয়ে বলার চেষ্টা করছিল। তবে কথাবার্তা যা-ই বলুক তারা, রাস্তার এপার থেকে কিছুই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল না মানিক। তবে ছেলেটির বিব্রতকর মুখমণ্ডল দেখে এক ধরনের মায়াই হয়েছিল তার।

আশেপাশের দু-তিনটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে, যারা কল থেকে খাবার জল নিতে এসেছিল, এমন মজার ঘটনায় তাদের করণীয় ভুলে গিয়ে খালি পাত্র মাটিতে রেখে হাঁ করে এই ঘটনা উপভোগ করছিল।

হালকা নীল রঙের ওপর কালো পাড়ের ইস্ত্রি করা তাঁতের শাড়ি ও লম্বা হাতার কালো ব্লাউজের সঙ্গে সোনালি ফ্রেমের চশমা-পরিহিত, পায়ে স্যান্ডেল, কাঁচাপাকা ঘন চুল সুচারুভাবে পেছনের দিকে আঁচড়ে হাত খোঁপা করা স্লিঙ্ক চেহারার এক ভদ্রমহিলা কল থেকে উপচেপড়া জলটা কোনোমতেই হাতে ধরে রেখে পান করতে পারছেন না। সঙ্গে ছেলেটির হাতে মাঝারি আয়তনের একখানা কালো ব্যাগ, যার ভেতর তেমন কিছু নেই নিশ্চয়ই যা দিয়ে খানিকটা জল ধরে রেখে পান করতে পারতেন এই পিপাসার্ত নারী।

মানিক তার ঘাড়ের ঝুলি ঘেঁটে একটা ঝকঝকে পিতলের গ্লাস বের করে আনে। তার এই ঝুলি হলো ছোটখাটো একটা আস্ত পৃথিবী। বাবা বেঁচে থাকতে বলত, তোর ব্যাগে বাঘের চোখ খুঁজলেও পাওয়া যাবে। প্রাত্যহিক জীবনে হঠাৎ করে কাজে লাগতে পারে, বা প্রয়োজন হতে পারে তার কিংবা অন্যদের, তেমন অনেক জিনিসই বা সেসব জিনিসের বিকল্প কিছু রয়েছে এই ব্যাগে। ধাতব গ্লাসটি বের করে নেবার পরেও যা পড়ে রইল ব্যাগে, তার ভেতর, — একটা হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি, ভাঁজ করা কালো ছাতা একখানা, সুই-সুতো, আঠা, কলম, পেনসিল, রাবার, কাঁচি, চাকু, চামচ, কাগজ, সেফটিপিন, কাগজের ক্লিপ, রাবার ব্যান্ড, স্কচটেপ, একখানা মাঝারি আকারের ফিনফিনে হালকা চিনেমাটির খাবারের প্লেট, একটি কাপ, একটা ছোট বাটি, পান-সুপুরি, চুন, প্যারাসিটামল, অ্যান্টিসিড, ওরস্যালাইন, অ্যান্টিবায়োটিক মলম, গোটা কয়েক ব্যান্ড-এইড, কিছু চিনাবাদাম, দু-তিনটা শক্ত লজেন্স, ইংরেজি থেকে বাংলার একটা ছোট্ট পকেট অভিধান... আরো ছোটখাটো কত কী! রাস্তায়, বাসে কখন কীসের দরকার হবে আগে থেকে জানা অতি কষ্টকর। কিন্তু মানিক যে এ নিয়ে ভাবে এবং তার এই খুতির ভেতরের জিনিসের তালিকার যে অনবরত পরিবর্তন ঘটে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানিক রাস্তা পার হয়ে উলটোদিকে দ্রুত চলে আসে। তারপর কোনো কিছু না বলে অপরিচিত ভদ্রমহিলার সামনে তার গ্লাসটি এগিয়ে দিয়ে তা ব্যবহার করার জন্যে তাকে অনুরোধ জানায়। তার মনে হয়েছিল ভদ্রমহিলা খুব পিপাসার্ত ও ক্লান্ত। হয়তো দূরে কোথাও থেকে আসছেন। গলা ভিজিয়ে জলপান করা দরকার তার।

মানিক জানত না, আসলে, দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়িতে ট্রেনে করে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। গিয়েছিলেন মাত্র দুদিনের জন্যে। গাঁ ছেড়ে প্রবাসী পুত্রের পীড়াপীড়িতে সেই যে শহরে এসেছিলেন তিন বছর আগে, আত্মীয়-পরিবৃত ছয়তলা দালানের দোতলার একটা ঘরে, তারপর এই বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাননি বা থাকেননি কখনো। কখনো মানে এই দুদিন আগে পর্যন্ত। এই প্রথম বেরিয়েছিলেন।

সালমা বানুর সঙ্গে তারই কালো ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ ছেলেটি সম্পর্কে তার ভুলে। সে-ই এসে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সালমাকে দুদিন আগে। আজ আবার তাকে ঘরে পৌঁছে দিতে সঙ্গে এসেছে।

বছর দশেক আগে সালমা বানুর ভাণ্ডার ও দেওরের ছেলেমেয়েরা মিলে শহরে যখন ছয়তলা এই বাড়ি তৈরি করে, সালমা বানুর একমাত্র সন্তান প্রবাসী রাসেলও একখানা ফ্ল্যাট কিনে রাখে তাদের সঙ্গে। যদিও প্রথম থেকেই তার ফ্ল্যাটটা ভাড়াতেই রয়ে যায়। ছেলে-ছেলের বউ, নাতনি — ওরা কখনো দেশে আসবে মনে করেন না সালমা বানু। বাড়ির দোতলায় যে-ঘরটাতে এখন থাকেন তিনি, সেটা কোনো ফ্ল্যাটের অংশ নয়। করা

হয়েছিল বাড়ির দেখাশোনা করবে যে-ম্যানেজার তার থাকার জন্যে। কিন্তু একজন ম্যানেজার নিয়োগ করার সামর্থ্য হয়নি এই ছোট্ট ভবনের ছয় পরিবারের, যারা এখানে বর্তমানে বসবাস করছে। দারোয়ান ছেলেটি নিচতলায় গ্যারাজের পেছনের দিকের একটা ঘরে থাকে। পাশেই থাকে বাড়ির ড্রাইভার। ফলে সালমা বানুর জন্যে দোতলার ওই ম্যানেজারের ঘরটি বরাদ্দ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। তিন তলায় থাকে সালমার ভাণ্ডারের ছোট ছেলে পিয়াল। সে-ই প্রতি শুক্রবার সালমার কাঁচা বাজার করে দেয়। মাসে মাসে চিকিৎসা, খাবার, ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন ও হাতখরচের সব টাকা-ই পাঠায় ছেলে। এভাবেই চলে যায়। মাঝে মাঝে ছেলে উঠেপড়ে লাগে মাকে বিদেশে তার কাছে নিয়ে যাবে বলে। এই বৃদ্ধ বয়সে তার মায়ের পক্ষে এভাবে একা থাকা সম্ভব নয়। শোভনও নয়। সালমা বানুও কৃত্রিম উৎসাহ দেন, আত্মহ দেখান ছেলেকে। বলেন, নিশ্চয় যাবো। কিন্তু তারপর আর যাওয়া হয় না। পুত্রের উৎসাহে ভাটা পড়ার জন্যেই কেবল নয়, সালমা বানুর নিজেরও শখ বা উৎসাহ হয় না বিদেশবিড়ুইয়ে অপরিচিত জায়গায় গিয়ে এ-বয়সে নতুন করে বসবাস শুরু করতে। তবে একমাত্র পুত্র খুব জোরাজুরি করলে কী হতো বলা শক্ত। ফলে যে যেখানে আছে, সে সেখানে সেভাবেই থেকে যায়। দিন কেটে যায় যথারীতি।

ভাণ্ডার সঙ্গে রেলস্টেশন থেকে রিকশা করে বাড়ি যাবার পথে হঠাৎ সেদিন এই সবুজ রঙের ডিপ টিউবওয়েলটি চোখে পড়েছিল সালমা বানুর। ভাণ্ডাকে বলে রিকশা থামিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি টিউবওয়েলটির দিকে। টিউবওয়েলের পানি খেয়েই বড় হয়েছেন সালমা বানু। সালমার ছোটবেলায় সরকারি চাকুরে পিতার কর্মোপলক্ষে তাঁরা যখন মেহেরপুর ছিলেন, তখন থেকেই এই পরিচিত ও প্রিয় পানি খেতে অভ্যস্ত তিনি। এরপর সারাজীবনই আশ্বাদন করে এসেছেন এই পানি। কিন্তু এখানে আসার পর আর তা পাননি। বোতলের পানি, সেদ্ধ করা ট্যাকের পানি, দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পাইপে আসা মিউনিসিপালটির পানি, — কোনোটির-ই স্বাদ সেই টিউবওয়েলের পরিচিত পানির মতো নয়। এইসব শহুরে পানি খেয়ে তাই তাঁর আত্মা মেটে না — পিপাসা দূর হয় না। অতৃপ্তি বাড়তেই থাকে।

মানিক তার গ্লাসখানি টিউবওয়েলের পানিতে খলখল করে প্রথমে ভালো করে ধুয়ে নেয় একবার। তারপর গ্লাস ভরে সদ্য উত্তোলিত টাটকা টিউবওয়েলের জল ভরে সালমা বানুর দিকে গ্লাসখানা এগিয়ে দেয়। হাসিমুখে বলে, মাজা গ্লাস। একেবারে পরিষ্কার। নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

কোনো আপত্তি বা দ্বিধা না করে স্মিতমুখে একবার মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি জলভর্তি গ্লাসখানা প্রায় ছিনিয়ে নেন মানিকের হাত থেকে। তারপর দুই হাত দিয়ে দুদিক থেকে গ্লাসখানা ভালো করে ধরে মুখের কাছে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে একটানে সবটা পানি খেয়ে ফেলেন। ভরদুপুরে উজ্জ্বল সূর্যের ঠিক নিচে খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিতলের প্রশস্ত গ্লাস-পূর্ণ একরাশ পানি ঢগঢগ করে পান করার এই দৃশ্য শুধু মানিক আর সেই লম্বা ছেলেটিই নয়, আশপাশের আরো কিছু পথচারীও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। জল নিতে আসা ফুটপাথে বসে থাকা ছোট ছেলেমেয়েগুলোও দাঁত বের করে হাসতে হাসতে হাততালি দেয়। এই অনানুষ্ঠানিক অথচ অসাধারণ পানি পানে কে বেশি পরিতৃপ্ত হয়েছিল বলা মুশকিল। পরম আত্মহে যিনি সেটা পান করলেন তিনি, নাকি যার সাহায্যে যার ধাতব পাত্রে করে তা পান করা সম্ভব হলো, সে।

সেই থেকে প্রতিদিন সালমা বানুর ঘরে এক কলসি ও এক জগ বা এক ঘটিভর্তি জগতের সেরা পানীয় — পানি অর্থাৎ ডিপ টিউবওয়েলের পানি আসা শুরু হয়।

তবে ব্যাপারটা অত সহজে সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেনি। পানি পান করে মানিককে ধন্যবাদ জানিয়ে, অনেক দোয়া করেও নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যেন যথেষ্ট হয় না সালমার। সম্ভব হলে তাদের বাসায় মানিককে একবার পারলে যাবার আমন্ত্রণও জানান তিনি।

সালমা বানুকে নিয়ে এসেছে যে-রিকশাওয়ালা, এতক্ষণ রিকশা

থামিয়ে পানির উৎসবের মজা দেখছিল সে নিজেও। পানি পানশেষে সালমা বানু ও ভাগ্নে এসে আবার রিকশায় ওঠেন। এতক্ষণে অবশেষে ভাগ্নেটি কথা বলার সুযোগ পায় যেন। রিকশাওয়ালাকে নির্দেশ দেয় কোথায় যেতে হবে। এখান দিয়ে সোজা গিয়ে সামনের মোড়ে ডাইনে যেতে হবে। সেটাই শহিদ তিতুমীর লেইন। ডাইনে মোড় নিলে পাঁচ-ছয়টা বাড়ি পরে বাঁদিকে ৩১-এর/এ শহিদ তিতুমীর লেইনের হলুদ ছয়তলা বাড়িটি চোখে পড়বে, যার নাম 'ভ্রমর'। ওটাই সালমা বানুর বাসস্থান।

রিকশাটা চলে যাবার পরেও শূন্য পিতলের গ্লাসখানা হাতে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মানিক। বেলা পড়তে এখনো ঢের দেরি। ট্যাক্সের কাজে দেরি হতে পারে এই আশঙ্কায় তার কাজটি মানে বিল্ডিংয়ের দারোয়ান কাম লিফটম্যানের দায়িত্বটা যথারীতি বাড়ির মালিকের ড্রাইভারকে দিয়ে এসেছিল মানিক। এটাই নিয়ম। চাকরির শুরু থেকেই এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তখন অবশ্য মানিক এখানে একা ছিল না। এই বাড়িরই তিনতলায় ভাড়া থাকত মানিকের জীবনের একমাত্র বন্ধন, — ছোট ভ্রাতুষ্পুত্র কাজল ও তার পরিবার। কাজলের সঙ্গে অনেক বছর একত্রে বসবাস করেছে মানিক।

জলের দরে গ্রামের জায়গাজমিন সব বেচে দিয়ে কন্যা কানন ও পুত্র বাগানসহ স্ত্রী ছায়া আর কাকা মানিককে নিয়ে যখন কাজল শহরে তার এক পরিচিত পরিবারের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন থেকেই মানিকের জীবন থেকে আনন্দ একরকম বিদায় নিতে শুরু করে। সে বোঝে, গ্রামে জায়গাজমিন রক্ষা করা, বিশেষ করে সবাই মিলে সেখানে বসবাস না করলে তা ধরে রাখা খুবই সমস্যার ব্যাপার। এছাড়াও গ্রামে পরিবার রেখে বছরের পর বছর শহরে মেসে থেকে নটা-পাঁচটা কাজ করার কঠিন জীবনযাপন করতে করতে কাজলও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সব বুঝে বাধা না দিয়ে নিশ্চুপে কাজলের এই বাড়ি বদল তথা জায়গা বদলকে সমর্থনই জানিয়েছিল মানিক।

কিন্তু অনেক স্বপ্ন আর সেইসঙ্গে ব্যাংকের চাকরিতে দু-দুটো প্রমোশন নিয়ে পরিবারসহ শহরে এসে উঠলেও এখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি কাজলের। বিরানব্বইতে আবার ঘর ছাড়ার সময় যখন এলো, মানিককাকাও তাদের সঙ্গে যাবে এটাই আশা করেছিল কাজল। তারা ছাড়া এই অকৃতদার কাকার আর কেই-বা আছে পৃথিবীতে? কিন্তু মানিক যায়নি। এভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা জীবনভর ছুটে ছুটে, ঘুরে ঘুরে আর ভালো লাগছিল না তার। সবচেয়ে বড় কথা, আবার নতুন অচেনা এক স্থানে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিপার্শ্ব, নতুন মানুষ, তাদের নতুন নতুন ভালো লাগা, মন্দলাগার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাদের সঙ্গে নতুন করে তাল মিলিয়ে চলা, কথা বলা, চিন্তা ভাগাভাগি করা আর পোষাবে না তার, মনে হয়েছিল মানিকের। তাছাড়া কোলেপিঠে করে মানুষ করা কাজলের ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু এখন এই বয়সে কাজলের পুত্র, কন্যা, স্ত্রীর ফরমাস-খাটা, আবদার মেটানো, সর্বদা তাদের মন জুগিয়ে চলা বড় কঠিন মনে হতো মানিকের। বিমধরা অবসন্ন জীবন নিয়ে বিব্রত মানিক বুঝি বা একরকম পরিত্রাণই চেয়েছিল। ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। তাই মাটি কামড়ে এখানেই পড়ে থাকা সাব্যস্ত করেছিল মানিক। থেকে গিয়েছিল সে ওই বাসাতেই। একা। তখন থেকেই দারোয়ান/ লিফটম্যান/ ম্যানেজার, একাই সব দেখাশোনা করে মানিক এই বাড়ির। আর নিজের জন্যে জুটিয়ে নেওয়া এই ছোট কাজখানি তার থাকা-খাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

মানিক এবার উঠে পড়ে। আজ ঘরে ঢোকার পর থেকে এখন পর্যন্ত ঘাড় থেকে তার ব্যাগটা একবারও নামায়নি। যথেষ্ট ভারী এ-ব্যাগ। তবু যতক্ষণ ঘরের বাইরে থাকে, সবটা সময় ওটা ঘাড়েই ঝোলে তার। আজ সালমা বানুর কথা শোনার পর ঘরের ভেতরেও ব্যাগটা মানিকের দেহলগ্ন থেকেছে। বরাবর।

খালি কলসিটা এক হাতে, আর জগটা অন্য হাতে তুলে নিয়ে বেরোতে প্রস্তুত হয় মানিক। সালমা বানু সামনে এসে দাঁড়ান।

তুমি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলে মানিক?

কী যে বলেন!

সঙ্গে আর কী বলবে ভেবে পায় না মানিক।

খাবার পানির জন্যে না হোক, আমাকে দেখতে মাঝে মাঝে আসবে তো?

নিশ্চয় আসব।

মানিক ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠে।

এ-ধরনের কথা বলে, প্রশ্ন করে আজকেই কি মানিককে পরিপূর্ণ বিদায় দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন সালমা বানু?

তারপরেও তার দুশ্চিন্তা হয়। মানিক জানতে চায়,

ফিল্টার ব্যবহারের পদ্ধতি সব ঠিকমতো জেনে নিয়েছেন তো?

তা নিয়েছি। তাছাড়া জবা বলেছে, প্রথম প্রথম প্রত্যেকদিন আসবে সে। এসে বুঝিয়ে দেবে সব। তুমি নিজেও একটা ফিল্টার কিনে নাও না মানিক! পানি বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। স্বাদটাও খারাপ লাগবে না এই ফিল্টারের পানির।

মানিক হাসে।

ওটা কোনো ব্যাপারই না। টিউবওয়েলের এত কাছে বাসা!

নির্দোষ মিথ্যেগুলো জিবের ডগাতেই যেন বসে থাকে আজকাল।

মানিক উঠে পড়ে।

ফেব্রার পথে আজ রাস্তার দূরত্বটা বড় লম্বা মনে হয় তার কাছে। মানিকের হঠাৎ সবকিছু কেমন শূন্য লাগে। নিজেকে হঠাৎ অতি অকর্মণ্য, অপ্রয়োজনীয় এক বৃদ্ধ ছাড়া কিছু মনে হয় না তার।

মনে পড়ে কাজলরা এখান থেকে চলে যাবার পরে এক মধ্যরাতের কথা। সেটা কাজলদের চলে যাবার দিন নয়, তার পরের দিন নয়। তার পরের পরের দিনও নয়। ওরা এখান থেকে চলে যাবার বেশ কয়েকদিন পরে হঠাৎ এক রাতে ঘুম ভেঙে যায় মানিকের। চারদিকে নিঃশব্দ অন্ধকার। একা একা বিছানার ওপর উঠে বসে মানিক। খোলা জানালা দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদ দেখতে পাচ্ছে সে। মানিকের মনে হয়েছিল, আকাশের এই যে চাঁদটা সে দেখছে, তা কাজলের ওখানেও একই রকম দেখাচ্ছে এখন, — আজ — এই রাতে এই মুহূর্তে। তার মনে কাজল এতটাই কাছে থাকে। অথচ কাজল তো আসলেই এত কাছে নেই! কত দূরে চলে গেছে। এতটা দূরে যে, হয়তো এই জীবনে আর কখনো দেখাই হবে না তার সঙ্গে। বেশি দূরে না গিয়েও অনেক দূরে চলে যাওয়া ভাইপো কাজলের জন্যে সেই গভীর রাতে একা একা বুকের ভেতরটা কীরকম হু-হু করছিল, খালি খালি লাগছিল সব। আজ এই মুহূর্তে ফুটপাথে উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ফেরা শত শত পথচারী-পরিবৃত মানিকের সেরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সবকিছু।

মানিকের মনে হয়, বাকি জীবনে কিছুই যেন আর করার নেই তার। সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। তার সাধ্যের আওতায় যা ছিল, সবই করে ফেলেছে সে। এখন কেবল রয়েছে অনন্ত অপেক্ষার কাল। অপেক্ষা, — অন্তিম দিনগুলোর জন্যে। সেই দিনগুলো কবে আসবে, কীভাবে আসবে, আর কতদিন পরে আসবে কিছুই জানে না সে। তবু বেঁচে আছে। হয়তো থাকবে আরো কিছুদিন।

দুই হাতে দুটো শূন্য পাত্র নিয়ে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে তালে তালে পা ফেলে যেমন ছোট্ট প্রতিদিন, তেমন করে নয়, আজ কোনোদিকে না তাকিয়ে হাতদুটোকে বুকের কাছে বাঁকা করে গুঁজে নিয়ে খুব দ্রুতগতিতে হাঁটতে শুরু করে মানিক।

মানিক হাঁটছে। হেঁটে-হেঁটে ঘরে ফিরছে। তার বুকের কাছে তখনো চেপে ধরা ভারী, অপ্রয়োজনীয় দুটি ধাতব সামগ্রী সম্পূর্ণ মূল্যহীন, বাহুল্য ছাড়া আর কিছু নয় — একখানা খালি পিতলের কলসি আর একটা শূন্য তামার জগ। কাঁধে ঝুলছে সেই পরিচিত গাঢ় নীল কাপড়ের ব্যাগ যার ভেতর, বাবা বলত, ভালো করে খুঁজে দেখলে বাঘের চোখও নাকি মিলবে।

মানিকের মনে হয় জন্মের পর থেকে এভাবেই গন্তব্যহীন অবিরাম হেঁটে চলেছে সে। মানিক যেন নিরবধি হাঁটছে। আর হাঁটছে। একা একা। ক্রমাগত। সোজা। একটানা। □



বুড়ো গাছ নিখিল অন্ধকারে

সুশান্ত মজুমদার



পাশ ওঠা ক্ষয়াটে কাঠের সিঁড়ি; আর মরচেধরা সরু রডের খরখরে রেলিং উঠেছে নিচ থেকে দোতলায়। দোতলা মানে সেকেলে আমলের চুন-সুরকির বাড়ি। সিলিং থেকে হঠাৎ-হঠাৎ পলস্তারার চাক খসে জমিয়ে রেখেছে রুমের অসুস্থতা। খণ্ড-খণ্ড প্রলেপ না-থাকায় শক্তিক্ষুণ্ণ

দেয়ালটা যেন ক্ষতে ভর্তি। ঢাকার ঝকঝকে চাকচিক্যময় পাইওনিয়ার রোডে সামনে-পাশে-আকাশে ঘাড় তোলা বিশাল সব সরকারি দপ্তর। মোড় ফিরলেই নতুন-নতুন অ্যাপার্টমেন্ট, কংক্রিট-ইট-কাঠ-টাইলসের অফুরন্ত জৌলুসের পাশে পুরনো এই বাড়িটা বাস্তবিক বেমানান, দেখতেও বাজে। শীহীন বাড়ির পেছনের দোতলার অংশের দুরূমে দাদার একাকী বহু বছরের দিনক্ষয় জীবন। জামরুল, আমগাছের পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাইরের আলো কোনোক্রমে



অলংকরণ : রোকেয়া সুলতানা

কাছাকাছি এসে থমকে যায়; ভেতর অবধি পৌছানোর সুযোগ নেই। অনুজ্জ্বল রঙে সার্বক্ষণিক তাই কম পাওয়ারের বাস্তব জ্বলে। ফ্যাকাশে ওই আলোয় দাদার চেহারার ছায়া দূর হয়েছে কি-না বোঝা কঠিন। বিছানার ওপর গোটা চার বেড়াল সত্তর-উর্ধ্ব নিঃসঙ্গ দাদাকে এমন ঘেরাও করে শুয়ে থাকে, যেন বুড়োকে পাহারার দায়িত্ব নিয়েছে। পায়ে-পায়ে ঘোরা বেড়ালগুলো খাওয়ার সময় দাদার মুখের দিকে আত্মীয়নজর ধরে রাখে। দাদা প্লেটের ভাত-মাছ খুঁটে-খুঁটে নিজে যা খান তার বেশি বেড়ালদের খেতে দেন। দুপুরে গুমোটভর্তি হেঁশেলে হাঁপাহাঁপি করে কাজের ছুটা বুয়ার রান্না করা খাদ্য হলুদ লবণজলের সেদ্ধ বলা ঠিক। দুই ফাও খাইয়ে নিজাম বা সিরাজ যখন যার সুযোগ হয় দাদার টাকায় এজিবির ফুটপাতের অস্থায়ী বাজার থেকে মাছ-তরকারি কিনে আনে। কিছু দামে কম শাকসবজির বেশিরভাগ বাসি। মলা-ঢেলা-পুঁটি-টেংরা-তেলাপিয়া মাছও সবসময় টাটকা থাকে না। দাদা নির্বিকার। কেবল তাঁর পেটে কিছু গেলেই ব্যস, অল্পেই খুশি তিনি। নিত্য আয়ু যাপনে বাড়তি কোনো চাওয়া বা সাধ পূরণের ইচ্ছা তাঁর নেই। শুধু বংশে বনেদি বর্তমানে ফতুর মানুষটি সেই কবেকার নাছোড় অভ্যাসে কোনো-কোনো রাতে কয়েক পেগ বিভোর উপযোগী রস পেলে বেজায় খুশি। তাঁর বুড়ো হাড়িডর জোড়ে-জোড়ে বুঝি সমর্থ তখন চালু হয়। তার তেজে তিনকাল বয়সের টুকরো-টুকরো ঘুম জোড়া লেগে মাখোমাখো

এজিবি অফিসের উলটোপাশে
ফুটপাথ-লাগোয়া পুরনো
দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বড়-বড়
পাতার ছালখোসা ওঠা কয়েকটা
উঁচু মোটা গাছ। তার ওধারে
বাঁশের বেড়ার টিনের ছাপরা।
বাস-অনুপযোগী লম্বা জায়গাটা
আদৌ রাজধানীর বুকের অংশ
বলে ভ্রম হয়।

দারুণ এক আরাম এনে দেয়। কদমে- কদমে এলোমেলো ভাব থাকে না। মনে হয় হাঁটাচলা বেশ উচিত রকমই। নিজেকে নিজে খুঁজে পেয়ে তখন আসল দাদাই ভাবেন। বাড়িঅলা যতদিন বেঁচেছে মান্যগণ্য করে তাঁকে দাদা ডেকেছে, তাঁর দু-ছেলেরও তিনি দাদা, নিচের অফিসের পিয়ন-দারোয়ান-কেরানি সবার এজমালি দাদা। দেয়ালের ওধারের কাচাবাচ্চাদের দাদা, সামনে ফুটপাথের টং দোকানির দাদা — সর্বজনের আন্তরিক দাদা সম্বোধনে চাপা পড়েছে তাঁর আসল নাম। কখনো পুরনো দিনের সমবয়সী কোনো সখা দেখাসাক্ষাতে এলে কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় থমকে উপরে চাহনি টেনে নিচের কাউকে জিজ্ঞেস করেন — কেশববাবু কি আছেন? তখনই অনেকদিন পর দাদার প্রকৃত নাম শোনা যায়। নিজস্ব চৌখুপিতে নিঃশব্দ আউল মানুষটি অধিকাংশ সময় লোকচোখের বাইরে-বাইরে থাকেন। হঠাৎ ঘটনা কী, কাহিল শরীরে গড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ইদানীং গ্রামের বাড়িতে তিনি যাতায়াত করছেন। ব্যাপার কী? অনুমানে কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া না গেলেও কেউ বলে গাছ, কেউ ধান, কেউ বলে জমি বেচতে বাড়ি গেছেন দাদা। হতে পারে হাতের পাঁচ তাঁর ফুরিয়েছে। ঢাকায় চুপচাপ বসবাসেও তো বেশ খরচ।

সকাল-সকাল ঘাড়ে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে রিকশা নিয়ে দাদা চলে যান আন্তঃজেলা বাসস্ট্যাণ্ডে। তাঁর হিসাবে অনিয়মিত হলেও প্রায় ষাট বছরেরও বেশি তিনি বাসে চড়েছেন। তখন ঢাকা, কি বাড়ির শহর ফেনী, কোথাও বাস টার্মিনাল ছিল না। আরে, দূরপাল্লার বাসই ছিল হাতেগোনা। এত ধোঁয়া, ধুলোবালির ওড়াউড়ি, যানজট, যাত্রীর গাদাগাদি ছিল কই। তাঁর এলাকার বাসে সবসময় বসার সিট পাওয়া গেছে। এই যে মাঝেমধ্যে গৃহযাত্রা, কদিন পর ফেরা, যাতায়াতের এমন সুবাদে হেলপার-ড্রাইভারের একই চেহারার দেখাদেখি, ছুটকো-ছটিকা আলাপের মধ্যে সখ্যভাবের সর জমে। কথা-চালাচালি করে তারা জেনে ফেলে, দাদা হচ্ছেন একসময়ের তাদের পাড়াগাঁর অবস্থাপন্ন বাড়ির লোক, তিনি চিরকুমার। অবশ্যই এমন মুরগি, সাধুপুরুষের বিশেষ কদর প্রাপ্য। বাসযাত্রায় কখনো-কখনো বাসের কর্মীরাই ভালোবেসে তাঁকে শসা-কলা খেতে দেয়।

মফস্বল থানা সদরের চলনসই রাস্তার তেমাথায় বাস থেকে নেমে দাদা এবার ভ্যানে চড়ে যান নিজ ঝাউ গ্রামের সীমানায়। ইট-বিছানো পুরনো সরু পথের দুপাশে রোদ-ছায়ার জড়াজড়ি। পামশু পরা কুলীন পায়ে হাঁটার পর টিনের দোচালা — এ-অঞ্চলের বহুদিন আগের বড় বংশের গুপ্তবাড়ি। বাড়িটা এখন নড়বড়ে কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে। ঘুণে-খাওয়া খুঁটির হাঁটু কখন জানি ভেঙে পড়ে। উত্তর-পশ্চিমে বাগান, তাঁর নিচে ধানের জমি, ওই জমি ও বাগান ভাগ করেছে একটা পগার। সীমানা ঘেঁষে নালায় কখনো বারো মাস জল থাকে না। প্যাঁচপেঁচে কালো কাদায় ভর্তি, এরই মাঝামাঝি উপরে ঢিবির পাশে পোক্ত বড় গাছটা চার মাস আগে বিক্রি করে নগদ একশ হাজার টাকা দাদা পেয়েছেন। দূরের কাঁহা-কাঁহা মুল্লুকে গুপ্তদের যে ধানি জমি ছিল আগেই বেচেছেন তিনি। কোনো ভাবাভাবি ছাড়াই বাড়ির সীমানার কাছাকাছি জায়গা বাজার চলতি দামের চেয়েও কমে তিনি ছেড়ে দেন। ঢাকা শহরে খরচ তাঁর অনেক। তাবাদের, গ্রামে গাছগাছালি, জমিজমা রেখে হবে কী, একমাত্র দূরসম্পর্কের ভাইপো ছাড়া বাড়ির শরিক বলে এদেশে কেউ নেই। ছয় যুগ আগে তাঁর মা-বাবা মরেছেন। একে-একে ভাইবোন দেশত্যাগ করে ভারতে গিয়ে নতুন সম্পত্তি করে ওখানে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত। বারবার হাত ধরে কত অনুরোধ তাঁদের, কখনো ভাই-ভাইপোরা বেড়াতে এসে কেঁদে-কেটে উপর্যুপরি অনুনয় — কিসের কী, তাঁর সাফ কথা, ওই পারে গিয়ে স্থায়ী হতে তিনি অনিচ্ছুক, একা হলেও এখানেই

থাকবেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভেতর দাদাকে রেখে মহাবিরক্ত আত্মীয়-স্বজন শেষাবধি যার-যার ডেরায় ফিরে গেছে। বছর ছয় আগে বড় ভাই মরেছেন। খবর পেয়ে তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তিতে যাওয়ার মনস্থ করলেও ভগ্ন শরীরের অবনতির কারণে উদ্যোগ বরবাদ হয়ে যায়। ওপারের আত্মীয়রা তো তাঁর এমন শোচনীয় দুরবস্থা জানে না। তাঁরা রেগেমেগে তাঁর মুণ্ডপাত করে।

এজিবি অফিসের উলটোপাশে ফুটপাথ-লাগোয়া পুরনো দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বড়-বড় পাতার ছালখোসা ওঠা কয়েকটা উঁচু মোটা গাছ। তার ওধারে বাঁশের বেড়ার টিনের ছাপরা। বাস-অনুপযোগী লম্বা জায়গাটা আদৌ রাজধানীর বুকের অংশ বলে ভ্রম হয়। বরাবর আড়ালে মুখ ফিরিয়ে রাখা এখানের ছেঁদো বাসিন্দারা একপাল গরু পোষে, বালতিভর্তি রোজ দুধ বেচে। দুপুরের চড়া রোদে গরুর গায়ের ও গোবরের মিলিত দুর্গন্ধে গোটা এলাকা নির্যাতিত হয়। তখন পথচারী, টং দোকানি, কি অফিসের মানুষজন নিয়মিত গালিগালাজ করে মুখ সমর্থ ও সচল রাখে। এখানে টুটাফাটা টিনের ছাওয়া খেলের কাছের গৃহবাসী দাদার টু-শব্দটিও নেই, খারাপ গন্ধ নিয়ে তিনি পুরো চুপ। ওই চালা অংশের কতগুলো নোংরা জামাপ্যান্ট পরা মলিন চেহারার শিশুসন্তান বুকে বইখাতা জড়িয়ে লেখাপড়ার নামে দাদার কাছে আসে। তাদের ফ্লোরে বসিয়ে অকাতরে তিনি জ্ঞানদান করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে বাচ্চাদের নজর বইয়ের চেয়ে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে বেশি-বেশি যায়। বুড়ো দাদা কখন হাতে করে কিছু খাওয়া এনে তাদের বিলি করবেন। দাদাও এই দুস্থ বাচ্চাদের খাইয়ে দারুণ আনন্দ পান। তাঁর রান্নার মহিলা যেদিন কাজে আসে না, লোকের অভাবে শরীরের কাঁপুনি ঠোঁটে-মুখে চেপে দাদা বাচ্চাদের জন্য লজেন্স, বিস্কুট, নিজের খাওয়ার রুটি নিয়ে আসেন। এই শিশুদের সঙ্গে খাইয়ে আছে বিড়ালগুলো। বছর-বছর বিড়ালগুলো বাচ্চা দিচ্ছে আর তাদের হারিয়ে ফেলছে। কয়েকটা বয়েসি বিড়াল দাদাকে ছেড়ে কোথাও যায় না। দাদা কখনো নিচে এলে বিড়ালগুলোও নেমে তাঁর পায়ের পাশে ঘুরঘুর করে। বিড়ালদের জন্য আছে দুধের খরচ। সপ্তাহে দুই-তিন দিন মাছের বরাদ্দও থাকে। দাদার দোতলার সামান্য তফাতে সোজাসুজি অংশে ডেভেলপিং অফিসের পিয়ন সালামত থাকে। তাঁকে বারান্দায় এসে তিনি ডাকেন। বিষয় কী? দ্যাখো, বিড়ালের জন্য ভালো কিছু খাবার না আনলে নিরীহ প্রাণীগুলো অভুক্ত থেকে নাকি অভিমান করে আছে। শুনে সালামত তাঁর চেয়ালের হাসি সারা শরীরে ছড়িয়ে দিতে চায়। — দাদা একা মানুষ, টাকা তাঁর খাবে কে, এখন বিড়ালই খাচ্ছে।

কোনো-কোনো রাতে ফুর্তিবাজ দু-তিনজন পুরনো অধিকারে দাদার বাসায় এসে উপস্থিত হয়। দাদার আদরে তাঁদের প্রবেশ এখানে অবাধ। খরচ করার মতো সময় তো পড়েই থাকে। এই রসভোক্তারা জানে, বয়সের উদ্বেগে বহুদর্শী মানুষটা ঢুলুঢুলু হলেও এখনো গুয়ে যাননি। ঘণ্টা-তিন জোর আমোদ করা যাবে। ড্রিঙ্কের বোতল, পরোটা-কাবাব, চানাচুর-চিপস সব নিয়ে আসে তাঁরা। বোতল কখনো না আনলেও ভোগ-সন্তোষে ঘাটতি নেই। নিয়মিত ঝাঁট না পড়া ভেতরের রুমে কাঠের যে জীর্ণ আলমারি তার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রাখা বোতলে অবশিষ্ট কিছু-না-কিছু জিন-ছইন্ধি-ভদকা আছে। এক সিটিংয়ে ওই মাল যথেষ্ট। আধা পেগ, কোনো বোতলের তলানি ঝেড়ে নিলে দিব্যি চুর নেশা জমে। অনিষ্ট পাত্তা না দিয়ে একাধিক পদের সুরা মেলানোর পদ্ধতি দাদাই শিখিয়েছেন, তাঁর মতে ম্যাড ককটেল। বেশি-বেশি বরফ দাও। দাদার ছোট্ট ফ্রিজটা অনেকদিন ধরে নষ্ট; আর মেরামত উপযুক্ত নেই। ঠান্ডা

জলের বোতলের জন্য নিজাম ছেলেটাকে বাড়িঅলার বাসায় পাঠাতে হয়। মরহুম বাড়িঅলার দুই ছেলে। ছোটটা কাবু-কাতরা ধোঁয়াখোর সাইফুল বাড়ি এখন দেখভাল করে। ঠাণ্ডাজলের বোতল দরকার শুনে পরিষ্কার সে বোঝে — দাদার বাসায় মউজ করা মেহমান এসেছে। দুটো কচি বয়সের ছেলে রেখে বাড়িঅলা আকস্মিক মারা গেলে পুরনো ভাড়াটে এই দাদা এদের আগলে রাখেন। ট্যাটন আত্মীয়দের ছোঁমারা ফন্দি থেকে অভিভাবকশূন্য দুই বালকের সম্পত্তি তিনিই রক্ষা করেছেন। দাদার জন্য এতদিন তাঁদের আলাদা মহকুমাত ছিল। হালে বয়স বা সঙ্গদোষে সাইফুলের দাদার সামনে বেফাঁস কথা বলতে মুখে বাধে না। তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভঙ্গিও সে করে। মনে-মনে তিনি সিদ্ধান্ত নেয়, ঢাকায় আর নয়, অনেক হয়েছে, এবার গ্রামে ফিরবেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

বছর এগারো আগে, এই পাইওনিয়ার এলাকায় এত মানুষ, তাঁদের কোলাহল, যানচলাচল, উঁচু-উঁচু নতুন বিল্ডিং ছিল না। অনেকটা নিরিবিলি চারপাশ। সন্ধ্যার আগেই দুপাশের অনাবশ্যক গাছপালার ছায়া নেমে বুঝি ভাঙুর রাস্তার ওপর লেংটা শুয়ে গেছে। আগাম কালো করেছে পরিবেশ। শেওলাধরা ইটপাটকেল ফেলে রাখা, জঞ্জাল-ধুলাময় শহরের অসার এই প্রান্তে লোক যাতায়াতে ভাটা দেখা যেত। দাদার বাস তখন নোনাধরা বাতিটার নিচতলার সিঁড়ির মুখের এক রুমে। কোনোক্রমে এঁটে যাওয়া রুমে একে অন্যের নিশ্বাসের ছোঁয়ার মধ্যে আরো থাকতো সম্পর্কে দুই ভাইপো। বাসা থেকে হেঁটে, কখনো তাঁরা রিকশায় গিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করত। থাকা, খাওয়াসহ তাঁদের যাবতীয় খরচ অকাতরে দাদা দিয়েছেন। পাশের পরপরই চাকরি পেয়ে এক ভাইপো বউ নিয়ে থাকত ইন্দিরা রোডে; আরেক ভাইপো বিদেশের এক ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করছে। কবছর পরপর শিক্ষক ভাইপো দেশে এলে অবশ্যই কাকার কাছে সে দীর্ঘ সময় কাটায়। ইন্দিরা রোডের ভাইপো কাকমুখেও যদি খবর পায় কাকা অসুস্থ তো উড়াল দিয়ে সে চলে এসেছে। কাকাকে জোর করে উঠিয়ে কাছে নিয়ে রাখত। কিন্তু দিন দুই যেতে না যেতেই যথারীতি দাদা তাঁর আস্তানায় ফিরে আসার জন্য উদ্যত। বিড়ালগুলো না খেয়ে আছে। তাঁর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ভরসা করা নিঃসহায় মানুষগুলো পথের ওপর দৃষ্টি ফেলে আছে। দুটি বাড়তি মানুষ, যারা রক্ত সম্পর্ক তো দূর, ধর্ম সম্পর্কেও কেউ না, একজন মোসলেম দুপুরবেলায়, আরেকজন নিজাম রাতে দাদার বাসায় প্রায়ই ফ্রি খায়। বাসার সামনের ফুটপাথের ডানে দেয়াল ঘেষে টং দোকান পেতে মোসলেম রোজ পান-বিড়ি-সিগারেট বেচে। বাড়ি না রামপুরার কোনো অফিস সকালে চালু হওয়ার আগেই তাঁর লাল রঙের বাস্কর দোকানটা দাদার সিঁড়ির নিচ থেকে টেনে সে ফুটপাথে সেট করে। এই মানুষটার চোখে ছানি জমেছে — পরিষ্কার নাকি সে দেখতে পায় না। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ করার খরচ দাদার কাছে সে চেয়ে রেখেছে। দাবির মতো করে তাঁর কথা — বাবু টাকা দিলেই অপারেশনের জন্য সে হাসপাতালে চলে যাবে। নিজাম ছেলেটা টোটো করে রাতের বেলা এসে হাজির। তার নিজস্ব একটা টিনের থালা আছে। পেটের ওপর থালাটা চেপে ধরে সোজা চলে যাবে দাদার রান্নাঘরে। ঠোঁটেমুখে ব্যস্ত ভাত গুঁজে দাদার বাসার ফ্লোরে পড়ে তার টানা ঘুম। ছেলেটার বাপ সিরাজ ছিল বাইন্ডার। একসময় দাদা পুরানা পল্টনের যে অফসেট প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের কর্মধ্যক্ষ ছিলেন, ওখানে কাজ করতো সিরাজ। শরীরে অচল হয়ে সে নিজের গ্রামে ফিরে গেলে তার ছন্নছাড়া ছেলেকে দাদার হাতে সঁপে দিয়ে যায়। এখন মোসলেম ও নিজাম — এই আলগা দুজনের ঈদ-কোরবানিরও যাবতীয় খরচ দাদার জোগান দিতে হয়।

অকৃতদার দাদার কামরায় একাকী নিভৃত জীবন, মামুলি বাড়ির নিরিবিলি বাস, নিরুপদ্রব সীমানা তাঁর যুবা বন্ধুদের বেশ পছন্দ। কেউ-কেউ সাংবাদিক। নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রতিদিন রিপোর্টার সালাম আসে তাঁর সংবাদ অফিসে। মধ্যরাতে জয়কালি মন্দির এলাকা থেকে শেষ বাসে সে বাসায় ফেরে। দাদার কর্মকালীন প্রতিষ্ঠানের কোলের পাশে তখন দৈনিক কাগজের অফিস। যাতায়াতে দেখাদেখি, আলাপ, পরে উভয়ের বয়স ভেঙে ঘনিষ্ঠতা। সালামের নিংড়ানো সুবাক্যে অন্য দৈনিকের রিপোর্টারদের সঙ্গে দাদার বন্ধুত্ব। দূর নিকট করে কোনো-কোনো রাতে একত্রে পানাহার, সঙ্গে চলে কালের বিবরণী, গল্পগুজব। মাখামাখি এখন জমাট। এদের মধ্যে হুমায়ূনের গুণপনা অনেক। সে শুধু সাংবাদিক নয়, ব্যবসায়ীও। বেতনে লোক রেখে রড-সিমেন্ট ছাড়াও বিবিধ ব্যবসার দোকান চালাচ্ছে। তদবিরে বুদ্ধি বলো, ফন্দি বলো — পরামর্শদানে হুমায়ূনের যশ-খ্যাতি আছে। এ-কাজেও তাঁর কমিশন থাকে। কালোপনা, লম্বা ছিপছিপে মোটা ফ্রেমের চশমাপরা এ-মানুষটার বহু সেক্টরে যোগাযোগ, নানা কিসিমের মানুষের সঙ্গে খাইখাতির। কন্ট্রোল দরে ওয়্যার হাউস থেকে হার্ড ড্রিঙ্কসের বোতল জোগাড় করে সে। নারকোটিকস ডিপার্টমেন্টও তাঁকে হাতে রাখতে চায়। তাদের আড়ালের কোনো কালো খবর ফাঁসের উপক্রম হলে হুমায়ূনকে দিয়ে তা চাপা দেওয়া হয়। সাংবাদিক বন্ধুদের কেউ-কেউ বাজার চলতি দামের চেয়ে কমে তাঁর থেকে বোতল নেয়। হুমায়ূনের খরচের হাত বেশ উদার — টাকা যেন তেজপাতা, উড়িয়ে দিতে তাঁর কার্পণ্য নেই। এমনি-এমনি কি হুমায়ূনকে নিয়ে দাদার বিশেষ স্নেহের নজর বহাল! তার আদব-কায়দাদুরস্ত মন দখল করে আছে। সুস্বাদু আহাৰ্য বস্তুর সঙ্গে কণ্ঠতরলের সুযোগে হুমায়ূন উদ্যোগী না হলে বর্তমান অনটনের দিনে সহসা সম্ভব নয়। শরীর যতই বিরুদ্ধে যাক, ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, হাত-পা কাঁপুক, বোতল দেখলে দাদার বুকবন্দি পুরনো পিপাসা শনৈঃশনৈঃ বেড়ে যায়।

গত পরশু থেকে দাদার মনের শান্তি-স্বস্তিতে ক্ষতি হয়েছে। এ-বাড়ির যে-ছেলেকে তিনি হামাগুড়ি দিতে দেখেছেন, তাঁর কোলে পেশাব করে লুঙি ভিজিয়েছে, সর্বক্ষণ যার মুখে ছিল দুধের গন্ধ, এখন সেই ছেলের গৌফ গজিয়েছে, ছ-ফুট ঢ্যাঙ্গা, সে তাঁকেই কি-না বাসা ছাড়ার কঠিন মনভাঙা কথা বলতে পারলো! শুনে নিজেকে সামলে নিতে বিস্ময়ে তিনি বুজে যান। এখানের সবচেয়ে প্রথম বাসিন্দা হলেও জমানা যতই বদলাক, তিনি যে ভাড়াটে সে-খেয়াল তাঁর পুরোপুরি আছে। মাগনা থাকেন না, অনিয়মিত হলেও সাবেক ভাড়াই তিনি দিয়ে আসছেন। গত দুমাসে কোনো ভাড়াই সাইফুলের হাতে দেওয়া যায়নি। হাতের পাঁচের মোটা অংশ গেছে শরীরের চিকিৎসায়। ডাক্তার পরিচিত, তাঁর ফি নয় বাদ, ওষুধ বিনামূল্যে দেবে কে?

দাদার অসুখ-বিসুখ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া আতাহার ডাক্তার বাসা বদলে এখন থাকে কামরাস্তরিতরে নিজের তৈরি নতুন বাড়িতে। চেম্বার তাঁর শান্তিনগরের চৌরাস্তার বাঁপাশে এক ফার্মেসির পেছনের খোপে। ওখান থেকে পাইওনিয়ার রোডে দাদার বাসাটা দূর নয়। সম্ভবত দাদাকে দেখতে-আসতে ডাক্তারের আত্মহ কমতির দিকে। অসচ্ছলতার কারণে গ্রাম মনুষ্য এই আতাহারের ছাত্রজীবন যখন বন্ধ হওয়ার জোগাড়, তখন তিনজন দরদি মানুষ ধরে দাদা প্রতিমাসে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পাশ করার পর আতাহার দাদার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে এসেছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এখন বুঝি ডাক্তারের মনোযোগ থেকে দাদা মুছে যাচ্ছেন। হতে পারে, বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত রোগী দেখে দূরের বাসায় ফিরতে-ফিরতে শরীর ও মনঃসংযোগ তাঁর ঠিক থাকে

না। ডাক্তারের কাছে সালামতকে পাঠিয়ে উপর্যুপরি অনুরোধের পর এক ফাঁকে সে নীরস মুখে বাসায় আসে। দাদার শরীর টিপেটুপে একগাদা টেস্ট দেয়। প্যাথলজির ওই টেস্টের খরচের কারণে হাত থেকে টাকা চলে যায়। শোনা যায়, সাইফুল বাসার চৌহদ্দির তুচ্ছ আদমদের প্রায়শই বলছে — পকেটে টাকা না থাকলে হাঁটতে-চলতেও তাঁর ভালো লাগে না, মেজাজ গরম থাকে। দ্যাখো, কত কম বয়সে ছেলেটা টাকা চিনেছে। সে যখন দুঃসময়ের হিতকারীর সঙ্গে বেয়াদবি ও বাসা ছাড়ার হুকুম জারি করতে পেরেছে, আখেরে ছেলেটা আরো ভয়ংকর হবে। আগামীতে মানসম্মান পয়মাল হতে পারে ভেবে তাঁর মনের মোটা চিকন বিভিন্ন তারে খেদ-আফসোসের টোকা পড়ে।

রুমে পাতলা অন্ধকারের ঘেরাও যখন শুরু, তার আগেই হালকা হলদে বিকেলে চাদর মুড়ি দিয়ে বিমর্ষ দাদা টানটান শুয়েছিলেন। বিড়ালগুলোও কার্যকলাপ, নড়াচড়া, এমনকি চেহারা দেখে নির্ভুল মনিবের হাল যেন বুঝতে পারে। তারা দাদার সঙ্গে উপবাসে, কী নিষ্ক্রিয় থাকতে একাট্টা। দুভাগে দাদার মাথা ও পায়ের পাশে চুপটি মেরে তারা শুয়ে আছে। তাঁকে দেখতে নিঃশব্দে মোসলেম উপরে এসে উঁকি মেরে তখুনি নিচে নেমে গেছে। রান্নার বুয়া বালিশের নিচ থেকে নিজেই টাকা খুঁজে ফুটপাতের পরিচিত হকার থেকে বাজার করে আনে। তাঁর ইচ্ছামতো তরকারি, কুঁচো মাছ পাক করে সে ঢেকে রেখে গেছে। পরে খেয়ে নিলেই হবে। কিন্তু দাদার উঠে বসার ইচ্ছা নেই। বিষাদ বুঝি অনুভূতির ওপর এমন দখল কায়ম করেছে যে, কোনো কিছু ভালো না লাগাই প্রধান হয়ে উঠেছে; কিন্তু সন্ধ্যা ঘুরে আঁধার ঘোরালো হয়ে এলে কাঠের সিঁড়িতে শোনা গেল একাধিক পায়ের ছড়ানো আওয়াজ। ক-মুহূর্ত পর দোতলার পাতলা ঘিলে খুটখুট শব্দ হলে খাট ছেড়ে তিনি নেমে আসেন। বিড়ালগুলো মেহমানদের খোশ আমদেদ জানাতে আগেই দৌড়ে গেছে। শব্দ করা মার্জিত হাত দাদার মুখস্থ। দাদার বাসায় কোনো মান খোয়ানো টেবিলও নেই। কখনো হয়তো ছিল, এখন ব্যবহার-অযোগ্য কিংবা ভেঙে যাওয়ায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। হুমায়ুন তাঁর সঙ্গী দুজনকে পুরনো দাগে ধরা বেতের চেয়ার টেনে বসতে দেয়। এই বাসার ভারী ও ঠুনকো সব তৈজসপত্র ঠোলামালা ধরার অধিকার তাঁর তৈরি হয়ে আছে। চার দেয়ালের মধ্যে বহুকেলে ব্যবহৃত নেহাত যা আছে চোখ বুজে সে বলে দিতে পারে। পানের গ্লাস, পানির জগ টানটানি করে, প্লেটে চানাচুর। রেস্টুরেন্ট থেকে কেনা কাবাব-তন্দুরি সব সে-ই সাজায়। রাতের জন্য দাদার কোনো কাজের লোক নেই। নিজাম ছেলেটা ঘুমানোর জন্য আগেভাগে এলে তাঁকে কাজে লাগানো হয়। আসর না-ভাঙা অবধি নিজাম ডাকের অপেক্ষায় বাইরে সিঁড়ির ধাপে অন্ধকারে বসে থাকে। খাওয়ার টুকরো-টাকরা তার ভাগেও কখনো-কখনো পড়ে। ফাই-ফরমাশ খাটা বাবদ কেউ-কেউ যাওয়ার সময় পানে উদার হয়ে খুচরো টাকার ময়লা নোট তার হাতে গুঁজে দেয়।

পানি-মেশানো ড্রিংসের গ্লাস ফ্লোরে রাখা ছাড়া ব্যবস্থা নেই। নিচু হয়ে গ্লাস তুলে তবে সিপ টানা। দাদা পা মুড়ে তাঁর খাটেই, কখনো বালিশে হেলান দিয়ে বসেন। এখানেও তাঁর কুলীন মানুষের ভঙ্গি শিষ্ট থাকে। মানুষের সাড়া পেয়ে বিড়ালগুলো শরীর-ঘেঁষে যাতায়াত করে, কখনো লেজ ছুঁয়ে আগতদের যেন আদর উপহার দেয়। বিড়ালের এমন বিরজিকর ঘোরাফেরা, পায়ের ফাঁকে অসহ্য চলাচলে হুমায়ুনের মুখে একজন ফোকাস দিলে চোখ টিপে সে ব্যাপারটা উপেক্ষা করার ইশারা দেয়। হুইস্কির গ্লাস চোখের সামনে ধরে দাদা পরখ করেন। রুমের ম্লান পীত আলোয় তাঁর কাছে হুইস্কির রং পরিষ্কার কি-না মুখ দেখে বোঝা গেল না। এবার নাকের কাছে গ্লাস ধরে ভাঙাভাঙা শ্বাস টেনে তিনি গন্ধ গ্রহণ করেন। এই হুইস্কি ডিলাক্স না। নরমাল হুইস্কির রুক্ষতা শরীরের

ভাঁজে-ভাঁজে ছড়িয়ে চনমনে ভাব এনে দেয়। তবে পা-জোড়া আজকাল মাঝেমধ্যে শাসনে থাকছে না। এখন কড়া হুইস্কির কারণে কদম বেসামাল হলে মুসিবত। নিজে দাদা হুঁশিয়ার — গলা পর্যন্ত টেনেও নিচ থেকে কাঠের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে-উঠতে একবারও তিনি পড়ে যাননি। পতন তাঁর পছন্দ নয়। কাহিল বুড়ো শরীর ভেতরে-ভেতরে এখনো হয়তো দৃঢ়। ঘাড় হেলে যাবে, কথা জড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু দারু টেনে তাঁর কুলমর্যাদা ধারণ করা শরীর পড়ে গুঁড়ো হবে, উঁহু, কস্মিনকালেও এমন নজির তিনি হতে দেবেন না। দাদার একাধিক স্নেহাস্পদ — সালামত, মোসলেম, নিজাম, গণি কি এমনি-এমনি তাঁকে গুরু বিবেচনা করে। নিজেদের মধ্যে রসালাপে তাঁদের বলাবলি, বুড়ো বট হেলে যেতে নারাজ। তিনিও জানেন, তালে ঠিক থাকা, নিজেকে পানের পর পোক্ত রাখা দোষ বা দুর্বলতা নয়।

অধুনা মনের মধ্যগত অন্দরের বেশ গভীরে কোথাও ফাটল ধরেছে। ওই চিড় থেকে কষ্ট, নিঃশব্দ রোদন চুইয়ে-চুইয়ে ভেতরে তা চাপ দিচ্ছে। টাকা এখন বসবাসের উপযোগী নয়, একলা মানুষের জন্য দিনকাল বিরুদ্ধে। লোকজনের উলটাপালটা খল স্বভাব ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। বাড়িঅলার ছোট ছেলেটাও তাঁর এখানের নিরুপদ্রব আশ্রয় আর পছন্দ করছে না। বুড়ো-হাবড়াটা কেটে পড়লে বাসা বেশি টাকায় ভাড়া দিয়ে মোটা আয়ের আমদানি সে করতে পারবে। ইন্দিরা রোড থেকে নিকেতনের ওদিকে বাস তুলে নেওয়া ভাইপোও চাইছে সে ফেনীতে ফিরে যাক। কিন্তু ওই নিষ্ফলা গ্রামের পনেরো আনা খালি বাড়িতে গিয়ে কদিন আদৌ মন টেকে না। ঢাকায় এখানে বয়সে ছোট হলেও হরেক জীবিকার সাধারণজন আন্তরিক স্বরে কেউ বাবু, কেউ দাদা ডেকে সময় তাঁর ন্যাড়া হতে দিচ্ছে না। খোঁজ-খবরের নামে পুরনো বন্ধুদের কেউ-কেউ এসে একপ্রস্ত আড্ডা দিয়ে যাচ্ছে। কারো-কারো পানাহারের সঙ্গী, কত মধুর এই বিনোদন। জীবনের বদলে যাওয়া অভ্যাসের বোঝাপড়া কী গ্রামে থেকে সম্ভব!

পাড়াগাঁর সম্মল-সম্পত্তি ফুরিয়েছে, এক আনা বলতে আছে পানাভর্তি ছোট পুকুর, একটা লম্বা দোচালা টিনের ঘর, দক্ষিণে বাঁশঝাড় বাগান — চালতে, আমড়া, কামরাঙা ও গোটা বিশেক সুপারিগাছ। এই বাগানের বহু বছরের একটা ছাইয়ের গাদার ভেতর ছিল লতানো মেটে-আলু গাছ। ছাইগাদা খোড়ল করে মেটে আলুর বড় খণ্ডাংশ তুলে এনে ঢাকায় বিতরণ করে ঘনিষ্ঠদের তিনি মাত করে দিয়েছিলেন। এখন এসবের কোনো মূল্য নেই। শহর-গ্রাম সব একাকার। শহুরে নষ্ট ঝাঁক-আসক্তি দ্রুত পাড়াগাঁয় ঢুকে ক্ষয় বলো, পচন বলো, মাটি ছেনা-চটকানো মনুষ্যদের ফোঁপরা করে দিচ্ছে। হিসাব-নিকাশেও তারা ঘাণ্ড এখন। তল্লাটের মানুষজন জানে, বাবু নিঃশ্ব। কোনো এককালে তিনি ছিলেন বড় সম্পদশালী পরিবারের মানুষ। কোথায় ওই বড় পরিবার, এখন শূন্য। ধুর, এই লোকের এখন দাম আছে নাকি! ভক্তি-শ্রদ্ধা টানে-টানে তাই পাতলা হয়ে গেছে। পথেঘাটে দেখে পাড়া-প্রতিবেশী আগের মতো খাতির জমানো গলা, শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ, কিংবা বাবু বাড়িতে আছেন তো কদিন বলে কোনো আন্তরিকতা দেখায় না। এর চেয়ে ঢাকার পাইওনিয়ার রোডের ধর্তব্য নয়, চুনকাম খসা বাসার নুন-ঝাঁঝরা চৌখণ্ডে যথাসম্ভব নিঃসঙ্গ সময় ফুরিয়ে দেওয়া ঢের ভালো। কে বলে এখানে তাঁর সুহৃদ নেই? এই যে দিন-দুনিয়ার হাল-হকিকত জানার উদ্দেশ্যে খবরের কাগজও তাকে পড়তে দেওয়া হয়। কোনো-কোনো দিন পড়ার অনিচ্ছায় সংবাদে হেড়িয়েও নজর দেওয়া হয় না। নিচের অফিসের পিয়ন ছেলেটা গণি কাগজটা সকালে দিয়ে দশটার সময় এসে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। গণি পারলে হইচই করার স্বরে কথা বলে — দাদা হচ্ছে আমাদের মনের মানুষ। আমরা থাকতে এই

সামান্য কাগজটা তাঁকে কিনতে হবে কেন?

দাদার ধারণা, নিচে ও আশপাশের পিয়ন-দারোয়ান-দোকানি থেকে মেকানিক-মিস্ত্রি যারা আছে, মাসের পর মাস তাঁকে দেখছে, একজন প্রৌঢ়ের আটপৌরে বিবাগী সন্ত জীবন পালন করতে, এরা তার কাছে অনেক বেশি অকপট, উদার, দরদি ও নির্ভেজাল। এই যে বাসায় আনন্দময় সময় ব্যয়ে আসা সাংবাদিকরা পত্রিকার সৌজন্য সংখ্যা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিলেও কখনো তা রক্ষা করেনি। মালের ঘোরে নিচে নামতে-নামতে তাদের দেয় কথা ওখানেই ফেলে গেছে। দাদার এমন সাজানো নিশ্চয়তার ওপর কোনো আস্থাও নেই। মহাসমারোহে স্বাদে বৃন্দ সঙ্গীরা হচ্ছে মৌচাকের মাছি, উড়লো-বসলো, সুযোগ বুঝে অন্য চাকে চলে গেল — ব্যস! দেশের, কি দুনিয়ার খবর মানে দুঃসংবাদ। টিভি দেখতেও তাঁর ইচ্ছা হয় না। হ্যাঁ, পুরনো সাদাকালো ছোট টিভি একটা রুমে অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। টিভিতে গোলমাল, ছবি লাফায়, সাউন্ড পরিষ্কার নয় — গ্যা-গ্যা করে। মেরামত করার সাড়া তাঁর মনের মধ্যে টের পান না। মগবাজারের টিভি কোম্পানির পরিচিত মেকানিক যুবক মাইকেল শেষবার যন্ত্রপাতি সারাতে এসে রায় দিয়ে গেছে — দাদা, এরপর নষ্ট মানে ফিনিশ, চলবে না আর, বাতিল। ডিশ লাইনের ব্যবসায়ী আবু দাদার বাসার লাইন টেনে দিয়ে মাসে-মাসে কখনো ভাড়া নেয়নি। বেশ মজার মানুষ দাদা, তাঁর থেকে পুরনো দিনের কাহিনি, কত রঙ্গরসের গল্প শুনে মন ফুরফুরে করেছে সে। এমন বিশেষজ্ঞ মানুষটাকে ফ্রি-সার্ভিস দিতে পেরে সে তৃপ্ত; কিন্তু আবু তো দাদাকে টিভি দিতে পারে না। এ নয় টেলিভিশনের ব্যাপার, টিঅ্যান্ডটির ল্যান্ডফোনের সংযোগ গত সাত মাসের বিল বাকি পড়ায় বিচ্ছিন্ন। কী আর করা — সময়ের সঙ্গে পারা মুশকিল!

বেশ কিছুদিন হলো গোছগাছ দিনযাপনে বিঘ্ন ঘটছে। এলোমেলো হয়ে গেছে ছিমছাম থাকার উপায়। টানাটানি থাকতে পারে; কিন্তু ঘাটতি-কমতির জন্য মন বলছে গুরু হয়ে গেছে হারানো সুর। বীতশ্রদ্ধ দাদা অবসাদে বারান্দায় চেয়ার পেতে দৃষ্টি ধরে রাখেন রাস্তার উদ্দেশে। কী দেখছেন তিনি? না, নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে স্মৃতি খনন করে খোয়ানো অতীত ধরতে চাইছেন? বোঝা সম্ভব নয়। থমথমে মুখে একান্তে দাদা নিজস্ব স্মরণ নিয়ে বিভোর। বিড়ালগুলো মিউমিউ করণস্বরে পায়ের পাশে বসে ডাকাডাকি করলেও তিনি সাড়া দেন না। খুঁটিনাটি থেকে ঘটনা পরম্পরা, তাঁর কুলবৃত্তি, প্রথা, ব্যবহার জোড়া দিয়ে-দিয়ে চূড়ান্ত উপলব্ধি করলে একটাই মানে — বয়সের তিনকাল গেছে, শরীর ভাঙবেই; কিন্তু মন ভেতরে-ভেতরে জখম হয়েছে বেশি। মন সারাবেন কী দিয়ে? সাতাত্তর বছর হতে যাচ্ছে, মনের ওপর দিয়ে তো ধকল কম যায়নি। এই যে তেতাল্লিশ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জীবন বাঁচাতে সব কিছু ফেলে বর্ডার পার হয়েছিলেন। সে কী দুঃসহ সময়! ফিরে এসে শোনে, তাঁদেরই মাঠেঘাটে কামলা খাটা দুমুঠ খুদকুঁড়োর দরকারে ক্ষেতের ঢেলায় মুগুরমারা, সামান্য একটা পরগাছা মোজাম্মেল দলে-বলে গুণ্ডবাড়ি লুট করেছিল। মন তছনছ চুরমার হয়ে যায়। সেই থেকে মন আর জোড়া লাগেনি, মজবুত, স্ফীত, তাজাও হয়নি। তাঁর বিমর্ষ মুখ পড়ে শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন — একলা জীবন উদ্যাপনে কত দুর্ভোগ, অন্তহীন সমস্যা। বলা তো যায় না কোন সময়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তাঁর উচিত ভিটেমাটির মায়া ছেড়ে রক্ত সম্পর্কদের কাছে জীবনের বাকি দিন কাটানো।

তিন নম্বর পেগের শেষ ফোঁটা জিভে নিয়ে হুমায়ুন শূন্য গ্লাস ফ্লোরে রেখে মুখ তুলতেই সে ওপরমুখো নজরসহ জমে যায় — ঘটনা কী,

দাদার মুখ কেমন ভারিঙ্কি। সে কি ঠিক দেখছে? অন্যদিন মুখের আঠা মুছে দাদার কথার পিঠে কথা, নিংড়ানো কত স্মৃতি, তাঁদের আমলের স্বচক্ষে দেখা নেতাদের বাহাদুরি বয়ান করেন তিনি। হুইস্কি আজ কি তাঁর পেটে জিন্মাই করছে না? মাল কি ভেজাল? উঁহু, এই তো তাঁর নিজের শরীরের অলিগলিতে মাথার খুলির নিচে চমৎকার কত তালের বাজনা। তাহলে? দাদার কেন চনমনে ভাব নেই? কোনো কারণে তিনি কি বিষণ্ণ? নাকি, তাঁর শুকনো শরীর বয়সের ভার ও পীড়ন ধারণে এখন অসমর্থ? তাই যদি হয়, ড্রিংকস নিয়ে দাদার এখানে আসর বসানো ঠিক হচ্ছে না। বাসায় দাদার একা বসবাসও উচিত নয়। দাদাকে নিয়ে অকথিত কষ্ট নিজের মধ্যে লতিয়ে উঠলে পরিবারশূন্য বুড়া মানুষটার জন্য বিস্তৃত মমত্ব হুমায়ুন নিশ্চিহ্ন টের পায়। দরদ-মহব্বতে তৈরি ফিনফিনে এক বাষ্প তাঁর অন্তস্তলে দ্রুতই ঘনীভূত হচ্ছে। না, একেজো দাদার সঙ্গে হুইস্কি খাওয়া ঠিক হচ্ছে না। অসমর্থ কাঠামোর মানুষ, হাড়-মাংসে শাঁসের অভাব, দিন-দিন ক্ষীণ হচ্ছেন তিনি, এই মানুষটা পানের প্রতাপে হঠাৎ অসুস্থ হলে দুর্নামের ভাগীদার হবে তারাও।

হুমায়ুন দাদার হাতের গ্লাসটি নিয়ে নিচে রাখতে-রাখতে বলে — ‘আজ থাক।’ তখনি দাদার মুখ থেকে খসে আসে অস্ফুট আত্ননাদ। এর মানে একটাই — বলো কী, সবে গুরু, আরো পেগ দুই পেটে না পড়লে শরীর বলো, মেজাজ বলো কিছুই উত্তম থাকবে না। এমন ব্যাখ্যা দাদার থেকে হুমায়ুন আগেও শুনেছে। বুঝি এবার সে হালকা কণ্ঠে রেহাই খোঁজে — ‘আরেক দিন ঠান্ডা ওয়েদারে বসা যাবে।’ দাদা ঘাড় কাত করে ফ্লোরে রাখা বোতল জরিপ করেন। তাঁর ধারণা, প্রায় সিকিভাগ আছে। হাত তুলে গ্লাসে তিনি মাল ঢালার ইশারা রাখতেই তাঁর চিবুক ঝুলে পড়ে। হুমায়ুনের ইচ্ছা হয় না। বিপদ না জানি আজই ঘটে। দেখো, মানুষটার অনুমানের ক্ষমতা কী অসাধারণ! শুধু মুখে চাহনি টেনে মনের কথা ধরতে এখনো ওস্তাদ তিনি। — ‘হুমায়ুন, আমি পুরো ফিট, ভয় নেই, ঢালো।’ বলেই খাটে নড়েচড়ে তিনি সরে বসতে গেলে প্রায় ঢলে পড়ার উপক্রম হন। হুমায়ুন খপ্প করে তাঁকে ধরে ফেলে। সেকাতর গাড় স্বরে সে মাথা নাড়ে — ‘না দাদা। বোতলের লেফট ওভার তো আপনার কাছেই থাকছে। একটা কথা বলি। কিছু মনে করবেন না।’

এরপর চুপ। শব্দশূন্য রুমের নীরবতা ক্রমশ ঘন হতে থাকে। এই একটা কথা বলার ব্যাপারে হুমায়ুন কি দ্বিধায় আছে? তাঁর চেহারা বলছে, কথা নিয়ে সে ভাবনাচিন্তা করছে। সঙ্গী দুজনের গ্লাস খালি হয়নি এখনো, তাঁরা বিরতি দিয়ে সিপ্ টেনে চলেছে। বোঝা যায়, পানে এখনো ঘাপ্তা হয়নি এরা। — ‘বলো।’ আর্দ্র স্বরে দাদা সায় দিলে হুমায়ুন নিজের হাতের আঙুল দাদার আঙুলের ফাঁকে নিয়ে সদাচার রক্ষার মতো উচ্চারণ রাখে। ‘আমার মনে হয়, শরীরের যে-অবস্থা আপনার এখানে আর একা থাকা ঠিক নয়। যদি অনুমতি দেন, আমরাই ওই পারে আপনাকে রেখে আসতে পারি।’ দাদার ব্যাকব্রাশ পাতলা সাদা চুলের ওপর দিয়ে রুমের আলো বুঝি পিছলে যাচ্ছে। সুঁচালো নাকের ডগায় পড়া ফোঁটা আলোয় মুখচ্ছবিও ধরা যাচ্ছে না। তাঁর দৃষ্টি সামনের লবণাক্ত দেয়ালের ম্যাডম্যাডে রঙের ওপর স্থির। চারটি মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া রুমে নিস্তব্ধতাই প্রধান। ধীরে দাদার ধ্যানী মূর্তির মৌনভাব ভেঙে গেলে শোনা যায় অতিশয় শান্ত কণ্ঠ — ‘দেখো, চারাগাছ মাটি থেকে তুলে আরেক জায়গায় লাগালেও বাঁচানো যায়। বড় হয়। কিন্তু গাছ বুড়ো হলে অন্য জায়গায় পুঁতে গোড়ায় শত জল ঢাললেও বাঁচানো যায় না। আমি বুড়ো গাছ, ওই পারে গিয়ে কি বেশি টিকবো?’ মর্মে জমা এমন জবাবির পর তাঁর নিজস্ব মাটিতে থাকার ব্যাপক স্পৃহা রুমের মধ্যে হাহাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। □



এখানে নয় অন্য কোনোখানে

জাকির তালুকদার



আজো অন্যদিনের মতো সকাল সাতটায় বেরিয়ে গিয়ে রোজকার মতোই সন্ধ্যা বাঁকরে যাওয়ার অনেক পরে বাসে ঝুলতে-ঝুলতে মহল্লার স্টপেজে নেমে কাঁচাবাজারে পেঁয়াজ, টমেটো, শসা, কাঁচামরিচ, মানকচু কিনে নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন তিনি। তারপর থেকেই অন্যরকম ব্যস্ততা তার। এই শতাব্দীতে এরকম ফ্ল্যাটবাসী পরিবারে কেউ কাউকে তেমন একটা খেয়াল করে না। ছেলে সদ্য ভার্শিটি শেষ করেছে। ভালো সাবজেঞ্চে পড়েছে এবং ভালো রেজাল্ট। চাকরি হয়ে যাবে। এখনই অফার আসছে। ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে-টুরে বেড়াচ্ছে ছেলে। বাসায় ফিরতে একটু রাত হলে কেউ বিরক্ত হয় না। মেয়ে তার নিজের ঘরে। ল্যাপটপ, মোবাইল, হেডফোন নিয়ে মহাব্যস্ত। মা তাকে বিকেলের নাশতা দিয়ে গেলেও সেগুলো টেবিলের এক কোনাতেই ঠান্ডা মেরে যাচ্ছে।



অলংকরণ : সুলেখা চৌধুরী

খাওয়ার ব্যাপারে বেদম আপত্তি মেয়ের। ডিশ টিভির কল্যাণে শ-দেড়েক চ্যানেলের নায়িকাদের স্লিম ফিগার দেখে-দেখে এই দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণী-যুবতীদের খাবার দেখলেই বমি আসে। যেভাবেই হোক, নিজেদের ওই রকম স্লিম রাখার সাধনায় দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায়। তার তো অন্যদিকে তাকানোর কোনো সুযোগই নেই। আর তাদের মা তো ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে, সেইসঙ্গে নিজের কিছু সমাজকল্যাণ কর্মসূচি নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে স্বামীকে সকালে নাশতা আর রাতে ভাত বেড়ে দেওয়া, সন্ধ্যায় চা দেওয়া আর বাড়তি খরচের টাকার জন্য মাঝে-মাঝে হেস্তনেস্ত করা ছাড়া স্বামী কী করছে না করছে তা দেখার সময়-সুযোগ কোনোটাই নেই। ইচ্ছাও নেই বোধহয়। আর আজ তো সন্ধ্যায় তাদের শৌখিন এনজিওর মিটিং রয়েছে। তাই বাড়িতে মেয়ে এবং গ্রাম থেকে নিয়ে আসা কাজের মেয়েটা ছাড়া আর কেউ নেই। ফলে আলমগীর হোসেনের সুযোগ ঘটে যায় নিজের মতো করে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার। কাজের মেয়েটাকে একবার শুধু চায়ের কথা বলেই নিজের কাজে মগ্ন হয়ে যেতে পেরেছেন তিনি।

কাগজপত্র প্রায় গোছানো হয়েই গেছে। একটা মাস ধরে একটু-একটু করে গোছাচ্ছেন তিনি। একটু-একটু করে, খুব লুকিয়ে-লুকিয়ে, কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি না করে। ছেলে, মেয়ে, তাদের মা — কেউ জানে না, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নিজের সমস্ত সঞ্চয়ের টাকা ভাগ করে করে জমা দিয়ে দিয়েছেন তিনি। ব্যাংকের একটা ডিপিএস, আর জীবন বীমার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে এসেছে প্রায়। সেগুলোর বাকি কয়েক মাসের টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে স্ত্রীকে নমিনি করে কাগজপত্র তৈরি করে দিয়েছেন। বাড়ির পানির বিল, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ। গত মাসে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাবা এবং মাকে নিয়মিত খেতে হয়

ট্রেনের মধ্যকার ঘটনা। কথা
হচ্ছে বিভিন্ন যাত্রীর সঙ্গে ভানুর।
একজন জিজ্ঞেস করল ভানুর
গ্রামের নাম। ভানু বললেন।
শুনে সবাই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে
বলল, এটা কোনো নাম হলো?
বদলে ফেলুন। ভালো কোনো
নাম রাখুন গ্রামের।

ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস আর বাতের ওষুধ। তাদের ছয় মাসের পুরো ওষুধ কিনে দিয়ে এসেছেন। অন্য ভাইদের জানিয়ে দিয়েছেন পারিবারিক জায়গা-জমি-সম্পত্তি তারা যেমন ইচ্ছা, ভাগ-ব্যবহার করতে পারে। স্ত্রীকে নিয়ে তার চিন্তা নেই। ছেলেমেয়ে মাকে চালিয়ে নেবে। কাজের মেয়েটাকে গ্রামে ফেরত পাঠানোর কাজটি বাকি আছে। সে-ব্যবস্থাও অবশ্য করা হয়েছে। তার বাপকে খবর দিয়েছেন তিনি। আজ রাতেই এসে পৌছাবে সে। বছরে দুবার মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যায় সে। আজো আসছে সেই রকম নিয়ে যেতে। তার হাতে এবার কিছু বেশি টাকা দিয়ে দেবেন। আর তো মেয়েটার ফিরে আসা হবে না এই বাসায়। কেবল কাজের মেয়েটার জন্যেই বুকের ভেতর একটু কষ্টের অনুভূতি এলো। মেয়েটা কেন যেন খেয়াল রাখে তার। বাড়িতে ফিরলেই কাছে এসে ঘুরঘুর করে। মুখ দেখলেই বুঝতে পারে মন তার খারাপ কি না। মাথা ধরেছে কি না। মাথার ব্যথাটা তার খুব নিয়মিত সমস্যা। মাঝে-মাঝে বেধড়ক বেড়ে যায়। সে-সময় বিছানায় লম্বা হয়ে একটু আহ-উহ করলেই কপালের ওপর ঠান্ডা কিশোরী-হাতের স্পর্শ পাওয়া যায়। কপাল টিপে দিচ্ছে রিনা প্রবল মমতায়। এই দৃশ্যে গা করে না কেউ। বউয়ের তখন বাইরে বেরোনোর সময়। একবার জানতে চায় তিনি প্যারাসিটামল খাবেন কি না। তারপরেই বেরিয়ে যায়।

আজ বাড়ি ফিরতে গিয়ে মনে হলো কতদিন বাড়ির কারো দিকে ভালো করে তাকাননি তিনি। অন্য কেউ-ও তার দিকে তাকায় না বটে, কিন্তু তিনি তো একই কাজ করতে পারেন না। গোছানোর কাজ করতে-করতেই একবার মেয়ের ঘরের দিকে এগোলেন। তার ঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে ডাকতে যাবেন নাম ধরে, এই সময় কানে এলো ফোনে কারো সঙ্গে চোঁচিয়ে ঝগড়া করছে কন্যা। যে দুয়েকটা শব্দ কানে এলো, তাতে তিনিই যেন ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মেয়ে ফোনের ওপারের শ্রোতাকে গালি দিচ্ছে স্ট্রিট গার্ল কুন্ডি মাগি বলে। এই ভাষায় কথা বলছে তার মেয়ে! কোনো এক ফারহানের সঙ্গে মেয়ের কাইজ্জা বাধানোর চেষ্টা করছে ফোনের ওপারের পেতনি একটা বুক-পাছাহীন মেয়ে, যার সঙ্গে অ্যানাল ফাকিং ছাড়া অন্য কিছু করতে পারবে না ফারহান বা কোনো মরদ, সেই মাগির এমন সাহস কী করে হয় তার বয়ফ্রেন্ড রে ভাগাইতে আসার! মেয়ে আরো হুমকি দেয় এই বলে যে, আমার মায়ের কানেকশন জানোস? রাজা-উজির, আমলারা আমার মায়ের অ্যাডমায়ারার। আমার মারে কইলে তোরে তো তোরে, তোর বাপ-ভাইরে পর্যন্ত রাস্তায় নাক-ছেঁছুড় দেওন লাগব।

মেয়ে তার মায়ের সোশ্যাল পাওয়ার নিয়ে দারুণ গর্বিত! বাপের কথা বলে না। আসলে বাপের যে কোনো স্ট্যাটাস-ক্ষমতা নেই, সে তো ছেলেমেয়েরাই সবার আগে বুঝতে পারে। আলমগীর হোসেন আলগোছে সরে এলেন মেয়ের দরজা থেকে।

তখনই দরজার বেল বেজে উঠল অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে। এই সময় কারো তো আসার কথা নয়!

রিনা দরজা খোলার আগে একবার জিজ্ঞেস করে — কে?

খোল!

অস্থিরতা এবং ধমকের মিশেল। ছেলে ফিরেছে। অসময়ে। মুখ থমথমে। আলমগীর হোসেন জিজ্ঞেস না করে পারেন না — কী হয়েছে পাভেল?

বাপকে দেখে বিরক্তির সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি অটোম্যাটিক যোগ হয়ে যায় চেহারায়। কোনো উত্তর না দিয়েই নিজের ঘরের দিকে এগোয় ছেলে। আলমগীর হোসেনের সমস্ত শরীর বিম্বিত হয়ে ওঠে রাগে। এভাবে তাচ্ছিল্য দেখাবে ছেলে! প্রশ্ন করলে উত্তরটা পর্যন্ত দেবে না! দুই পা এগিয়ে তিনি পথ আটকান ছেলের। খুব ঠান্ডা গলায় প্রশ্নটা করেন আবার — কী হয়েছে?

ছেলে তীব্র বিরক্তি নিয়ে বাপের মুখের দিকে তাকায়। তারপরেই পরিবর্তিত হয়ে যায় তার মুখের চেহারা। বিরক্তির বদলে বিহ্বলতা, একটু ভীতিও। এমন কিছু একটা আছে বাপের ভাবলেশহীন মুখে যা বহু বছর দেখেনি পাভেল কিংবা বাড়ির কেউ। তার মুখে কথা জোগায় না।

একই ভঙ্গিতে আলমগীর হোসেন জিজ্ঞেস করেন — কী হয়েছে?

বাংলালিংকের চাকরিটা আমার হলো না।

তাতে কী হয়েছে? একটা চাকরি হয়নি, আরেকটা হবে।

আর হবে! ছেলে এবার একটু-একটু করে নিজেকে ফিরে পাচ্ছে — কানেকশন ছাড়া করপোরেটে বড় চাকরি হয় না বাবা। আমি কানেকশন কোথায় পাব?

ঠিকই তো। আলমগীর হোসেন হেসে ওঠেন শব্দ করে — তোর বাপকে কে চেনে? চিঠি পেতে হলেও ঠিকানাতে কেয়ার অফ দিতে হয় তোর মায়ের নাম। এমন অনামা বাপ দিয়ে চলবে না রে। তার চাইতে বদলে ফ্যাল!

মানে? ছেলে বুঝতে পারেনি বাপের কথার পুরো তাৎপর্য।

তিনিও পুরোটা বোঝান না। শুধু আবার বলেন — বদলে ফ্যাল!

এবার ছেলের মুখ লাল হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছে সে। নির্বিকারভাবে আলমগীর হোসেন বলেন — জীবনে ওপরে উঠতে গেলে মানুষের কত কিছু করতে হয়! এ আর এমন কী? তবে অসুবিধা হবে না।

বলতে-বলতে নিজের ঘরে চলে এলেন তিনি।

ঢাকার ভানুর কৌতুক কেউ কি এখনো শোনে? তাহলে সেই গল্পটা মনে পড়ার কথা। ট্রেনের মধ্যকার ঘটনা। কথা হচ্ছে বিভিন্ন যাত্রীর সঙ্গে ভানুর। একজন জিজ্ঞেস করল ভানুর গ্রামের নাম। ভানু বললেন। শুনে সবাই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, এটা কোনো নাম হলো? বদলে ফেলুন। ভালো কোনো নাম রাখুন গ্রামের। ভানু তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন বাপের নাম। শুনে বললেন, পুরনো কালের নাম, জঘন্য শোনায়। বদলে ফেলুন বাপের নাম।

আলমগীর হোসেন মনে-মনে বলেন — পাভেল, খোকা আমার, আমার বাবার নাম ছিল সেফাত মিয়া। লেখাপড়া না জানা মাটি-আঁচড়ানো কৃষক। আমার ছোট চাকরিটা পাওয়ার জন্যে বাপের নামের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু তোকে যে অনেক ওপরে উঠতে হবে। করপোরেটের সিঁড়িতে পা দিতে হলে বাপের আইডেন্টিটি থাকতে হবে। বদলে ফ্যাল! বাপের নাম বদলে ফ্যাল!

তারপর তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে নিজেকেই নিজে গুনিয়ে বললেন — সব ঠিক হয়ে যাবে রে বাপ!

বউ ফিরতে-ফিরতে তার গোছানো শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো জায়গামতো লুকিয়ে রাখো। রেহানা ফিরল এগারোটা পেরিয়ে যাওয়ার পর। প্রথম-প্রথম রাত আটটা হলেই আলমগীর হোসেন কথা শোনাতে চাইতেন। ঘরের বউয়ের এমন রাতচরা স্বভাব কোন স্বামীরই বা ভালো লাগে। এখন কিছু বলতে গেলে বউ উলটো কথা শোনায়। আজ নিজে থেকেই রেহানা জানায় — রাত একটু বেশিই হয়ে গেল। তবে অসুবিধা হয়নি। তাহমিনা গাড়িতে করে নামিয়ে দিয়ে গেল।

তাহমিনার গাড়ি আছে, রোকেয়ার গাড়ি আছে, মেহেরুনের গাড়ি আছে, এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের গাড়ি আছে, আরো কত গাড়ি আছে রেহানাকে লিফট দেওয়ার! তাকে নিয়ে আলমগীর হোসেনকে কোনো চিন্তাই করতে হয় না। রেহানাও তাকে হিসাবে আর গণনে না। মাঝে-মাঝে সংস্থার চাঁদা, পার্টিড্রেস, বিউটি পার্লামেন্টার টাকার জন্যে নেহাত হাত পাততে হয় বলেই না স্বামীর সঙ্গে বাতচিত হয়। নইলে কে কথা বলতে আসে তার সঙ্গে! কয়েক বছর ধরে স্বামীর সবকিছুই তার কাছে খারাপ লাগে। আলমগীর হোসেনের গায়ে নাকি বোটকা গন্ধ। বিছানায় গুতে গিয়ে নাক কৌঁচকায় রেহানা। মনে-মনে আলমগীর হোসেন বলেন — মাসে-মাসে তোমার পারফিউমের সাড়ে তিন হাজার টাকা দেওয়ার পরে দিনে একবার মাত্র সাবান ঘষার টাকা থাকে আমার কাছে। কিন্তু বলেন না। বললেই রাতটাকে চোঁচিয়ে মাছের বাজার বানিয়ে দেবে রেহানা। তিনি নির্বিকারে একটা কাঁথা-চাদর নিয়ে মেঝেতে গুয়ে পড়েন। তখন আবার রেহানার আরেক রূপ — ‘ঢং করতে হবে না। মেঝেতে গুলে বুক ঠান্ডা লাগবে। ঠং-ঠং করে দিনরাত কাশবে। কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা গুনতে হবে ডাক্তারের পেছনে, ওষুধের পেছনে। বিছানাতে উঠে শোও বলছি।’ তো সেই কথা শুনে বিছানাতে উঠে আসা। ঘুম গাড় হতে না হতেই ধাক্কা। কী হলো? ‘এমন ছাদ ফাটিয়ে নাক ডাকালে পাশের মানুষ ঘুমাতে পারে! সোজা হয়ে শোও। তাহলে তোমার নাকের বাঁশি কম আওয়াজ করবে।’ তখন শবাসনের মতো টানটান গুয়ে থাকতে

হয়। এত অপছন্দের স্বামীকেও মাঝে-মাঝে শরীরের টানে ঘুম থেকে জাগায় রেহানা। এখনো তার মেনোপজ হয়নি। যে-রাতে কামনাকাতর কণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে খুনসুটির ভঙ্গিতে কথা বলবে, সে-রাতেই আলমগীর হোসেন বুঝে যান যে আজ তাকে যৌনভূতের ভূমিকা নিতে হবে। নিজের ভেতরের অনিচ্ছা মাথা তুলে বিদ্রোহ করতে চায়। নিজেকে সক্রিয় করতে রীতিমতো কষ্ট হয়। তবু করতে হয়। কারণ গরিব-গোঁয়ো-ছোটমন-সেকেলে-আনস্মার্ট-অসামাজিক-অযোগ্য পিতা ইত্যাকার নানা রকম খারাপ বিশেষণ তার গায়ের সঙ্গে স্ত্রী-কর্তৃক এঁটে বসলেও নিজেকে যৌনক্ষম ভাবতে দিতে মন সায় দেয় না। তাছাড়া রেহানার যা মনের অবস্থা, তাকে অনিচ্ছুক দেখলে হয়তো বলে বসবে, অন্য কোথাও থেকে নিশ্চয়ই শরীরের চাহিদা মিটিয়ে আসছ। তার চেয়ে এটাকে আনস্মার্ট স্বামীকে স্মার্ট স্ত্রীর দেওয়া প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করাই ভালো।

আজ রাতে আলমগীর হোসেন স্ত্রীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। সযত্ন মেককাপ, প্লাক করা ভুরু, গালে বোঝা যায় কী যায় না এমনভাবে রং মাখানো, রং করা চুল খুব কায়দা করে বিউটি পার্লার থেকে কাটানো, ম্যাচ করা শাড়ি-ব্লাউজ — কিন্তু তাকে একটুও সুন্দর লাগছে না দেখতে। অথচ রেহানার সহজ সৌন্দর্য দেখেই তো বিয়ে করেছিলেন তিনি। কেন কমে গেল সেই আকর্ষণ? নিজেই আবিষ্কার করলেন — সৌন্দর্য ঠিকই আছে, নেই সেই সহজতা; যেটাকে বাদ দিলে আলমগীর হোসেনের কাছে কোনো সৌন্দর্যই সৌন্দর্য থাকে না।

স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান না আজ রাতে। তাই পাশ ফিরে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকলেন। বুকের ভেতর ব্যথা গুমরে উঠছে মাঝে-মাঝে। কাল সকাল থেকে আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না তার। অথচ কত কষ্ট কত অপমান সহ্য করে তিলে-তিলে এই সংসার তৈরি করেছেন তিনি, ধারণ করে রেখেছেন তিনি! বহুদিন আগে থেকেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তাকে আচরণ দিয়ে কথা দিয়ে বুঝিয়ে আসছে যে তিনি তাদের মনের কাছে প্রয়োজনীয় নন। তবু তিনি আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছেন তাদের। অপেক্ষা করেছেন, একদিন ঠিক হয়ে যাবে সব। কিন্তু ঠিক যে হবে না তা এখনকার মতো তখনো জানতেন। তাই তিনি চলে যাচ্ছেন। তার চলে যাওয়াতে মানসিকভাবে এদের কিছুই এসে যায় না। কিন্তু যখনই টাকায় টান পড়বে! মেয়ের মাসে মোবাইল খরচ, বন্ধুদের নিয়ে পিজাহাট-কেএফসি, ছেলের বন্ধুদের নিয়ে ডাটমারার খরচ, বউয়ের সপ্তা-সপ্তার খরচ। তখন? তখন কী হবে? বুঝবে কত ধানে কত চাল! চোখে অন্ধকার না দেখে কোনো উপায় থাকবে না কারো। মনে-মনে এক অদ্ভুত আনন্দ পেলেন আলমগীর সাহেব। সেই আনন্দই তাকে ঘুম এনে দিলো। অনেক গাড়ি ঘুম।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আলমগীর হোসেন স্বপ্ন দেখলেন। এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারার জন্য আলমগীর হোসেনের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে আরেক আলমগীর হোসেন — এতদিন তো অন্যের জন্য বাঁচলে হে; এবার থেকে নিজের মতো বাঁচো, নিজের মতো বাঁচো!

দুই

সকালে বেরুতেই রাস্তার মোড়ে তন্ময়ের সঙ্গে দেখা। এই ছেলেটাকে দেখলেই বুকাটা ভরে যায় আলমগীর হোসেনের। আহা সত্যিকারের মানুষ একখান! সত্যিকারের যুবক একখান! গার্মেন্টের শ্রমিকরা ঈদের আগে বেতন পাচ্ছে না, তাদের মিছিলে তন্ময়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি হচ্ছে, সেখানে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছে তন্ময়। তেল-গ্যাস রক্ষার জন্য লংমার্চ হচ্ছে, সেই মিছিলে তন্ময়। মহল্লায় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন হবে, সেই অনুষ্ঠানে গান গাইছে তন্ময়। সরকারি দলের ক্যাডাররা চাঁদা তুলছে, মারধর করছে মানুষকে, দেখা গেল প্রতিবাদের আওয়াজ প্রথম তুলল তন্ময়। আবার বস্তির ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল চালাচ্ছে তন্ময়। এসব করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার মাস্তানদের হাতে বেধড়ক পিটুনি খেয়েছে সে। তারপরে হাসপাতাল থেকে এসে আবার বাঁপিয়ে পড়েছে একই কাজে। মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে থাকে তন্ময়। নিজে লেখাপড়া শেষ করেছে। ছোট ভাইটা ভার্টিটিতে পড়ে। তন্ময় প্রিন্টিং লাইনের ব্যবসা করে। খুব যে অনেক আয় তা নয়। কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট সে। তন্ময়কে দেখেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আলমগীর

হোসেন — আহা তার ছেলেটা যদি এমন হতো!

একবার শোনা গেল তন্ময়ের ওপর খুব খাপ্পা হয়ে আছে ধলা জাহাঙ্গীর। তার এলাকায় চাঁদাবাজি কমানোর জন্য দায়ী তন্ময়। সে নাকি নিজে আসবে মহল্লায়। এলোও। জিপ-হোন্ডা আর ক্যাডারের বহর নিয়ে। তার ক্যাডাররা তুলে নিয়ে এলো তন্ময়কে। তারপরে ঘণ্টাখানেক কী যে কথা হলো তাদের দুজনের মধ্যে, ধলা জাহাঙ্গীর চোখ মুছতে-মুছতে উঠে বসল গাড়িতে। পরের দিন সে আবার এসেছিল মহল্লায়। এবার কোলে তার ছোট পুত্র। সেই ছেলেকে তন্ময় কোলে নিতে ধলা জাহাঙ্গীর সকল মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে বলল — ব্যাটারে তুই তর বাপের মতোন হইছ না, হইবি তোর তন্ময় চাচার মতোন!

তন্ময় তাকে সালাম দেয় — এত সকালে কই যান চাচা!

ধমকাতে হয় আলমগীর হোসেনকে। তাই তো! কোথায় যাবেন তিনি? ঠিক করা তো হয়নি। আমতা আমতা করে বলেন — এই একটু যাই আর কি। তা তুমি এত সকালে কই যাও?

তন্ময় উত্তর দেয় — শাহবাগে যাব চাচা।

শাহবাগে কী কাজ?

মানববন্ধন আছে। তনু নামের একটি মেয়ে ধর্ষিত আর খুন হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হবে নানাভাবে। সেই প্রতিবাদেই মানববন্ধন।

রোজই তো শুনি মানববন্ধন হয়। শাহবাগে হয়, প্রেসক্লাবে হয়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে হয়। তা কোনো ফল আসে এই মানববন্ধন করে?

উত্তর দেবার আগে একটু চুপ করে থাকে তন্ময় — ফল হয়তো তেমন পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গেলে তো মানুষের চলবে না চাচা।

ও আচ্ছা। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও। আমি চলি। একটু দূরে যেতে হবে। কাজ আছে।

খুব একটা তাড়াহুড়া নেই আলমগীর সাহেবের। ছুটির দিন আজ। সিএনজি, বাস, রিকশা — সবই পাওয়া যায় সহজে। তিনি রিকশা নিয়েছেন। বাসস্ট্যাণ্ডে যাবেন না রেলস্টেশনে যাবেন, তা নিয়ে কিছুটা দোনোমনো ভাব ছিল। পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রেনই ভালো। দেখতে-দেখতে আর ভাবনা-চিন্তা করতে করতে যাওয়া যাবে। রিকশা এখন কমলাপুরের দিকে যাচ্ছে।

তনু মেয়েটির কথা হঠাৎ-ই মনে পড়ে আবার। নিশ্চয়ই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে খবরটা। তিনি নিয়মিত পত্রিকা পড়েন। অথচ তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি তনুর খবর। রোজ এত এত খুন-জখম, এত এত ধর্ষণ, এত এত বাড়ি থেকে উচ্ছেদের খবর ছাপা হয় যে, পত্রিকা-পাঠকদের চোখ এখন এসব এড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই শহরে দেড় কোটি মানুষ দিনগত পাপক্ষয় করছে। অথচ কয়জন যায় এইসব প্রতিবাদের কাজে! একটু কৌতূহল হয় আলমগীর সাহেবের। রিকশাওয়ালাকে বলেন শাহবাগ ঘুরে যেতে। দেখে আসি কেমন মানববন্ধন হচ্ছে সেখানে।

শাহবাগে নেমে রীতিমতো মুষড়ে পড়েন আলমগীর হোসেন। জমায়েত বেশি বড় হবে না এটা ধারণা করেছিলেন; কিন্তু সেটা যে এতই কম, তা কল্পনাও করতে পারেননি। অন্তত মেয়েরা তো আসতে পারত! নারী সংগঠনগুলো! হায়রে দেড় কোটি ঢাকাবাসী! বিস্ময়ের সঙ্গে আলমগীর হোসেন খেয়াল করেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, টিএসসি, বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের ফাঁকে-ফাঁকে বসে গল্প করছে অন্তত পাঁচশো প্রেমজুটি। এরা এসে দাঁড়ালেই তো মানববন্ধন বিশাল আকার ধারণ করতে পারে।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিকশায় উঠে বসেন। কিন্তু হঠাৎই তার মনে হয়, দেড় কোটি অধিবাসীর মতো তিনিও তো এই দায়িত্বটা এড়িয়ে চলে যাচ্ছেন। নাহ। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তনুর চেহারা মনে পড়ছে না; কিন্তু নিজের মেয়েটার মুখ তো ঠিকই ভেসে উঠছে মনের চোখে। একজন মেয়ের বাপ হিসাবে এইভাবে এড়িয়ে যাওয়াটা ফক ঠিক হচ্ছে! আলমগীর হোসেন নেমেই পড়েন রিকশা থেকে। আপাতত মানববন্ধনে অংশ তো নেওয়া যাক। তারপরে দেখা যাবে, কোথায় যাওয়া যায়। □



চারি এবং ভালোবাসা

হরিশংকর জলদাস



দাদুর চার ছেলে, দুই মেয়ে। এটা জীবিতদের হিসেব। মৃতের সংখ্যা কম নয়। তিন। যে ছেলের নামে দাদু পরিচিত, সে ছেলে মারা গেছেন। লোকে দাদুকে হরকিশোরের বাপ বলে ডাকত। গাঁ-গেরামে এরকমই রেওয়াজ। সন্তান হওয়ার আগ পর্যন্ত নাম ধরে ডাকাডাকি। সন্তান হলেই নাম বদলে যাওয়া। তখন চন্দ্রকান্ত, সুশীল, মিলন নয়, তখন – নেপালের বাবা, বিশাখার বাপ – এসব। সন্তানের নামের মধ্যে মা-বাপের নাম হারিয়ে যাওয়া।

সেই রীতিতে দাদুর নামও পাটে গিয়েছিল। তাঁর নাম যে কী, অনেকটা বয়স পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি। তিনি আমাদের কাছে দাদু, গ্রামবাসীর কাছে হরকিশোরের বাপ।

কিশোর শব্দটির প্রতি দাদু সমীরকিশোরের টান ছিল ভীষণ। মেয়েদের বেলায় রানি। ছেলেদের নাম রেখেছিলেন – হরকিশোর, রূপকিশোর, সঞ্জীবকিশোর, রামকিশোর, সঞ্জয়কিশোর। এসব



অলংকরণ : তরণ ঘোষ

নামের ক্ষেত্রে কিশোর খাটে কিনা সেদিকে নজর নেই দাদুর, যত দুর্বলতা কিশোরের প্রতি। রবীন্দ্রনাথদের যেমন নাথ, বঙ্কিমদের চন্দ্র, তেমনি দাদুদের কিশোর। বিয়ের পর তাঁর সন্তানদের কৈশোরত্ব থাকবে কিনা, সেদিকটা ভাবেননি দাদু। মেয়েদের নামের শেষে রানি যুক্ত করে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলেন। মেয়েদের নাম রেখেছিলেন তুলসীরানি, বৃন্দারানি।

খুব ছোট একটা চাকরি করতেন দাদু তাঁর প্রথম জীবনে। কুবস্টিল নামে একটা কারখানা বসেছিল আমাদের গাঁ থেকে এক গ্রাম পরের গাঁয়ে। দাদু খুব বেশি পড়ালেখা জানতেন না। ওই কারখানায় জাপানি ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করত। সুন্দর সুন্দর বাংলা টাইপের ঘরে থাকত তারা। দাদু তাদের দেখভালের চাকরি করত। বাবাদের ওরকমই বলতেন দাদু। কিন্তু বহু বছর পরে জানা গেছে – দাদু ওখানে সুইপারের চাকরি করতেন।

তবে এজন্য দাদুর কোনো আফসোস ছিল না। তাঁর যত কষ্ট, সব ছেলে সমানভাবে মানুষ না হওয়ার জন্য। আমার বাবা ছিল দাদুর জীবিত ছেলেদের মধ্যে দ্বিতীয়। সঞ্জীবকিশোর অন্য ভাইদের তুলনায় বেশ বেশিই লেখাপড়া করেছিল।

আমার জেঠা রূপকিশোরের থলথলে শরীর। গৌরবর্ণ। ফর্সা রঙের জন্যই বোধহয় দাদু তাঁর এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন রূপকিশোর। পড়াশোনা খুব বেশিদূর করেননি জেঠা। মাধ্যমিক পাস করেই নাটকের দিকে ঝুঁকেছিলেন। গান-বাদ্য – এগুলোতেই জেঠার যত তৃপ্তি। কোনোদিন রাগ করতে দেখিনি জেঠাকে।

নামের ক্ষেত্রে কিশোর খাটে
কিনা সেদিকে নজর নেই
দাদুর, যত দুর্বলতা কিশোরের
প্রতি। রবীন্দ্রনাথদের যেমন
নাথ, বঙ্কিমদের চন্দ্র, তেমনি
দাদুদের কিশোর। বিয়ের
পর তাঁর সন্তানদের কৈশোরত্ব
থাকবে কিনা, সেদিকটা
ভাবেননি দাদু।

কী একটা ভাবের মধ্যে হাঁটাচলা করতেন তিনি। অন্যান্য ভাই আর ভ্রাতৃবধূরা যখন ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ঝগড়াঝাঁটিতে লিপ্ত, জেঠু তখন নির্বিকার। ভাইয়েরা তাঁকে মধ্যস্থতা মানলে তিনি বলতেন, ‘এসব আমাকে বুঝিয়ে তেমন লাভ নেই, নিজেদের সমস্যা নিজেরা মিটিয়ে নাও।’

রামকিশোর কাকা বলত, ‘তোমার স্বার্থও জড়িয়ে আছে এখানে।’
‘আমার স্বার্থ?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন জেঠু।

‘হ্যাঁ দাদা, এ ব্যাপারে তুমি কথা না বললে তোমারও সমূহ ক্ষতি হবে।’ রামকিশোর কাকা আবার বলত।

চোখ দুটোকে সামান্য খুলে জেঠু বলতেন, ‘কী রকম ক্ষতি বুঝতে পারছি না রামকিশোর।’

‘সঞ্জয় বেলিকটা পুকুরপাড় দখল করে ঘর তুলছে। বলে নাকি মুরগির খামার দেবে।’ বলল রামকিশোর কাকা।

‘এ তো ভালো কথা। বাউন্ডুলে স্বভাবের সঞ্জয়। চিরদিন কিছুই করল না। ঘুরে বেড়িয়ে আর আড্ডা মেরে কাটাল। এখন যদি তার সুমতি হয়, তাতে তোমার ক্ষতি কী রামকিশোর, বুঝতে পারছি না।’ মৃদু গলায় রূপকিশোর জেঠু বললেন।

এবার রামকিশোর কাকা গলায় একটু ঝাঁঝ ঢেলে বলল, ‘তুমি চিরটাকাল এরকমই থেকে গেলে দাদা।’ তারপর নিজেকে সংযত করে মৃদু কণ্ঠে বলল, ‘দাদা, ওই পুকুরপাড়টা তো শুধু ওর না, আমাদের সবার। এই যে ঘরটা বাঁধার উদ্যোগ নিচ্ছে, বাধা না দিলে শেষ পর্যন্ত ওই জায়গাটা তো সঞ্জয়েরই দখলে চলে যাবে। শেষে কি ওই পুকুরপাড়টা ভাগবাটোয়ারায় আসবে?’

জেঠু বলেন, ‘তো আমাকে কী করতে হবে বল রামকিশোর?’

রামকিশোর কাকা বলে, ‘বাবা নেই আমাদের। থাকলে তার কাছেই বিচার চাইতাম। তুমি বড় ভাই। সঞ্জয়ের এই অন্যায়ের বিচার তোমার কাছে না চেয়ে কার কাছে চাইব, বলো দাদা?’

জেঠু বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকেন। তারপর করুণ চোখে রামকিশোর কাকার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘দেখ রাম, আমার কোনো ছেলেপুলে নেই। বয়সও কম হলো না আমার। তোরা দয়া করে দোকানটা আমাকে দিয়েছিস। ওই দোকানেই আমাদের সংসার চলে যায়। ওসব জায়গাজমির প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। তোদের ছেলেমেয়ে আছে। সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলে এর একটা বিহিত কর। পারলে পাড়ার দু-একজনকে ডাক। আমাকে আর এতে জড়াস না ভাই।’

রামকিশোর কাকার হতাশা চোখে জেঠার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

দাদু চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্টের পর বড় রাস্তার ধারে একটা চাল-ডালের দোকান দিয়েছিলেন। একটা সুন্দর গদিও তৈরি করিয়েছিলেন। ওখানে আয়েস করে বসে চাল-ডাল বিক্রি করতেন দাদু। দোকানে ভবতোষ নামের এক কর্মচারী ছিল। ও-ই দোকানের সবকিছু দেখাশোনা করত।

গোড়ালি ঢাকা ধুতি পরতেন দাদু। গায়ে ফতুয়া। ধবধবে সাদা। পেছন দিকে চুল আঁচড়াতেন। প্রতি রাতে দিদিমা দাদুর মাথায় তেল ঘষে দিতেন। ফলে দাদুর মুখমণ্ডলে সর্বদা তেল-চকচকে একটা আভা থাকত। সুইপারের চাকরি করার বেদনাটা চাল-ডালের গদিতে বসে দাদু ভুলতে চেয়েছিলেন।

শেষের দিকে দাদু রূপকিশোর জেঠুকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যেতেন। তাঁর আসনের পাশে ছোট্ট একটা গদি তৈরি করিয়ে জেঠুকে সেখানে বসতে দিয়েছিলেন। মাস তিনেক ছেলেকে বেশ কড়া চোখে পরখ করে নিয়েছিলেন দাদু।

একদিন ক্যাশবান্সটা তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন, ‘আজ থেকে হিসেবপত্রটা তুই দেখবি রূপকিশোর। আমি এইখানে বসে-বসে তোকে দেখে যাব।’

অন্যান্য ছেলের তুলনায় জেঠুকে একটু বেশিই ভালোবাসতেন

দাদু।

তো দাদুর মৃত্যুর পর এই দোকানের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সঞ্জয় কাকা চাইল – দোকানটা তার দখলে নিতে। বাবারও লোভ ছিল দোকানটার প্রতি। এক রাতে মায়ের সঙ্গে কথোপকথনে বুঝেছিলাম আমি।

মা বলেছিল, ‘তুমি এরকম চুপচাপ থাকলে কি চলবে? এত টাকার দোকান! সঞ্জয় নাকি দোকানটা আত্মসাৎ করতে চাইছে। তোমারও তো হক আছে ওই দোকানে। স্বত্ত্বের সম্পত্তির ওপর তো তোমাদের চার ভাইয়ের সমান দাবি।’

‘তা তো জানি। কিন্তু দোকানটা তো এতদিন দাদাই চালিয়েছে। আমাদের চেয়ে দাদাকেই বেশি পছন্দ করত বাবা। দোকানটার প্রতি আমারও যে লোভ নেই, এমন নয়। কিন্তু দাদাকে একথা বলি কী করে?’

‘কেন, সঞ্জয় যদি বলতে পারে, তুমি বলতে পারবে না কেন?’ মা গলা উঁচিয়ে বলেছিল সে রাতে।

‘দেখো, সঞ্জয় বেয়াড়া ধরনের। তার উদ্ধত আচরণ বাবাকে ক্ষুব্ধ করত। বাবা মুখে কিছু বলত না সত্যি, কিন্তু তার ওপর বাবা যে ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিল, তা বাবার চেহারা দেখে বোঝা যেত। আর যা-ই করি, সঞ্জয়ের মতো বেয়াদবি করতে পারব না।’

বাবার কথাবার্তা শুনে মা সে রাতে চুপ মেরে গিয়েছিল।

দাদু থাকতে-থাকতেই উঠানের চারদিকে চারটা ঘর উঠেছিল। চার ছেলেকে ওই চারটা ঘর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দাদু। ওখানেই জেঠা-কাকার সপরিবারে থাকতেন। দাদুর খুব বেশি সহায়সম্পত্তি ছিল না। বড় একটা বাস্তভিটে, বিশাল একটা পুকুর, পুকুরের চারপাশে বাঁশঝাড়, শিমুলগাছ, শিরীষগাছ – এসব। পুকুর বা পুকুরপাড় ছেলেদের মধ্যে ভাগটাগাও করে দিয়ে যাননি দাদু। ভিটেটাতেও পরবর্তীকালে যে যার মতো করে ঘরদোর বানিয়ে নিয়েছে। আমার বাবা দক্ষিণ হালিশহর হাইস্কুলে হেডমাস্টারি করত। বিএ পাস করেই মাস্টারিতে ঢুকেছিল বাবা। পরে প্রয়োজনে বিএডটাও করেছিল। রামকিশোর কাকা আবু তাহের অ্যান্ড কোং-এ ক্যাশিয়ারের চাকরি করত। বাবার চাপে রামকিশোর কাকা আইএ পাস করেছিল। সঞ্জয় কাকা কিছু না করেই জীবনটা কাটিয়ে দিল প্রায়। কিছু না করে বললে অবশ্য ভুল হবে, কিছু তো একটা করতই সঞ্জয় কাকা। সে টাউটগিরি।

পাড়ায় কে পাকা ঘর বানাচ্ছে, প্রতিবেশীকে উস্কে দিল সঞ্জয় কাকা – কিরে সাধন, চুপচাপ বসে আছিস যে! যদু কাকার ছাদটা কোথায় এসে পড়বে, বুঝতে পারছিস না? তোর তিন ফুট জায়গা তো যদু কাকার দখলে চলে যাবে রে। কিছু একটা কর।

গরিব সাধন কাঁচুমাচু করে বলল, আমারও সেরকম মনে হচ্ছে দাদা। কিন্তু কী করতে পারি আমি?

কাকা বলল – কী করতে পারিস মানে! চল আমার সঙ্গে, থানায় চল। জিডি কর যদু কাকার নামে। তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল!

সাধন বলল – আমি অশিক্ষিত গরিব মানুষ, থানায় যেতে আমার ভয় করছে দাদা।

তোর ভয়ের কিছু নেই। ওসির সঙ্গে আমার ভালো জানাশোনা। কিছু টাকা খরচ করতে হবে, এই যা। ধমকের সুরে সঞ্জয় কাকা বলে।

এইভাবে টুপাইস কামায় সঞ্জয় কাকা। কাকিটাও সেরকম। বাঘের সঙ্গে যেমন বাঘিনী, শেয়ালের সঙ্গে শেয়ালিনী, তেমনি সঞ্জয় কাকার সঙ্গে অমিতা কাকি। দুজনে মিলে বাড়িটাকে সর্বদা উত্তপ্ত করে রাখে।

এই অমিতা কাকি আর সঞ্জয় কাকা দোকানের মালিকানা নিয়ে একদিন গুণ্ডগোলটা পাকিয়ে বসল। সকাল থেকে হইচই। জেঠা দোকানে, বাবা স্কুলে, রামকিশোর কাকা চাকরিতে। ফাঁকা মাঠ। রূপকিশোর জেঠার বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করল দুজনে – বাপের সম্পত্তি একা লুটেপুটে খাচ্ছে দাদা। বউ বলল – আক্কেল থাকলে কি এরকম করে কেউ? ভাইয়ালি সম্পত্তি একা ভোগ করে? কাকা বলল – লেড়া নাই, লেড়কি নাই, তার এত দরকার কী দোকানের? ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। দোকানটা ছেড়ে দিতে বলো আমাকে।

শেষের কথাটা যে বড় বউদিকে উদ্দেশ্য করে বলা, সেটা বড় বউদি বুঝতে পারেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না বড় বউদি। একেবারেই নির্ভেজাল নারী তিনি। কিছুটা স্বভাবগুণে, অনেকটা জেঠুর প্রভাবে সাদাসিধে একজন নরম-সরল নারীতে পরিণত হয়েছেন জেঠি।

দেবরের হাউকাউয়ের কোনো জবাব দিলেন না জেঠিমা। উপরন্তু সঞ্জয় কাকার বাড়ির দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

জেঠি জেঠাকে বড় ভালোবাসেন। সন্তানাদি না হওয়ার কারণে সে ভালোবাসা আরো গাঢ় হয়েছে। জেঠুর দিবানিদ্রার অভ্যাস আছে। একদিন কী কারণে জেঠুদের দরজাটা একটু ফাঁক করা ছিল। ওই ফাঁক দিয়ে এক দুপুরে দেখলাম – জেঠু চিং হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন, জেঠির বাম হাতে হাতপাখা। আর ডান হাত দিয়ে জেঠুর চুলবিরল মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন।

সঞ্জয় কাকা আর কাকির হইহল্লা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। না জানি জেঠু কী রকম কষ্ট পান! কোনো না কোনোভাবে তো ওদের হল্লাবাজির কথা জেঠুর কানে যাবেই। আর কেউ বলুক না বলুক, জেঠিমা তো বলবেনই। মাকে দেখেছি – সংসারে টুকরাটাকরা কিছু একটা ঘটলেই বাবা স্কুল থেকে ফিরতে না ফিরতেই নামতাপড়া গুরু করে। নামতায় তো নির্দিষ্ট গাণ্ডি আছে, দুই একে দুই, দুই দুগুণে চার, তিন দুগুণে ছয়। কিন্তু মায়ের নামতায় সেরকম গাণ্ডি নেই। তিলকে তাল বানায় যেমন অনেকে, মায়ের নামতাতেও দুই দুগুণে ছয়, ছয় দুগুণে বত্রিশ। বলছিলাম – বানিয়ে বানিয়ে বলে মা তৎক্ষণাতই বাবার মাথা গরম করে ছাড়ে। জেঠিমার কাছে তা-ই আশা করেছিলাম আমি। কিন্তু কী আশ্চর্য, জেঠিমা সেদিনের কথা কিছুই বলেননি জেঠুকে। নইলে কেন সাত দিনেও কোনো প্রতিক্রিয়া জানান না জেঠু।

সাত দিন পর এক সন্ধ্যায় দোকান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন জেঠু। সাধারণত দোকানের হিসেবপাতি চুকিয়ে বাড়িতে ফিরতে ফিরতে তাঁর দশটা বেজে যায়। সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। ভাইপো-ভাইবীদের মধ্যে জেঠু আমাকে বেশি ভালোবাসেন। আমিও। তো আমি জেঠুকে দেখতে গিয়েছিলাম তাঁর ঘরে। ‘শরীর খারাপ জেঠু?’ আমার কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন জেঠু, ‘দূর পাগলা, অসুখ করবে কেন? ভালো আছি আমি। যা যা, তোর বাপকে একটু ডেকে দে। বলবি – আমি ডেকেছি। আর হ্যাঁ, তোর রামকাকু আর সঞ্জয়কাকুকেও একটু ডেকে দিস।’

আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। জেঠু হঠাৎ করে সবাইকে নিজ ঘরে ডেকে পাঠাচ্ছেন কেন? ভয়ংকর কিছু কি? দ্বিধাস্থিত পায়ে ঘরের দিকে হেঁটে গিয়েছিলাম আমি।

হয়েছে কী, আমাদের প্রতিবেশী যতীন মণ্ডল দাদুর কাছে চালের বস্তা কিনতে গিয়েছিল সেদিন বিকেলে। কথায় কথায় সঞ্জয় কাকা আর তার বউয়ের চোঁচামেচির কথা জানিয়ে দিয়েছিল। যতীন মণ্ডল এটা বলতে ভুল করেনি যে, কাকা-কাকির হাউকাউটা মূলত চাল-ডালের দোকানটাকে ঘিরে।

সেই সন্ধ্যায় বাবা আর কাকারা জেঠুর ঘরে এলে দোকানের চাবিটা টেবিলের মাঝখানে রেখেছিলেন জেঠু। টেবিলের চারদিকে চার ভাই বসেছিলেন।

জেঠু বলেছিলেন, ‘আমি আর দোকানটা চালাতে পারছি নারে। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তোদের মধ্যে কেউ দোকানটার দায়িত্ব নে।’

জেঠুর কথা শুনে সঞ্জয় কাকার লোভী চোখ চকচক করে উঠেছিল। ডান হাতটা টেবিলের ওপর তুলেও ছিল। কী বুঝে আবার হাতটা টেবিলের নিচে গুটিয়ে নিয়েছিল সঞ্জয় কাকা।

বাবা আর রামকিশোর কাকা বউদের কল্যাণে সেদিন-সেদিনই সঞ্জয় কাকার দুর্ব্যবহারের কথা জেনে গিয়েছিল। দাদার প্রতিক্রিয়ার জন্য এতদিন অপেক্ষা করে ছিল তারা।

আজকে দাদার কথা শুনে রামকিশোর কাকাই প্রথমে কথা বলে উঠল, ‘কী বলছ দাদা তুমি? আমরা চালাব দোকান! এ দোকান তো

তোমার দাদা!’

বাবা নীরস গলায় বলেছিল, ‘রামকিশোর ঠিকই বলেছে দাদা, এ দোকান তোমার।’

জেঠা মৃদু গলায় বলেছিলেন, ‘দোকানটা বাবার সম্পত্তি। তোদের সবার অধিকার আছে ওই দোকানের ওপর।’

রামকিশোর কাকা বলেছিল, ‘দেখো দাদা, আমরা সবাই চাকরি করি। তুমি করো না। ওই দোকানের আয় দিয়ে তোমার সংসার চলে। তুমি কি বলো তোমাকে আমরা পথে বসাই!’

এই সময় সঞ্জয় কাকা বলে ওঠে, ‘আমি করি না। আমি কোনো চাকরি করি না।’

সদ্বুদ্ধি বাবার মাথায় উদয় হলো। বলল, ‘তুই চাকরি না করলে কী হবে, তোর ইনকাম আমাদের কারো চেয়ে কম না।’ মেজদার কথা শুনে সঞ্জয় কাকা চুপ মেরে গেল।

রামকিশোর কাকা বলল, ‘শোনো দাদা, এই দোকান তোমার। তোমার কিছু হলে বউদির। বউদি তখন দোকানটা নিয়ে যাচ্ছে তা-ই করবে। এই দোকানের ওপর আমাদের কোনো দাবি নেই।’

‘আমার আছে।’ কঠিন গলায় বলে উঠল সঞ্জয় কাকা।

রামকিশোর কাকা বলল, ‘ঠিক আছে, তোর দাবি মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। দাদা তোকে বিশ হাজার টাকা দেবে দোকানের মালিকানা হস্তান্তর বাবদ। কালকে আমি স্ট্যাম্প নিয়ে আসব। ওই স্ট্যাম্পে আমরা সবাই স্বাক্ষর করব। আমাদের কোনো টাকা দিতে হবে না দাদা। তুমি সঞ্জয়কে টাকাটা দিতে পারবে তো দাদা?’

রামকিশোর কাকার কথা শুনে জেঠু ম্লান একটু হেসেছিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় একইরকমভাবে ডাইনিং টেবিলটা ঘিরে সব ভাই বসেছিলেন। রামকিশোর কাকা উকিলকে দিয়ে দলিলটা একেবারে লিখিয়ে নিয়ে এসেছিল। সঞ্জয় কাকাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে, তা-ও লেখা ছিল দলিলে। তিন ভাই দলিলে স্বাক্ষরও করেছিল।

সেই সন্ধ্যায় সঞ্জয় কাকাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া ছাড়া আরো একটা কাজ করেছিলেন জেঠু। ঘরের ভেতর থেকে জেঠু টাকার তিনটে বান্ডেল নিয়ে এসেছিলেন। একটা বান্ডেল সঞ্জয় কাকাকে দিয়ে আর দুটো বান্ডেল বাবা আর রামকিশোর কাকার দিকে এগিয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, ‘আমি কারো ঋণ নিয়ে মরতে চাই না ভাইয়েরা। তোরাই ঠিক করেছিস – বিশ হাজার দিলে দোকানের মালিকানাশ্রু ছাড়বে সঞ্জয়। সঞ্জয় শর্তটা মেনেও নিয়েছে। নইলে টাকাটা সে নিত না। ভাবলাম – তোদের ঋণটাও রাখব কেন? ঋণ নিয়ে মরতে চাই না আমি।’ বলতে বলতে কেঁদে দিয়েছিলেন জেঠু।

সে রাতে প্রত্যেক ভাই বিশ হাজার টাকার বান্ডেল নিয়ে যার যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

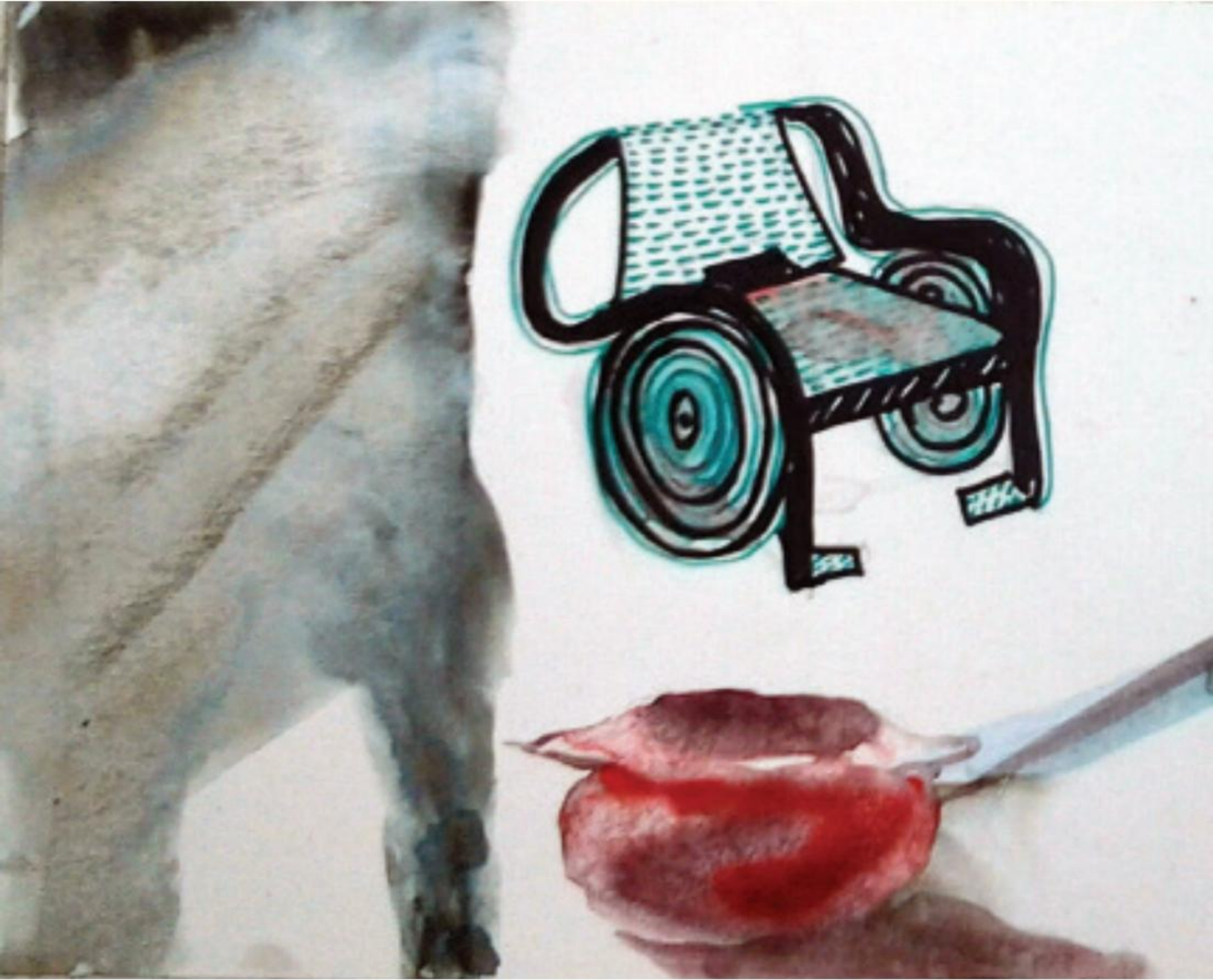
ওই ঘটনার পর খুব বেশি বছর বাঁচেননি জেঠু। জেঠিমার মৃত্যুর পর একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। দূর সম্পর্কের এক পিসি জেঠুর রান্নাবান্নার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আধাপেট খেয়ে পাত থেকে উঠে যেতেন জেঠু। আমাকে একদিন বলেছিলেন, ‘জানিস প্রত্যাশ, তোর জেঠির হাতের রান্না ছাড়া আর কারো রান্না খেতে রুচি লাগে না আমার।’

তো আমার রূপকিশোর জেঠু একদিন মারা গেলেন। শ্রাদ্ধশান্তিও চুকে গেল একদিন।

তারপর এক দুপুরে সমীরকিশোরের উঠানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হলো। তিন ভাইয়ের হাতের কাছে যা ছিল, তাই নিয়ে মারামারিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যান্য ভাইয়ের পক্ষে তাদের ছেলেমেয়েরা, স্ত্রীরা যোগ দিলো।

জেঠা গেছেন, জেঠি গেছেন। দোকান আছে। দোকানের চাবি আছে। এই চাবির মালিক কে হবে এখন – এই নিয়ে তিন ভাইয়ের মধ্যে লাঠালাঠি।

আমি উঠানের এক কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখে যেতে লাগলাম, স্বর্গ থেকে রূপকিশোর জেঠুও হয়তো। □



আলীবাবার বাসায় দুই চোর

মঈনুল আহসান সাবের



বাসের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে আজিজুর রহমান একসময় বাসের কথা ভুলে গেল। অফিস ছুটির পর তার যথারীতি ক্লান্ত লাগছিল, প্রতিদিন যেমন ভাবে — অফিস থেকে বেরোবে আর বস বা এলাকার কোনো মাস্তান কষে একটা লাথি কষাবে পেছনে, সে বাড়ি পৌছে যাবে — এমনও ভেবেছিল একবার। তারপর, এটাও নিয়মমাফিক, সে হাঁটতে-হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছিল বাসস্টপেজে, লাইনে। লাইনটা বড়, গুতোগুতি ধাক্কাধাক্কি নেই, তবে ধুলো-ধুলো একটা ব্যাপার আছে, ঘামের গন্ধ আছে, আর সবার ওপর সবার বিরক্তি আছে। তা যা হলো, বাসের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে আজিজুর রহমান



অলংকরণ : দিলারা বেগম জলি

বাসের কথা ভুলে গেল। তার মনে হলো সে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। সাদা সবুজ আর লাল মেশানো ট্রেনের শরীর, ভেতরটা পরিপাটি সাজানো, আপনি দাঁড়াতে পারবেন, হাঁটতে পারবেন, বসতে পারবেন, শুতে পারবেন। আপনি মৃদু ঘণ্টা বাজালে খেদমতের জন্য লোক চলে আসবে। আপনার যা খেতে ইচ্ছা করবে, বলবেন, চলে আসবে। গতরাতে সে আর মাহফুজা এক টিভি চ্যানেলে রয়্যাল রাজস্থান রেইলওয়ের একটা অনুষ্ঠান দেখেছিল। তারপর, বাকি রাতের যতটা তারা জেগেছিল, আর আজ অফিসে কাজের ফাঁকে কিংবা কখনো কাজের ভেতরই, সেই ট্রেন ঢুকে পড়ছিল। এখন আবার। আজিজুর রহমান তাই পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে একবার লাইন থেকে সরে এসে আরেকবার দেখল — ট্রেন আসছে কি না। দেখা গেল না, তবে আজিজুর রহমানের মনে হলো চলে আসবে যে-কোনো সময়। পাশের রাস্তার একপাশে রেললাইন তৈরি হয়ে যাবে। ট্রেন এসে দাঁড়াবে, আজিজুর রহমান, যেন সে প্রতিদিনই এমন এক ট্রেনে বাড়ি ফিরছে, এভাবে উঠে পড়বে। চারপাশের কেউ-কেউ ওঠার চেষ্টা চালাতে পারে। খালি ট্রেন, ভাববে ট্রেন বুঝি তাদের সবার জন্য এসেছে, তা এরকম ভাবতে অসুবিধা নেই, দুবেলা কত কী ভাবছে মানুষ, শুধু তার ট্রেনে চড়তে না পারলেই হতো।... তার ট্রেন? একটু ভাবল আজিজুর রহমান — নাহ্ আর একার না, তার আর মাহফুজার। এমন হতে পারে ট্রেন এসে থামার পরপর সে উঠলে দেখা গেল মাহফুজা সেখানে আগে থেকেই বসে আছে, বলল — এই একটু

বাড়ি ফিরে আজিজুর রহমান
দেখল মাহফুজা বাসায় নেই।
এ-সময় মাহফুজার বাইরে
যাওয়ার কথা নয়। গেলেও
তাকে ফোনে জানিয়ে যেতে
পারত। তাতে এক টাকাও
খরচ না।

হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম। তাই দেরি হলো একটু, রাগ করেছ? আজিজুর রহমান ঠিক করল মাহফুজা এমন প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেবে — না না, রাগ কিসের! তবে দুজনের জন্য দুটো ট্রেন হওয়া আরো ভালো। যে যার মতো ঘুরলাম, আবার একসঙ্গেও ঘুরলাম।

কাল রাতেও তারা দুটো ট্রেনের কথাই ভেবেছিল। অনুষ্ঠান দেখতে-দেখতে সে যখন বলল — ইশ, আমার যদি এরকম একটা ট্রেন থাকত — মাহফুজা তার দিকে কটমট করে তাকাল — সবসময় শুধু নিজেরটার কথা ভাবো কেন! তোমার একটা আমার একটা দুটোই থাকতে পারে।

হে-হে। সে বলল। আমার থাকা মানেই তোমার থাকা।

তাহলে আমারই একটা থাক। আমার থাকা মানেও তোমার থাকা।

আচ্ছা, দুজনের দুটো। কিনবই যখন...।

আজিজুর রহমান আবার লাইন থেকে বের হয়ে দেখতে গেল ট্রেন আসছে কি না। নাহ, ট্রেনের দেখা নেই। একটু বিরক্ত বোধ করল সে, লাইনে ফেরার সময় তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হলো পেছনের লোকটা — বারবার পা উঁচা কইরা, লাইন ছাইড়া কী দেখেন? আপনে দেখলেই বাস আগে চইলা আসব?

আজিজুর রহমান একবার ভাবল সে কিছু বলবে না, তবে সে চুপ করেও থাকতে পারল না। পেছনে ফিরল, বলল — দেখি ট্রেন আসে কি না।

ট্রেন!... গরমে বাঁচি না আর আপনে মজা মারেন!

আজিজুর রহমান বলল — মজা ভাবলে মজা, সত্য ভাবলে সত্য।

বাড়ি ফিরে আজিজুর রহমান দেখল মাহফুজা বাসায় নেই। এ-সময় মাহফুজার বাইরে যাওয়ার কথা নয়। গেলেও তাকে ফোনে জানিয়ে যেতে পারত। তাতে এক টাকাও খরচ না। তারা এত গরিব না ওই কটা পয়সা খরচ করতে পারবে না! পোশাক পালটে সে-ই ফোন করল মাহফুজাকে — কই তুমি? বাড়ি দেখি আন্ধার!

তুমি ফিরেছ?

বললাম না, বাড়ি আন্ধার।... কই? ট্রেন কিনতে গেছ?

ট্রেন! মাহফুজার গলায় প্রথমে বিস্ময়, পরে হাসি শোনা গেল — না, ট্রেন না, এসি।

অ। পয়সা নষ্ট, কথা তো ছিল পয়সা জমিয়ে প্রথমে ট্রেন কিনব। ফিরছি। দাঁড়াও, কিংবা চা বানিয়ে খাও।

মাহফুজা ফিরলে বিস্তারিত জানা গেল। সে এসিই কিনতে গিয়েছিল। পাশের বাসার ভাবি তারানুমের সঙ্গে। মাহফুজা বলল — দুপুরে হঠাৎ তারানুম ভাবি এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে যেতে হবে, এসি কিনবেন। ঘোরাঘুরির কোনো ব্যাপার নেই। নির্দিষ্ট দোকান, নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড, নির্দিষ্ট, ওই যে... দেড় টন। রাস্তায় জ্যাম, ফিরতে-ফিরতে তাই দেরি হলো।

...আজিজ, খারাপ লাগছিল জানো...!

আজিজুর রহমান বলল — আমরা অনেক দিন হলো এসি কেনার কথা ভাবছি।

সেজন্যই।... লজ্জাও পেয়েছিলাম। তারানুম ভাবি হঠাৎ করে বললেন — এসি কি আর আমাদের মতো লোকজনকে মানায়! কিন্তু যে গরম পড়েছে! আপনারা কিনছেন না কেন ভাবি?

এটা হচ্ছে শয়তানি।

হ্যাঁ, শয়তানি। মহিলা খোঁচা মারতে ওস্তাদ। আমি বললাম — আর বলবেন না, ও তো রোজই বলছে, কিন্তু আমার না ঠান্ডা লেগে যায়।

আজিজুর রহমান হাসল।

হাসছ কেন!

এই যে বললে না। এসব লোকজন আজকাল টের পেয়ে যায়।

তা ঠিক। তারানুম ভাবিকে দেখলাম একটু মুচকি হাসলেন। তখন আবার লজ্জা পেলাম।

গরিবের এই একটাই সম্বল...।

দেখো, একদম গরিব আমরা না...।

আবার দু-চারটা শখ মেটানোর মতো ধনীও না। এই গতরাতেই বলছিলাম না, টিভিটা আরেকটু বড় হলে বেশ হতো।

তা বলেছি। পিকচার কোয়ালিটি কিন্তু ভালো, শুধু আরেকটু বড়...।

তারপর দেখো, গরমে হাঁসফাঁস করি, ওই যে... সঙ্গমের সময় ঘেমে একাকার, কিন্তু একটা এসি আমরা কিনতে পারি না...।

তারপর ট্রেন...।

একটাই সমাধান মাহফুজা। একটাই।

ধনী হতে হবে। প্রায় বলো তুমি।

হ্যাঁ, ধনী-ধনী। বিশাল বড়লোক। ইচ্ছা হবে, খাব। ইচ্ছা হবে, কিনে ফেলব। ইচ্ছা হবে — এই। ইচ্ছা হবে — ওই।

এরজন্য একটা ডাকাতদল দরকার, তুমি বলেছ।

হেসো না। ভুল কিছু বলেছি নাকি।

না। কিন্তু সদস্য আমরা মাত্র দুজন। চলবে?

প্রথমে আমরা সদস্য বাড়ানোর চেষ্টা করব। বিশ্বাস করো — পাওয়া যাবে। দেখিয়া-শুনিয়া, খেপিয়া গিয়াছি — ডাকাত হওয়ার ইচ্ছাটা এখন অনেকের। তবে বাঙালির বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। ভেতরে ইচ্ছা যোলো আনা, কিন্তু এমন ভাব দেখাবে — ভাজা মাছ উলটে খাওয়া দূরের কথা, ভাজা মাছই দেখেনি জীবনে...।

তুমি কিন্তু বলেছিলে অবস্থা এখন অনেক বদলিয়েছে...।

তা বদলিয়েছে...। তোমারও কি তা মনে হয় না?

হয়। রাখঢাক এখন অনেক কম।

একটু ডেসপারেটও, তাই না। সুতরাং সদস্য পাওয়া যাবে।

দেখো একটু। প্লিজ।

দেখব। দরকার হলে পিঠে কাগজ সঁটিয়ে বের হবো — ডাকাতদলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। উচ্চাশা যাদের আছে ও অনৈতিক হতে পারবেন, তারা যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে...। সাহস? সাহস লাগবে না?

নাহ। আজকাল সাহস লাগে না মাহফুজা। করে ফেললেই হলো। সবাই জেনে গেছে — করে ফেললেই হলো, তারপর কিছু হইচই ছাড়া কিছু হবে না। তবে লাইনটা ঠিক রাখা চাই।

বুঝলাম। তবে আমার কিন্তু তোমার দ্বিতীয় পরিকল্পনাটা বেশি পছন্দ।

আজিজুর রহমান হাসতে আরম্ভ করল।

হাসছ কেন! আশ্চর্য, খামোখা হাসছ কেন তুমি!

কত কী ভাবি আমরা...।

আহা, হতে পারে না ওরকম!

যাও, এক কাপ চা বানিয়ে আন। চা খেতে-খেতে ভাবি, হতে পারে কিনা।

এখনো চা খাওনি! তখন না বললাম বানিয়ে নিতে।

খেয়েছি। আরেক কাপ খাব। না হয় গল্প জমছে না। আমি বারান্দায় বসছি।

বসো। কিন্তু গল্প বলবে না, কখনো গল্প বলবে না। এসব গল্প না।... হয়।

বারান্দাটা ছোট। বেশ ছোট। কখনো-সখনো ঘসা খেতে হয়। আজিজুর রহমান একবার তার এক বন্ধুকে বারান্দার পরিসরের কথা জানাতে গিয়ে বলেছিল — বুঝেছ, এতই ছোট দুজন নারী-পুরুষ যদি কোনোমতে ওখানে শারীরিকভাবে নানা কসরতের পর মিলিতও হয়, এতই ছোট জায়গা, আটকে যাবে, আর বিযুক্ত হতে পারবে না।

বারান্দায় এসে আজিজুর রহমান আড়মোড়া ভাঙল, চেয়ারে বসতে-বসতে তার হঠাৎই মনে হলো নিচে রাস্তায় ট্রেনটা দাঁড়িয়ে

আছে। আজিজুর রহমান ছিল ধরে আরেকটু ঝুঁকে তাকানোর চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ট্রেন, ওই ট্রেনই, অন্ধকারে তাকে আরো মায়াবী লাগছে। মাঝে-মাঝে যেন ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরে তাকাচ্ছে — আজিজুর রহমান আর মাহফুজা কি প্রস্তুত? আজিজুর রহমান সেদিকে তাকিয়ে থাকল। মাহফুজা চা নিয়ে ফিরলে সে বলল — ট্রেনটা ভোগাচ্ছে।

ট্রেন! কোন ট্রেন!

রয়্যাল রাজস্থান।

ওহ। আমিও ভুলতে পারছি না। তুমি ট্রান্স-সাইবেরিয়ান না কি এক রেলপথের কথা বলেছিলে না...।

হুমম।..., মাহফুজা, ওরকম আরো আছে। কত কী যে আছে, তা-ই আমরা জানি না।

জানার জন্য গুপ্তধন পাওয়াটা জরুরি, আজিজ।

আজিজুর রহমান সামান্য হাসল — আজকালকার দিনে কেউ আর গুপ্তধন পায় না, মাহফুজা।

বললে! মোহাম্মদ আলী ভাই গুপ্তধন পাননি।

মোহাম্মদ আলী তাদের পরিচিত। বছর দুয়েক আগে পরিচয়টা এখনকার তুলনায় বেশি গাঢ় ছিল। এখন একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তাদের তরফ থেকে একটা সমীহ তৈরি হয়েছে। মোহাম্মদ আলী, মাহফুজাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়, ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছোট, গোছানো সংসার। তারা বেড়াতে গেলে দেশ, উল্লয়ন, মানুষের জাগরণ এসব বিষয়ে কথা হতো। আজিজুর রহমান ও মাহফুজার মনে হতো, এই লোকটা সত্যিই দেশ ও মানুষের ভালো চান। তো, এই মোহাম্মদ আলী কী করে এক সরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন। বছরখানেক সম্ভবত চেয়ারম্যান ছিলেন। মেয়াদ শেষ হলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন তবে বেশিদিন থাকলেনও না। চাকরি ছেড়ে দিলেন তিনি। ব্যবসা শুরু করলেন, ঠিক তাও না, কারণ সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, কিন্তু তার টাকার গরম টের পাওয়া গেল। বেশ গরম, তার আঁচ ততদিনে বেশ অনেকটা দূরে সরে যাওয়া, আজিজুর রহমান ও মাহফুজাও টের পেল।

ব্যাপারটা কী বলো তো? মাহফুজা জানতে চাইল আজিজুর রহমানের কাছে।

ডাকাতি করেছে?

ধাত।

ধাত কেন?

কই, এতদিনেও একটা অভিযোগ দেখলাম না কোথাও।

তাহলে গুপ্তধন পেয়েছেন।

গুপ্তধন!

হ্যাঁ। ভল্টের ভেতর আরেকটা ভল্ট ছিল। সেই ভল্টে ছিল গুপ্তধন। এতদিন কেউ বুঝতে পারেনি। মোহাম্মদ আলী ভাই সেটা প্রথম বুঝতে পারেন। ভেতরের ভল্টে তিনি খুঁজে পান হীরে-জহরত, মণি-মুক্তা।

মাহফুজা মাথা ঝাঁকাল — ঠিক। গুপ্তধনই পেয়েছেন।... গাজীপুরে বিশাল এক বাগানবাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন, শুনেছ।

গুপ্তধন পেলে কত কী করা যায় মাহফুজা, তার কটাই-বা আমরা জানি!

আমরা একটা ভুল করেছি।

হয়তো একটা না, অনেক।

না, আমি অনেক কিছু কথা বলছি না। একটার কথা বলছি। আমাদের হায়দার আলী ভাইয়ের কাছ থেকে দূরে সরে আসা উচিত হয়নি।

আজিজুর রহমান আবার হাসল — তুমি কী ভাব, আমরা চাইলেই তিনি আমাদের কাছে রাখতেন?

মাহফুজা মৃদু গলায় — তবু, চেষ্টা করে দেখা যেত — বলতে-বলতে চুপ করে গেল।

আজিজুর রহমান শব্দ করে আড়মোড়া ভাঙল — চা-টা ভালো বানিয়েছিলে।

তাহলে গুপ্তধনের কথা একটু বলো।

ওই কথাই বহাল — গুপ্তধন এখন আর কেউ পায় না।

মোহাম্মদ আলী ভাই যে পেলেন!

উনি মোহাম্মদ আলীবাবা... আরে! আজিজুর রহমানকে বিস্মিত ও আনন্দিত দেখাল। দেখেছ, আমি ওনার একটি নাম দিয়ে দিলাম। আলীভাই কেন বলি ওনাকে, আলীবাবাভাই বলব এখন থেকে।

একদম ঠিক নাম হয়েছে। আলীবাবাভাই, দারুণ!... কিন্তু আজিজ, আমরা পাব না?

নাহ।

কেন?

কারণ আমরা না ডাকাত, না গুপ্তধন-সন্ধানী।

তাহলে আমরা কী?

চোর। মানে খুব বেশি হলে আমরা চোর হতে পারি।

চোর?

চোর। ছোটখাটো।

কথা না বলে তারা বেশ অনেকটা সময় বারান্দায় বসে থাকল।

কোনো-কোনোদিন অফিসে এত বেশি কাজ থাকে, মাথা তোলার উপায় থাকে না। আজিজুর রহমানের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সে বেশিক্ষণ মাথা নিচু করে থাকতে পারে না। তার ঘাড় টনটন করতে আরম্ভ করে, তার বমি-বমি লাগে। বমি-বমি অবশ্য তার সকাল থেকেই লাগছে, ফাইলে মাথা নিচু করার আগেই। সকালে মাহফুজা যখন রান্নাঘরে, দেশের বাড়ি থেকে একটা ফোন এসেছিল তার কাছে। ছোট ভাইয়ের ফোন, বক্তব্য প্রায় বরাবরের মতো — মা একটা ভালো হুইল চেয়ারের আবদার করেছে।

সে তখনই বলল — কেন, ঘরে বসে দুনিয়া দেখা হচ্ছে না?

সেইটা তুমি মারে জিগাও। আমাদের জিগাও ক্যান!

তো তুই একটা কিনে দে না।

তুমি আমার অবস্থা জানো না?

তুই আমার অবস্থা জানিস না?

শুনো, মা কইছে এইটা বড় ছেলের কাছে তার শেষ আবদার।... রাখলাম, পয়সা উঠতেছে।

ছোট ভাই লাইন কেটে দিলে প্রথম যে প্রশ্নটা তার মাথায় এলো সেটা এরকম — আচ্ছা, মায়ের বয়স কত হলো?... কম তো না। দুনিয়া দেখার সাধ তাহলে ফুরায় না ক্যান! এই প্রশ্ন কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেলে সে প্রথমে কিছু স্বস্তি, তারপর কিছু অস্বস্তি, তারপর স্বস্তি-অস্বস্তির মিশ্রণ পেল, তারপর কিছু অপরাধবোধে ভুগতে আরম্ভ করল।

আজিজুর রহমান — সে বলল — তোমার এইভাবে ভাবা উচিত হয়নি। সে তোমার মা। সে তোমার জন্মদাত্রী। সে তোমাকে বহু কষ্ট সহ্য করে বড় করেছে। তুমি যে আজ এইখানে আছ, তার পেছনে তোমার মায়ের ভূমিকা কম নয়। এই কথাগুলো সে বলল বটে, তবে বলতে-বলতেই টের পেল, ঠিক জুতসই হচ্ছে না। একটা অপরাধবোধ থেকে যাচ্ছে, রাগটা থাকছে তার বেশি — হ, হুইল চেয়ার! নিজেরটাই কিনতে পারি না!... নিজেরটার কথা বলছি মানে, এখন না লাগলেও লাগবে তো। তখন কিনতে পারব?

মাহফুজাকে এ-বিষয়ে কিছু বলবে না ঠিক করেছিল আজিজুর রহমান। কিন্তু মাহফুজাকে কিছু না বলে সে থাকতেও পারে না।

মাহফুজা বলল — কী করবে! অফিস থেকে বেরিয়ে দাম দেখো।

দাম দেখলে চলবে! ব্যাপারটা কেনার।

আমি দাম দেখতে বলেছি মানে কিনতেই বলেছি।

টাকা? তুমি দেবে?

আমার থাকলে আমি দিতাম, তুমি জানো।... ওই যে, কিছু আছে না হাতে...।

ওটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন কেনার টাকা জমাচ্ছি আমরা।

আশ্চর্য, তাই বলে তোমার মায়ের একটা ইচ্ছা তুমি পূরণ করবে না! ওভেন আমরা পরে কিনব। ওনার বয়স হয়েছে...।

তাই বলে ভেবো না সহজে মরবে। আমাকে আরো অনেক জ্বালাবে।

ছিঃ, এভাবে বলে না। উনি মারা গেলে তুমি খুশি হও?

এই প্রশ্নের উত্তর আজিজুর রহমানের জানা নেই। মাহফুজা উত্তর পাওয়ার জন্য কথাটা বলেওনি। কিন্তু কথাটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে আজিজুর রহমানের ভেতরে থেকে গেল। সে কি তার মা মারা গেলে খুশি হয়? হ্যাঁ, খুশি হয় সে, নাকি বেশি বা কিছু দুঃখ পায়? প্রশ্নটা অমীমাংসিত হয়ে বুলে থাকল ও আজিজুর রহমান এক সময় টের পেল এই প্রশ্নের উত্তর সে নিজের ভেতর তৈরি করতে পারছে না বলেই তার বমি পাচ্ছে। কাজের চাপ প্রচুর, মাথা তোলা উচিত হবে না, সামনে ইনক্রিমেন্টের একটা মুলো আছে, সবাই পাবে না। কেউ-কেউ পাবে, এখন দক্ষতা ও আনুগত্য দেখানোর সময়, আজিজুর রহমান তবু মাথা তুলল। বড় করে শ্বাস নিল, পাশের টেবিলের মোস্তাকিম তাকালে সে বলল — বমি পাইতেছে রে।

পাইতেই পারে। গরম পড়ছে। যা কইরা আয়।

টেবিলে-টেবিলে করব।

টেবিলের ওপরই করবি?

টেবিলের ওপরই করা — এটা মোস্তাকিমের পুরনো কথা। তাদের চারজন নারী সহকর্মী আছে। তাদের একজনের প্রতি মোস্তাকিমের আসক্তি। তার বহুদিনের ইচ্ছা, অফিস ছুটির পর সবকিছু ম্যানেজ করে সে মেয়েটির সঙ্গে টেবিলের ওপর মিলিত হবে। মিলনটি কেমন হবে — তার বিশদ বর্ণনাও সে মাঝে-মাঝে দেয়।

আজিজুর রহমান বলল — তোর মতন না। আমি টেবিলে-টেবিলে বমি করব।

আমিও তো বমিই করতে চাই, অন্যভাবে।

আমি সত্যিই বমি করব। আজিজুর রহমান বমি করার ভঙ্গিতে মোস্তাকিমের টেবিলের দিকে এগোল।

তুই মর হারামজাদা।

এইখানে সবার টেবিলে করা শেষ হলে এমডির টেবিলে যাব।

যা, তোর পায়ে ধরি, প্লিজ যা।

আজিজুর রহমান সত্যিই এরকম ভেবেছে। সবার টেবিলে কাজটি সারার পর সে এমডির রুমে যাবে — স্যার।

আপনি?

আমি স্যার আজিজুর রহমান, এই অফিসে চাকরি করি।

সে আমি জানি। কী দরকার?

বমি করব স্যার।

বমি করবেন মানে। বমি করবেন তো এখানে কেন!

আপনার টেবিলে বমি করব...। আজিজুর রহমান দুপা এগোবে।

এমডি দাঁড়িয়ে যাবে — আপনি দেখি... আরে, এ কী...!

বমি, স্যার।

আজিজুর রহমান মোস্তাকিমের দিকে ফিরল — হুইল চেয়ারের দাম জানস?

কী দরকার? হুইল চেয়ারে বইসা বমি করবি?

মারে একটা কিইন্যা দিতে হইব...। অবশ্য আরেকটাও দরকার। দুইটা। একজোড়া।

আরেকটা কার শাণ্ডি?

না, সংসারের।

কী!

সংসারের।

মোস্তাকিম কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আজিজুর রহমানের দিকে। চেয়ার ছেড়ে উঠল সে, কোনোদিকে না তাকিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে গেল। ফিরল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সিগারেটের একটা প্যাকেট আজিজুর রহমানের দিকে বাড়িয়ে দিতে-দিতে বলল — এক প্যাকেটই কিনমু ভাবছিলাম। পয়সা শর্ট। ১০টা দিতেছি। যে একখান কথা বলছস, লোম খাড়ায়া গেছে। সংসারের জন্য হুইল চেয়ার। আরেকবার! কখনো এইভাবে ভাবি নাই।

ভাইবা বলি নাই। বাইর হইয়া গেছে।

বাইর হইয়া গেছে মানে ভেতরে ছিল?

আজিজুর রহমান মাথা ঝাঁকাল — ছিল নিশ্চয়।

লাধের পর আজিজুর রহমান ও মোস্তাকিম অফিসের বাইরে এসে সিগারেট ধরাল।

মনটা খচখচ করতেছে। মোস্তাকিম বলল।

আজিজুর রহমান ধোঁয়া ছেড়ে মোস্তাকিমের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

তোর জন্য এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে চাইছিলাম...।

সিগারেট আমি কম খাই, তুই জানস।

তোর সিগারেট কমবেশি খাওনের ইয়া করি। এইটা ব্যাপার না। কিনতে চাইছিলাম এক প্যাকেট, পারি নাই — ব্যাপার হইল এইটা।

মাসের শেষ...।

এক প্যাকেটের দাম কত যে মাসের শেষে পারম না।

বাদ দে। কত কি পারতেছি না।

বাদ দিমু?

না, থাক। আজিজুর রহমান বলল। বলুক। বাদ দিলেই তো বিদায় হইতেছে না।

আসলে আর পারতেছি না। সব সময় মনে হয় হাঁপাইতেছি।

অবস্থা যে বদলাইব, দেখ, তারও কোনো সম্ভাবনা নাই। একটা ইনক্রিমেন্ট বাড়তে পারে, বেতন কত বাড়ব তাতে?

সেইটা তোর আমার মাথাব্যথা। এমডির না।

এমডি একা পারে না, বোর্ড আছে।

কিন্তু সে একটু জোর গলায় কথা তো কইতে পারে।

সেইটা সে কইতে পারে।

কইব না। ব্যাডায় ফকিন্নির পুত। এমডির বাপে ছিল দরজি, এইটা জানস?

নাহ। শুনি নাই। তোরে কে কইছে?

কইছে। এই রকম কত আছে। ছিল ফকিন্নির পুত, এহন টাকা রাখনের জায়গা পায় না।

এভাবে কথা এগোলে একসময় মোহাম্মদ আলীর কথা উঠে এলো। মোস্তাকিম বলল — তোর উচিত ছিল ঘেসটাইয়া পইড়া থাকা।

লাভ হইত না। ব্যাংক যখন ছিল, একবার কনজুমার লোনের জন্য গেছিলাম। হাসতে-হাসতে বলল, চেয়ারম্যানের আসলে নাকি কোনো ক্ষমতাই নাই। আমি একটু গাঁইগুঁই করলে বলল — আজিজুর, তোমার স্যালারি তো অ্যালাউ করতেছে না। তুমি দুইটার বদলে একটা জিনিস নাও।... ওই ব্যাটার লগে তো ঘেসটাইয়া লাভ হইত না।

এইটাও ঠিক।

অথচ দেখ, নিজের অবস্থা কেমনে বদলায়া ফেলল। গাজীপুরে বিশাল বাগানবাড়ি তুলতেছে। মাঝে-মাঝে দলেবলে গিয়া ফুটি করব।

করব। ডাকাতির টাকা।

হ, ডাকাতির টাকা।... আমি তো মাঝে-মাঝে ভাবি একটা ডাকাতদল থাকা উচিত।

ডাকাতি কইরা বেড়াইতি?

বেড়াইতাম।... তুই চিন্তা কর মোস্তাকিম, সারাজীবন এইভাবে পার করবি?

মোস্তাকিম বলল — একটা ডাকাত দল থাকা উচিত।

মোস্তাকিমকে আজিজুর রহমান গুপ্তধনের কথা বলল না। জানে সে, মোস্তাকিমের যে স্বভাব, এই নিয়ে বহুদিন তাকে খেপাবে — কিরে, পাইলি?... মন দিয়া বোধ হয় খোঁজস নাই।... এক কাজ কর, বাইর হইয়া পড়। চাকরিও করবি আবার গুপ্তধনও খুঁজবি, এইটা হয় না। সুতরাং মোস্তাকিমকে সে বলেনি, মাহফুজাকেও সে এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চায় না। বরং সেদিন সে বলেছে — আজকাল গুপ্তধন আর পাওয়া যায় না। সে জানে, মাহফুজা মজাই করে, গুপ্তধন পাওয়া যায়, কিংবা তারা পেয়ে যাবে কোনোদিন — এমন নিশ্চয় সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই মজা থেকে ব্যাপারটা একটু-একটু করে চেপে বসলে কী হতে পারে, তার ধারণা আছে। এই ধারণা সে নিজের কাছ থেকে পেয়েছে। সে মোস্তাকিমকে বলেনি, সে মাহফুজার সঙ্গে মাঝে-মাঝে ইয়ার্কির ছলে বলে, কিন্তু সে বোঝে — এই ব্যাপারটা তার ভেতর আছে। গুপ্তধন পাওয়ার ইচ্ছা। তার প্রায়ই মনে হয়, হঠাৎ সে কোনোদিন গুপ্তধন পেয়ে যাবে। হ্যাঁ পেয়ে যাবে, হঠাৎ। কীভাবে পাবে, তা সে নির্দিষ্ট করে জানে না, তবে পাবে। তারপর তাদের এই অবস্থা আর থাকবে না।

দুই

আজিজুর রহমান বলল — আমি যাব না। কেন যাব, বলো?

মাহফুজা মাথা নাড়ল — না, আমি যাব। কেন যাব না, বলো?

তুমি কেন যাবে, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না।

আমিও বুঝতে পারছি না। তুমি কেন যাবে না!

এটাকে তুমি দাওয়াত বলবে! আমার কাছে এটাকে অপমান মনে হচ্ছে।

আর, আমার কাছে মনে হচ্ছে সুযোগ।... না, কথা বোলো না। আজিজ, আমি তোমার কথা শুনি না বা তর্ক করি — এমন খুব কমই ঘটে।

আর, আমি শুনি না?

না, আমি সে কথাও বলছি না। তুমি শোনো। শুধু এবার শুনতে চাচ্ছ না। আমি জানি তোমার কথার পেছনে যুক্তি থাকবে। সেই যুক্তির সঙ্গে আমি হয়তো পারব না। তবু আমি যেতে চাচ্ছি। চাচ্ছি, তুমিও যাবে।

আমি না গেলে তুমি একা যাবে?

তা যাব না। কিন্তু তুমি যাবে, এটা আমার অনুরোধ।

এটা, মোস্তাকিম যেদিন সিগারেট দিয়েছিল আজিজুর রহমানকে, তার মাসদেড়েক পরের কথা। এর মধ্যে আজিজুর রহমানের মা মারা গেছেন। খুব হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা। ছোটভাই জানিয়েছিল তাকে, সে যখন মাহফুজাকে নিয়ে গিয়েছিল মৃত মাকে শেষবারের মতো দেখতে — সব ঠিকই ছিল, বুঝছ? তারে তো চিন্তা তুমি, শুধু হাঁটতে পারত না। আর সব ঠিক। তা, মা-ও আমাকে জিগাইল — আজিজুর কী বলছে? হুইল চেয়ার কিন্না দিব? আমি কইলাম — দিব তো বলছে। মা-ও কইল — যাউক, চিন্তা গেল। পরদিন সকালবেলা দেখি মা-ও নেই।

এই কথা শুনে আজিজুর রহমান হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। এর আগে মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে সে থম্ মেরে গিয়েছিল, কাঁদেনি, পরেও কাঁদেনি, শুধু মৃতদেহ কবরে নামানোর পর একটু চোখ মুছেছিল।

রাতে, মাকে হুইল চেয়ার কিনে দেওয়া হয়নি, এই নিয়ে খুব মনমরা ছিল আজিজুর রহমান, মাহফুজাকে সে বলেছিল — দেখো, তুমি তো জানো, হুইল চেয়ার কিনে দেওয়ার ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে ছিল।

মাহফুজা বলেছিল — শোনো আজিজ, এইটা শুধু আমি জানি

না, মা-ও জানে।

কী বলো! মায়ের কী জানার কথা। সে কীভাবে জানবে!

তুমি জানবে, অথচ মা জানবে না — এইটাও কি হয়!

শুনে আজিজুর রহমান দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

এছাড়া, তুমি যে কিনে দিচ্ছ, এইটা তিনি শুনেও গেছেন।

কিনে তো আমি দিতামই, তুমি জানো।

জানি আজিজ, জানব না কেন!

সময়মতো কিনে দিলে হুইল চেয়ারে দুইটা দিন ঘুরতে পারতেন।

তিনি জেনে গেছেন।

শুধু একসঙ্গে এতগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে, বাধো-বাধো ঠেকছিল, তাই কেনা হয় নাই। তুমি জানো।

আমি সব জানি। জানি বলেই তোমাকে এসব কথা আর বলতে হবে না।

না, বলব না। একটা হুইল চেয়ার, মায়ের একটা শখ, কিনে দিতে পারি নাই, এই কথা বারবার বলার কী আছে!

আজকের সামান্য কথাকাটাকাটির মধ্যে, প্রায় মাসদেড়েক পর সেই হুইল চেয়ারের প্রসঙ্গ উঠে এলো। ওঠাল মাহফুজা, সে বলল — তুমি জানো না মোহাম্মদ আলীভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে আমাদের ভালো হতো কি না।

মোহাম্মদ আলী তার বাগানবাড়ির উদ্বোধন উপলক্ষে আজিজুর রহমান ও মাহফুজা দম্পতিকে দাওয়াত দিয়েছে। ফোনটা করেছে সে মাহফুজাকে — অনেকেই আসবে। তোমরা হচ্ছে আামাদের নিজের লোক। তোমরা কিন্তু অবশ্যই আসবে।

প্রথমে কিছু দ্বিধা ছিল মাহফুজার। কিন্তু মোহাম্মদ আলী যখন বেশ অনেকটা সময় ধরে কথা বলল, তারা যোগাযোগ রাখে না — এই অভিযোগও তুলল কিছুটা, মাহফুজার মনে হলো কিছুটা অভিমানই যেন মোহাম্মদ আলীর গলায়, তখন, কথা এগোলে মোহাম্মদ আলী যখন বাগানবাড়ির কিছুটা বর্ণনা দিয়ে ফেলল ও বলল — আসার ঝক্কি তাদের পোহাতে হবে না। সে গাড়ি পাঠাবে, সেই গাড়ি তাদের তুলে নেবে ও রাত যতই হোক, অবশ্যই ফিরিয়ে দিয়ে যাবে, মাহফুজার মনে হলো তাদের যাওয়া উচিত।

আজিজুর রহমান যেতে রাজি হয়, সে বলল — আমি জানি, সম্পর্ক কিছুই ভালো হতো না। মোহাম্মদ আলীভাইয়ের হচ্ছে আলাগা ভাব।

ফোনে মোটেও সেরকম মনে হলো না।

আমার জানা হয়ে গেছে। সামান্য একটা কনজুমার লোন দেয়নি।

দিতে তো চেয়েছিল। নাওনি তুমি।

কেন নেব। চেয়েছি দুটো জিনিসের জন্য, বলে — একটাই নাও।

একটাই নিতে।

আচ্ছা মাহফুজা, হঠাৎ তুমি আলীবাবার জন্য এত দরদ দেখাতে আরম্ভ করলে কেন!

কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, বড়লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা দরকার।

সম্পর্ক রাখবে? পাত্তাই দেবে না।

আমরা পাত্তা পাওয়ার চেষ্টাই করিনি। ভাব আমরাও কম নিইনি।

আমরা আবার কিসের ভাব নিই!

নিই। যার আছে তার সামনে একটু কাঁচুমাচু হয়ে থাকলে কিছু এসে-যায় না।

ডেকেছে তো শান-শওকত দেখাবে বলে।

দেখব। অসুবিধা কী। দেখব আর তার প্রশংসা করব।

তাতে অবস্থা বদলাবে?

বদলাতেও পারে। দেখি না একবার চেষ্টা করে। আমরা কখনো সেভাবে তার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি বলো?... আমাদের

অবস্থা কি বদলানো দরকার না?

সেটা আমি অস্বীকার করছি না।

সারাজীবন নিশ্চয় আমরা এভাবে কাটাতে চাই না?

আহা, আমি বলেছি এভাবে কাটাতে চাই!

একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। আমাদের অবস্থা যদি বেশি না, আরেকটু ভালোও হতো, মাকে আমরা সময়মতো একটা হুইল চেয়ার কিনে দিতে পারতাম।

আজিজুর রহমান চুপ করে গেল।

তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে স্যরি।

না, দাওনি। ঠিক কথাই বলেছি।

যাবে?

যাব।... তুমি যে-কারণে যাচ্ছ সে-কারণে যাব না।

তাহলে। গুপ্তধন বলো আর লুটকরা ধন বলো, সেই ধনে তিনি কী বানিয়েছেন, দেখতে যাব।

মাহফুজা হেসে ফেলল — বেশ, তাই সই।

হাসল আজিজুর রহমানও — বলা যায় না, গুপ্তধনের বাকি অংশ তিনি হয়তো ওই বাগানবাড়ির কোনো চোরা কুঠুরিতেই লুকিয়ে রেখেছেন। সেটা খুঁজতেও যাব।

তিন

মোহাম্মদ আলীর বাগানবাড়ি বড় ও জমকালো। কথামতো গাড়ি গেছে তাদের বাসায়, তারা রওনা দিয়ে পৌঁছেছে দুপুর ১২টার দিকে। মোহাম্মদ আলী তাদের দেখে উচ্ছ্বসিত — থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং। খুব খুশি হয়েছি তোমরা আসায়। আজিজ, বলো তুমি কেমন আছ?

আজিজুর রহমান ও মাহফুজা আশা করেছিল তারা পৌঁছে বেশ অনেক লোকজনের দেখা পাবে। কিন্তু খুব একটা লোক নেই। যারা আছে, কয়েকজন বাদে, সবাই এখানকার ফুটফরমাশ খাটার লোক।

মাহফুজা জিজ্ঞেস করল — লোকজন যে দেখছি না, আলীভাই!

দেখবে-দেখবে। মোহাম্মদ আলী যেন আশ্বস্ত করতে চাইল। অনেকে আসবে। কিন্তু তারা আসবে বিকালের পর। মূল অনুষ্ঠান তখনই।

ও মা, তাহলে আমরা এত সকাল-সকাল কেন!

যারা আমার নিজের লোক, আরো কজন আসবে, তাদের আমি আগেই আসতে বলেছি। তারা ঘুরবে-ফিরবে।... অনেক পরিশ্রম করে বানিয়েছি, নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে।... আর আমি থাকি বা না থাকি, তোমরা কিন্তু নিজেরাই এসে এখানে থেকে যেতে পারবে। মূল বিল্ডিংটায় রুম অনেক, তাছাড়া কটেজও আছে, তোমাদের যেখানে ইচ্ছা থাকবে।... আজিজ মুখ গম্ভীর কেন তোমার?

আমার! আজিজুর রহমান হাসার চেষ্টা করল। কী যে বলেন না! আমার এতই ভালো লাগছে যে কী বলব!

সত্যি! মোহাম্মদ আলীকে খুশি দেখাল।

জি সত্যি। একদম মুগ্ধ হয়ে গেছি।... তা, কী পরিমাণ গুপ্তধন পেয়েছিলেন, আলীবাবাভাই?

এই শেষ কথাটা মোহাম্মদ আলী শুনতে পেল না। কারণ সে তখন কিছুটা এগিয়ে, আজিজুর রহমান বলেছেও গলা নামিয়ে। মাহফুজা অবশ্য ভয়ে ও বিস্ময়ে তাকাল, মোহাম্মদ আলীও ফিরল — কিছু বললে?

এতই ভালো লাগছে যে থেকেই যেতে ইচ্ছা করছে এখানে।

মোহাম্মদ আলী হাসল — থেকে যাবে থেকে যাবে।... বাগানবাড়িটা কেন বানিয়েছি, জানো? বানিয়েছি মানসিক বিশ্রামের জন্য। দরকার আছে না, বলো? শহরে থাকতে-থাকতে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাই, এখানে এসে সতেজ হয়ে ফিরে যাব।

মোহাম্মদ আলী তার কথা বেশিক্ষণ চালাতে পারল না। তার

জরুরি ফোন এলো। সে বলল — তোমরা নিজেরাই ঘুরে-ঘুরে দেখ। আগে বাইরেটা দেখো। হাঁটতে পার, বসতে পার, ঘাসের ওপর শুয়েও থাকতে পার।... গরম আছে, আজিজ, একটা ঠান্ডা বিয়ার নেবে নাকি?

মোহাম্মদ আলী চলে গেলে মাহফুজা ফিরল আজিজুর রহমানের দিকে — তোমার কি মাথা খারাপ? তখন কী বললে তুমি ওটা!

যেন না শোনে, সেভাবে বুঝেও নেই বলেছি।

প্লিজ, আজিজ...

আর একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করব — ওই যে, গুপ্তধন, নাকি লুটকরা ধন কি এখানেই লুকিয়ে রেখেছে।

আমার ধারণা খরচ করে ফেলেছে?

না। আলীবাবা বুদ্ধিমান মানুষ। সে হাত খালি করে ফেলবে না। দেখছ না, চেহারা কেমন চকচক করছে। মানে, হাতে এখনো অনেক আছে।

কিন্তু তুমি খেপিও না আলীভাইকে।

খেপাব না।... চলো, আমরা বরং গুপ্তধন খুঁজি।

আজিজুর রহমান ও মাহফুজা মৃদু পায়ে সামনে এগোল। হাঁটতে-হাঁটতে তারা বেশ অনেকটা সময় পার করে দিলো। চারপাশ তাদের মোহিত করল, ক্ষিপ্তও। শেষে মাহফুজা বলল — চলো, খুব গরম, টায়ার্ড হয়ে গেছি। এবার মূল বাড়িতে যাই।

মোহাম্মদ আলীকে পাওয়া গেল বাইরের ঘরেই। বিশাল একটা ঘর। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন করে বসার ব্যবস্থা। মোহাম্মদ আলী এক কোণে, ফোনে কথা বলছিলেন, কথা শেষ করে তাদের দিকে ফিরে হাত তুললেন — গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনকে একটু মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম। এরা সব বিগ শট, খুব ব্যস্ত থাকেন।... তা তোমরা কেমন দেখলে?

অপূর্ব! আজিজুর রহমান বলল! কী অসাধারণ রুচি আপনার আলীভাই।

মোহাম্মদ আলী হাসল — বসো, একটু বিশ্রাম নাও। তারপর এ-বাড়িটা দেখবে।

বেয়ারা এসে পানীয় দিয়ে গেল। মোহাম্মদ আলী আজিজুর ও মাহফুজাকে পানীয় নেওয়ার ইঙ্গিত করে বলল — এখানে এলে আমার মনটা জুড়িয়ে যায়। দেখ শীতকালে আরো অনেক ভালো লাগবে। তখন ফ্যামিলি পিকনিকের জন্য দারুণ। বাচ্চারা ইচ্ছামতো দৌড়াদৌড়ি করবে, আমার তো আর সে-বয়স নেই, হা-হা-হা, কিন্তু আজিজ... মাহফুজা, তোমরা বাচ্চা নিচ্ছ না কেন এখনো!

এটা আজিজুর রহমান ও মাহফুজার জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা বিষয়। তারা এ-বিষয়ে কখনো কারো সঙ্গে কোনো কথা বলতে চায় না। নিজেদের মধ্যেও না। ফলে মোহাম্মদ আলীর কথায় তাদের দুজনেরই চোখে মুখে একটা ছাপ পড়ল। মোহাম্মদ আলীও সেটা খেয়াল করল — স্যরি, আমি হয়তো অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা বলে ফেললাম।

না, প্রাসঙ্গিক। আজিজুর রহমান বলল। আপনার ভার্শিটির কোয়ার্টারেও একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তর দিয়েছিলাম।... হচ্ছে না। তখন ট্রিটমেন্টে ছিলাম।

ওহো, একদম ভুলে গেছি। তা, এখন?

এখনো ট্রিটমেন্টে আছি। তবে ডাক্তার শেষ পর্যন্ত যে ব্যবস্থার কথা বলেছে, সেটা খুবই ব্যয়বহুল। আমাদের পক্ষে সেই খরচ মেটানো সম্ভব না।

কেমন খরচ, বলো তো?

আজিজুর রহমান বলল।

মোহাম্মদ আলী সামান্য মাথা ঝাঁকাল — হুমম... আজিজ, তোমার চাকরির কী অবস্থা? ওখানেই আছ?

মাহফুজা তড়িঘড়ি করে বলল — আলীভাই, আমরা দুজনই ভাবছিলাম একটা ব্যবসা-ট্যাবসা শুরু করার কথা।

ব্যবসা? আজিজ কি পারবে! পারলে অবশ্য খুবই ভালো।
পারবে। পারবে না কেন! তাছাড়া বুদ্ধি দেওয়ার জন্য আপনি
আছেন...

মোহাম্মদ আলী সামান্য হাসল — এ-বাড়িটা তোমরা দেখোনি।
ঘুরে দেখো। তারপর তোমাদের মুখ থেকে শুনব, কেমন লাগল।

আজিজুর রহমান ও মাহফুজা বসে থাকল।

কই যাও। পরে লোকজন সবাই এসে গেলে সেভাবে আর সুযোগ
পাবে না।

জি-জি, নিশ্চয়। মাহফুজা বলল। আজিজ আসো।

মাহফুজা উঠলে আজিজও উঠল। কিছুটা এগোল তারা, আজিজ
চাপাগলায় বলল — একে তোমার মানুষ মনে হচ্ছে?

এসে যখন পড়েছি, ভুল ধরো আমারই। মাহফুজা বলল। আমি
শেষ দেখতে চাই।

কিছুই পাবে না তুমি এখানে। আমাদের সব কথা কীভাবে
এড়িয়ে যাচ্ছে দেখেছ?

দেখেছি।... আমাদের বেবি হচ্ছে না, খুব খরচের চিকিৎসা... এ
প্রসঙ্গও কীভাবে পাশ কাটল।

খুব খরচের, আমাদের জন্য। তার জন্য ওটা কোনো খরচ না
সেও জানে।

আজিজ। মাহফুজা আজিজুর রহমানের হাত ধরল। আমি তবু
দেখতে চাই।

আমার রাগ হচ্ছে। দেখব কী, আমার সবকিছু ভাঙতে ইচ্ছা
করছে।

মাহফুজা হেসে ফেলল।

বেডরুম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই চোখ জুড়িয়ে গেল।
কার্পাজ করা দেয়াল, কোথাও দেয়াল মসৃণ, সেখানে ছবি টানানো
কয়েকটা, দারুণ দুটো আলমারি, একটা ওয়্যারড্রোব, একসেট বেড-
রুম সোফা, একটু অদ্ভুত শেপের ফ্রিজ, একদিকের দেয়ালে কাভার্ড
ক্রিনের টিভি। আজিজুর রহমান সেদিকে তাকিয়ে বলল — এরকম
টিভি আগে দেখেছ?

শুনেছি। তোমার মুখে। এটার দাম কত হবে?

দশ-এগার লাখ। শুনেছিলাম।... মাহফুজা?

মাহফুজা ফিরল।

আমার মনে হচ্ছে গুপ্তধন এখানেই লুকানো আছে।

মাহফুজা হাসল — তাই বুঝি!

হেসো না। আমি সিরিয়াস।

আজিজুর রহমানের গলায় কিছু একটা ছিল, মাহফুজা ফিরে
তাকাল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল — তোমাকে সত্যিই অন্যরকম
দেখাচ্ছে।

এই যে দুই আলমারি, আমার মনে হচ্ছে এর কোনো একটার
ভেতরে সুড়ঙ্গ আছে।

দেখবে?

তারা অবশ্য সে সুযোগ পেল না। তার আগেই দরজায় নক করে
ভেতরে ঢুকে পড়ল একজন, জানাল — মোহাম্মদ আলী তাদের
নিচে ডাকছেন।

নিচে ছোটখাটো একটা জমায়েত, আরো কয়েকটি পরিবার চলে
এসেছে। মোহাম্মদ আলী বলল — লাঞ্চ টাইম। তারপর রেস্ট।

ডাইনিং রুমের দিকে এগোতে-এগোতে মোহাম্মদ আলী তাদের

আজিজুর রহমান ফিরল মাহফুজার দিকে, গলা নামিয়ে বলল — খেয়াল
করলে? আমরা যে তার বেডরুমে গেছি, এটা তার খুব একটা পছন্দ
হয়নি। ওই রুমটা নিয়ে কথাও বলতে চাচ্ছে না।

হাসছ!

ধরো এমন হলো, হাতুড়ি দিয়ে দেয়াল ভেঙে ফেললে তুমি,
আর, দেয়ালের ভেতর থেকে গুপ্তধন বের হলো।

গুপ্তধন আমাদের জন্য না।

লুট করা ধন আমাদের জন্য না। কিন্তু গুপ্তধন আমাদের হতেই
পারে। ভাবো না তুমি। আমি ভাবছি।

কী?

গুপ্তধনের বাকি অংশ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে আলীভাই।

ওই ব্যাটা যে পাশ কাটিয়ে গেল, তুমি সেটা থেকে আমার মন
সরাতে চাইছ, না?

আহা, ভাবো না তুমি, মজা পাবে।

শালা, অমানুষ একটা। আজিজুর রহমান বলল। বলল, তবে
একটু পর দেখা গেল মাহফুজার পাশাপাশি সে-ও উৎসুক চোখে
এদিক-ওদিক দেখছে কত টাকা খরচ করেছে, বলতে পারবে?

আমার আন্দাজের বাইরে। তোমার?

আমারও।... গুপ্তধনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?

কী?

বাকি অংশ কোথায় রাখতে পারে লুকিয়ে?

সেটাই আজ আমরা বের করব।

হুমম। করব।... একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ?

দোতলায় ওঠার বাঁকানো সিঁড়িটা?

আমাদের প্রায় কিছুই নেই, অথচ আরেকটা মানুষের কত আছে,
কত যে আছে... খুব অদ্ভুত, তাই না?

দোতলায় ৬-৭টা ঘর। একটা বোধহয় মোহাম্মদ আলীর

দিকে কিছুটা ঘেঁষে এলেন — কেমন দেখলে?

কী বলব, আলীভাই! মাহফুজা বলল। আপনার রুচি এতই
সুন্দর!

ধন্যবাদ-ধন্যবাদ।... ছাদের ঘরটা দেখেছ?

না তো! জানিই না। আপনার বেডরুমের চেয়েও সুন্দর?

না না, দুটো দূরকম ব্যাপার।... বেডরুম দেখেছ?

কী যে সুন্দর...!

কী আর, বেডরুম তো বেডরুমই...। মোহাম্মদ আলীকে খুব
একটা প্রসন্ন মনে হলো না। ওটা আর দেখার কী! মোহাম্মদ আলী
পেছনে ফিরল — আসুন আপনারা। খাবার টেবিলে সবার সঙ্গে
সবার আলাপ-পরিচয় হবে।

আজিজুর রহমান ফিরল মাহফুজার দিকে, গলা নামিয়ে বলল
— খেয়াল করলে? আমরা যে তার বেডরুমে গেছি, এটা তার খুব
একটা পছন্দ হয়নি। ওই রুমটা নিয়ে কথাও বলতে চাচ্ছে না।

মাহফুজা মাথা ঝাঁকাল — হুমম ব্যাপার আছে কোনো।

আছে যে। আমি নিশ্চিত।

চার

বিকালের পর থেকে অতিথিরা আসতে আরম্ভ করল। বাইরে পুকুর
পাড়ে বিশাল ব্যবস্থা করা হয়েছে, ব্যবস্থা করা হয়েছে মূলবাড়ির
সুইমিংপুলের পাশেও। বার-বি-কিউ হবে, অটেল মদ্যপানের
ব্যবস্থাও আছে। মোহাম্মদ আলী বলল — আজ হচ্ছে মাতাল
হওয়ার রাত। মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী এসেছে একটু আগে। তার এক
ভাই অসুস্থ, লাইফ সাপোর্টে। সেখানে তাকে যেতে হয়েছে, থাকতে

হয়েছে — এই কথা সে বারবার জানাচ্ছে বিভিন্ন জনকে। না হয় সকাল থেকেই থাকতে পারত। মোহাম্মদ আলীর কথা শুনে বলল — অ্যাঁই, তুমি কিন্তু বেশি খাবে না। তোমার অবস্থা ভালো না।

ঘণ্টা দুয়েক পর চারপাশের চেহারা বদলে গেল। কে কোথায় কী করছে, বোঝার উপায় নেই। কে কোথায় কখন আছে, কখন নেই — জানার উপায় নেই। আজিজুর রহমান ও মাহফুজা শুধু এটুকু বুঝেছে, সুইমিংপুলের পাশের জমায়েত ওজনদার লোকদের জন্য। পুকুরপাড়েরটা হালকা-পাতলা লোকজন যারা, তাদের। আজিজুর রহমান বলল — দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস। মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে তাদের একবারই কথা হয়েছে। মোহাম্মদ আলী বলেছে — তোমাদের নিজেদের পছন্দ থাকলে অন্য কথা। না থাকলে, আজিজ, তুমি নেবে হুইস্কি বা ভদকা, মাহফুজা, তুমি ওয়াইন। কয়েকজন দারুণ মিস্কোলজিস্ট নিয়ে এসেছি। তাদের যে কতরকম প্রিপারেশন। ট্রাই করেই দেখো।

তারা ট্রাই করল না। তাদের ট্রাই করার ইচ্ছা হলো না। মাহফুজা বলল — তুমি খাবে না কিন্তু। মাতাল-টাতাল হয়ে গেলে...।

খাব না। দু-একদিন খেয়েছি। ভালো লাগেনি।... কিন্তু মাহফুজা, আমরা করবটা কী?

মজা হচ্ছে চারপাশে। মজা দেখি।

ভালো লাগছে না। মজা ওদের, আমাদের কী!... চলে যেতে পারলে হতো।

চলো, একটু হাঁটি।

তারা দুজন হাঁটল কিছুক্ষণ। তবে লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, হেঁটেও মজা নেই। আজিজুর রহমান থামল — একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? উত্তর অবশ্য আমিও জানি না।

তাহলে আমিও জানি না।... বলো।

এখানে আজ কত টাকার মদ কেনা হয়েছে?

হাজার-হাজার টাকার।... মানে লাখ...।

কয়েক লাখ। কিছু-কিছু বোতলের দাম নাকি ৭-৮ থেকে ১৪-১৫ হাজার টাকাও। ভাবতে পার?

ইশ, অতগুলো টাকা যদি আমরা একসঙ্গে পেতাম।

সামান্য হাসল আজিজুর রহমান — আমাদের যে চিকিৎসাটা দরকার, ২-৩ বার করতে পারতাম।... শালার টাকা।... মাহফুজা...?

মন খারাপ করে দিয়েছ।... বলো।

থাক।... চলো, ওদিকটায় যাই।

তারা মৃদুপায়ে আরো কিছুক্ষণ ইতস্তত ঘোরাঘুরির এক পর্যায়ে আজিজুর রহমান আবার বলল — মাহফুজা...?

বলো।

একটু সময় নিল আজিজুর রহমান — কিছু না।... এমনি... এমনি।

কী হয়েছে তোমার? খারাপ লাগছে?

উত্তর দিলো না আজিজুর রহমান। তারা আরো কয়েক পা হাঁটল। আজিজুর রহমান বলল — মাহফুজা...?

আশ্চর্য তো।

যাবে?

সেটা ভালো দেখাবে? আমি সুযোগটুকু নষ্ট করতে চাই না।

আমিও না। চলো যাই।

মানে!

মোহাম্মদ আলীর বেডরুমে।

ধাং।

যাই, চলো।

মোহাম্মদ আলীর বেডরুমে ঢুকতে খুব একটা কষ্ট করতে হলো না তাদের। মূলবাড়িতেও এদিক-ওদিক কিছু লোক আছে। তবে তারা সবাই যে যার মতো। যারা দেখভালের দায়িত্বে আছে,

আজিজুর রহমান ও মাহফুজাকে শুধু তাদের চোখ এড়িয়ে ওপরে উঠে আসতে হলো। দোতলায়ও কিছু লোক। তবে তাদেরও পাশ-কাটানো গেল। মোহাম্মদ আলীর বেডরুমের সামনে দাঁড়িয়ে দুপাশে দেখে নিল তারা, তারপর লক ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঢুকে পড়ল সাবধানে, কারণ ভয় ছিল — ভেতরে কেউ থাকতেও পারে; কিন্তু নেই। বড় করে শ্বাস ফেলল। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

তুমি কি ভাবছ এই দুই আলমারির কোনো একটাতেই? মাহফুজা জিজ্ঞেস করল।

আমার কোনো সন্দেহ নেই। আলমারি খুলতে হবে, বুঝলে? কোনো একটা আলমারির ভেতরে পথ আছে, সেই পথে চোরাকুঠুরি, সেখানে গুপ্তধন।

মাহফুজা এগিয়ে আলমারির সামনে থমকে গেল — আরে, হাতল-টাতল কিছু নেই। এটা খোলে কীভাবে? আজিজুর রহমান দাঁড়াল আরেকটার সামনে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে — আছে কোনো সিস্টেম। আলীবাবা নিশ্চয় চাইবে না সেটা অন্য কেউ বুঝুক।

দুজন তবু বেশ কিছুক্ষণ টানাটানি করল। আলমারি খুলল না। একসময় হেসে ফেলল আজিজুর রহমান — আমরা বোকার মতো কাজ করছি। কম্বিনেশন লক এখানে? কী ছিল কম্বিনেশন, মনে আছে তোমার?

আমার? কম্বিনেশন?

কম্বিনেশন বলো পাসওয়ার্ড বলো,... দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে পড়েছে — চিচিং ফাঁক। চিচিং ফাঁক, না?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। চিচিং ফাঁক।

তাহলে সরে এসে একটু পেছনে দাঁড়াও।

তারা পেছনে সরে এসে আলমারির মুখোমুখি দাঁড়াল। আজিজুর রহমান মাহফুজার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, চোখ সরিয়ে নিল। দুজন একসঙ্গে বলে উঠল — চিচিং ফাঁক।

আলমারি খুলল না।

আবার।... চিচিং ফাঁক।

আলমারি খুলল না।

তারা একটু পেছনে সরে বলল — চিচিং ফাঁক।

আলমারি খুলল না।

তারা বেশ কিছুটা সামনে এগিয়ে বলল — চিচিং ফাঁক।

আলমারি খুলল না।

তাদের দুজনকে অস্থির দেখাল। মাহফুজা বলল — কী ব্যাপার? আলীবাবা কি পাসওয়ার্ড বদলে ফেলেছে।

না-না, ওটাই পাসওয়ার্ড। ওটাই পার্মানেন্ট পাসওয়ার্ড। আসলে আমাদের ঠিকমতো বলা হচ্ছে না। আসো, আবার...।

তারা নানাভাবে বারবার চিচিং ফাঁক বলে যেতে লাগল। তারা নানাভাবে চিচিং ফাঁক বারবার বলল। তারা বারবার এগিয়ে পিছিয়ে জায়গা বদলিয়ে চিচিং ফাঁক চিচিং ফাঁক করল। কিন্তু আলমারি খুলল না।

তারা হতাশ ও ক্লান্ত চোখে দুজন দুজনের দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর তারা দুজন প্রায় একইসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল। তারা হাসল বেশ অনেকক্ষণ ধরে — আমরা না... আমরা না... আজিজুর রহমান বলল, আর মাহফুজাও তাতে হাসি সামলাতে সায় দিলো — আমরা কী আমরা কী?

তারপর হঠাৎই তারা সতর্ক হয়ে উঠল — অনেকক্ষণ হয়েছে। কেউ চলে আসতে পারে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলো বেরোই।

তারা বেরোবার দরজার কাছে পৌছালে আজিজুর রহমান হাত রাখল মাহফুজার কাঁধে — বেশি ভিজে গেছ। কেউ দেখলে কী না কী ভাববে। চোখ মুছে নাও।

মাহফুজা বলল — তুমিও। □



তোমার চরিত্র খারাপ

আন্দালিব রাশদী



আমার মেয়ে নাতাশা ঠিক এই কথাটাই বলেছে।
কাঁদতে-কাঁদতে বলেছে, বাবা তোমার চরিত্র খারাপ।
স্বামীর চরিত্র নিয়ে স্ত্রী হাজার কথা বলতেই পারে; স্ত্রীরা বলেও থাকে। যা
বলে তার পুরোটা না হোক আংশিক তো সত্য।
কিন্তু তাই বলে মেয়ে বাবার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলবে?
নাতাশা যখন এই কথাটা বলে, তখন আমার সামনে নীতু, বিপাশা, সিনথিয়া, তন্ময় এবং
মিতু। যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলেছে নিহার বানুও জিহ্বায় কামড় দিয়েছে।



অলংকরণ : ফরিদা জামান

নীতু আমার স্ত্রী। নীতুকে আমি আপনি সম্বোধন করতাম। কখনো-কখনো ম্যাডামও বলতাম। সৈয়দ বোরহান উদ্দিন সাহেবের এটাই ছিল নির্দেশ। তার নির্দেশেই নীতু আর পাঁচজনের মতো আমাকেও তুমি বলত। কর্মচারীদের আপনি বলে বেশি সম্মান দেখিয়ে মাথায় তুলতে নেই। ছোটলোকেরা সম্মানের মর্যাদা বোঝে না। সম্মান করাকে দুর্বলতা ভাবে। তুই-তোকারি করতে পারলে সব ঠিক থাকে।

বিপাশা আমার মেয়ে। ইন্টারমিডিয়েট ফাস্ট ইয়ারে পড়ে। এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে। খুব কম কথা বলে। কোনো কিছু ভালো লাগলে সেদিকে যেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কোনো কারণে রেগে গেলেও তার একই অভিব্যক্তি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। নাতাশা যখন আমাকে এরকম একটা কথা বলল, একইভাবে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বাকি সময়টা আমার দিকে চেয়ে রইল। এই দৃষ্টির মানে আমি বুঝে উঠতে পারি না। নাতাশা যা বলেছে ঠিকই বলেছে নাকি বাবাকে এভাবে বলা নাতাশার ঠিক হয়নি। বিপাশা ব্রিটিশ কাউন্সিল রিডিং কনটেস্টে ক্লাস ইলেভেন-টোয়েলভ গ্রুপে ফাস্ট হয়ে একটি ল্যাপটপ পুরস্কার পেয়েছে। সে পছন্দ করেছিল ন্যাথানিয়েল হথর্নের লেখা দ্য স্কারলেট লেটার। সেখানে মন্দ চরিত্রের একজন নারীর ওপর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে। তার গলায় ইংরেজি 'A' অক্ষরটি ঝুলিয়ে দেওয়া

নাতাশা যে-কথাটা বলেছে
পুরোটাই শুনেছে এবং একই-
ভাবে হেসে উঠেছে। কোলাহল
যখন মিটে গেল তন্ময় বলল,
বাবা, তোমার চরিত্র খারাপ।

হয়েছে। এখানে A-তে apple নয়, A-তে adulteress, তার মানে ব্যভিচারিণী। বিপাশাও কি আমার জন্য এরকম একটা কিছু ভাবছে?

সিনথিয়া আমার মেয়ে। বিপাশা আর সিনথিয়ার বয়সের ব্যবধান বেশি নয়, এক বছর তিন মাস। সিনথিয়া যখন পেটে, নীতুর শারীরিক সমস্যা হচ্ছিল। নীতুর ডাক্তার প্রফেসার সুমাইয়া নবী নীতুর সামনেই আমাকে খুব অপমান করলেন। বললেন, হাতের কাছে বউ পেলেই স্পার্ম মাথায় উঠে যায় নাকি?

স্পার্ম মাথায় ওঠার কোনো সুযোগই নেই। তবু এটা গালাগালের মতোই। আমি মানেটা বুঝেছি।

তিনি বললেন, আপনারা পুরুষ মানুষেরা একটা বাচ্চা হওয়ার পরই কেন ভেসেকটমি করিয়ে নেন না বুঝি না। তাহলে মেয়েরা অন্তত কিছু শারীরিক ও মানসিক কষ্ট থেকে রেহাই পায়।

আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি দাঁত কটমট করে এমনভাবে আমার ওপর দৃষ্টি ফেললেন, যেন হাতের কাছে একটা ভালো ছুরি পেলে ঘ্যাচাং করে আমার প্রজনন দণ্ডটা কেটে ফেলবেন।

তিনি বললেন, ছ-মাস পেরিয়ে গেছে, নইলে অ্যাবর্ট করিয়ে নিতে বলতাম। কতগুলো ক্লিনিক অবশ্য করে কিন্তু আমি এটা প্রেসক্রাইব করি না। অবশ্য এটা আপনাদের ইচ্ছা।

আমি নীতুর দিকে তাকাই, নীতু আমার দিকে। নীতুর জরায়ুতে একটি বাচ্চা আছে জানি; কিন্তু বাচ্চাটির জন্য আমার ভালোবাসা তখনো তৈরি হয়নি, যেমনটা হয়েছিল নাতাশার বেলায়। নীতুকে নিয়ে সুমাইয়া নবীর চেম্বার থেকে যখন বের হচ্ছি, তিনি আবার ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আগের বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে?

নীতু বলল, মেয়ে।

আমি বললাম, আমাদের দুটি মেয়ে।

তিনি সম্ভবত আমাকে সহ্য করতে পারছেন না। বললেন, সব ঝামেলা তো আপনার জন্যই। আপনার ওয়াইফের কী দোষ? দেন, প্রেসক্রিপশনটা দেখি।

তিনি নিজের প্রেসক্রিপশনের নিচের দিকে লিখলেন : আলট্রাসোনোগ্রাম ফর প্রেগন্যান্সি প্রোফাইল।

ফিসফিস করে বললেন, ডাক্তারকে রিকোয়েস্ট করে বাচ্চার সেক্স কী জেনে নিতে পারেন। ছেলে না মেয়ে জানলে ডিসিশন নিতে আপনাদের সুবিধা হবে।

আলট্রাসোনোগ্রামের জন্য যেতেই ডাক্তার ইশরাত নীতুকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রস্রাবের চাপ আছে? না থাকলে তিন গ্লাস পানি খেয়ে একঘণ্টা অপেক্ষা করুন। আমাদের দেড়ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো।

তিনি আমাকেও ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, বাচ্চাটা পেটের ভেতর কেমন আছে আপনারা দুজনই দেখে নিন। নীতুর পেটে স্বচ্ছ জেল লাগিয়ে পেটের ওপর প্রব চালালেন আর মনিটরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই দেখুন মাথা, এই যে পা-হাত। মনিটরে মাপ দেখলেন। বললেন, ফুইড ঠিক আছে; সব ঠিক আছে।

নীতু জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে?

ডাক্তার বললেন, বাচ্চা কমন জেন্ডার। ছেলেও হতে পারে, মেয়েও হতে পারে।

নীতু বলল, তবু ম্যাডাম।

ডাক্তার মেশিনের পয়েন্টার মনিটরে দু-পায়ের সন্ধিস্থলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, এবার আপনারাই বলুন মেয়ে না ছেলে।

আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকাই। মনিটর দেখে বোঝার সাধ্য আমাদের নেই।

তিনি বললেন, খুব সহজ। ছেলে হলে ঠিক এই জায়গাটাতে

কালো একটা ছোট বলের মত কিছু দেখতে পেলেন। ওটাই ক্রোটাম — অণ্ডকোষ।

আমি আবার নীতুর দিকে তাকাই। তিনি বললেন, কি দেখতে পেয়েছেন?

আমি বললাম, কিছু নেই।

তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, তাই তো হওয়ার কথা। মেয়েদের তো অণ্ডকোষ থাকে না। নাকি থাকে?

আমি বললাম, আমি তো মেয়েই চেয়েছি।

বেশ, তাহলে মিষ্টি নিয়ে বাড়ি চলে যান। কিন্তু নিজেরা মিষ্টি কম খাবেন।

সিনথিয়া তার মাকে আর ভোগায়নি।

সে-সময় অ্যাবর্ট করালে আমি এই অসাধারণ মেয়েটিকে কোথায় পেতাম!

সিনথিয়া ক্লাস টেনে। নতুন টেন। পুরনো টেন একমাসের মধ্যেই এসএসসি পরীক্ষায় বসছে। সিনথিয়া বিপাশার মতো ভালো ছাত্রী নয়, মাঝারি মানের। কিন্তু সে-ই স্কুল প্যারেডের কমান্ডার। বিজয় দিবসে সিনথিয়াই তার স্কুলের ট্রুপ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্যালুট করেছে। সিনথিয়া কবিতা লিখে, গান গায়, নাটক করে। স্কুলের সবাই তাকে চেনে। একই স্কুলে বিপাশা ও নাতাশা পড়লেও টিচাররা আমাকে চেনে সিনথিয়ার বাবা হিসেবে।

নাতাশার কথা শুনে সিনথিয়া কারো দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক পা-দুপা করে পেছনদিকে সরতে-সরতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি দরজা খোলার শব্দ পেয়েছি। সিনথিয়া এই রাতের বেলা কোথায় যাবে? আমি জানি ছাদের ওপর। যখন মনে হবে পরিস্থিতি থিতিয়ে এসেছে আবার ফিরে আসবে। এমন ভাব করবে, যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু সিনথিয়া কী ভাবল? বাবার চরিত্র খারাপ!

তন্ময় আমার ছেলে। সিনথিয়ার চেয়ে প্রায় তিন বছরের ছোট। তন্ময় হাসে, শুধুই হাসে। বকা দিলেও হাসে। তন্ময় এখন পর্যন্ত বাবার নামটা ঠিকমতো লিখতে পারে না। সর্বশেষ লিখেছিল আরিকুশ হরমান।

তন্ময় অক্ষর ও সংখ্যার পর্যায়ক্রম মনে রাখতে পারে না।

তন্ময় যেভাবে আমার নাম লিখেছে তাতে নীতু খুশি। একটা অক্ষরও বাদ পড়েনি। অক্ষর ও যতিচিহ্নের সামান্য এদিক-ওদিক হয়েছে। আমার নাম আশিকুর রহমান। আমার ছেলে তন্ময়ের আসল নাম মুশফিকুর রহমান। আমার ছেলেটা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী।

নাতাশা যে-কথাটা বলেছে পুরোটাই শুনেছে এবং একইভাবে হেসে উঠেছে। কোলাহল যখন মিটে গেল তন্ময় বলল, বাবা, তোমার চরিত্র খারাপ। তারপর তন্ময় ঘুরে-ঘুরে নাচতে-নাচতে বলতে লাগল, টেবিল তোমার চরিত্র খারাপ, তেলাপোকা তোমার চরিত্র খারাপ, মুরগি তোমার চরিত্র খারাপ, পুলিশ তোমার চরিত্র খারাপ — এরকম কিছুক্ষণ বলার পর বিষয়টা ভুলে যায়। জিজ্ঞেস করে, আমি কী বলেছি?

নীতুর মনে পুত্রবাসনা তীব্রই ছিল। আলট্রাসোনোগ্রাম মেশিনে এবার বাচ্চার অণ্ডকোষ দেখতে চায়নি। তার ভয় ছিল, যদি আগের মতোই হয়! ছেলের জন্মের পর বাড়ি-বাড়ি মিষ্টি পাঠিয়েছে। নীতু এখন তাদের এড়িয়ে চলে, পাছে তাদের কেউ তন্ময়ের কথা জিজ্ঞেস করে।

মিতু আমার শ্যালিকা। যখন নীতুকে বিয়ে করি, মিতুর বয়স সাড়ে চার কি পাঁচ। মিতুর হাজব্যান্ড তৌহিদ টাউন প্ল্যানার। রিয়াদ আরবান ডেভলপমেন্ট অথরিটির বড় কর্মকর্তা। মিতু সেখানেই থাকে। আজ সকালেই ঢাকা এসেছে, রাতটা আমাদের সঙ্গে থেকে

কাল ভোরে মেহেরপুর চলে যাবে। শাওড়ি অসুস্থ, সে- কারণেই আসা। তৌহিদ নেক্সট উইক আসছে।

মিতু নিঃসন্তান। তৌহিদ হুমকি দিয়েছে, আবার বিয়ে করবে। আমি বলেছি, সমস্যাটা হয়তো তৌহিদের। সে যে ক্যাপেবল তার মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখাতে বলো।

নাতাশার কথাটা মিতু শোনাতে আমি একটু বিব্রত। নিহারবানু অনেক বছর ধরে এ-বাড়িতে। তন্ময়ের জন্মের তিনমাস আগে এসেছে। বেতন বাড়ানোর তেমন চাপ নেই। তবে পান আর শাদা পাতার সরবরাহ ঠিক রাখতে হয়। নতুবা অসন্তুষ্ট হয়। আমাদের পরিবারের গোপনীয় অনেক বিষয় নিহারবানু জানে। এসব নিয়ে অন্য কারো সঙ্গে গপশপ করে না। দরকার হলে নিহারবানু সাক্ষ্য দেবে তার গৃহকর্তার স্বামী তার দিকে হাত বাড়ায়নি।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর নাতাশা আবার চিৎকার করে বলল, বাবা, তোমার চরিত্র খারাপ। ছিঃ, তুমি অন্য মানুষের প্রেগন্যান্ট ওয়াইফের সঙ্গে সম্পর্ক করেছে। তুমি একটা আস্ত বেহায়া। তাও যদি সেই মহিলাকে তুমি প্রেগন্যান্ট করতে, একটা কথা ছিল।

ততক্ষণে সিনথিয়া ফিরে এসেছে।

নাতাশা আবারো চৈচিয়ে উঠে আমার নাম ধরে শ্যালিকাকে শুনিতে বলে, আশিকুর রহমানের চরিত্র খারাপ। অন্য মানুষের প্রেগন্যান্ট ওয়াইফের সঙ্গে কুকাজ করেছে।

ছেলেমেয়েরা কে কী মনে করল তা নিয়ে আমি আর ভাবছি না। আমি নিজেই এবার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। নাতাশা মিথ্যে বলেনি।

দুই

এক অর্থে আমার দাদা থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত আমরা প্রায় সবাই নবাব এস্টেটের আশ্রিত ও উচ্চিষ্টভোগী। আমার দাদা এস্টেটের বড় শরিক নবাব সৈয়দ আমীর উদ্দিনের ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান ছিলেন। ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন কমে আসায় আমার বাবা পেশা বদলে তার ছেলে নবাব সৈয়দ হাফিজ উদ্দিনের বাজার-সরকার হলেন। আর আমি হলাম তাঁর আয়েশি ছেলে নবাব সৈয়দ বোরহান উদ্দিনের অ্যাটেন্ডেন্ট। যখনই খবর পাঠান চলে আসি, যখনই বেল টেপেন আমিও বলে উঠি, ইয়েস স্যার।

নবাব এস্টেটের বাগানবাড়ির শেষ প্রান্তে হলুদরঙা নায়েব অফিস উঠে গেলে ঝাড়পোছ করে এটাকেই বানিয়ে নিয়েছি অ্যাটেন্ডেন্টস কোয়ার্টার। তরুণ সৈয়দ বোরহানের সাক্ষ্য মাহফিলে যোগ দেন বিগতযৌবন দু-একজন বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, তাদের বিদেশ জীবনের দু-একজন বন্ধু, সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন শৌখিন রাজনীতিবিদ এবং হেলেন, সুইট হেলেন — এই নামের একজন সচিবালয় সুন্দরী। ঘরোয়া কাজগুলোতে ঝামেলা কম — এগুলোর ফলো-আপসহ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আমার। দেশি ও আন্তর্জাতিক বিষয় দেখাশোনা করেন দ্বাদশ সচিবালয় সুন্দরীর একজন হেলেনা খান ওরফে সুইট হেলেন। তার নিত্য অতিথিদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী হেলেনও চল্লিশোর্ধ্ব, সৈয়দ বোরহান পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়েছেন কিনা সন্দেহ। আমার তখন সাতাশ কি আঠাশ।

আমার মতো আরো দু-একজন বিভিন্ন পরগনায় জমিদারপুত্রদের সেবক হিসেবে কাজ করছে। তাদের মূল কাজ মেয়ে সাপ্লাই দেওয়া। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে আমার সাত বছরের কর্মজীবনে তিনি ইশারা-ইঙ্গিতেও এই লোভনীয় বিষয়টির প্রতি কোনো ধরনের আসক্তি প্রকাশ করেননি।

সৈয়দ বোরহান মধ্যদুপুর পর্যন্ত ঘুমান। উঠে দু-একটি ইংরেজি খবরের কাগজ পড়েন, কয়েকটা ফোন করেন, কেনাকাটার কিছু

থাকলে নির্দেশ দেন। এক গ্লাস কুসুম গরম ঘন দুধ খেয়ে বাথরুমে যান। নাস্তার টেবিলে যেতে-যেতে বিকেল চারটা। আমি সকালে অটেল সময় পেয়ে যাওয়ায় আমার পড়াশোনাটা কমবেশি চালিয়ে যেতে পেরেছি। আমার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ কিছু কিনতে হয়নি। সৈয়দ সাহেব দু-একবার ব্যবহারের পর যা রিজেক্ট করতেন, একটু অলটার করিয়ে নিলে আমার বেশ চলে যেত। স্টকের পুরনো চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজও দিয়ে দিতেন। আমি একা নই, নবাব এস্টেটে চাকরিরত সুইপারও এই গুডেচ্ছার কিছু না কিছু ভাগ পেয়ে থাকে। জমিজমার কিছু আয়, সুগারমিল ও ইটভাটার লাভ, কিছু ফিক্সড ডিপোজিট — কাজকর্ম না করে তার ভালোই চলে যায়। নবাব সৈয়দ হাফিজ উদ্দিন ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন — পড়াশোনায় ভালো এই ছেলেটি লিঙ্কন'স ইন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসবেন। জিন্নাহ সাহেবও লিঙ্কন'স ইন থেকে পড়াশোনা করা। পরে সময়-সুযোগ বুঝে বড় দলগুলোর সঙ্গে দর কষাকষি করে ইলেকশন করবেন, মন্ত্রী হবেন।

কিছুই হয়নি। বারেও নাম লেখাতে পারেননি। বিলেতে আত্মানুসন্ধান করেই নাকি দশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। মাঝখানে বেশ পয়সাকড়ি খরচ করে একজন স্কটিশ নার্সকে বিয়ে করেছিলেন। মাসতিনেক পর ক্ষতিপূরণ দাবি করে এবং তার বিরুদ্ধে যৌন-শীতলতার অভিযোগ এনে বিচ্ছেদের মামলা করেন। তার সাক্ষ্য আসরের নন-প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজার মধ্যস্থতায় র্যাচেল নামের সেই নার্সকে আশি হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণ ও তালাক দিয়ে মামলাটি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করেন। তিনি তার যৌন-শীতলতার বিষয়টি মেনে নিয়ে র্যাচেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন, তার সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন সম্ভবত ভিন্ন, যা তিনি র্যাচেলকে বিয়ে করার আগে কখনো ভালোভাবে বুঝতে পারেননি।

সৈয়দ বোরহান সাহেবের বাসার মিনি বার রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। তিনি আশা করেন, তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী নয়নতারা বেগম তার অবগুপ্তন থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধুদের সামনে হাজির হবেন। হাসিমুখে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দেবেন।

নয়নতারা কখনো না বলেননি, কিন্তু তাঁর আড়ষ্টতা এবং সৈয়দ সাহেবের ভাষায় আনস্মার্টনেস কোনোভাবেই নবাববাড়ির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নয়নতারা কাঁদতে-কাঁদতে বলেছেন, তা হলে আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ফিরে যাই। সৈয়দ বোরহান বলেন, তা হয় না। আমাদের ফ্যামিলিতে ডিভোর্সের নজির নেই। হিসাবে না মিললে ওয়াইফকে হয় খুন করা হয়, নতুবা ওয়াইফ সুইসাইড করে। সুইসাইডের ঘটনাই বেশি।

নয়নতারা সেদিনই মুখের ওপর বলে দেয়, আপনি যে-কাজের জন্য বিবাহ করেছেন, সে-কাজও তো ঠিকমতো করতে পারেন না।

তিনিও সেদিনই প্রথম গায়ে হাত তোলেন এবং বলেন, আমি কোনো কাজের জন্য বিবাহ করিনি। নবাববাড়িতে সৈয়দ বোরহানের একজন স্ত্রী থাকা দরকার, সেজন্য ঘরে স্ত্রী এনেছি। আর তুমি যে কাজের কথা বলছ তার জন্য যদি আমার আগ্রহ থাকত তাহলে এটাই হতো বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বাইজিবাড়ি। আমি প্রথম দিনই স্বীকার করেছি, আমার সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন একটু ডিফারেন্ট, তুমি সম্ভবত আমার কথার মানে বুঝতে পারনি। প্রপার এডুকেশন না থাকলে যা হয়।

তারপর প্রতিদিন রাতেই নয়নতারা কমবেশি মার খেতে থাকেন। কোনো-কোনো দিন বেডরুম থেকে বের করে বলে দেন, গো টু হেল।

কোনোদিন বলেন, টেবিলে একটা সুইসাইড নোট রেখে যাও : আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

কোনোদিন বলেন, যাও আমাদের বাগানবাড়িতে তোমার

পছন্দমতো একটা গাছে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ো।

আমার দায়িত্ব সৈয়দ সাহেবের মিনি বারের দরজা বন্ধ করা, গ্লাসগুলো ধুয়েমুছে আগামীকালের জন্য সাজিয়ে রাখা।

আমি আমার পড়াশোনার সময় বাড়িয়ে দিলাম। নিজের কাজের সময় নিজেই নির্ধারণ করি, সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত একটা।

সৈয়দ বোরহান সাহেবের স্ত্রীকে তাজিমের সঙ্গে সালাম দিই, ম্যাডাম সম্বোধন করি। তিনি আমার চেয়ে পাঁচ-ছ-বছরের ছোটই হবেন।

এক রাতে আমি বার বন্ধ করে বের হচ্ছি, তিনি বেডরুম থেকে বের হয়েছেন, তার নাকে-মুখে রক্ত। আমি দ্রুত মিনি বার খুলে বরফ নিয়ে আসি, বলি, নাকে চেপে ধরুন ম্যাডাম।

তিনি বলেন, না না, তুমি যাও। তিনি তোমাকেও গুলি করবেন। এরকম চলতেই থাকে।

একদিন মধ্যরাতে তাকে পাই আমার বাসার কাছাকাছি একটা গাছের নিচে। তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে সুবিধাজনক ডাল খুঁজছেন।

আমাকে দেখে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, আমাকে ধরবে না, সাবধান।

আমি বললাম, ম্যাডাম প্রাণের ভয়, চাকরির ভয় দুটোই আমার আছে। আপনাকে ধরার সাহস আমার নেই। কিন্তু আমার চোখের সামনে আপনাকে মরতেও দেব না।

তিনি ধীরে-ধীরে হেঁটে মূল ভবনের দিকে চলে যান। বেডরুমে ঢুকতে না পারলে সমস্যা — পাশাপাশি অন্তত চারটা গেস্টরুম। যে-কোনো একটাতে ঢুকলেই হলো।

নবাব সৈয়দ বোরহান উদ্দিনের উপেক্ষা ও অত্যাচার এবং নয়নতারাকে রক্ষা করার একান্ত ইচ্ছা আমার রাতের ঘুম হরণ করতে শুরু করল। আমি মধ্যরাতের পর নবাববাড়ির গাছের নিচে হেঁটে বেড়াই। নয়নতারা ম্যাডামকে আমি এভাবে মরতে দেব না।

নয়নতারা একদিন বললেন, তার পেটে বাচ্চা।

আমি বললাম, খুব ভালো হয়েছে। আপনি আর মরতে পারবেন না। পেটের বাচ্চা আপনার হলেও তাকে মারার অধিকার আপনার নেই।

তিনি বললেন, এত বড়-বড় কথা তুমি কোথায় শিখলে?

বললাম, পড়াশোনা করছি। ভালো একটা চাকরি পেতে হবে। আপনার পেটে যে বাচ্চা সৈয়দ সাহেব কি তা জানেন?

আমি বলেছি, তিনি মদের ঘোরে কতটা বুঝেছেন তিনিই জানেন।

মাফ করবেন ম্যাডাম নয়নতারা, তিনি নাকি নারীসঙ্গ পছন্দ করেন না। এটা শোনা কথা, তিনি নাকি এসব ভালো করতে পারেন না।

এটাও সবাই জানে নাকি, আমি তো কাউকে বলিনি। বাচ্চা হওয়াবার জন্য ওসব ভালো করে করার দরকার হয় না, সময়মতো কোনোরকম একটু করতে পারলেই হয়।

আমার সঙ্গে রাত-বিরেতে তার দেখা হয়, কখনো নাকে রক্ত, ঘৃষিতে কখনো চোখের তলাটা ফুলে আছে। আমি উদ্বেগ হয়ে জিজ্ঞেস করি, বাচ্চাটার কোনো ক্ষতি হয়নি তো?

তিনি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

আমি বলি, ম্যাডাম অনুগ্রহ করে আপনার পেটটা সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকে আড়াল করে রাখবেন, যেন পেটে আঘাত করতে না পারেন। বাচ্চাটা যেন ব্যথা না পায়।

অন্য একদিন রাত দেড় কি দুটোর দিকে নয়নতারা ম্যাডামকে গাছের নিচে পেয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি, সৈয়দ সাহেব আজ কোথায় আঘাত করেছেন? বাচ্চাটার লাগেনি তো?

তিনি বললেন, আজ তিনি পুরো মাতাল অবস্থায় বেডরুমে ঢুকে তখনই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি বাইরে থেকে লক করে চলে

এসেছি।

তিনি যদি উঠে পড়েন?

কাল দশটা পর্যন্ত ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই।

যুগপৎ আতঙ্ক ও আকাজক্ষায় দোল খেতে-খেতে আমি বলি, ম্যাডাম যদি অনুমতি দেন বাচ্চাটাকে একটু আদর করি।

তিনি বললেন, করো।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে আলতো করে তার পেট স্পর্শ করি। তিনি আমার হাতের ওপর হাত রেখে আমার হাতকে তার শাড়ি-ঢাকা পেটের ওপর সঞ্চালন করতে-করতে বললেন, বাবুটা এখানে, বাবুটা এই তো এখানে।

আমি তার ঈষৎ স্কীত পেটের ওপর ঠোঁট রেখে বাবুটাকে, সম্ভবত বাবুটার মাকেও চুমো দিতে চেষ্টা করি।

সৈয়দ সাহেবের আচরণে সামান্য পরিবর্তনও ঘটেনি।

একরাতে তিনি বললেন, নবাবরা কখনো ওয়াইফকে ডিভোর্স করে না। হয় খুন করে নতুবা সুইসাইড করতে বাধ্য করে। শেষেরটাই বেশি হয়। কিন্তু তুমি তো আমাকে শেষেরটা করতে দিচ্ছে না। বাকি থাকল খুন হওয়া। যে-কোনোদিন ঘটনাটা ঘটে যেতে পারে।

এক রাতে আমি বললাম, ম্যাডাম আমি ব্যাংকে চাকরি পেয়ে গেছি। নবাবদের কাছে আমার পরিবারের অনেক ঋণ। কিন্তু আমি যে আর নবাবদের উচ্ছিষ্ট খেতে চাই না।

তিনি বললেন, এখনি এমন প্রতিজ্ঞা করো না।

তিনি আরো বললেন, বাচ্চাটা তোমার আদর পেয়ে খুশি হয়েছে। এই প্রথম একটুখানি আদর পেয়েছে।

আমি আবার হাঁটু গেড়ে কাপড়ের ওপর দিয়ে নয়নতারার পেট স্পর্শ করি। আমি তাঁর অনুমতি নিয়েই আমার খোলা হাতে তার ত্বক স্পর্শ করি, তার নাভি এবং চারপাশ।

তিনি বললেন, বাবুটা নড়ছে, তোমার হাতের ছোঁয়া বেশ বুঝতে পেরেছে।

তিনি বললেন, তোমাকে নবাবের উচ্ছিষ্ট আরো কিছু যে খেতে হবে।

আমি অতি সন্তর্পণে নয়নতারাকে আমার ছোট্ট ঘরে নিয়ে আসি। আমার আতঙ্ক হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। ঘরের ছিটকিনি লাগিয়ে আমার অগোছালো বিছানায় নয়নতারাকে শুইয়ে দিয়ে মৃদু আলোয় তাকে নির্বসন করতে-করতে বলি, আমি এই বাবুটার বাবা হতে চাইলে আপনি আপত্তি করবেন?

তার মুখে হাসি, চোখে অশ্রুবিন্দু। তিনি এক-এক করে আমার শার্টের বোতাম খুললেন। আমিও নির্বসন হয়ে গেলাম।

হিমযুগের দুজন নির্বসন মানব-মানবী উষ্ণতার খোঁজে পরস্পরের ভেতর সেধিয়ে দুজন মিলে এক হয়ে গেল।

আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললাম, নয়নতারা।

তিনি বললেন, চলো এখনই পালাই।

আমি বলি, চিন্তা করবেন না। নবাবের শেষ উচ্ছিষ্ট আমি গ্রহণ করেছি। নবাবরা কখনো প্রজার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে না।

আমি আরো একবার হাঁপাতে-হাঁপাতে বললাম, নয়নতারা।

তিনি বললেন, তুমি আমাকে নীতু বলো। নীতু আমার ডাকনাম।

আমিও বললাম, তুমি নীতু?

হ্যাঁ।

আমি জিজ্ঞেস করি, আমি বাবুটাকে ব্যথা দিইনি তো?

নীতু বলল, না তো, একটুও না। তুমি না বাবুটার বাবা!

সেই বাবুটার জন্ম আমাদের বিয়ের ঠিক সাড়ে তিনমাস পর। বাবুটা দারুণ কিউট। মাথাভর্তি চুল, গাঢ় দুধের মতো গায়ের রং। এটিই আমাদের প্রথম সন্তান।

আমরা এই বাবুটার নাম রেখেছি নাতাশা। □



স্বপ্নের সারস ওড়ে সুবর্ণপুরাণে পারভেজ হোসেন



দুনিয়া ঘুরে এসে সুবর্ণখামের মাটিতে প্রথমবারের মতো পা রাখলেন ভিন্ন দুটি সংস্কৃতি থেকে আসা দুই পর্যটক ইবনে আল আসাদ আর ফ্রান্সিস নাহিয়ান। একজন মরক্কোর মুসলমান, অন্যজন পর্তুগিজ খ্রিস্টান হলেও বসবাস মালাকায়। জাহাজেই পরস্পরের পরিচয়। জাহাজেই তাদের বন্ধুত্ব। একুশ দিন একটানা জলে কাটিয়ে ডাঙায় নামতেই বিস্ময়ে ভরে উঠেছে তাদের চোখ, ঐশ্বর্যময় বন্দরের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে মন।

এদেশীয় এবং ভিনদেশি নাবিক-বণিক আর কুলিদের ভিড়ে মোগরা বন্দর হইহই করছে। ঘাট পেরিয়ে বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সুবিশাল সব ইমারত, প্রকাণ্ড বাজার আর দূরে প্রশস্ত রাজপথের ওধারে ফোয়ারার জলে বিকেলের নুয়ে পড়া সূর্যের শেষ আভার ঝিলিক চোখে পড়ে।



অলংকরণ : আবদুস শাকুর

ঘোড়ার গাড়িগুলো কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে সম্মুখে নগরকেন্দ্রের দিকে ছুটছে। গলার ঘন্টায় টুং-টাং শব্দে পথচারী সতর্ক করে মাহুতের নির্দেশে হেলেদুলে চলছে নানা কারুকাজখচিত হাওদাবাহী কয়েকটি হাতি। এরই মধ্যে মাথায় বা কাঁধে বোঝা নিয়ে পথ চলছে মানুষ। এত কোলাহল, এত ব্যস্ততা তবু কোথায় যেন এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে প্রাচ্যের এ-নগরী রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

ঘাট ছেড়ে চবুতরা বা কাস্টম অফিসের খাতায় নাম লিখিয়ে পরিচয়পত্র পাওয়ার পর এখন তারা এগিয়ে চলেছেন আপাতত বিশ্রামের জন্য কোনো পাহুশালা যদি পাওয়া যায়, তারই খোঁজে।

মূল রাস্তা ধরে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এমনভাবে হাঁটছেন যেন চোখের পাতায় স্বপ্নে পাওয়া কোনো নগরের ছবি ভাসছে। অনেকটা পথ এগোতেই যথেষ্ট সন্দেহ নিয়ে উর্দি পরা দুই প্রহরী বেসামাল ঘোড়ার রাশ টেনে এগিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়, জিজ্ঞেস করে, মহাশয়, আপনারা এই নগরে কি প্রথম?

একটু থতমত খেয়ে নাহিয়ান বলেন, জি হ্যাঁ, আমরা পরিব্রাজক, বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। আপাতত বিশ্রামাগারের খোঁজে আছি।

সৈনিক দুজন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে কুর্নিশ জানায়, আমাদের নগরে সুস্বাগত। তারপর একটু দূরে জাফরি ইটে তৈরি একটি খয়েরি অট্টালিকার দিকে আঙুল তুলে বলে, ওটিই বন্দরের অতিথিশালা। আপনারা গিয়ে ওখানে

এদেশীয় এবং ভিনদেশি
নাবিক-বণিক আর কুলিদের ভিড়ে
মোগরা বন্দর হইহই করছে। ঘাট
পেরিয়ে বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা
সুবিশাল সব ইমারত, প্রকাণ্ড বাজার
আর দূরে প্রশস্ত রাজপথের ওধারে
ফোয়ারার জলে বিকেলের নুয়ে পড়া
সূর্যের শেষ আভার ঝিলিক চোখে
পড়ে।

বিশ্রাম নিতে পারেন।

সন্ধ্যা নামতে বেশি দেরি নেই। বহু দূরে নহবতখানার ঢং-ঢং ঘন্টারবনি বেজে ওঠে। আর না দাঁড়িয়ে প্রহরীদ্বয় অশ্বপৃষ্ঠে চেপে নগরমধ্যে মিলিয়ে যায়।

পাছশালার নোকর-বাকরের সেবায়ত্নে দীর্ঘ পথযাত্রার ক্লান্তি যেন আরো গাঢ় হয়ে চেপে বসেছে এখন। কিন্তু শুধু বিশ্রামে সময়ক্ষয় পরিব্রাজকের কাম্য হতে পারে না। তার ওপর রাত্রির অন্ধকার ফুঁড়ে হাজারো আলোকমালায় জ্বলজ্বল করছে পানাম। পোতাশ্রয়ে নোঙর করা জাহাজগুলোর আকাশচুম্বী মাস্তুলের ওপারে জেগে-ওঠা চাঁদ জোয়ারের নিস্তরঙ্গ জলেই শুধু ছায়া ফেলেনি, নগরজুড়ে কোমল আলোর মসলিন বিছিয়েছে যেন। ধূলিধূসর রাজপথে ক্ষিপ্ত ঘোড়সওয়ার আর আমির-ওমরাদের নিয়ে পাইক-বরকন্দাজের হাঁকডাকে দিনের পানাম একেবারে পালটে গেছে। পাছশালা খালি করে অনেকেই তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়েছে এখন। আবু আসাদ আর নাহিয়ানের মনে খটকা লাগে, রাত গভীর হতে না-হতেই এরা যাচ্ছে কোথায়? পাছশালার আরাম কেদারায় এলিয়ে দেওয়া আলস্য ভেঙে নগরের রাস্তায় নেমে পড়েন তারা।

শাহ কড়োরি বা কর আদায়কারীর বাসভবন ছাড়িয়ে পূর্ব-দক্ষিণমুখী রাস্তা ধরে কিছুটা নির্জনে হাঁটতে থাকেন দুই বন্ধু। সামনেই নহবতখানা, অর্থাৎ সময় জানাবার ঘর। দ্বিতল এই ঘরটির ওপরতলায় মস্ত এক পেতলের ঘন্টা বা নহবত ঝুলছে। পাশেই ঝোলানো আছে গোবদা একটা মুগুর।

এখানের সময় বিভাজনটা এরকম : দিন ও রাত মিলে হয় মোট আট প্রহর। চার প্রহর দিন, চার প্রহর রাত। আবার আট ঘড়িতে হয় এক প্রহর। এই প্রহর মাপার জন্য নহবতখানার নাদার জলে ভাসিয়ে রাখা আছে তলায় নির্দিষ্ট মাপে ফুটো করা একটা ঘটি। ওই ছোট্ট ফুটো দিয়ে জল ভরে-ভরে ঘটিটা যখন ডুবে যাবে, তখনই সময় এক ঘড়ি পূর্ণ হবে। এভাবে চলতে-চলতে আট ঘড়িতে হবে এক প্রহর।

নহবতখানার ঘন্টায় নহবত-বাদকেরা পালা করে দিন-রাত বিশেষ ঢঙে আটবার ঘন্টা পেটাবার পর অনবরত কিছু পিটুনি দিয়েই একেক প্রহর পুরো হওয়াকে জানান দেয়।

একটু এগিয়েই টাঁকশাল আর খাজাঞ্চিখানার প্রশস্ত দেয়াল। ডানে নির্জন মাঠে একখানা বড় কালো পাথরের উঁচু বেদি। তার ওপর মাথাতোলা আরেকখানা কালো পাথরের কারুকাজে গড়া বাংলার লোকপ্রসিদ্ধ স্বাধীন শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কবর। পারস্যের কবি হাফিজের বন্ধু ছিলেন তিনি। চরিত্রবান, বিদ্যোৎসাহী এ-মানুষটি গজলও লিখতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যে-মানুষটি তাঁর শাসনামলে প্রজাকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই ভাবেননি, তিনি কিনা সিংহাসনে বসেই সৎভাইদের চোখ উপড়ে রেকাবি ভরে বিমাতার কাছে পাঠিয়েছিলেন! তার কবরের শিয়রে বেলে পাথরের চেরাগদান জ্বলছে। বেদির কার্নিশে বুটাদার অলংকার। আরো নিচে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কারুকাজ। তার নিচে শিকল দিয়ে ঝোলানো প্রতিটি কুলুঙ্গিতেও জ্বলছে প্রদীপ। বাংলায় কালো পাথরের ব্যবহার তেমন নেই। এটিই এক ব্যতিক্রম।

বাঁদিকে শিবমন্দিরের চূড়ায় নিশান উড়ছে। ভেতর থেকে ভেসে আসছে চন্দনপোড়া ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ আর ছোট্ট ঘন্টির একটানা আওয়াজ। দেয়াল এত উঁচু যে, ভেতরে উঁকি দেওয়ার উপায় নেই। বোঝা যায়, পুজোয় নিমগ্ন আছেন পুরোহিত। কাছের কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসছে গলাভাঙা মোয়াজ্জিনের এশার আজান।

এতক্ষণে চাঁদ পশ্চিমের নগরপ্রাচীরঘেঁষা বাঁশঝাড়ের মাথায় উঠে পড়েছে। বেঘোরে আলোয়-অন্ধকারে হাঁটতে-হাঁটতে প্রায় পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরের নির্জনে চলে এসেছেন এরা।

ওই তো সুফি সাহিত্যের সাধক পণ্ডিত শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার খানকা শরিফ আর ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। প্রায় দুশো বছরের ভবনগুলোকে যথেষ্ট ম্লান মনে হচ্ছে আবু আল আসাদের। তাওয়ামার সমাধিও এদিকে থাকবে কোথাও — দেয়ালের বাইরে থেকেই চারদিকটায় উঁকি দিয়ে খুঁজতে লাগলেন তিনি। বললেন, তাওয়াসার-রচিত সুফি মতবাদের বিখ্যাত গ্রন্থ মঞ্জিলে মাকামাতের খবর কে না জানে বন্ধু। আর তার এই ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রে বিদ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে যে-জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতেন, সেই বক্তৃতামালার সংকলন নামে-ই-হকও সমান গুরুত্বপূর্ণ রচনা। বুঝলেন, চিন্তায় মহাজ্ঞানী ওই মানুষটি কথোপকথনেও ছিলেন সরল কৃষকের মতো। সুফিতত্ত্বের গভীর জ্ঞানগুলোর কথা সাধারণের জীবনযাপন দিয়েই ব্যাখ্যা করতেন। সে-কারণেই বোধ করি এই জলাদেশের নরম-কোমল মানুষগুলোর কাছ থেকে আর নড়েননি তিনি। ওদের মধ্যে মিলিয়েছিলেন। তার সুবাদে সুফি কবি-দার্শনিকদের মিলনমেলা বসত এখানে। এখন কী হালে চলছে কে জানে — বলতে-বলতে আবু আসাদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়েন। বিমূঢ়ের মতো নাহিয়ানও ভরা চাঁদের আলো-ছায়ায় এই আশ্চর্য সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, গোটা দুনিয়ার সবকিছুই কি মুখস্থ নাকি ওর? পরপরই মনে হলো, এখানটায় দাঁড়িয়ে দিল যেন একেবারে কাদা হয়ে উঠেছে আসাদের। বিড়বিড় করে বলছেন, হানাফি ধর্মতত্ত্ববিদ, হাদিসবেত্তা, রসায়নবিদ, প্রকৃতিবিজ্ঞানী কী ছিলেন না বোখারার এই মহান মানুষটি। আর তাঁর লেখার কী যে ভক্ত ছিলেন আমার দাদু আবু ইবনে আল আব্বাস! পারস্য আর আরবের বন্দরে-বন্দরে ব্যবসা করতেন দাদু। জ্ঞানপিপাসাও ছিল অসীম। পর্তুগিজরা যখন মরক্কো আক্রমণ করে, তখন সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে গড়ে তোলা তাঁর বিশাল কিতাবখানা জ্বালিয়ে দিয়েছিল পাষণ্ডরা। ওই ঘটনার পর আর বেশিদিন বাঁচেননি দাদু। বলতে-বলতে আব্বাস উঁকিঝুঁকি মারলেন; কিন্তু কোনো সমাধির হাদিস পেলেন না আর।

এদিকের শেষ প্রান্তে শানবাঁধানো ঘাটের বড়-বড় দুটো দিঘি ছাড়িয়ে আম-জাম-বেল আর তাল-নারিকেলের বাগান। মুসা খাঁর বাগানবাড়ি বাগে-ই-মুসা। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পুরো প্রাচীরের গায়ে টেরাকোটা। পোড়া মৃত্তিকার কারুকাজ আর নানা মুদ্রায় নৃত্যরতা নারীমূর্তি।

চারদিকে কোথাও কেউ নেই। ভেড়ানো প্রকাণ্ড শাহি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাচঘেরা প্রদীপ আর জোছনার হালকা আলোয় যতটুকু দেখা যায়, দেখে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না নাহিয়ান, কি অপূর্ব, তাই না? পোড়া মৃত্তিকার হলেও কত খরচ করে যে বানিয়েছে! একেবারে বিশুদ্ধ প্রাচ্যকলা।

তা যা বলেছেন, এ কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব! তবে যে বললেন, একেবারে বিশুদ্ধ, তা কিন্তু নয়। সভ্যতার কিছুই বিশুদ্ধ হয় না, বন্ধু।

মন দিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছেন আবু আল আসাদ আর মাথা তুলে চোখ নেড়ে-নেড়ে বলছেন, প্রাচ্যের এ-মূলুকের সভ্যতার আত্মা হচ্ছে এর কোমলতা আর শিষ্টতা, যা সর্বদা অন্যের কথা ভাবে। এর হৃদয় বড়ই উদার। যুগ যুগ ধরে অকাতরে নিচ্ছে যেমন, দিচ্ছেও তত। ফলে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই, এতে দেশি-বিদেশি উপাদানের মিলন ঘটছে প্রচুর। এক অঞ্চলের আলো আরেক অঞ্চলের আলোর মধ্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন আলো এসে জড়ো হচ্ছে এর প্রদীপে। সেই কোন যুগে হাজার বছরের স্থানীয় জনবসতির জীবনযাপনের মধ্যে এসে মিশে ছিল আর্যদের সৌন্দর্য। পরে আরব, পারস্য আর তুর্কিরা যখন এখানে আসতে শুরু করল, সঙ্গে করে আনতে লাগল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। নৃত্যের এই যে ভঙ্গিমাগুলো দেখছেন, এ হলো হিন্দুস্থানি আর্যধারা আর এই যে চারপাশজুড়ে নকশা, এগুলো আরবীয় অথবা পারস্যান। পৃথিবীজুড়ে পোড়ামাটির ব্যবহার সুপ্রাচীন

হলেও এখানকার কুমোরদের এই কারিগরিটি কিন্তু খাঁটি বঙ্গাল। এটুকু বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন আবু আসাদ। গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবেন একবার। আবার বলতে শুরু করেন, এখান থেকে বিহার, লখনৌ, দিল্লি, লাহোর — যেখানেই যাবেন, দেখবেন, সবাই বহন করছে আর্যের উত্তরাধিকার। আবার আরব, পারস্য, তুর্কিরাও তাই। ফলে ওরা যখন এসে এদের সঙ্গে মিলছে, তখন তো দুই অপরিচিতের মিলন ঘটছে না। ঘটছে দীর্ঘ অদর্শনের পর দুই আত্মীয়ের মিলন এমন আত্মীয়, যারা প্রজন্মের দিক থেকে অভিন্ন। হিন্দুস্থানজুড়ে যে-জনপদেই যাবেন, এ-মিলন চোখে পড়বে আপনার।

বলতে-বলতে হঠাৎই যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন আবু আল আসাদ। বললেন, শোনেন নাহিয়ান, আমরা বোধহয় নগরের একটি প্রান্তে এসে পড়েছি আর বকতে-বকতে আপনার যথেষ্ট বিরক্তিও ঘটিয়েছি। এভাবে রাত করে নির্জনে ঘোরাফেরা করতে দেখে পাহারাদাররা যদি বিদেশি গুপ্তচর ভাবে আমাদের? কোনো কথা শুনবে না, ধরে নিয়ে যাবে। সে এক ফ্যাসাদ।

কেন, আমাদের তো পরিচয়পত্র আছে। বললেন নাহিয়ান।

ওর কথায় মৃদু হাসলেন আবু আল আসাদ, কাগজপত্র যতই থাকুক, একবার সন্দেহ হলে কাজির দরবার থেকে ফিরে নগর কোটালের ফের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত গারদে পচতে হবে।

নাহিয়ান বুঝি ভয় পেলেন, বললেন, তাহলে চলেন বন্ধু, আজকের মতো পাছশালায় ফিরে যাই। কাল জাহাজ থেকে মালপত্র ছাড়িয়ে তবে বের হবা।

দুই

খালাসিদের হইচইয়ে মোগরাঘাটের ঘুম তখনো ভাঙেনি। কাঠের বিশাল পাটাতনের প্রকাণ্ড সব খুঁটির সঙ্গে মোটা-মোটা দড়া দিয়ে বাঁধা জাহাজগুলোকে ঘিরে ছোট-ছোট অসংখ্য নৌকা ঢেউয়ের তালে দুলছে। দূরবিস্তৃত নদীর অপর কিনার এখনো স্পষ্ট নয়। গরমকালেও সকালের ঠান্ডা হাওয়ায় আবু আসাদ আর নাহিয়ান গায়ে চড়ানো জোব্বাজাকি নিয়ে কিছুটা শীতবোধ করেন। যে-জাহাজে চড়ে ওনারা এসেছেন, তার পাটাতনের খোলে মালখানায় রাখা পেঁটরাগুলো বুঝে নিতে হবে। উপযুক্ত শুদ্ধ দিয়ে মালপত্র ছাড়াবার হাঙ্গামা শেষ হতে দুপুর হয়ে গেল।

ভাদ্র মাসের তপ্ত রোদের তালপাকা গরমে আলখাল্লার নিচে কাপড় ভিজে গেছে। ঠান্ডা পানীয়ের দোকানে নকশা-তোলা পিতলের সোরাই থেকে রূপার পানপাত্রে ঢেলে দেওয়া পেস্তার শরবতে গলা ভিজিয়ে পাগড়ির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন আবু ইবনে আসাদ। নাহিয়ানও বেজায় ঘামছেন আর পান করছেন। ঘাম আর গরমের তোয়াক্কা না করে অবশেষে মালপত্র কুলির মাথায় তুলে দিয়ে নির্বাঞ্ছাট পাছশালায় ফিরলেন তারা।

কাপড়ের পুঁটলিতে মূল্যবান পাথরের কিছু জিনিসপত্র আছে। ওরা ভাবলেন, এখানকার বাজারে দাম মিলবে ভালো; কিন্তু বণিক ছাড়া আড়তের বাজারে কেউ বেচাকেনা করে না। তাছাড়া এগুলো এখানে বিকোবেও না। এসব জেনে দুই বন্ধু এবার পাইকারি আড়ত ছেড়ে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে নগরমধ্যে ছুটলেন বেচাকেনার উদ্দেশ্যে। মসলিনের নেকাবে ঢাকা পানামের নারীরা যেখানে তাদের বিখ্যাত পণ্যসম্ভারের পসরা সাজিয়ে বসেছে।

এ যে এক অভূতপূর্ব বাজার — নাহিয়ান বলেন।

আবু আসাদের চোখ তো ছানাবড়া।

আবে রওয়া, শাবনাম, মলমল খাস, মলবুল খাস, সরকার-ই-আলির মতো উঁচু দরের খাস মসলিন বাজারে বিকোয় না। তা শুধু বাদশা, সুবাদার, নবাবদের জন্যই বোনা হয়। কিন্তু নয়নসুখ, বদনখাস, সরবুটি, সরবদের মতো নানা জাতের মসলিন

আর রং-বেরঙের মেঘ-উদুম্বর শাড়ির তো অভাব নেই। আছে চোখ-ধাঁধানো জাফরানি রঙের আলোয়ান, অসাধারণ সব টুপি, কাঁসা-পিতল-চাঁদির বাহারি তৈজস, হাতির দাঁতের তৈরি পাটি, কারুকার্য করা দুর্লভ গয়না, নকশিকাঁথা আর আছে মিহি মসলিনের আড়াল থেকে সুরমামাখা বিপণিবালাদের মদির কটাক্ষ।

আমার অনেক চাই, এসব আমি মালাকায় নিয়ে যাব, একেবারে বেহুঁশের মতো কাণ্ড করে বসেন নাহিয়ান।

একটু ঘুরেটুরে দেখি, বন্ধু। তারপর না হয় কিনব, হাঁটতে-হাঁটতে বলেন আবু আল আসাদ।

অচেনা কত দেশের কত-না সামগ্রী আর স্থানীয় এতসব পণ্যে বাজারটি যেমন জমকালো হয়ে উঠেছে, তেমনি পারস্য, আর্মেনীয়, গ্রিক এমনকি রো বণিকরাও আছে। তাদের কেনাবেচার শোরগোলে আর দালালদের টানাহেঁচড়ায় কে কোনদিক থেকে কোনদিকে যাবে, বুঝে উঠতেই দিশেহারা একেকজন।

নয়নসুখ আর বদন-খাসের বিপণি পেরিয়ে ছায়াঘেরাবিস্তৃত এক কালীকড়ই বৃক্ষ। তারই নিচে ছুরি-কাঁচিসহ বিবিধ তৈজসপত্র আর অলংকারের বিরাট ঘরগুলোতেই একসময় ছিল ক্রীতদাস-দাসীদের বেচাকেনা।

তখন ছিল সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহর রাজত্বকাল। প্রায় আড়াইশো বছর আগের ঘটনা। মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা এখানের কোনো এক ঘর থেকেই হয়তো স্বল্পমূল্যে কিনে নিয়েছিলেন অপূর্ব এক রমণী আশুরা আর এক বালক লুলুকে; কিন্তু সেদিন আর নেই। শুনেছি মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ মানুষ কেনাবেচা একদমই বরদাশত করেননি। কারণ বাল্যকালে তাকে এবং তার ভাইকে কিনে নিয়ে পাঠানো হয়েছিল পারস্যে। তাদের চাচা অনেক পরে উদ্ধার করে আনেন তাদের।

বলতে-বলতে ইবনে আল আসাদের অন্তর ছটফট করে। নাহিয়ানকে তিনি সংক্ষেপে তাদের পর্যটক ইবনে বতুতার দাসী কেনার গল্প শোনান। বলেন, যদি থাকত, আমিও না হয় একজনকে কিনে নিতাম। মরক্কোয় নিয়ে মরুর অঙ্গরী বানাতাম তাকে।

বলেন কি বন্ধু, পর্তুগিজ আর মগরা গোপনে বঙ্গালের উপকূল থেকে নিরীহ মানুষ ধরে-ধরে দাস বানিয়ে উৎকৃষ্ট দামে বিক্রি করছে, সে নিয়ে তো জাহাজে বসে এতদিন কত কী বললেন। আমার সঙ্গে কত ক্ষোভ দেখালেন। আর আজ বলছেন থাকলে এক দাসীকে কিনতেন আপনি?

হায় খোদা, আমি কি ওরকম বলেছি? ও তো কথার কথা। আর আপনি কিনা এই কথাকে এত শক্ত করে জাপটে ধরলেন!

এরই মধ্যে ফারসি ভাষায় পারদর্শী অল্পবয়সী একটি বালক পটিয়ে ফেলেছে ওদের। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, চোখে-মুখে তেমনি বুদ্ধির ঝিলিক। বেশভূষা ও সুরত দেখেই সে অনায়াসে চিনতে পারে কোন লোকটা আরবি আর কেইবা আর্মেনি। চীনা ও আরাকানিদের চেহারার তফাৎ সে যেমন ধরতে পারে, তেমনি পর্তুগিজ, ওলন্দাজদের চিনতেও তার ভুল হয় না। আর কারো সাজগোজের বৈশিষ্ট্যও অজানা নয় ছেলেটির। এমন তালেবর এ-বাজারে আরো ঢের আছে; কিন্তু এটির জাত একেবারে আলাদা। সে-ই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সব দেখায় আর বলে, কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ বাধবে, গোটা মুলুকে তার প্রস্তুতি চলছে। সস্তায় সব পাওয়া যাচ্ছে এখন; যদি পারো তো আরো কিছু কিনে নাও।

সত্যি-সত্যি দাম যা পাবে ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক কম দামে ওদের জিনিসগুলো বিক্রি করতে হলো আর কিনলও বেশ কমে।

ইবনে আসাদের কেনাকাটা এত বেশি হয়েছে যে, দুজনে তা বহন করা অসাধ্য। এরই মধ্যে এক ঝাঁকাওয়ালা মুটেকে জোগাড় করে ফেলেছে ছেলেটি। সে-ই মালপত্র ওদের আস্তানায় পৌঁছে দেবে বলে ঠিক হলো।

নগরে ঘুরেফিরে কেনাকাটা করে দুদিন কেটে গেছে। নগরের বাইরে গিয়ে ওরা দেখে এসেছে লাক্ষার চরে মোষের লড়াই আর তাড়িখোরদের বেস্তমার হুল্লোড়। গাঁয়ের পথে, গৃহস্থের উঠানে ভিড় করা মানুষের মধ্যে বেদিয়াদের বাঁশবাজি, দড়িবাজি আর সাপ খেলাও দেখেছে।

বর্ষাকাল শেষ। শরতের শুরুতেই বেদিয়ারা গাঁয়ের পথে-পথে রোজগারে নেমে পড়েছে। আশ্চর্য যাযাবরজীবন এই জলবেদেদের। বিশ থেকে পঞ্চাশটি নাওয়ার বহর নিয়ে একেকটি বেদের দল ঘুরে ঘুরে যুগ-যুগ ধরে জলের ওপর কাটিয়ে দিচ্ছে। সে-জল হোক জোয়ারের কি ভাটার, গাঙের কি খালের। জলই জীবন, জলই তাদের ভিটা। জন্ম-মৃত্যু সবই ওই জলের ওপর! এদের নারীরা যেমন বুদ্ধিমতী, কথায়, ভাবে-ভঙ্গিতে তেমনই চতুর। তারা দলবেঁধে পাড়ায়-পাড়ায় বেহুলা-লখিন্দরের গীত গেয়ে সাপের খেলা দেখায়। সাপে কাটা রোগীর বিষ ঝাড়ায় আর বাতের ওষুধ, দাঁতের ওষুধ, বাঁজা মেয়েমানুষের সন্তানবতী হওয়ার ওষুধ বেচে জীবন চালায়। জগতের সেরা হাতসাফাই ওদের আর মুখের ভাষার গড়নটিও তেমন — গাঁয়ের সরল গৃহিণীরা কি তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারে? গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে এসবের পরিচয় নিয়ে পানশালায় ফিরল ওরা।

অর্ধরাতে পানশালার আসর ফুরিয়ে এলে বাজাদারের বেসামাল বাজন থেকে ওদের কান রক্ষা পেল যেন। একে-একে চলে যেতে থাকল নর্তকীরা। নেশায় চুর-চুর গলায় আবু আসাদ নাহিয়ানকে কাছে ডেকে কানে-কানে বললেন, বন্ধু, চার-চারটা বছর আমি হিন্দুস্থানি গানবাজনার মধ্যে কাটিয়েছি। এরা আর কী নাচবে, কী গাইবে এরা, বলুন? যদি যেতেন লখনৌ, এলাহাবাদ কি লাহোর তো দেখতেন! সে এক অভিজ্ঞতা। যদিও এদের অনেকে সেখান থেকেই আসা। আমার প্রাণ ভরেনি, বন্ধু। একদম না। টাকা দিয়ে তুষাটা চাগিয়ে দিয়েছে মাত্র।

লাল হয়ে-ওঠা চোখের পাতা দুটো বুজে আসছে তার, তবু বলছেন, এদের নৃত্যগীতে ফুর্তি আছে, মদিরার আমোদ আছে, তার অতিরিক্ত কিছু নেই, যা আপনাকে সম্মোহিত করবে, আপনার চোখে জল এনে দেবে। চোখের জলও তো বৃষ্টি, কী বলেন? তা কজন পারে চোখের জলের বরষাত নামাতে? ঘুঙুরের আওয়াজে নর্তকীর হৃদয়ের রক্ত যদি ছলকে না পড়ে, কণ্ঠের ভাঁজে-ভাঁজে উপচে না যায় যদি মধু, দেহভঙ্গিমায়-মুদ্রায়-চোখের বাণ নিক্ষেপে যদি মনে না হয় এ-স্বপ্নঘোর — কী করে নাচ-গান হলো তবে, বন্ধু? বলে আর লাভ কী, মোগরাঘাট হয়তো তার উপযুক্তও নয়।

নাহিয়ানও তার ক্লান্ত হাত ওর কাঁধে ফেলে বেসামাল পায়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে জড়ানো কণ্ঠে ভেঙে-ভেঙে বলেন, কী যে বলেন, বন্ধু। আপনি হয়তো একটু উতলা আছেন। আমার কিন্তু খুব মনে ধরেছে। কী জাদুকরী কণ্ঠ! কী দেহভঙ্গিমা! আহু, মরে যাই!

যুদ্ধ নিয়ে নগরজুড়ে কানাঘুসা কিছু আছে বটে, কিন্তু দৃশ্য তেমন কিছু চোখে পড়েনি তাদের। মসনদ-ই-আলার কোনো ফরমানও জারি হয়নি। তবু আবু ইবনে আসাদের প্রাণ ফরফর করে।

সরাইখানার সুরা, গীত, নৃত্য — কোনো কিছুতেই তিনি আর মন বসাতে পারছেন না। হিন্দুস্থানের ভাটির বঙ্গালে আগমন প্রথম হলেও রাঢ়বঙ্গে থেকেছেন অনেকবার। যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে পড়ে নাজেহালও হয়েছেন। সে-অভিজ্ঞতা আর কাম্য নয় তার। ফলে যে-জাহাজটি কাল সকালে সুতোলার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে, সেটিতে চেপে বসতেই উদ্দীবি তিনি। পাছশালায় মালসাও গোছানো হয়ে গেছে। সুতোলা হয়ে জাহাজ বদলে তবে যাবেন মরক্কোয়। এ-যাত্রায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রায় এক বছর নয় মাস হতে চলল, হঠাৎ করেই বাড়ির জন্য অন্তরে তীব্র একটা হাহাকার বোধ করছেন আবু আসাদ।

তিন

অসংখ্য পরিখা, খাল, দিঘি আর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সোনারগাঁ নগরের বাইরের গ্রামগুলোও যে কী অপূর্ণ! প্রকৃতি যেন দুই হাতে ঢেলে সাজিয়েছে। কিন্তু নগরের বাইরের এই জনপদে মানুষেরা নিতান্তই সাধারণ খেটে-খাওয়া তাঁতি, কামার, কুমোর, জেলে, ক্ষেত্রকর।

পঞ্জিরাজ খালের ঝুলন্ত সেতু পার হয়ে অনন্তমুসা মৌজার কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নাহিয়ান দেখেন, রাস্তার দুই পারে দিগন্তবিস্তৃত ঘন সবুজ কার্পাস তুলা আর ধানের ক্ষেত। একেকখানা লম্বা কাপড় গায়ে পেঁচিয়ে কালো কি শ্যামবর্ণা জনপদবধূরা রোদে তুলা শুকাচ্ছে। খালি পা তাদের, কানে কচি তালপাতার মাকড়ি, তেল-জবজবে চুল আর কোমরে তাগা। কোনো কোনো বাড়ির মাটিলেপা বারান্দায় সুতা কাটছে কেউ-কেউ। কারো বারান্দায় জাঁতা ঘুরিয়ে ফুটকলাই ডাল পিষছে কেউ। দুকুলা, কার্পাসিকা আর করন্তা ফুলের নকশা-তোলা শাড়ি বুনেতে মাকু নিয়ে নিবিষ্ট আছে কারিগর। খালি গায়ে শিশুরা বাড়ির উঠানে খেলছে। কোনো এক বিদেশি হেঁটে যাচ্ছে না দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে, সে নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই। বোঝা যায়, এমন মানুষ তারা হরহামেশাই দেখে থাকে। গ্রামে একটুখানি ঘুরে যখন আবার তিনি ফিরে আসেন নগরে, তখন পানামে রাত্রির উৎসব উথলে উঠেছে।

আজ পাছশালা থেকে পালকি চড়ে নাহিয়ান যাবেন নাচমহলে। কোনো এক ধনাঢ্য নৃপতির আয়োজনে লখনৌসুন্দরী জন্দন বাইয়ের মেয়ে কুমারী রওশন আরার মুজরা হবে আজ। আমির, ওমরা, সর্দার, জমিদার, বণিক, পর্যটক — কে না হুমড়ি খেয়ে পড়বে! নাহিয়ানও পর্যটক হিসেবে নগর কোটালের দরবার থেকে কোনোমতে একখানা দাওয়াত জোগাড় করে নিয়েছেন আর যাওয়ার জন্য ভাড়া করেছেন পালকি।

পোশাক পরে পাছশালার বাইরে এসেই পালকিবাহকদের দেখে বুক কঁপে উঠল তার। মুখ শুকিয়ে গেল। বেহারারা নিশ্চয়ই হাবসি! বসে-বসে হাতের তালুতে খইনি পিষছে। কুচকুচে কালো রং, কোঁকড়া চুল আর বিশী রকম মোটা ঠোঁটের পালোয়ানতুল্য লোক দুটোকে কিছু বলার আগেই উঠে এসে পালকির পর্দার ফিল্মফিল্মে ঝালর টেনে ধরে কুর্নিশ করল।

দৈলুরবাগের শেষ মাথায় বিরাট দিঘির পাড়ে নাচমহলের থামগুলোর মোজাইকের কাজ মশাল আর শত-শত মোমের আলোয় ঝকঝক করছে। সে-আলোর ছায়া পড়েছে দিঘির স্থির জলে।

পারস্য চিত্রকলার নকশা-আঁকা কাঠের বিশাল দেউড়ি। তার ওপর মতির ঝালরের আড়ালে কোমরে খঞ্জর গুঁজে থির হয়ে আছে তাকে বহনকারী বেহারাদের মতোই দেখতে হাবসি দুটি দারবান। হাতে রূপার দণ্ড। সে-দণ্ডের মাথায় সোনালি বল্লম। হাজার তারার ঝাড়বাতির আলোয় ফুটে থাকা মহলের ভেতরটা সমাগতের ভিড়ে থইথই করছে। মালাক্কার ঐতিহ্যবাহী শিরবন্ধটি ঠিক করতে করতে মৃদু পায়ে সামনে এগিয়ে গেলেন নাহিয়ান।

পুরো মহলের মেঝাজুড়ে বিছানো বিশাল গালিচা। তার ঠিক মধ্যখানে আরেকখানা বাহারি গালিচার ওপর বসে আছেন এক বয়োবৃদ্ধ ওস্তাদ, সঙ্গে জরিদার চাপকান, মাথায় দোপল্লি চিকেনের কাজ করা টুপি, পরনে চুড়িদার চোস্ত সালোয়ার। কোলের ওপর তানপুরা। তাতে আঙুল চালাতে চালাতে ধ্যানমগ্ন হয়ে মধ্যলয়ে তিন তালের লখনৌই বোলবাটের ঠুংরি গাইছেন তিনি। গায়কের বাঁপাশে বসে সংগত দিচ্ছে সারেঙ্গিয়া, তবলিয়া আর পাখোয়াজি।

ডানপাশে গালিচার প্রান্তে সোনালি জরির নকশা-তোলা বেগম-খাসপরিহিত এক চল্লিশোর্ধ্ব নারী। পারস্য গালিচায় ধবধবে ফরসা পা ছড়ানো তার, নরম পালকভরা মলমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চোখ মুদে এক মনে গান শুনছেন।

নিমন্ত্রিত আমির-ওমরারা যাদের কারো গালে রাজপুত-মার্কি গালপাট্টা, কারো কালো-মোটা পাকানো গোঁফ, মাথায় মসলিনের

পাগড়ি। কারো কপালে চন্দনের ফোঁটা আর চোখ দুটি গোল গোল রক্তবর্ণ। কেউ-কেউ নিজ-নিজ বিবি-বারাঙ্গনা বগলদাবা করে গালিচার ভিড় ছেড়ে কয়েকখাপ সিঁড়ি ভেঙে একটু ওপরে মহলের চারদিকের ঘোরানো বারান্দায় আসন নিয়েছেন। খাঞ্জায় মুক্তাচূর্ণে মেশানো শরাবের পেয়ালা, রেকাবিতে বাদাম, মনক্কা, শুকনো মেওয়া নিয়ে তাদের কাছে কাছে ঘুরঘুর করছে মাথায় লাল পাগড়ি আর সাদা আলখাল্লা পরা বাঁদি ও গোলাম।

চন্দন আর ধূপ-পোড়ানো হালকা গন্ধে মহলের বাতাস স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। ওস্তাদজি তার নরম গলায় নানানভাবে গাওয়া পদটি পূরণ করছেন কখনো ছোট-ছোট মীড় দিয়ে, কখনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টপ্পার কাজ আর কখনো বা বাট করে পদটিকে ভেঙে ভেঙে। এতক্ষণে তার চোখের কোণে ফুটে উঠেছে আবিরের আভাস — আসরের আবহাওয়া কী, মেজাজ কেমন, কোনো কিছুতেই খেয়াল নেই তার। কী করেই বা থাকে? সংগীতের এমন পরিবেশনা তো মনের অন্য স্তরের ভাষা। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সেই ভাষার প্রকাশ যখন পূর্ণ করলেন ওস্তাদজি, তার পেছনের রেশমি পর্দা কেঁপে উঠে সরে গেল। দুজন সুসজ্জিত বাঁদি ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে পর্দা-ওঠা পথে এগিয়ে আসতেই ওদের মাঝ দিয়ে ছিটানো পাপড়ি মাড়িয়ে প্রায় বিদ্যুচ্চমকের মতো ঘুড়রের রুমরুম আওয়াজ তুলে নীল রেশমের পটভূমিতে উদ্ভাসিত হলো এক প্রাচ্যসুন্দরী। ফুলদার স্বচ্ছ ওড়নার ভেতর থেকে প্রসারিত গোলাপধোয়া তরঙ্গায়িত দীর্ঘ বাহু তার। আলতারাঙানো ঘুড়রবাঁধা পায়ের ছোট-ছোট পদক্ষেপ। এগিয়ে এসে তাকিয়ায় হেলান দেওয়া নারী আর ওস্তাদজির পদধূলি নেয় সে। এরপর জরি-চুমকি, মণি-মুক্তার ঢেউতোলা দীপ্তি ছড়িয়ে নকশাদার গালিচায় বসে উপস্থিতির ইজাজত চায়।

বাজাদারেরা তাদের যন্ত্রে ক্ষীণ আওয়াজ তুলতেই সোনার কাঁকন, বাজুবন্ধ আর আঙুলের মূল্যবান পাথরের আংটির ঝিলিক দেওয়া ঝলমলে হাতটি গালে চেপে ধীরলয়ে কণ্ঠে সুর তোলে সুন্দরী। হাততালিতে ফেটে পড়ছে পুরো মহল।

অভিভূত, স্থির, নিশ্চল দৃষ্টি নাহিয়ানের। এই তাহলে জন্মদেব বাইয়ের কন্যা রওশন! আহ, রূপের কী বৈভব!

রাত কত হলো কে জানে। আসর একেবারে তুঙ্গে উঠেছে এখন। একটু পরপরই মহলজুড়ে আওয়াজ উঠছে, ‘বহুৎ খুব’, ‘মারহাবা’। রওশন আরার সঙ্গে এখন নাচে সঙ্গী হয়েছে আরো দুজন। ওদের মাঝে নৃত্যের তালে-তালে রওশনের ঘুড়রবাঁধা পায়ের ছন্দের কী দ্যুতি! দেহভঙ্গিমা আর কণ্ঠেও কী অভূতপূর্ব মায়া! বাজাদারের তালের সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি বারবার ঘুরেফিরে আসা ওর সবকটা মুদ্রায় রক্তমাখা হৃদয়টাকেই যেন চোখের সামনে মেলে ধরছে। এর সবটাই ঘটছে বাকি দুজন দ্বারা অদ্ভুত আড়াল রচনা করে। আর ওই আড়ালের সৌন্দর্য এমন একটা মোহ ছড়াচ্ছে, যেন চাঁদের আলোয় ধোয়া মসলিনের আবডালে জেগে উঠেছে এক অভিনব খোয়াব। পাছশালায় আবু আসাদের সেদিনের কথাগুলো স্মৃতি থেকে সরে যায়নি নাহিয়ানের। তখন বিরোধিতা করলেও পরে ওর মনে হয়েছিল, কোনো দিনও মেটবার নয় এমন এক আশ্চর্য খিদে যেন পরানে জিইয়ে রেখে গেলেন মরক্কোর বন্ধু আবু আল আসাদ। আর হ্যাঁ, এই তো সে নৃত্য, এই তো সে-গীত, বন্ধু আসাদ পানামের মোগরাঘাটের এক পানশালায় যার হৃদিস না পেয়ে আফসোস করেছিলেন।

রাত কত হলো সে-হিসাব এখানে অর্থহীন। লোবানের নির্যাসে এখনো আয়েশি গন্ধের ছাপ রয়ে গেছে। ঝাড়বাতি নিভে গেছে মহলের। মোমদানিগুলোতে পিটপিট করছে ফুরিয়ে আসা আলোর শিখা। পঞ্জিরাজ খাল থেকে বুলন্ত সেতু আজকের মতো তুলে ফেলা হয়েছে।

চারদিকের পরিখাবেষ্টিত দুর্ভেদ্য এ-নগরের অভিজাত মানুষেরা রংমহল ছেড়ে এলোমেলো পায়ের তালের ঘরে ফিরে গেছে কখন। নাহিয়ানও নৃত্যগীতে পরান পুড়িয়ে পালকি চড়ে পাছশালায় আসেন। কিন্তু ঘুম নামে না তার চোখে। বারবার আবু আসাদকে মনে পড়ছে

আজ। বলতে ইচ্ছা করছে, ইবনে আসাদ, আপনি তো দেখেননি বন্ধু, পানামের লখনৌ-তরঙ্গ কতটা দ্যুতি ছড়াতে পারে!

চার

নাচমহলের ঠিক পেছনেই দ্বিতল ও ত্রিতল বাড়িগুলোর একটিতে জন্মদেব বাইয়ের বাস। বাড়িভর্তি যে-নারীদের দেখা মিলছে, তাদের পরনে মেঘ-উদুম্বর শাড়ি, পায়ে মল, কানে সোনার মাকড়ি, গলায় মুক্তার মালা, কাঁচা হলুদ আর চন্দনপঙ্কে ঘষা মুখ, চুলের এলায়িত খোঁপায় গোঁজা তরতাজা ফুল। দিনের কয়েক প্রহর কাটে তাদের অগ্রহার ওস্তাদজির সঙ্গে রেওয়াজ আর গানের তালিম নিয়ে। আরো কয়েক প্রহর নকশাকারকের কাছে নকশার কাজ শিখে খাঞ্চগাবোঝাই পাথর, জরি-চুমকি দিয়ে ফুল তুলে পর্দার কাপড়ে। তার ওপর ফারসি কাব্য আর সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্যাচর্চা তো আছেই। এর অবসরে দুপুর গড়িয়ে গেলে গোখলিবেলায় হাতির দাঁতের চিরকন দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে, বেগি বেঁধে মোজাইক করা মেঝেতে ষোলো ঘুঁটি বা বাঘবন্দি খেলা তো আছেই।

আজ আর খেলা হলো না। মালাক্কার এক যুবক এসেছেন গত রাতের আসরে মুগ্ধ হয়ে জন্মদেব বাই আর তার মেয়ে রওশনের দেখা পেতে। এখন ওই মেহমানের খেদমতে লেগে পড়েছে সবাই। একে তো বিদেশি, তার ওপর কত রকম উপটোকন যে এনেছেন! জন্মদেব বুক গর্বে ভরে গেছে।

রওশন আরো অন্দর থেকে কপাট ঠেলে বেরিয়ে এলো সিন্ধের সালায়ার-কোর্তা পরে। কোর্তার বুকে সোনা আর রূপোর জরির কাজ করা বাহারি নকশা। মুখ ঢাকা তার এমন হালকা ওড়নায়, যেন একখণ্ড কুয়াশা ছড়িয়ে রেখেছে মুখের ওপর। অল্প কিছু গয়না যা পরেছে, ঝলসাচ্ছে দিনের আলোয়। বিমূঢ়ের মতো আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নাহিয়ান, অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।

না না, বিরক্ত কেন হব, এ তো আমাদের সৌভাগ্য। অচিন দেশের বণিক হয়েও আপনি প্রাণ দিয়ে আমাদের আসর উপভোগ করেছেন। বিনয়ের সঙ্গে নাহিয়ানকে বসতে বলে নিজেও একটা গদিআলা আসন টেনে বসে আলগোছে মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে নেয় রওশন।

আমি বণিক নই, পর্যটক। জাতে পর্তুগিজ খ্রিষ্টান। নগর মালাক্কা থেকে এসেছি, ওকে শুধরে দিয়ে বলেন নাহিয়ান। বলেন, গত রাতে আপনার পরিবেশনায় আমি এতটাই মুগ্ধ যে, অভিনন্দন জানাতে এলাম।

হিন্দুস্থানি এ-নৃত্যগীতে পূর্বপরিচয় কি আছে মহাশয়ের?

তা নেই, তবে হিন্দুস্থানি নৃত্যগীতের কথা কে না জানে। এর প্রশংসা শুনেছি অনেক। তাছাড়া জগতের যে-প্রান্তেরই হোক, শিল্পকলার ভাষা তো একটাই। হৃদয় স্পর্শ করাতেই তো তার সার্থকতা।

রওশন আরার সুরমামাখা চোখের দ্যুতি ঝলকে ওঠে। নাহিয়ানের দিকে দৃষ্টি ফেলে বলে, সে তো আমাদের জন্য গৌরবের। একজন পর্যটককে আমি মুগ্ধ করতে পেরেছি। আমার ওইটুকু পরিশ্রম তবে ধন্য হলো।

সরু, লম্বা নাক আর সুরমামাখা ওই চোখ, অমন চোখ বুঝি এ-পৃথিবীতে আর কখনো দেখেননি নাহিয়ান। মনে হলো, সূর্যের একটা রশ্মি এসে রওশনের চোখের পাতায় আটকে আছে।

মেয়েরা তশতরিতে সাজিয়ে শরবত, হালুয়া আর রাংতা দিয়ে মোড়া শাহি পান দিয়ে গেল।

নাহিয়ান ওর আশ্রয় জন্মদেব বাইয়ের কাছে রওশন বলে, আশ্রয়জানের তো বয়স হয়েছে। শরীরটা সবসময় ঠিক থাকে না। উনি বিশ্রামে আছেন। আপনার কথা বলেছি আম্মাকে।

কবে এসেছেন আপনারা এ মুলুকে? নাহিয়ান প্রশ্ন করেন।

ওর হাতে শরবতের কাচপাত্র তুলে দিয়ে রওশন বলে, বঙ্গাল মুলুকে সোনাদানা নাকি পানিতে ভেসে বেড়ায়, তাই শুনে আশ্রয় সেই দূর লখনৌ থেকে এখানে আসেন তার বত্রিশ বছর বয়সে। বারো ভূঁইয়াদের প্রধান ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলার তখন প্রবল প্রতাপ। কিন্তু

এক যুদ্ধের পর এখানে অস্থিরতা দেখা দিলে আবার লখনৌ চলে যান আম্মা। এর কয়েক বছর পর আম্মাকে নিয়ে আবার আসেন। তা-ও দশ-এগারো বছর তো হলো।

তার মানে লখনৌয়ে আপনি তখন একা ছিলেন?

তা কেন? নানিজান ছিলেন না? তার সঙ্গেই তো ছিলাম।

নাহিয়ানের চোখেমুখে একরাশ প্রশ্ন উঁকি দিতে দেখে রওশন নিজে থেকেই বলে, সে অনেক কথা, অল্পতে ফুরোবে না।

কারুকাজ করা রূপার বাটিতে ঘিয়ের গন্ধভরা হালুয়া পরিবেশন করতে থাকে রওশন। নাহিয়ান মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ওর হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। মহলের আলোয় চুড়ি, জরি, আংটির জমকালো সাজের মধ্যে গতকাল এই স্নিগ্ধ হাতদুটি তিনি দেখেননি। মেহেদিরাঙা উজ্জ্বল হাতের দীর্ঘ আঙুলগুলোও যেন পাপড়িমেলা পদ্মকলি।

রওশন বলে, নানাজান ছিলেন পারস্যের মানুষ। কবিতা লিখতেন। হাফিজের রুবাইয়াত, মুখামমিস, কাসাইদ ছিল তাঁর মুখস্থ। ভাগ্যান্বেষণেই এসেছিলেন হিন্দুস্থানে। দিল্লি থেকে লখনৌ এসে থিতু হলেন নানাজান। তখন নানিজান তো অল্প বয়সের একটি লাজুক মেয়ে, ভজন গাইতেন লখনৌর মন্দিরে-মন্দিরে। ওই যুগে কীভাবে দেখা হয়েছিল দুজনার, নানিজান তা কখনো বলেননি। গোঁড়া হিন্দুর ঘর ছেড়ে একজন মন্দির-সেবিকা এক ভিনদেশি মুসলিম কবির হাত ধরে পালালেন। সেই জীবনযুদ্ধের ফসল আম্মাজান তাদের একমাত্র সন্তান। আর আমিও তো আম্মার একটিই চোখের মণি। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তো তিনি এসেছিলেন এই এতদূর।

মসনদ-ই-আলার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসা খাঁ এখন মসনদের অধিকারী। আম্মা তো আফসোস করে বলেন, জলাদেশের এই শানদার নগরীতে স্বর্ণালি যুগের সেই জৌলুস আর নেই। মনে হয় পুরনো জৌলুস ফুরিয়ে গিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু লেগে আছে মাত্র। আমার কিছ্র তা মনে হয় না। হবে কী করে, আমি তো আর অতীতের সেই জৌলুসে বড় হইনি।

কথা বলতে-বলতে রেকাবির ওপর ফিনফিনে রঙিন রুমাল সরিয়ে এক খিলি পান তুলে নেয় রওশন, মুখে পুরে দিয়ে বলে, ভুঁইয়াদের মধ্যেও আর সেই ঐক্য নেই এখন। কতকটা কাবু হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ তলে তলে মোগলদের শরণাপন্নও আছেন। একের পর এক যুদ্ধ, মগ আর পর্তুগিজ জলদস্যুদের দৌরাড্য, নানা মুলুকের আক্রমণ, লুণ্ঠন। কী করবে তারা? ওদিকে গুলি দিল্লীশ্বর আবার বিশাল সেনাবহর পাঠিয়েছেন। রাজমহলে বসে তারা শলা করছে। যুদ্ধ লাগতেই বা কতক্ষণ। এ-নগর এখন ক্রান্ত। আপনি নতুন মানুষ, কতটুকুই বা বুঝবেন জানি না। নাচ-গানের তরিকারই বা এখন আর কী আছে, বলুন? জলসাঘরও মোগরাঘাটের বাজার হয়ে গেছে। দু-চারটা আসর দেখলেই আন্দাজ পাবেন। আপনার যদি আগ্রহ হয়, আম্মার কাছে গুনবেন আগের দিনের কথা। ঘোর লেগে যাবে।

পানের রসে রওশনের ঠোঁট টুকটুক করছে। প্রাচ্যের এ-বস্তুর সঙ্গে নাহিয়ানের পরিচয় মধ্যে নেই, তাই বিনয়ের সঙ্গে তাম্বুল চর্ষণ থেকে বিরত থাকলেন। কথায়-কথায় বিস্তর কথা হলো। শুধু গল্পে নয়, রওশন আরার রূপ আর বলার বাকভঙ্গিমায় গভীর ঘোর লেগে গেল নাহিয়ানের। এটুকু বয়সে পৃথিবীর কত দেশ ঘুরেছেন, কত কত রমণীকে দেখেছেন তিনি; কিছ্র প্রাচ্যের রহস্যঘেরা জনপদের মতো এর নারীরাও কি তবে মোহময়ী? এক অবোধ্য অন্তরালের আলো-ছায়ায় রওশন আরাকে খুঁজবার চেষ্টা করছেন নাহিয়ান।

রওশন আরার আমির, ওমরা, বণিক, জমিদার, সর্দার, কবির সান্নিধ্যে তো কম আসেনি। তা ছাড়া পর্তুগিজদের সম্পর্কে তার ধারণা তো সুখকর নয়। কিছ্র এক লহমার পরিচয়ে যতটুকু আলাপ হলো মালাক্কীয় এই পর্তুগিজ খ্রিস্টানের গভীর নীল নয়নের দৃষ্টিপথে হাজার সারস উড়ে যাওয়ার ছবি দেখতে পেল যেন সে। ওর বিনীত ব্যবহারে আর অভাবনীয় শালীনতায় মুগ্ধ হয় রওশন। মানুষটা যেমন সুপুরুষ, তেমনি সংবেদী তার হৃদয়। আর সংযমও তারিফযোগ্য।

পাঁচ

অসময়ে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় চারদিক পানিতে থইথই করছে আজ। পানামার সব খাল কানায়-কানায় পূর্ণ। সর্বজনের প্রবেশাধিকার নেই এমন একটা গুপ্ত খাল আকালিয়া দিয়ে বাহারি ডিঙিতে চেপে নাহিয়ানকে খাসনগর মসলিনপাড়ায় নিয়ে যাচ্ছে রওশন। ভুবনবিখ্যাত এই কাপড়ের কারিগরদের যেমন দেখা হবে, ওর জন্য একখানা উড়ানিরও ফরমাশ দিয়ে আসবে। খালটির দুই পাড়ে অগণিত গাছগাছালির ডালপালা, ঝোপঝাড় স্নিগ্ধ জল ছুঁয়ে এমনভাবে নুয়ে আছে, মনে হচ্ছে এটা জঙ্গলের সুডঙ্গপথ যেন। এ-পথেই নৌকা একসময় চলে আসে খাসনগর দিঘির তঁতিপাড়ায়।

রওশন আরার আগমনে প্রবীণ তঁতি গৌরীপ্রসাদের উঠানের বেলতলায় বউ-ঝিদের জটলা পড়ে গেল। আবছায়া অন্ধকার মেটেঘরের মাকু ছেড়ে উঠে এসেছে গৌরীপ্রসাদ। সারাজীবন ওই ছায়া-ছায়া অন্ধকার ঘরে বসে বসে আবে রওয়া, শবনম, কাসিদা আর মলমল খাস বুনতে-বুনতে কোমর বেঁকে গেছে তার।

ওর একমাত্র মেয়ে মায়াময়ী এ-পাড়ায় আবে রওয়ার সেরা কাটুনি। কাঠাসন পেতে খাস মেহদের বসতে দিয়েছে সে। পাড় উপচে এখন ভিটার কাছাকাছি বর্ষার জল। দিঘির অথই সে-জলে অগণিত লাল-লাল শাপলা ফুটেছে। গৌরীপ্রসাদের এই মেয়েটিও যেন জলের শাপলার মতোই কোমল আর সুস্থির। কলাপাতায় সাজিয়ে পায়ের পরিবেশনকালে ওকে তেমনই মনে হলো নাহিয়ানের। অথচ এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে, সুতা কাটতে গেলে ওর হাতেই ডলনকাঠির দ্রুত সঞ্চালনে কেমন বিদ্যুৎ খেলে যায়! না দেখলে বোঝা দুষ্কর।

গৌরীপ্রসাদ হাতজোড় করেই বসেছিল। আপ্যায়ন শেষ হলে বলল, মা জননী, এই গরিবের কী খেদমত চাই?

গৌরীদাদা, এ আমার মেহমান। মালাক্কা থেকে এই দেশ দেখতে এসেছেন। ওর জন্য একখানা উড়ানির ফরমাশ দিতে চাই। আমি জানি, আপনি অন্তর দিয়ে বুনবেন।

জে আজ্ঞা, মা জননী। কিছ্র কটা দিন সময় লাগবে যে।

তা লাগুক, ও তো আর চলে যাচ্ছে না, বলেই মখমলের থলে থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা তুলে গৌরীপ্রসাদের হাতে দিলো সে। গৌরীপ্রসাদ এমনটা কল্পনাও করেনি। মুষ্টিবদ্ধ মুদ্রাটা কপালে ঠেকিয়ে মাকুর দিকে উঠে যায়। আবার ফিরে এসে বলে, আমির-ওমরাদের খবর তো আপনি রাখেন মা, গুলি দিল্লীশ্বর নাকি সেনা পাঠিয়েছে। শিগগিরই যুদ্ধ বাধবে। এমন যদি হয়, সোনারগাঁ যে শ্মশান হবে!

তা কেন হবে? মসনদ-ই-আলা অন্য ভুঁইয়াদের জড়ো করছেন, সৈন্যরা সব ইচ্ছামতির মোহনা ডাকছড়ায় শক্ত ঘাঁটি বানিয়েছে। মীর্জা মোমিনের মতো বীর সেখানে আছে, ভয় কী গৌরীদাদা। তা ছাড়া খাজা ওস, মজলিশ দেলোয়ার, মজলিশ কুতুব, বায়েজিদ কররানি, আনোয়ার গাজিরা মসনদ-ই-আলার সঙ্গে আছেন। আর সোনারগাঁ রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী শামসুদ্দিন বাগদাদির ওপর আপনাদের কি আস্থা নেই?

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে মাটিতে পোঁতা বড় বড় গর্তে রঙের চাড়ি, শনে-ছাওয়া মাটির ঘর, মাকু, চরকা — সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলেন নাহিয়ান। আর ভাবছিলেন, বয়নশিল্পীদের কী অদ্ভুত জীবন! কী অসম্ভব অভিনিবেশ! একেবারে মাটির সঙ্গে সংলগ্ন, প্রকৃতির মতো কোমল আর জলের মতো সরল।

ফেরার পথে রওশনের হাত চেপে ধরেন নাহিয়ান, এ তুমি কী দেখালে আমাকে?

কেন? জগৎখ্যাত মসলিনের কারিগর। তুমি তো কয়েক ঘর মাত্র দেখেছ, এমন হাজার আছে।

সবার জীবনযাপনই কি এমন?

হ্যাঁ, এমনই। ওরা ওতেই আনন্দ পায়। একখানা কাপড় বুনবে যদি অমাত্যজনের বাহবা আসে, তাতেই ওরা ধন্য। এই ধরো আমি নেচে-গেয়ে যেদিন তারিফ পাই, মনে হয় আর কিছু চাই না, আমার জীবন সার্থক হলো।

পুরো নগরেই চলছে মৃদু গুঞ্জন। যুদ্ধ কি তবে অত্যাশঙ্ক? বণিক আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের অন্দরমহলের বাতাস ভারী হয়ে আছে। বাঁদি, গোলাম আর খেদমতগারদের চালচলনেই যেন বেশি আতঙ্ক। নগরের আশপাশ ছাড়া দূর গ্রামের জনপদে এসবের আঁচ খুব একটা লাগে না। দৈনন্দিনের মধ্যে তারা শুধু এক রাজার চলে যাওয়া আর এক রাজার আগমনের বার্তা শোনে।

ছয়

জদ্দন বাই তার সুরম্য খাটে আধশোয়া হয়ে কারুকার্যখচিত রূপার পানদান থেকে এক খিলি শাহি পান মুখে পুরে বাঁদিকে ইঙ্গিত করলেন। বাঁদি এসে আখরোট কাঠের চৌপায়ায় রাখা রেকাবিতে পেস্তা, কাজু, খুবানির বাটিগুলো সাজিয়ে গেল।

নাহিয়ান তাঁতিপাড়ায় শোনা যুদ্ধের আশঙ্কার কথা তুললে জদ্দন বাই মুখের পান চিবাতে থাকায় নীরব রইলেন।

ভবনের পেছনে চবুতরা। এখান থেকে জালালি কবুতরের গমগমে বাক্বাকুম-বাকুম-বাক ডাক শোনা যায়। সেইসঙ্গে ওদের পাখা ঝাপটানোর শব্দ।

মক্কাশরিফ থেকে বের হয়ে বহু দেশ-জনপদ ঘুরে দরবেশ শাহজালাল তখনকার বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজির দিল্লিতে এলেন এবং কয়েক দিন দরবেশ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার আস্তানায় কাটালেন তিনি। দিল্লি ত্যাগের সময় হজরত নিজামউদ্দিন তাকে ধূসর বর্ণের একজোড়া কবুতর উপহার দিলেন। শাহজালাল তিনশো ষাটজন আউলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি থেকে এসে আসামের অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্টকে জয় করে বিসমিল্লাহ বলে উড়িয়ে দেন সেই কবুতর।

তিনশো বছর পূর্বের সেই কবুতরের বংশধরই এই জালালি কবুতর। এই পায়রা পোষা দরবেশবাবার প্রতি বিশেষ ভক্তির নিদর্শন।

দ্বিপ্রহরে ওই জালালি পায়রাদের একডালা ধান খাইয়ে তবে গোসল সেরেছে রওশন আরা। এখন মাখনরঙা মিহি সুতায় বোনা সালোয়ার-কামিজ আর হালকা গয়না পরে প্রসাধনহীন এক অঙ্গরীর বেশে আন্নার কোল ঘেঁষে গভীর আলস্য নিয়ে আধশোয়া হয়েছে সে। তার মুখাবয়ব থেকে কাঁচা হলুদের রং ঠিকরে পড়ছে। মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে মেলে দিয়েছে কোঁকড়ানো ঘন কালো ভেজা চুল। মনে হচ্ছে যেন পানপাত্র ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে সুরা।

পিকদানিতে পান চিবানো খয়েরি পিক ফেলে এবার জদ্দন বাই বললেন, যুদ্ধ আমি দেখেছি বেটা। রক্তপাত, লুণ্ঠন আর অগ্নিসংযোগ জীবনের সব আয়োজন ছারখার করে দেয়। এর হাত থেকে রক্ষা নেই মানুষের। মুসা খাঁ কন্দুর কী করতে পারবে জানি না, তবে তার বাবা এই সোনারগাঁর মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ একবার কৌশলী রাজনীতি আর বীরত্বের যে-নজির রেখেছিলেন, তার তুলনা নেই।

আমি তাকে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি, তার অনুগ্রহ নিয়েছি। আমার গানে মুগ্ধ হতেন। খাঁ রওশনকেও আদর করতেন খুব। অকুতোভয় বীর, বিরাট হৃদয় ছিল তার। বঙ্গাল মুলুক মুক্ত রাখতে বারো ভূঁইয়াদের সঙ্গে নিয়ে কি না করেছেন তিনি!

বিরাট এক বাহিনী গড়েছিলেন। রাজধানীর চারপাশে চক্রাকারে দেওয়ানগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, শেরপুর, ডাকছড়া, এগারোসিঙ্গু, টোক, কত্রাভূ, জঙ্গলবাড়ি, রাঙামাটিতে দুর্গ বানিয়েছিলেন, যাতে যে-কোনো দিকের আক্রমণ অনায়াসে ঠেকাতে পারেন। মোগল সম্রাট আকবরের তা পছন্দ হয়নি। বারবার তার সেনারা পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে। এত বিত্ত, এত ঐশ্বর্যের বঙ্গাল মোগলদের হাতছাড়া থাকবে কত দিন? এবার তাঁর শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার সিংহকে পাঠালেন ঈশা খাঁকে দমন করতে। এগারোসিঙ্গু দুর্গের বাইরে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। সাতদিন ধরে সে-যুদ্ধে কত যে প্রাণ গেল! নদীর পানি লালে লাল। তবু জয়-পরাজয় কিছুই নিশ্চিত হলো না।

রাত নেমে গেছে। পরদিন আবার যুদ্ধ হবে। কিন্তু এমন রক্তপাতে

আর যেতে চাইলেন না ঈশা খাঁ। দূত পাঠিয়ে সিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। রাজপুত সেনাপতি মান সিংহও সে-আহ্বানে রাজি। এটাও যে ঈশা খাঁর এক অদ্ভুত রাজনীতি-কৌশল সিং সেদিন তা ধরতে পারেননি।

মুখে পানের রস জমে গেলে জদ্দন বাই আবার পিকদানিতে পিক ফেলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বলতে লাগলেন, এরকম কৌশল আর বিল-খাল, নদী-নালায় সহায়তা উনি এমন করেই কাজে লাগাতেন। যে-কারণে কোনো দিনও কারো কাছে তাকে মাখানত করতে হয়নি। সে যা-ই হোক, পরের দিন অশ্বপৃষ্ঠে দুই বীর নাঙা তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত। সৈন্যরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। চলল লড়াই। একপর্যায়ে সিংহ ঘোড়া থেকে গেলেন পড়ে। দ্বৈরথ যুদ্ধে ওর জয় তো হয়েছে গেছে, এখন ক্ষত্রিয়সুলভ মহানুভবতা দেখাতে দোষ কি। ঈশা খাঁ তাড়াতাড়ি তার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভূপতিত সেনাপতিকে টেনে তুললেন। খাঁয়ের শৌর্যে মুগ্ধ হলেন মোগল সেনাপতি। এমনটা কোনো দিন কল্পনাই করেননি রাজপুত বীর। বিনা বাক্যব্যয়ে ঈশা খাঁকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি! এদিকে শিবির থেকে সবার সঙ্গে বসে সবই দেখছিলেন সিংহ-পত্নী। ভীত হয়ে সব রীতি-রেওয়াজ ভুলে ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন রাজপুতানি। লুটিয়ে পড়লেন ঈশা খাঁর পায়ে। মিনতি জানালেন, তার স্বামী পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে দিল্লি ফিরে গেলে নিশ্চিত শিরশ্ছেদ হবে। কারণ পরাভূতের প্রতি আকবরের ক্ষমা নেই। ঈশা খাঁ কি তাকে পতিহারা আর তার সন্তানদের পিতৃহারা হতে দেখে খুশি হবেন? ব্যাকুল কণ্ঠে বিজয়ীর করুণা প্রার্থনা করলেন তিনি। দুই চোখে তার উথলে ওঠা কাতর সে-আকুতি। রাজপুতানির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কথা আর অমন আকুতি শুনে ঈশা খাঁর চিত্ত বিগলিত হলো। মান সিংহের সঙ্গে দিল্লি গিয়ে সম্রাটের কাছে ক্ষমা চাইতেও রাজি হলেন। সেটাও যে ছিল ভূঁইয়াপ্রধানের সময়ক্ষেপণের আরেক কৌশল, আমরা কি আর তখন তা বুঝে উঠতে পেরেছি। আমরা এতে অস্থির হয়ে উঠলাম। ঈশা খাঁর অনুপস্থিতিতে এখানকার পরিস্থিতি কী হয় না-হয় বুঝে উঠতে পারছিলাম না। চলে গোলাম লখনৌ।

ততদিনে প্রচার হলো, দিল্লি গিয়ে বন্দি হন ঈশা খাঁ। পরে তাঁর কৃতিত্ব আর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর তাকে বঙ্গালের বাইশটি পরগনার জমিদারি আর ‘মসনদ-ই-আলা’ খেতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন।

আসলে ওসবই ছিল সিংয়ের ছড়ানো গুজব। ঈশা খাঁ কোনোদিনই দিল্লির সম্রাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াননি। নিজের বাহুবল, প্রখর বুদ্ধি আর রাজনীতির কৌশল দিয়েই বাইশ পরগনার মালিক হয়েছিলেন তিনি। ‘মসনদ-ই-আলা’ খেতাবও তার নিজেরই দেওয়া। মোগলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তো আরামেই থাকতে পারতেন, কিন্তু উনি কি তা চেয়েছেন? চাইলে তো আর এত রক্তপাতের দরকার ছিল না। বঙ্গের অধিকার আর সম্পদ লুটে নেওয়ার মোগলি তৎপরতা মেনে নেওয়ার মতো লোক ছিলেন না ঈশা খাঁ।

তবে কি জানো, ভূঁইয়াপ্রধান কখনো পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা নানা কারণেই সংগত বোধ করেননি। আবার কারো অধীনতাও স্বীকার করেননি কোনো দিন। তারই তো সুযোগ্য পুত্র আমাদের মসনদ-ই-আলা মুসা। বঙ্গাল মুলুকের ঐশ্বর্য এত সহজে কেউ কেড়ে নিতে পারবে বলে মনে করো?

একটু দম নিয়ে জদ্দন বাই আবারো পানের পিক ফেললেন। নাহিয়ান বিমূঢ়ের মতো শুনছিলেন। বললেন, সত্যি, এ যে রূপকথাকেও হার মানায়।

ঈশা খাঁ আর সোনারবির কাহিনি তো শোনোনি। শুনলে বুঝতে! আম্মা বলেন না ওকে। ছোট্ট খুকির মতো বছবার শোনা সে-গল্প আবারো শোনার সুযোগ হারাতে চায় না রওশন।

আজ আর না, আমি। খাবার সময় হয়ে এলো। তোমরা গল্প করো, আমি বরং গোসলে যাই, যা গরম পড়েছে আজ! □



উড়ন্ত গিরিবাজের ইন্দ্রজাল

পাপড়ি রহমান



ও ই শহরে বিকেল নামে মস্তুর গতিতে। ধীরস্থির ও মনোরম ভঙ্গিতে। শহরের তিনদিকেই পাহাড়ের সারি। ফলে রোদ্দুর হঠাৎ করে নিষ্প্রভ হয়ে উঠতে পারে না বা জলস্রোতের ভেতর নিরুদ্দেশে যেতে পারে না। গনগনে মধ্যদুপুর হয়ে তাকে ওইসব পাহাড়ের চূড়ায় ঝুলে থাকতে হয়। আর ভাপ-তাপের বিকিরণে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। পাহাড়ের শক্ত মাটিতে উত্তাপ ঢুকে পড়লে ক্রমে অবসাদ আক্রান্ত হয়। ক্লান্তি এসেও তাকে নিস্তেজ করে ফেলে। দীর্ঘক্ষণ পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় লটকে



অলংকরণ : সুলেখা চৌধুরী

থাকার বিষাদ ও জলহীন হাওয়ার যুগপৎ আক্রমণে সে নমিত হয়। সূর্যের নমিত হওয়া মানেই রূপালি-রঙা-উজ্জ্বল-আলোকরশ্মিতে ম্লানিমা ঢুকে পড়া। অথচ তখন তার উদ্যত তেজ অনেকাংশেই নিভে গেছে। কারণ আখসিকাতের পেটের ভেতর বিকেলের বাদামি আভা ঢুকে পড়েছে। বাদামি রঙের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে আখসিকেল্লা, ঘর-দোর-আঙিনা আর জলভরন্ত জলাধারগুলো।

গনগনে মধ্যদুপুরে যেসব পাহাড়ের সারি দৃশ্যমান ছিল, তারাও এক্ষণে অস্পষ্টপ্রায়। চারপাশে ছায়াচ্ছন্ন ও মাধুকরী বিকেলের তীব্র উপস্থিতি। খানিক বাদেই ওই অস্পষ্টতার ভেতর নিমজ্জিত পাহাড়-সারিকে আর আলাদা করে চেনার উপায় থাকবে না। ওই শহরের পাহাড়েরা তখন মেঘেদের ডানার ভেতর ঘুমিয়ে পড়বে। পাহাড় আর মেঘ একাকার হয়ে আকাশের অলিন্দে বিশ্রাম নেবে।

আখসিকেল্লার ছাদে দাঁড়ালে বাদামি-রঙা বিকেলের মৌতাত তীব্রভাবে অনুভব করা যায়। শান্ত-দেহের ওপর মৃদুমন্দ-হাওয়া কোমল-পালকের স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। ওই মৌতাত অনুভব করার স্পৃহায় জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবুর হররোজই ছাদে পায়চারি করে।

সলমাজরির কারুকাজখচিত তার পায়ের নাগরা জুতা ক্ষীণ শব্দ তোলে, যা বিকেলগুলোর দীর্ঘ নীরবতায় চিড় ধরিয়ে দেয়।

আখসিকেল্লার ছাদে দাঁড়ালে
বাদামি-রঙা বিকেলের মৌতাত
তীব্রভাবে অনুভব করা যায়।
শান্ত-দেহের ওপর মৃদুমন্দ-
হাওয়া কোমল-পালকের
স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। ওই
মৌতাত অনুভব করার স্পৃহায়
জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবুর
হররোজই ছাদে পায়চারি করে।

পোড়ামাটির ছাদ। বাবুর পায়চারি করতে-করতে খেয়াল করে, বড় যত্নের হাতে এই ছাদ সমতল করা হয়েছে। কতশত দুরমুশ দেওয়ার পর ছাদের এমন সমতল চেহারা হয়েছে — কে জানে? পোড়ামাটির মসৃণ ছাদের ওপর সূর্যের আলো ক্ষণে-ক্ষণেই রহস্য খেলিয়ে দেয়। দিবসের ফটফটা আলোয় এর রং হাতির চামড়ার মতো ধূসর। রোদ্দুরের উত্তাপ ক্ষীণ হওয়া মাত্রই পোড়ামাটি ফের রং বদলে ফেলে। তখন তাকে দেখায় কোনো প্রাচীন পুকুরে জমাটবাঁধা শ্যাওলার মতো। যেন-বা ওরকমই নিভন্ত-সবুজ তার গাত্রবর্ণ! ফের সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে রং বদলে ফেলে। ওই নিভন্ত-সবুজ ততক্ষণে গাঢ়-গোলাপি। ক্রমে তা হালকা-গোলাপি।

কেল্লার ছাদে পোড়ামাটির রং বদল দেখতে-দেখতে বাবুর তার আক্বাজানের জন্য অপেক্ষা করে। বাবুরের আক্বাজান ওমর শেখ মীর্জা। ফরগানার শাসক। ওমর শেখ মীর্জা ছাদে আগমনের পূর্বেই দুজন খাস খানসামা বর্ণিল কারুকাজ করা টানাপাখা হাতে পৌছে যায়। অতঃপর পাখার হাওয়ায় কেল্লার ছাদের রৌদ্রতাপ বিলীন হতে থাকে। ইতোমধ্যে আরো দুজন খানসামা উর্দি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের একজনের হাতে রূপার ট্রেতে শরবতের গ্লাস। দুধ, পেস্তা, জাফরান, মিছরি আর বরফকুচি দেওয়া শরবত। জাফরানের খুশবু পাখার হাওয়ার সঙ্গে ছাদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অন্যজন খাস খানসামার হাতে জমকালো নকশার রূপার রেকাবি। রেকাবিতে রাখা তরমুজের সুদৃশ্য ফালি। ফালিগুলো রূপার জালিতে থেকে ঢেকে রাখা। বাবুরের আক্বাজান ওমর শেখ মীর্জার পছন্দের ফল তরমুজ। আক্বাজানের মুখেই বাবুর তরমুজের উচ্চশ্রবণশ্রবণ শুনছে। ওমর শেখ মীর্জা হরহামেশাই বলেন —

‘এই আখসির তরমুজই সর্বোত্তম। ‘মীর তৈমুরীর’ চাইতে উত্তম তরমুজ দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। বুখারা ও সমরখন্দের তরমুজেরও প্রসিদ্ধি রয়েছে। কিন্তু তা কোনোভাবেই মীর তৈমুরীকে টেকা দিতে পারে নাই।’

শরবতের গ্লাসে ছোট-ছোট চুমুক দিতে-দিতে বাবুর পোড়ামাটির রং থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আকাশের দিকে তাকালে সে ইষৎ চমকে ওঠে। আখসির আসমান কখন মীর তৈমুরীর বক্ষের রং ধারণ করল? মেঘেদের ভাঁজে-ভাঁজে ওই রঙের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ‘মীর তৈমুরী’র রংটাই কোথাও-কোথাও হালকা হয়ে গোলাপি বর্ণে পরিণত হয়েছে। ফলে লালচে ও গোলাপি মেঘে সয়লাব আসমান। কিছু সাদাটে মেঘ তুলার মতো ভেসে আছে। সাদা মেঘেদের সন্নিহিতে অল্পবিস্তর সুরমারঙা মেঘ। আক্বাজানের চোখের সুরমা দেখে বাবুর ওই রংটি ভালো করে চিনতে শিখেছে। বাবুর যাকে সুরমারঙা মেঘ বলছে, আক্বাজান তাকে বলে ধূসর অথবা পাংগুর্মা-মেঘ। ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে বাবুর পাহাড়ের চূড়াগুলিকে খুঁজে চলে। কোথায় যেন তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথচ দিনের আলোয় মাথা উঁচু করে জেগে ছিল। এখন কোথায় যেন উধাও। হয়তো মেঘেরা তাদের আড়াল করে ফেলেছে। ধূসরবর্ণা-আলোয়ানের তলায় চাপা পড়ে আছে পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ারাজি।

মেঘ আর পাহাড়ের লুকোচুরি খেলা দেখতে-দেখতে বাবুর ফের কী যেন ভাবে। কেল্লায় নিচের দিকে তাকালে খানিকটা বিম্মিত হয়। মীর তৈমুরীর কিছু রং ছলকে পড়েছে সৈহনের জলে। কেল্লার ঠিক পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে ওই খরস্রোতা নদী। অতটা উঁচু থেকেও বাবুর কল্লোলধ্বনি স্পষ্ট শোনে। খানিক বাদেই সূর্য অস্ত যাবে এই নদীর বুকে। সূর্য ডুব দেওয়ার পরক্ষণে সৈহনের জল ঘন অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে যাবে। আখসির যাবতীয় অন্ধকার বুকে নিয়ে সে ছুটে যাবে দুর্বীর বেগে। আক্বাজান বলেছিলেন এই সৈহনের নদী খোদ বেহেশত থেকে নেমে এসেছে। বেহেশতে যে-চারটি নদী রয়েছে তারই একটির ধারা সৈহনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

বাবুরের আক্বাজান ওমর শেখ মীর্জাও কেল্লার ছাদে বিকেল

কাটাতে ভালোবাসেন। আর আক্বাজানের সঙ্গে সময় কাটানো বাবুরের জন্য পরম আকর্ষিত। বাবুর আক্বাজানকে যারপরনাই ভালোবাসে। পছন্দ করে। আক্বাজান শেখ মীর্জা ইস্পাত চরিত্রের অধিকারী। চরিত্রের সঙ্গে তাঁর অবয়বেরও কোথায় যেন কাঠিন্য রয়েছে। ওমর শেখ মীর্জার ছোট করে ছাঁটা দাড়ি। ঘন লোমে আবৃত খর্বকায় দোহারা শরীর। মাথায় পাগড়ি ‘দেস্তার পেঁচ’ কায়দায় পরা। অর্থাৎ যে-পাগড়ি ভাঁজ ছাড়াই পরা যায়। মীর্জা পাগড়ির লেজ পেছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখেন। পরনের লম্বা আলখাল্লা কোমরবন্ধনীতে বাঁধা থাকে। সেই বন্ধনীর ভেতর বাঁ-হাত ঢুকিয়ে রেখে ডানহাতে পায়রাদের খাবার খাওয়ান। ওমর শেখ মীর্জা পোষা পায়রা নিয়েই বিকেলটা কাটিয়ে দেন। খোজন্দ আর সমরখন্দ থেকে আনানো গিরিবাজরা ডিম-বাচ্চা ফুটিয়ে সংসার সম্প্রসারণ করে চলেছে। গিরিবাজদের দীর্ঘক্ষণ উড়ে চলাকে মীর্জা তারিফ করেন। দুই-চার ঘণ্টা তারা উড়ে বেড়ায়। আসমানের অনেক উঁচুতে উঠে মেঘের আব শরীরে মেখে নেমে আসে। নামতে-নামতেই শতবার ডিগবাজি দেয়। আকাশ পরিভ্রমণের ক্লাস্তি নিয়ে কেল্লার ছাদে বিশ্রাম নেয়। ডানা ছড়িয়ে মীর্জার আশপাশেই ঘুরে বেড়ায়। আর তার হাতের তালু থেকে বাসমতি ধান খুঁটে-খুঁটে খায়। উদর পূর্তি হলে মেঘের মতো গম্ভীর শব্দে ডেকে-ডেকে ওঠে — বকম... বাকবকম... বকম

ওমর শেখ মীর্জার এই এক নেশা। নিত্যদিন গিরিবাজ নিয়ে খেলা করা। হাতের প্রশস্ত তালুতে গমদানা, সরিষা নয়তো বাসমতি ধান নিয়ে বসে থাকা। পায়রাদের ঠোকরানো দেখে মীর্জা পরম আনন্দে হেসে ওঠেন।

ওমর শেখ মীর্জা সপ্তাহের এক-দুদিন সুরার মজলিশেও উপস্থিত থাকেন। বুজা ও তালার-জাতীয় সুরাতেই তিনি অধিক আসক্ত। কিন্তু সুরার নেশা তাঁকে তেমন আকর্ষণ করে না। সুরার চাইতে গিরিবাজদের বকম-বকম তাঁর প্রিয়। তাদের ধূসর-সাদা মেশানো মসৃণ পালক। ধবধবা সাদা ডানা মেলে উড়ে যাওয়া মীর্জাকে স্বর্গীয় আনন্দ দেয়। গিরিবাজের পালক সরিয়ে দেহের উষ্ণতা নিতে-নিতে মীর্জা জোরে হেসে ওঠেন। তাঁর সেই হাসির শব্দ সৈহনের জলের ওপর আছড়ে পড়ে।

দুই

নিজেদের শৌর্য-বীর্যের কথা মীর্জা হরহামেশাই বাবুরকে বলেন। বাবুরও আক্বাজানের কথা মন দিয়ে শোনে। কারণ বাবুর জানে, তাকেও একদিন শৌর্য-বীর্যশালী হতে হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে ফরগানার শাসনভার বাবুরের ওপরই ন্যস্ত হবে। বাবুর জানে, আক্বাজান চান যে, সেও সুশাসক হোক। আরো দুই-চারটা রাজ্য সে ফরগানার সঙ্গে যুক্ত করুক। কিন্তু বাবুর এখনো কিশোর বালক। রাজ্য জয় করার মতো যুবক সে হয়ে ওঠেনি। কিশোরের বুকের ভেতর মীর্জা প্রতিদিনই স্বপ্নের বীজ রোপণ করেন।

বিকেল বেলাটা মীর্জা আর বাবুরের একান্ত নিরিবিলি সময়। দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার পর বাপ-বেটা মিলে ছাদ জুড়ে পায়চারি করে। পায়চারি করতে-করতে খিদে পেলে দুই-চার টুকরা ফল মুখে দেয়। রেকাবি উপচে থাকে ‘মীর তৈমুরী’র ফালি। নয়তো খোজন্দের ডালিম। অথবা সমরখন্দের আপেল। আম্মিজান খুতলাঘ নিগার নিজে তদারকি করে এসব ফল ছাদে পাঠান। পেস্তা-দুধ-জাফরান-মিছরির শরবতের গ্লাসে স্বহস্তে বরফকুচি ছড়িয়ে দেন। গ্লাসের রূপার ঢাকনার ওপর লেসের গিলাব পরিয়ে দেন। বাবুর দেখেছে, আম্মিজান এসব কাজ খুব প্রসন্নচিত্তে সম্পন্ন করেন।

আক্বাজান আর আম্মিজানের একান্ত মুহূর্ত কাটে ফজরের নামাজের পরপরই, যখন আক্বাজান খামসা আর মসনবী পাঠ করতে বসেন। আম্মিজান খামসা আর মসনবীর বেজায় ভক্ত। মাওলানা

রুমীর শাহনামা শুনতেও তিনি ভালোবাসেন। আর এসবই কিনা আব্বাজানের মেঘমন্ড্র গলায় দুর্দান্তভাবে মানিয়ে যায়। ফজরের নামাজ সম্পন্ন করে আব্বাজান কোরান তেলাওয়াতের পরপরই আম্মিজানকে ডাক দেন। বাবুরও ততক্ষণে তেলাওয়াত শেষ করেছে। অতঃপর খামসা আর মসনবী পাঠের আসর জমে ওঠে। আম্মিজান ঘাঘরা ছড়িয়ে পারস্য-গালিচার ওপর বসে আব্বাজানের পাঠ শোনেন। কখনোবা বলে ওঠেন —

‘মারহাবা’।

গ্রীষ্মকালের বিকেলগুলো রোদ্দুরের ঝাঁজে পুড়তে-পুড়তে আসে। খানসামার টানাপাখার হাওয়া সেই উগ্র ঝাঁজ সামান্য কমিয়ে আনে। আর ওমর শেখ মীর্জা তখন কেবল ছাদে গমের দানা ছড়িয়ে দেন। ধবধবে সাদা রঙের গিরিবাজরা জোড়া লেজ ফুলিয়ে দৌড়ে আসে। আর নৃত্যের ভঙ্গিতে দানা খেতে শুরু করে। সাদা জোড়াদের পাশে গলার পালক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়ায় ধূসর রঙের তিন জোড়া। দুই-একটা ধূসরের গলায় কালো-কালো ফুটকি। ফলে ওদের আলাদা করে চেনা যায়। আব্বাজানের ছড়িয়ে দেওয়া গমদানা খেয়ে পায়রাদের গলার নিচটা উঁচু হয়ে ওঠে।

ওমর শেখ মীর্জা এতক্ষণে পুত্রের দিকে মনোযোগী হন। বাবুরের কিশোর মুখের রেখায় পাহাড়ের চূড়ার মতো দৃঢ়তা। ওই দৃঢ় মুখে যেন সৈন্যের ঢেউয়ের ওঠানামা। বাবুর জানে আব্বাজান এখন কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে ঝরনাধারার মতো ঝরে পড়বে পূর্বপুরুষদের স্তুতি। বলতে-বলতে আব্বাজানের নয়নদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আব্বাজান বলবেন —

‘তৈমুর লঙ, তুমি, আমি সকলেই তার বংশের শাহজাদা’।

তৈমুর লঙের বীরগাথা — কত বড় যোদ্ধা ছিলেন তিনি, ছিলেন অকুতোভয় — এসবই আব্বাজানের কথার ঝরনাজলে ভাসতে শুরু করবে।

তৈমুর লঙ — যাঁর পূর্বনাম তৈমুর বেগ। কিন্তু লৌহের মতো শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর নাম হয়ে যায় তৈমুর লঙ। চকচকে সোনা আর দ্যুতিময় রত্নে যাঁর কোষাগার পরিপূর্ণ থাকত। পাথরের মতো শক্ত ছিল যাঁর দেহ আর মনে ছিল অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা।

সোনালি রঙের আলখাল্লার ওপর কালোরঙের সিল্কের কোমরবন্ধনী পরেছেন মীর্জা। হাতদুটো পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করছেন। পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্যগাথা শোনাতে-শোনাতে তার চোখেমুখে উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। কপালে জমেছে বিন্দু-বিন্দু স্বেদ। বাবুর মুগ্ধ দৃষ্টিতে আব্বাজানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মীর্জার সেদিকে দ্রষ্টি নেই। তিনি যেন চলে গেছে তাঁর চারপুরুষ-পূর্ব সেই বীরের কাছে। সেই যোদ্ধার কাছে। যিনি ঘোড়ায় চড়ে দাবড়ে যাওয়ার সময় দুইপার্শ্বে মরঝাড় সৃষ্টি হতো। আর তাঁর চলমান অশ্বের শরীর থেকে ঘামের মতো রক্ত ঝরে পড়ত।

কেবলার নিচে বয়ে যাওয়া সৈন্যের জলে সেই রক্তচিহ্ন ঢেউ হয়ে ভেসে আসে। মীর্জা ছাদের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত সূর্যের ডুবে যাওয়া দেখেন। জলের তলায় সূর্য হারিয়ে গেলে বিষণ্ণ স্বরে বাবুরের উদ্দেশ্য বলেন —

‘বীরযোদ্ধা তৈমুর বেগ। তাঁর দুইপুত্র মিরান শাহ আর শাহরুখ। মিরান শাহের পুত্র মুহম্মদ মীর্জা। আর মুহম্মদ মীর্জার পুত্র আবু সাঈদ। আবু সাঈদ — আবু সাঈদ তোমার দাদাহুজুর — বুঝলে শাহজাদা বাবুর?’

আব্বাজানের প্রশ্নের উত্তরে বাবুর সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। অর্থাৎ আব্বাজানের সকল কথার অর্থই তার কাছে বোধগম্য। কিশোর পুত্রের দিকে তাকিয়ে মীর্জার বুকের ছাতি গর্বে ফুলে ওঠে। এই পুত্র একদিন বিশাল রাজ্যের শাসনকর্তা হবে।

রাজ্যশাসনের যোগ্য রূপে তিনি বাবুরকে গড়ে তুলছে।

ভবিষ্যতে শুধু ফরগানা নয়, সমরখন্দ, খোজন্দ, কান্দবাদাম, আসফারা, মার্গিনান সব রাজ্যের অধিকর্তা বাবুরই হবে। মীর্জা ফের বলতে শুরু করেন —

‘শোনো বাবুর — তৈমুর লঙের রক্ত আমাদের শরীরে বইছে। তৈমুর লঙ — যুবা বয়সে জখম হওয়ার কারণে যাঁর এক পা অন্য পায়ের চাইতে লম্বা হয়ে যায়। ফলে তিনি সামান্য খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। এই খুঁড়িয়ে চলা তাঁকে দমাতে পারেনি। তিনি দিল্লি থেকে ভূমধ্যসাগর, সমৃদ্ধ পার্সিয়া থেকে ভলগার অরণ্যভূমি পর্যন্ত বিশাল এলাকার অধিকর্তা হয়েছিলেন। বুঝলে, জয়ী হওয়ার জন্য শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনো বিষয় নয়। বিষয় হলো তোমার মন। তোমার মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক দ্বারাই জয়ী হওয়া যায়। রাজ্যদখল তখন ইশারা মাত্র।

মহান তৈমুর লঙ — তাঁর শেষ অভিযান ছিল চীনের উদ্দেশ্যে। বিজয় নিশ্চিত ছিল তাঁর অশ্বের তীব্র ধারে। কিন্তু আল্লাহতাআলা তাঁকে বেহেশতে নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নেন।’

বাবুরের চোখের দৃষ্টি সূচ্য হয়ে ওঠে। মৃদুস্বরে জানতে চায় —

‘আব্বাজান, তাহলে তৈমুর লঙ মহান যোদ্ধা ছিলেন?’

‘শুধু যোদ্ধাই ছিলেন এমন বলা যাবে না। তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল পাথরের মতো ঠান্ডা আর স্থির। সে-চোখের দিকে তাকালে কেউ আর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারত না। যোদ্ধার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান মানুষ।’

‘সংস্কৃতিবান!’

‘নয়তো কী? তাঁর প্রিয় শহর ছিল সমরখন্দ। তুমি তো জানই, ওই শহর ছিল রুচি, জ্ঞান, সৌন্দর্য আর পৃষ্ঠপোষকতার শহর।’

‘রুচি, জ্ঞান, সৌন্দর্য তো আপনিও ভালোবাসেন, আব্বাজান।’

‘তা বাসি। আমি তো তৈমুরেরই উত্তরসূরি। কিন্তু দেখ বাছা, তাঁর যা ছিল তা আমার নাই।’

মীর্জার কণ্ঠ যেন হঠাৎ করেই খাদে নেমে যায়। কেমন করুণ ও আর্দ্র শোনায। বাবুর ভেবে পায় না আব্বাজানের কী নাই?

মীর্জা তখন ফের বলতে শুরু করেন —

‘দেখ, আমি কেবল ফরগানার শাসক। এটা কি একটা রাজ্য হলো? যার তিন দিকেই পাহাড় আর পাহাড়। যদিও ওই পাহাড়ই আমাদের রক্ষাবর্ম। মাত্র ৫০ ফারসঙ লম্বা আর ২৫ ফারসঙ চওড়া একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। আমার এই ক্ষুদ্রতা কি তৈমুর লঙ মেনে নিতেন?

তিনি কত বড় যোদ্ধা আর কত-কত রাজ্য ছিল তাঁর কজার ভিতর।’

মীর্জার কথা বাবুরের কানে প্রতিধ্বনি তোলে।

‘কত-কত রাজ্য ছিল কজার ভিতর’ ততক্ষণে চারপাশের সমস্ত আলো উধাও হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে অন্ধকারের মাঝে একুনি মাগরিবের আজান ধ্বনিত হবে।

মীর্জার সমস্ত কথা যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যায় মীর্জাকে বহু প্রাচীন পাথরের স্মৃতির মতো দেখায়।

আব্বাজানের নিশ্চল মূর্তির দিকে তাকিয়ে বাবুর সহসা ঘণ্টাধ্বনি শোনে। অজস্র-ঘণ্টা। যেন একই তালে বেজে চলেছে। বাবুর জানে, এসব ঘণ্টা বাঁধা রয়েছে ভেড়া আর ছাগলের গলায়। পাহাড়ে-পাহাড়ে দিনভর তারা চরে ফিরেছে। আর সন্ধ্যা নামার পূর্বেই বাড়ির পথ ধরেছে। ছাগল আর ভেড়ার পাল নিয়ে বাড়ি ফিরছে ক্লান্ত রাখালেরা। বাবুরের মনে হয় কোনো অলৌকিক ও অপরিপাক সংগীত শুনছে সে। যে-সংগীতের মিঠে আওয়াজ কেবল অন্দর-বাহির পূর্ণ করে দিচ্ছে।

তিন

ওমর শেখ মীর্জার দেহরক্ষী দলটিকে ইদানীং অধিক তৎপর মনে হয়। দলপ্রধান ওয়াজির খানকে মীর্জার সন্নিহনেই ঘোরাঘুরি করতে

দেখা যায়। মীর্জাকে যেন সে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

গত কয়েকদিনে বাবুর ওই রকমই দেখেছে। আখসিকাতের সকালগুলোও ইদানীং যেন অন্যরকমভাবে ফুটে ওঠে। সূর্য পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পূর্বেই বল্লমের ধার পরখ করে যায়। ফলে প্রভাত আসে রূপালি রঙের আধিক্য নিয়ে। বাবুর আন্দাজ করতে পারে বড় কোনো অঘটন হয়তো ঘটতে যাচ্ছে। আম্মিজানের মুখে আগের সেই হাসি আর নেই। স্নান মুখে হররোজই তিনি পূর্বের কাজগুলো করে যান। দুধ-পেস্তা-জাফরানের শরবতের ওপর বরফকুচি ছড়িয়ে দেন। ফজরের নামাজ অস্তে খামসা ও মসনবীর আসরও যেন পূর্বানুরূপ জমে উঠছে না। খামসা ও মসনবীর পরিবর্তে আব্বাজান আর আম্মিজান কী নিয়ে যেন বিস্তর কথাবার্তা বলেন।

আম্মিজান চিন্তিত মুখে আব্বাজানকে বলেন —

‘সুলতান মাহমুদ খাঁ বেমতি হওয়ায় কারণ কী হুজুরে আলা?’

বাবুরের সম্মুখে সবকিছু খোলাসা করে বলা না গেলেও মীর্জা উত্তর দেন —

‘বেগম, তেমন কিছু এখনো শুনি নাই। তবে গোপন সূত্রে জেনেছি তিনি সমরখন্দ গেছেন। সুলতান আহমদ মীর্জার সঙ্গে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে।’

আম্মিজান সন্তর্পণে ফিরোজা রঙের ওড়না টেনে কপাল অবধি ঢেকে দেন। হয়তো চোখের জল গোপন করার চেষ্টা করেন।

বাবুরের বয়স স্বল্প হলেও সে এই বয়সেই অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছে। আব্বাজান ও আম্মিজানের কথার সূত্র সে ধরতে পারে। সমরখন্দের রাজা সুলতান আহমদ মীর্জা আব্বাজানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যিনি আব্বাজানের ভ্রাতা এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মাতুল সুলতান মাহমুদ। তাঁরা উভয়েই নাকি সৈন্য অগ্রসরমাণ। ওমর শেখ মীর্জার চেহারা পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো। ওই বলিষ্ঠ চেহারা দেখে ভেতরের কোনো কিছুই কেউ অনুমান করতে পারে না।

বাবুর বুঝতে পারে, শত্রুর আসন্ন আক্রমণ নিয়ে আব্বাজান ও আম্মিজান দুজনই চিন্তিত। আম্মিজান প্রায়ই ওয়াজির খানকে গোপন নির্দেশ দেন, যাতে করে সে আব্বাজানকে ভালোমতন হেফাজত করে।

ওমর শেখ মীর্জাও ভীর্ণ নন। কাপুরুষ নন। যুদ্ধকে তিনি ভয়ও পান না। কিন্তু তাঁর লোকবল অল্প। অস্ত্রশস্ত্র আরো অল্প। তবু তিনি সাদা পতাকা তুলে আপস প্রস্তাব করতে চান না। তৈমুর লঙের রক্তধারা তাঁর শরীরেও প্রবহমান।

আখসিকেল্লার ছাদে মীর্জার সঙ্গে বাবুরের রোজই আলাপসলাপ হয়। সেই পুরনো গাঁও — তৈমুর লঙের বীরগাথা। বাবুর ইদানীং লক্ষ্য করেছে — আব্বাজানের কথাবার্তায় যেন পূর্বের সেই দম নেই। সেই চাঞ্চল্য নেই। কথা বলতে-বলতেই আব্বাজান যেন ফাঁপড়ে পড়ে যান। তাঁর দম যেন হঠাৎ আসা দমকা বাতাসে নিভে যায়। তখন ছাদে নীরবতা বিরাজ করে। গিরিবাজদের দানা খুঁটে খাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না।

গ্রীষ্মকালের এই বিকেলেও পায়রাদের বকম-বকম ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না। রোদ্দুর সবোমাত্র স্নান হতে শুরু করেছে। আর সৈলুন থেকে জলজ বাতাস ধেয়ে আসছে। বাবুরের চক্ষু আরামে বুজে আসতে চাইছে। কিন্তু আব্বাজানের কাণ্ডকারখানা দেখে সে চোখ মুদছিল না। আব্বাজান আজ যেন অন্যদিনের চাইতে পায়রাদের নিয়ে অধিক মগ্ন। পোড়ামাটির ওপর ইতোমধ্যে তিনি দুবার গমদানা ছিটিয়েছেন। আর দুধসাদা গিরিবাজের জোড়াকে দুই হাতে ধরে আসমানে উড়িয়ে দিয়েছেন। ঘণ্টা দুয়েক হলো, ওরা উড়ে গেছে। ওমর শেখ মীর্জা এখনো অপেক্ষমাণ ওদের অবতরণের। ফলে তিনি ঘনঘনই দৃষ্টি ফেলছেন ওপরে। গিরিবাজ দূরে থাক, কোনো পক্ষীর দেখাও মিলছে না। কিংবা কানে আসছে না কোনো

পাখসাট। মীর্জাকে আজ খুব অধৈর্য দেখাচ্ছে। দুই-চারবার আকাশে দৃকপাত করে তিনি চবুতরার দিকে এগিয়ে গেলেন। চবুতরাগুলো চোঙাকৃতি। গিরিখাদের দিকে আংশিক ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। মীর্জা চবুতরার ভেতরে উঁকি দিলেন। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা, দুধসাদা জোড়াটি হয়তো অলক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। এক্ষুনি পালক ফুলিয়ে উড়ে আসবে। আর বসবে মীর্জার হাতের ওপরে।

মাগরিবের ওয়াক্ত সমাসন্ন। বাবুর জানে, ওয়াক্তের নামাজ ওয়াক্তেই পড়ে নিতে হবে। কারণ নামাজ অস্তে জেনানামহল থেকে খাবারের ডাক আসবে। বাবুর তড়িঘড়ি করে ছাদের সিঁড়িতে পা রাখে। সেই মুহূর্তে কিছু একটা ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনে। বাবুরের পায়ের নিচের সিঁড়ি ভয়ালভাবে কেঁপে ওঠে। আর তার চোখে অন্ধকার নেমে আসে। যেন-বা ধূলিঝড়ের খপ্পরে পড়ে সে। সম্মুখের কিছুই দেখতে পায় না। তার চোখ বেয়ে শুধু দরদরিয়ে জলধারা নামে। কিন্তু কিছুই তার দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আকস্মিক অন্ধতা নিয়েও বাবুর দ্রুত চিন্তা করে — কেল্লার ছাদ কেন ওইভাবে কেঁপে উঠল? আর ওই প্রচণ্ড শব্দইবা কিসের? কী হলো হঠাৎ?

ধূলিঝড়-আক্রান্ত বাবুর হঠাৎ অনুভব করে, কে যেন তাকে দুই বাহু দিয়ে আড়াল করতে চাইছে। যে-ই চাইছে সে তার শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু কেন? কী ঘটল এক লহমায়?

‘শাহজাদা, আপনি এখন নিরাপদ।’

দেহরক্ষী ওয়াজির খানের পরিচিত কণ্ঠ। ধাই করে বাবুরের মনে পড়ে — শত্রুরা কি ইতোমধ্যে কেল্লা আক্রমণ করে ফেলেছে? আব্বাজান কোথায়?

ওয়াজির খানের হাতের বেষ্টনী থেকে বাবুর ছিটকে বেরিয়ে আসে। আব্বাজান? ওমর শেখ মীর্জা এই মুহূর্তে কোথায়?

কেল্লার ছাদ থেকে গিরিবাজদের চবুতরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেয়ালের ওই দিকটা শূন্য। বাবুর সাহস সঞ্চয় করে সৈলুন নদীর দিকে ঝুঁকে তাকায় — পায়রাদের বাসা, সেই চবুতরার ভাঙা অংশ স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু মীর্জার কোনো চিহ্নই ওই স্রোতের ওপর নেই। বাবুর ফের সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায়। পাথরের ফাটলে জন্ম নেওয়া ঝোপের ডালে আব্বাজানের পাগড়িটা ঝুলে আছে। ঝোপের ওপর কাত হয়ে থাকা পাগড়িটা দেখাচ্ছে লালচে-খয়েরি রঙের ফুলের মতো। চবুতরার সঙ্গে-সঙ্গে ওমর শেখ মীর্জাও কি আছড়ে পড়েছেন? বাবুর এর চাইতে বেশি ভাবতে পারে না। তার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যেতে চায়। ফের বাবুর গিরিফাঁদে উঁকি দেয়। জ্বলন্ত মশাল হাতে সৈনিকরা ইতোমধ্যে তালাশিতে নেমে পড়েছে। দূর থেকে মশালের আলো সোনালি ফুলের মতো দেখায়। যেন অন্ধকারের বুক চিরে সোনার ফুল ফুটে উঠেছে।

ভেতর থেকে তীব্র কান্নার দমক বাবুরকে অস্থির করে তোলে। তার মনে হয়, আকাশ-ফাটানো চিৎকার দিয়ে সে ডেকে ওঠে — ‘আব্বাজান’। কিন্তু বাবুরের কোনো ইচ্ছাই বাস্তবতা পায় না। বাবুর শাহজাদা। শাহজাদারা কখনো সাধারণ মানুষের মতো কোনো ইচ্ছা করতে পারে না। সাধারণ মানুষের মতো নিজের দুঃখ-বেদনা জানাতে পারে না। আবেগের অতি প্রকাশ রাজরক্তের ধর্ম নয়। ফলে বাবুর বুকের ভেতর কান্না লুকিয়ে ফেলে। নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় — ‘শাহজাদারা কোনো অবস্থাতেই ভুলে যাবে না যে, রাজরক্ত তার শরীরে বইছে।’

আখসিকাতের আকাশে আর কোনো আলোর চিহ্ন নেই। তীব্র অন্ধকার ঝাঁপিয়ে নামছে। হঠাৎ পাখসাটের শব্দে বাবুর চমকে ওঠে। আব্বাজানের উড়িয়ে দেওয়া দুধসাদা গিরিবাজ! ডানাদুটো প্রসারিত করে পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে। বাবুর অন্ধকারেও তাদের দেখার চেষ্টা করে। অত দূর থেকে পায়রাদুটোকে বরফশুভ্র বলের মতো দেখায়। □



স্মৃতি

আহমাদ মোস্তফা কামাল



মানেই, মায়ের স্পর্শ যেন লেগে আছে এখনো, এই ঘরে। মুনীর ঘুরে-ঘুরে দ্যাখে — যে-চেয়ারে মা বসতেন, যে-বিছানায় ঘুমাতে, সেগুলোতে আলতো করে হাত বুলায়, যেন মাকেই ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখছে সে, এভাবে। মায়ের তসবি, জায়নামাজ, পানের বাটা, রুমাল, তোয়ালে সব রয়ে গেছে তেমনই, যেমনভাবে তিনি রেখে গিয়েছিলেন। দেখে মনে হয়, মা গেছেন পাশের ঘরে, যেন এখনই এসে বলে উঠবেন — ‘তসবিটা দে তো বাবা, রাখি এক জায়গায়, চলে যায় অন্য জায়গায়। কে যে দুষ্টুমিটা করে!’
 ‘কে আর করবে! তোমার নাতি-নাতনিরা আছে না?’
 ‘আরে নাহ। ওরা আমাকে জ্বালায় না। এই বাসায় জিন-ভূত আছে।’
 ‘জিন-ভূত থাকলেও তোমার কাছে আসবে না মা। সারাদিন কী সব দোয়া-দরুদ পড়ো, ওরা তো ভয়েই পালাবে।’



অলংকরণ : তরুণ ঘোষ

জিন-ভূতের কথাটা কথার কথা। নাতি-নাতনিদের কাঁধ থেকে দোষ অন্য কোথাও চাপাতে হবে না? ওদের এতটুকু বকলেও মা রেগে যান, মন খারাপ করে থাকেন। মুনীর অথবা তার ভাইদের কেউ হয়তো বলে — ‘এত রাগ করো কেন, মা? আমরা তোমার বকা খেয়েছি না? মা-বাবা তো একটু বকেই।’ ‘দাদু হলে বুঝবি।’

একবাক্যে মায়ের বক্তব্য শেষ। হ্যাঁ, দাদা-দাদি না হলে হয়তো এই অবুঝ-অন্ধ-প্রশ্নহীন স্নেহের ব্যাপারটা বোঝা যায় না। তাদের দাদিও তো এরকম কত কাণ্ড করতেন! মা কিংবা বাবা ছেলেমেয়েদের একটু বকলেই দাদু কাঁদতে শুরু করতেন। শুধু কেঁদেই ক্ষান্ত হতেন না, এমনসব কথা বলতেন, যাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলিং ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেমন — ‘আসলে আমাকেই বকতে চায়, পারে না, তাই ছেলেমেয়েদের ওপর দিয়ে রাগ ঝাড়ে। বুড়ো হয়েছি, কাঁধে চেপে বসেছি, না পারে ফেলতে, না পারে রাখতে। গলার কাঁটা। না পারে গিলতে, না পারে উগরাতে। বস্তায় ভরে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে এলেই পারিস। টু শব্দটি করব না। কেউ টেরও পাবে না। লোকে মনে করবে আবর্জনার বস্তা ফেলে দিয়ে এলো...’

একা-একাই এসব ভয়ংকর কথা বলতেন দাদু। তখন কেউ আর কোনো কথা বলত না, বলার সাহসই পেত না আসলে। অথচ মা-বাবা কী যে যত্ন

মা যখন দাদি হলেন, তখন যেন ফিরে পেলেন নিজের শাশুড়ির রূপ। নাতি-নাতনিদের কেউ কিছু বললে আর রক্ষা নেই। এসব ব্যাপার কি ফিরে-ফিরে আসে? এই শর্তহীন মায়া-স্নেহ-ভালোবাসা?

করতেন তাঁর, এতটুকু অসুবিধা হতে দিতেন না। দাদুর অন্য কোনো অভিযোগও ছিল না এসব নিয়ে, কেবল নাতি-নাতনিদের কেউ বকলেই গুরু হয়ে যেত এসব বকবকানি। কেউ শুনলে নির্ঘাৎ ভাবত — তাঁকে কতই না কষ্টে রেখেছে তাঁর ছেলে আর ছেলের বউ। বাবা ফিসফিসিয়ে মাকে বলতেন — ‘মা তো আবার ক্ষেপেছে। থামাবে কে?’

‘তুমি থামাও।’

‘আমি পারব না। তুমি যাও।’

‘তা তো পারবেই না। রাগিয়েছ তুমি, এখন আমাকে কতগুলো বকা খেতে হবে।’

মা গিয়ে হয়তো বলতেন — ‘নামাজ পড়েছেন মা? ভাত খাওয়ার সময় হয়ে গেছে তো!’

‘আর খাওয়া! ভাতের বদলে বিষ দাও, খেয়ে মরি।’

‘ছি মা! এসব বললে লোকে কী ভাববে?’

‘কী আর ভাববে! তোমরা যা করছ, তাতে লোকের ভাবায় আর কী আসে যায়!’

‘আচ্ছা মা, ছেলেমেয়েরা দুষ্টমি করলে একটু না বকলে চলে?’

‘ওরা দুষ্টমি করে? কত্ত ভালো ওরা। কত্ত লক্ষ্মী।’

‘পড়াশোনা করতে চায় না...’

‘দরকার নাই পড়াশোনার। ওই অতটুকুন বাচ্চা, পড়াশোনার কী বোঝে?’

‘আচ্ছা ঠিক আছে মা, আর বকব না। এখন উঠুন তো! আপনি না খেলে তো ওরাও খাবে না!’

খাওয়ার টেবিলে একদল নাতি-নাতনি নিয়ে বসে দাদুর ভিন্ন চেহারা। একটু আগে যে এত কথা বলেছেন, তার চিহ্নমাত্র নেই। হাসি-হাসি মুখ, গালভরা গল্প!

আহা, সেসব নির্মল-নির্ভর দিন! এক স্বচ্ছ, এত উজ্জ্বল যে, মনে হয় সেসব স্মৃতিতে কখনো কোনো দাগ লাগেনি, ধুলোও জমেনি এতটুকু।

মা যখন দাদি হলেন, তখন যেন ফিরে পেলেন নিজের শাওড়ির রূপ। নাতি-নাতনিদের কেউ কিছু বললে আর রক্ষা নেই। এসব ব্যাপার কি ফিরে-ফিরে আসে? এই শর্তহীন মায়ী-স্নেহ-ভালোবাসা? কোথায় থাকে এগুলো? মায়ের স্মৃতিচিহ্নগুলো ছুঁয়ে দেখতে-দেখতে এরকম কত কথা যে মনে পড়ে মুনীরের!

অথচ কতদিন হয়ে গেল মা চলে গেছেন! কতগুলো দিন! তাঁর মৃত্যুর সময় মুনীর ছিল দেশের বাইরে। এক মাসের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে জার্মানিতে গিয়েছিল সে। তার অনেক আগে থেকেই মা অসুস্থ ছিলেন — প্রায় দুবছর ধরে শয্যাশায়ী। বহু চেষ্টাচরিত্র করেও আর সারিয়ে তোলা যায়নি। হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তাররা, বলেছিলেন — ‘বাসায় নিয়ে যান, যত্নআত্তি করেন, ছেলেমেয়ে-নাতি-নাতনি নিয়েই বরং ভালো থাকবেন তিনি।’ এমনকি, যে-ডাক্তার দীর্ঘকাল মায়ের চিকিৎসা করতেন, তিনিও এক-এক করে সব ওষুধ বন্ধ করে দিলেন। ওগুলো নাকি কোনো কাজই করছে না আর। বয়স হয়ে গিয়েছিল মায়ের। বার্ষিক্য নাকি এমন এক রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই, ডাক্তাররা কেবল চেষ্টা করেন জীবনের শেষ দিনগুলোতে মানুষটার যেন একটু কম কষ্ট হয়, সেটি নিশ্চিত করতে। তারা — মুনীর এবং তার ভাইবোনরা — এই অনিবার্য বাস্তবতাটিকে মেনেও নিতে গুরু করেছিল, যদিও এই মেনে নেওয়াটাই কঠিন ব্যাপার। এই পরিবারের কেন্দ্রে ছিলেন মা। মুনীররা তিন ভাই, দুই বোন। বোনদের বিয়ের পর দূরে চলে গেলেও ভাইরা রয়েছে একসঙ্গেই। আড়াইতলা এই বাড়িতে তিনজনের সংসার, আবার বোনরা আসে মাঝে-মাঝে, আসে আত্মীয়স্বজনও,

একটু চাপাচাপিই হয়। তিন ভাইয়ের সামর্থ্যও আছে এই পুরনো ধাঁচের বাড়িটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করার। সাড়ে তিন কাঠার প্লট, ছয়তলা বাড়ি সহজেই তোলা যাবে, নিচতলায় পার্কিংসহ অন্যান্য সুবিধাও রাখা যাবে। কিন্তু মায়ের অনুমোদন নেই তাতে। বাবা বহু কষ্ট করে এই বাড়িটা তুলেছেন, চারতলার ফাউন্ডেশন ছিল, দোতলা পর্যন্ত তুলতে পেরেছিলেন, হাউস বিল্ডিং থেকে নেওয়া ঋণের টাকা শেষ হয়ে যায় ওটুকু তুলতেই, পরে তিনতলায় কেবল একটা রুম তুলেছিলেন, আর পারেননি। আকস্মিক হার্টঅ্যাটাকে চলে গিয়েছিলেন তিনি। মায়ের ধারণা — বাড়ি করতে গিয়েই বাবার হার্টের অসুখটা হয়। এই বাড়ির প্রতিটি বিন্দুতে বাবার হাতের ছোঁয়া, বাবার রক্ত আর ঘাম মিশে আছে, মা সেটি নষ্ট করতে রাজি নন। চারতলার ফাউন্ডেশন তো দেওয়াই আছে, বাকি দুটো তলা তুলে নিলেই হয় — এই হলো মায়ের ইচ্ছা। এই বাড়ি তাদের অনেক দিয়েছে, এ-ও সত্য। বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর এই বাড়ির ভাড়াই ছিল পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। নিচতলায় তারা সবাই থাকত, দোতলা ভাড়া, তিনতলার রুমটার সঙ্গে একটা বারান্দা, একটা কিচেন, আরেকটা বাথরুম জুড়ে দিয়ে সেটাও ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এই সামান্য আয় দিয়ে কী কষ্ট করেই না মা সংসার চালিয়েছেন! ছেলেমেয়েরা বড় হতে লাগল, এক-এক করে পড়াশোনা শেষ করল সবাই, চাকরিতে ঢুকল আর সংসারের চেহারা আবার বদলাতে লাগল। মেয়েদের বিয়ে হলো, ছেলেদের বউ এলো ঘরে, তাদের ছেলেমেয়ে হলো, মায়ের ঘর হয়ে উঠল চাঁদের হাট। মা ওভাবেই বলতেন। ভাড়াটিয়াদের উঠিয়ে দিয়ে দোতলা আর তিলতলার চিলেকোঠায় ভাগাভাগি করে নিল বড় দুই ভাই, মুনীর রইল মায়ের সঙ্গে নিচতলায়।

পুরনো ধাঁচের এই বাড়িটিতে আরো টাকা ঢালার কোনো মানেই হয় না। বাবা যে বাড়িটা নিয়ে খুব বেশি পরিকল্পনা করেননি ডিজাইন দেখেই তা বোঝা যায়। কোনো আর্কিটেক্ট তো এরকম ডিজাইনের কথা ভাবতেই পারবেন না, একটু ভালো ডিজাইনাররাও এর চেয়ে ভালো চিন্তা করবেন। ছোট্ট প্লট, তার ওপর এলোমেলো ডিজাইনের ফলে জায়গা যেমন নষ্ট হয়েছে, আলো-বাতাসও তেমন একটা ঢোকে না। ফলে মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তারা যেমন নতুন করে তৈরি করার উদ্যোগ নেয়নি, তেমনই কোনোরকম সংস্কারের কথাও ভাবেনি। থাকুক যেমন আছে তেমনই। এরকম ভাবনা কি তাদের মনের মধ্যে ছিল যে, মা তো একসময় থাকবেন না, তখন নতুন করে ভাবা যাবে? কেউ কাউকে বলেনি সে-কথা, কিন্তু ছিল তো বটেই। মা থাকতেই যেহেতু এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, মায়ের অনুমতি আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে, সেই চিন্তাটা তো আর মরে যায়নি! কী নিষ্ঠুর একটা চিন্তা, তুমি বেঁচে আছো বলে আমরা তোমার এই আবেগের মূল্য দিচ্ছি, যখন থাকবে না তখন এই আবেগ খেলো হয়ে যাবে আমাদের কাছে! কথাটা ভাবলেই একটা অদ্ভুত অপরাধবোধ হয় মুনীরের। অবশ্য তার অপরাধবোধ আছে আরো অনেক বিষয় নিয়েও। মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার ফলে শেষের দিকে সে খানিকটা ক্লান্ত এবং হয়তো কিছুটা বিরক্তও হয়ে উঠেছিল। না, কাউকে বুঝতে দেয়নি মুনীর, মাকে তো নয়ই, কিন্তু সে নিজে জানে এ-কথা। প্রথম একটা বছর শুধু চেষ্টাই করে গেছে মাকে সুস্থ করে তোলার জন্য, তারা সবাই মিলে। যখন ডাক্তাররা একেবারে আশা-ভরসা ছেড়ে দিলেন, তখন থেকেই গুরু হলো এক অদ্ভুত অপেক্ষা। যেহেতু সুস্থ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই, অপেক্ষাটা তাই তাঁর চলে যাওয়ার জন্য। কী ভয়াবহ! না, মায়ের কোনো অযত্ন করেনি তারা, কখনো। ছেলেমেয়েরা তো বটেই, বউরা এবং নাতি-নাতনিরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে তাঁর শেষ সময়টিকে

আদর-যত্ন-মায়া ও ভালোবাসায় ভরে দিতে। কিন্তু এ-ও তো সত্যি, অনির্দিষ্ট কোনোকিছুর জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করা কঠিন। কেবলই মনে হতে থাকে, এর শেষ কোথায়? মায়ের পাশে কাউকে-না-কাউকে রাত জাগতে হয়, একা তো আর জেগে থাকা যায় না, অন্তত দুজনকে জাগতে হয়। অনির্দিষ্ট সময় ধরে এ-কাজটি করা এত সহজ ব্যাপার তো নয়! মাকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, আবার রেখেও যাওয়া যায় না। ফলে প্রায় সবারই বন্দিদশা। অফিস থেকে বাসা, বাসা থেকে অফিস — এই হলো বড়দের রুটিন। ছোটরাও স্কুল-কলেজে যায় বটে, কিন্তু অনেক দিন ধরে সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। শুধু কি তাই? সারাক্ষণ একটা টেনশন, একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকে — কারো কোনো আচরণে মা কষ্ট পাচ্ছেন না তো! কখন কী হয়ে যায়, সেই দুশ্চিন্তাও মনের মধ্যে জেঁকে বসে থাকে। কোনো কাজে মন বসে না, কোথাও স্থির হয়ে দুদণ্ড বসতে ভালো লাগে না, অফিসের কাজ এলোমেলো হয়ে যায়। হ্যাঁ, মুনীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এমন নয় যে, সারাক্ষণই ক্লান্ত থাকত সে, কিন্তু কখনো-কখনো খুব অবসাদগ্রস্ত মনে হতো নিজেকে। তো, ঠিক সেই সময়ে, ইউরোপে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য অফিস থেকে তার নাম প্রস্তাব করা হলে খুশি হওয়ার বদলে মুনীর খুব দ্বিধায় পড়ে যায়। ভেবে দেখার জন্য সময় চায় সে। মায়ের যে-অবস্থা তাতে যে-কোনো সময় যে-কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে, এ-অবস্থায় কি যাওয়া ঠিক হবে? যদি সত্যিই কিছু ঘটে যায় তাহলে নিজেকে তো সারাজীবনেও ক্ষমা করতে পারবে না। আবার এ-ও ভাবে যে, মায়ের অবস্থা অনেকদিন ধরেই ভালো না, এখন হয়তো একটু বেশি খারাপ, প্রায়ই স্মৃতিভ্রষ্ট হচ্ছেন, কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যাচ্ছে, তার মানে তো এই নয় যে, এখনই তিনি চলে যাচ্ছেন! এই অবস্থায় ইউরোপে ট্রেনিংয়ের এ-সুযোগটা কি ছাড়া ঠিক হবে? এমনিতেই অনেক সুযোগ সে হাতছাড়া করেছে, বারবার এরকম করলে একসময় কেউ আর তাকে নিয়ে ভাববে না। নিজে-নিজে ভেবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে মুনীর বউকে বলল ব্যাপারটা। কিন্তু সে-ও কোনো পরামর্শ দিতে পারল না। পরের দিন ভাইবোনদের সঙ্গে বসে আলাপ করল মুনীর। তারা একবাক্যে বলল, ‘যা ঘুরে আয়। এরকম সুযোগ বারবার আসে না। মাকে নিয়ে চিন্তা করিস না, আমরা সবাই তো আছি। আল্লাহ ভরসা।’

ভাইবোনদের সমর্থন পেয়েও ঠিক স্বস্তি পেল না মুনীর, এবার তাই অনুমতির জন্য মায়ের কাছে গিয়েই বসল। মা সব কথা বোঝেন কিনা বোঝা যায় না, তবু সে সবকিছু বলল। শুনে, মা দুবার জিজ্ঞেস করলেন — ‘কোথায় যাবি?’ সে দুবারই উত্তর দিলো। মা জানতে চাইলেন — ‘কবে আসবি?’ সে জানাল — ‘একমাস পর।’ ‘ও!’ বলে কতক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন — ‘আচ্ছা যা, তোকে আল্লাহর হেফাজতে আমানত দিলাম।’

মায়ের অনুমতি পেয়েও তার মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা গেল না। মনে হতে লাগল, মা তো এখন সবকিছু বোঝার অবস্থায় নেই, ছেলে যে একমাস তাঁর কাছে থাকবে না সেটি কি বুঝেও নেই অনুমতি দিয়েছেন? দ্বিধাভ্রষ্ট নিয়েই কয়েকদিন পর উড়াল দিলো মুনীর। সকালে ফ্লাইট ছিল, বাসা থেকে বেরোতে হলো ভোরে। মা তখন ঘুমাচ্ছিলেন, কয়েকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করে সে বেরোল। মা চলে গেলেন তার দু-সপ্তাহের মাথায়। মুনীরকে খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। একে তো ট্রেনিংয়ের ঠিক মাঝামাঝি সময়, তার ওপর আয়োজকদের ব্যবস্থাপনায় গিয়েছে বলে হঠাৎ করে ফিরে আসার সুযোগ তার ছিল না। মাকে শেষবারের মতো দেখতেও পারেনি সে।

ফিরে আসার পর সে উপলব্ধি করতে থাকে, মায়ের অনুপস্থিতিতে

তার জীবন কতটা শূন্যতায় ভরে গেছে। অসুস্থ ছিলেন, বিছানায় পড়ে ছিলেন, তবু তো ছিলেন। একদিকে ভয়াবহ এক শূন্যতার অনুভূতি, অন্যদিকে নিজের দিকে ফিরে তাকালেই অপরাধবোধ। সে যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, মাঝে-মাঝে বিরক্তি এসেও ভর করত, ট্রেনিংয়ে গিয়েছিল নিছক পেশার স্বার্থে নয়, বরং তার মনে হয়েছিল — আমার খানিকটা রিলিফ দরকার, এসব মনে হতে থাকে। মা কি কোনোভাবে তার ক্লান্তি, বিরক্তি, হাঁপিয়ে-ওঠা টের পেয়েছিলেন? সেজন্যই কি তার অনুপস্থিতিতে অভিমান নিয়ে চলে গেলেন? এসব অপরাধবোধ মুনীরকে কুরে-কুরে খায়। যন্ত্রণা আর মনের এসব বেয়াড়া প্রশ্ন থেকে মুক্তি মেলে না কিছুতেই, মায়ের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যই হয়তো-বা তাঁর ঘরটিকে সে অবিকল সেরকমই রেখে দেয়, যেমনটি তিনি রেখে গিয়েছিলেন। প্রতিদিন সেই ঘরে গিয়ে বসে সে, বিছানায় হাত বোলায়, মায়ের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দ্যাখে। যেন প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে সে তার অকথিত অপরাধের।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন? মা চলে যাওয়ার পর এই বাড়ি ভেঙে নতুন করে তোলার প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু চিরদিন যে চাপা পড়ে থাকবে না, এ তো জানা কথাই। সবারই সংসার বড় হয়েছে, ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের আলাদা রুম দরকার — এসব নানা প্রয়োজন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাছাড়া বোনদের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, তাদের তো আর কিছু নেই, এই বাড়িটাই নিজেরা মিলে নতুন ডিজাইনে তুললে অনায়াসে সবার জন্য দুটো করে অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে যাবে। সেটা সবার জন্যই ভালো, সেটা পাওয়ার অধিকারও আছে সবার। তাছাড়া, তাদের সবারই বয়স হয়ে যাচ্ছে; এসব কাজ করার জন্য এখনই তো উপযুক্ত সময়। সে সবই বোঝে, তবু মায়ের এই ঘরটি আর থাকবে না ভাবতেই বুক ভেঙে আসে।

মুনীর সবার ছোট বলে তাকে একটু বিশেষভাবেই স্নেহ করে ভাইবোনরা। তার এই স্মৃতি-পাহারা দেওয়া কর্মকাণ্ডে সবার সমর্থন না থাকলেও সহমর্মিতাটুকু তাই রয়েই গেছে। কিন্তু ওকে তো এই ভার চিরকাল বহন করতে দেওয়া যায় না! একদিন তাই ভাইবোনেরা বসে তাকে নিয়ে। গভীর মমতা মেখে বড় ভাই বলেন — ‘স্মৃতিকে এভাবে আঁকড়ে ধরতে নেই, খোকা। মানুষের মৃত্যু যেমন অমোঘ, ফেরানো যায় না, তেমনই স্মৃতির ওপর ধুলোর প্রলেপ পড়াটাও অমোঘ, ফেরানো যায় না। এই ধুলোটা পড়তে দিতে হয়। প্রকৃতি সেটাই চায়। নইলে তো মানুষ বাঁচতে পারত না। সব স্মৃতি জমা করে রাখলে স্মৃতির পাহাড় জমে যেত আর তার নিচে চাপা পড়ে মরে যেত মানুষ। প্রকৃতিই মানুষকে ভুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে রাখে। আমরা সবাই তোর কষ্টটা বুঝি, আমাদেরও কষ্ট লাগে, তবু আমরা চাই — তুই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আয়।’

হ্যাঁ, সে জানে। জানে যে, স্মৃতির পাহাড় জমাতে নেই। জানে যে, মানুষের ‘ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা পর্বতসমান হওয়া চাই।’ কিন্তু এ-ও জানে, মানুষ একটু-একটু করে স্মৃতি ভুলতে থাকে আর একটু-একটু করে মরে যেতে থাকে। স্মৃতিহীনতা মৃত্যুরই আরেক নাম। সে তাই বড় যত্ন করে স্মৃতিকে। যদিও সে জানে না, স্মৃতি আসলে কোথায় থাকে! মনে, নাকি বস্ত্রসামগ্রীতে? জানে না, কেন সে মায়ের স্পর্শধন্য জিনিসগুলোকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে! সে কি তবে বস্ত্রর মধ্যেই স্মৃতিকে খোঁজে? নিজের মনের ওপর আস্থা নেই তার? বস্ত্রগুলো হারিয়ে গেলে কি তবে মায়ের স্মৃতিগুলোও মুছে যাবে তার মন থেকে? না, সে জানে না এসব প্রশ্নের উত্তর। এসব ভয়ংকর প্রশ্নের সামনে নিজেকে দাঁড় করাতেও ভীষণ ভয় লাগে তার, ভীষণ ভয়। □



অন্তর্লীন

প্রশান্ত মৃধা



দশার মন্ত্রের পরে ছেলে এই ঘরে এলো। মুণ্ডিত মস্তক, এভাবে শরৎচন্দ্রের কোনো একটা চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছিলেন স্কুলের পণ্ডিত মশাই। এখন তার ছেলের তাই, মাথা কামানো, ন্যাড়া। মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে কেশ বিসর্জন। অশৌচ পালনের এই শেষ দিন।

পাশ্চ অপর্যাপ্ত পুলকেশের সামনে এসে দাঁড়ায়নি। নিজের কোনো প্রয়োজনে এসেছে। ফরসা গায়ে আটহাতি খাটো ধুতি-পরা ছেলেকে এ-সময় তার অচেনা লাগে! অথচ, অচেনা লাগার কোনো কারণ নেই। সুস্থ-সবল অরুণিমা দেখতে-দেখতে বিছানপড়তা হওয়ার পরে এই ছেলেই তো এই দুটো বছর মাকে টেনেছে। ডাক্তার বলো, হাসপাতাল বলো, এমনকি কবিরাজ বলো কি বদ্যি বলো আর যদি বলো সাধু-ওঝা, পির-ফকিরের ঝাড়ফুক সর্বত্রই সামলেছে পাশ্চ!

পুলকেশ কখনো হাত-পা গুটানো মানুষ নন, কিন্তু ছেলের তৎপরতায় তার প্রায় করতে হয়নি



অলংকরণ : ঢালী আল মামুন

কিছু। বরং, পাশুর তৎপরতায় পুলকেশ ভেবেছে, সত্যি অরুণিমা গত জনমে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছিল, তাই এই জনমে এমন ছেলে পেয়েছে। এই কথা অবশ্য পুলকেশ একলাই ভাবত না, জ্ঞাতিগুপ্তির মানুষজন, আত্মীয়স্বজন সবাই বলত। এমনকি সদর হাসপাতালের বড়ো ডাক্তারসাহেব একদিন তাকে বলেছিলেন, 'পুলকেশবাবু, আপনার বড়ো ছেলে প্রণবশ দারুণ কাজের! ওর মায়ের দিকে যা খেয়াল!' প্রণবশ পাশুর কাগজপত্রের নাম। আর সে পুলকেশের বড়ো ছেলে নয়, ছোট ছেলে। বড়ো ছেলে অরুণেশ। অরুণিমার থেকে অরুণেশ, পুলকেশ থেকে প্রণবশ। বড়োজনের নাম মায়ের নামের কাছাকাছি, ছোটজনেরটা বাপের নামের। একসময়ে অরুণিমা আর পুলকেশ ভাবতও তাই, বড়োজন অরুণিমার ছেলে, ছোটজন পুলকেশের। কিন্তু আজ মায়ের এই মন্তব্যের সময়ে, কি মায়ের শেষযাত্রায় সেই ছেলেটা উপস্থিত থাকতে পারল না। সেসব সামলাল এই পাশু! অবশ্য এই নিয়ে অরুণেশের করারও তো কিছু নেই। ছোটবেলায় তাকে নিয়ে গেছে অরুণিমার ছোটদা, ইন্ডিয়ায়। তখন তো ভেবেছিল, একসময় তারাও চলে যাবে। কিন্তু আজ যাই, কাল যাই, আজ প্রণবশের বাবা অসুস্থ, কাল মা; প্রণবশ বড়ো ছেলে, পৈতৃক বাড়ি, ঘরদোর, এই জায়গাজমি রেখে যাওয়া হয়নি। তখন ভেবেছে, পাশু আর একটু বড়ো হলে পাঠিয়ে দেবে। ভেবেছে, একটা গেছে, আর এই একটা আছে চোখের সামনে, এটা গেলে আর থাকল কী? তাছাড়া পুলকেশের মা কোনোভাবে ছোট নাটিকে হাতছাড়া করতে চায়নি। তখন পুলকেশের বাবা মারা গেছে, তার

যেটা কখনো ঘটে না, তা-ই
পাশুকে বলেছিল অরুণিমা,
অরুণের ভাত তার সামনে
দিতে। অরুণ খাবে, সে
দেখবে। তবু নিজহাতে রান্না
করে ছেলেকে খাওয়াতে না
পারার আফসোস অরুণিমার
কোনোদিনও যায়নি।

মায়ের চোখের সামনে এই পাশ্চ। ফলে মায়ের অমতে তাকে ওদেশে পাঠানোর কথা আর ভাবতে পারেনি তারা।

এদিকে তখন মাকে নিয়ে আর অরুণিমা ও পাশ্চসহ যে পুলকেশ ওদেশে চলে যাবে, সে-সুযোগও তখন আর নেই। পাশ্চ হওয়ার পরপরই অরুণিমা গার্লস স্কুলে স্থায়ী চাকরি পায়। ছেলের বউয়ের এত গুণে পুলকেশের মা বলত, সোনার পিঁপ্টিমা বউ আমার!

একথা পুলকেশের মা কেন, প্রতিবেশী আর আত্মীয়দের কেউ-কেউও বলত। অরুণ হওয়ার সময়েও অরুণিমা বেশ রোগা; কিন্তু উজ্জ্বল ফরসা গায়ের রং আর বড়ো দুটো চোখ ও খাড়া নাকটার জন্যে সহজেই চোখে পড়ত। কিন্তু সোনার প্রতিমা নিশ্চিত কেউ বলত না। এমনকি রং করে পুলকেশের ভাইয়েরা কেউ একবারও রেখা কিংবা শ্রীদেবীও বলত না। বড়জোর শাবানা বলতে পারত। গ্রামে তখন সবে ভিসিআর ঢুকেছে, কেউ-কেউ ইন্ডিয়ায় গেলে হিন্দি ‘বই’ দেখে এসে নায়িকাদের নানান ছলাকলার গল্প বলত, দেওর-ননদদের সেই গল্পে পুলকেশের মায়ের এই সোনার পিঁপ্টিমা পুত্রের বউয়ের চেহারা নিয়ে কোনো প্রকার উচ্ছ্বাসের কথা মনে পড়ে না পুলকেশের।

কিন্তু সেই পাশ্চ পেটে এলে, ধীরে শরীর ভারি হলো অরুণিমার, একটু মোটাও হলো, কোটরে ডুবে থাকা চোখদুটো একটু ভেসে উঠল, মুখখানা আরো ভরে গেল, তখন সেই আশ্বিন মাসে অরুণিমার দিকে তাকিয়ে পড়লে, কুচিবগার বারোয়ারি কোলার দুর্গাপ্রতিমার থেকে চোখ ফেরানো গেলেও অরুণিমার থেকে নজর সরাতে পারত না পুলকেশ। আর তখনই তার ডিগ্রি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে পাশ করবে একথা ভাবেনি কেউ। অরুণকে টেনেটুনে, পেলেপুষে কখনো শাওড়ির কাছে দিয়ে যতটুকু পড়াশোনা, তবু এর ভেতরে, পুলকেশ বলত, ‘দেও, যা হয় হবে, আর নয় সামনের বার!’ তাতেও অরুণিমা প্রায়শ কোনো খেদ প্রকাশ করত না, যেন শাওড়ি না-শোনে এমন চাপা গলায় বলত, ‘এহোন একজন, সামনের বার দুইজন, ‘মোশায় কতা যে এক একটা কও কোনো হিসাব থাকে!’ পুলকেশের মুখজোড়া হাসি, পানের রসে ঠোঁট রাঙানো। সেই হাসিতে যেন আরো খেপে উঠত অরুণিমা, ‘যাও এহোন দে, সামনে যাও, পড়তি দেও। ছওয়ালডা ঘুমতিচে, এই সুযোগে এট্টু রিভাইজ দিয়েনি। ওনার আছে খালি হাস। হাইসে দুনিয়া উদ্ধার... বাদানোর সময় কোনো খেয়াল থাকে না?’ এও নিচু গলায়। সন্তানসন্ততি শত সাধনার ধন। শাওড়ি শুনলে গলা উঁচু করে ঝাড়বে। মানুষ শতচেষ্টায়ও পায় না। দেবতার কাছে দুচোখের জল ছেড়ে কাঁদে কতজন তবু মেলে না, যদি একদিন যেত সে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি কি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে, তাহলে দেখতে পারত কী অবস্থা!

কিন্তু অরুণিমার ওই নিচুগলার কথায় কি আর পুলকেশের হাসি থামে। হাসির আরেক কারণ, অরুণিমার দিক থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না। তবু, এই কথায় একটা অন্তত সান্ত্বনা দেওয়া লাগে, অন্তত বোঝানো লাগে, তারও বোধ-বিবেচনা কিছু আছে। শুধু হেসে আর টরে সিটের পাতলা ফিনফিনে জামা বানিয়ে, তাতে আচ্ছাসে ত্রিচ ফেলে গায়ে দিয়ে ঘুরে সে জীবন পার করেছে না। বরং, বউয়ের যাতে ভালো হয়, সে যেন লেখাপড়াটা ঠিকঠাক মতন করতে পারে, সেদিকেও কিছু বিবেচনা তার আছে। তাই, অমন মুহূর্তে দ্বাদশীর চাঁদের মতন প্রায় গোল হয়ে আসা অরুণিমার মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘রেডিয়ো সারাদিন কানের ধারে কয় — ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তান যথেষ্ট! আমাগো এই দুইজনেই সই! কী কও!’ এবার অরুণিমার অস্ফুট হাসির পালা, ‘হইচে এহোন যাও। পড়তি দেও। মা শুনলি ছাড়াইয়ে দেবেনে তোমার ফেমিলি প্লানিং!’

সেকেড ক্লাস পেয়ে ডিগ্রি পাশ করল অরুণিমা। তার কিছুদিন আগে জন্ম পাশ্চর। আর সেবার দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিয়ে পাল-ভাস্কর কালীপ্রতিমা গড়তে না গড়তে এই ঘটনা ঘটায় পুলকেশের মা তো বলতেই পারে, বউ তাদের সোনার পিঁপ্টিমা! তা সত্যি! সে-ই সোনায়ে সোহাগা হয়ে দেখা দিলো আরো কিছুদিন বাদে। যখন স্থানীয় গার্লস স্কুলে চাকরি হয়ে গেল অরুণিমার! আসলে, পুলকেশের মনে

হতো, এখনো মনে হয়, দারুণ মাথাশক্তি ছিল অরুণিমার। অরুণেশ মায়ের এই গুণটা পেয়েছে ষোলো আনা। ওদেশে একলা থাকল। একলা বলতে সেই ছোটবেলার পর আর বাপ-মায়ের কাছে থাকল কদিন। সেখানে স্কুল ফাইনালে ফাস্ট ডিভিশন, হায়ার সেকেন্ডারিতেও তাই, তারপর কোথায় কটকে না কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ল, এখন ব্যাপালুরুর ওদিকে চাকরি করে। ওই মাথাশক্তির জন্যেই ছেলেটা সারাটা জীবন কোন দূর-দূর দেশে থাকল। একবার আসল বিছানপড়তা মাকে দেখতে। তাও মাত্র কয়দিনের জন্যে। তারপর যাওয়ার সময় বুঝে গেল, আর কোনোদিন হয়তো তার আর মাকে দেখা হবে না। তখনো অরুণিমা উঠতে পারে, উঠে বসে দুটো ভালো-মন্দ কথা কইতে পারে। সেই অরুণেশ থাকার দিনগুলোতে কতবার উঠতে চেষ্টা করেছে ছেলেকে নারকেলপাতায় চিংড়ির বড়া খাওয়াবে। শেষবার ইন্ডিয়ায় যাওয়ার আগে অরুণেশ নাকি বলেছিল চিংড়ির বড়া রান্না করতে। সে-দৃশ্য আজো চোখে ভাসে অরুণিমার। কাঁঠালি চিংড়ির বড়া তার সামনে খাইছে ছেলে। এবার তার শরীরে সেই শক্তি নেই। এখন আছে সে-বাবদ চোখের জল ফেলানো। চোখের জল ছেড়ে দিয়ে পাশ্চর সামনে সে-কথা বলেছে অরুণিমা। চাপা নিচু স্বরে, যেন কোনোভাবেই অরুণেশ না শোনে। ইঞ্জিনিয়ার ছেলের বিবেচনাবোধ সম্পর্কে ভালোই ধারণা অরুণিমার। শুধু অরুণিমার কেন, পুলকেশেরও। জানত, যদি বড়ো ছেলে শুনতে পায় তাহলে আর রক্ষা নেই। কী বলবে তাও জানা আছে তাদের। সে কি ওই পাতায় ভাজা মাছ খাওয়ার জন্যে এতদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে? এসেছে মাকে দেখতে। সেখানে তার এই সবই অর্থহীন!

যদিও পাশ্চ থাকতে এই বিষয়ে কোনো চিন্তা তাদের করা সত্যি অপ্রয়োজনীয়। সে-কথা অরুণিমাকে নিচুগলায় বলেছিল ছেলেটা। শুধু পুলকেশ যেন হাট বা বাগেরহাট বাজার থেকে এনে দেয় কাঁঠালি চিংড়ি, তাহলেই কীভাবে মায়ের মতো করে রান্না করতে হয়, তা তার ভালোই জানা আছে। ঘটেছিল তাই। মোটামুটি সাইজের, পেটে তেমন ডিম নেই কিছু কাঁঠালি চিংড়ি জোগাড় করেছিল পুলকেশ। পাশ্চ রান্নায় ওস্তাদ। তারা জানত, ও ছেলে পারবে। সে একেবারে অরুণিমার মতো করেই রান্না করেছিল। কিন্তু মায়ের মন, নিজে রান্না করতে পারল না। তবু যেটা কখনো ঘটে না, তা-ই পাশ্চকে বলেছিল অরুণিমা, অরুণের ভাত তার সামনে দিতে। অরুণ খাবে, সে দেখবে। তবু নিজহাতে রান্না করে ছেলেকে খাওয়াতে না পারার আফসোস অরুণিমার কোনোদিনও যায়নি। চোখের জল ছেড়ে দিয়ে এরপরও ওই গান গোয়েছে। তখন সেই দৃশ্য পুলকেশের কাছে যেন মা দুর্গার চোখে জল!

কিন্তু অরুণিমার যাওয়ার দিনটা যদি ছেলেটা থাকত। কী করা, থাকবে কীভাবে। তবু বড়ো ছেলে। পুলকেশের আফসোস যায় না কোনোভাবে। কিন্তু তাঁর আগে, এ সবকিছুর আগে তার মনে হয়, অরুণিমার যাওয়া লাগল কী জন্যে। একটা ছেলেরও বউ দেখে দেখে যেতে পারল না। কত ইচ্ছা ছিল, তারা তিনজন মিলে যাবে ওদেশে অরুণেশের বিয়ের সময়। অরুণিমার ছোটদাকে বলেছিল মেয়ে দেখতে। আগে তো চিঠি চালাচালি ছিল, আজকাল সব ফোনে, বিছানপড়তা অবস্থায়ও কতদিন অরুণিমা তার ছোটদার সঙ্গে কথা বলেছে। তখনো কি পুলকেশ জানত, এসব কথা শুধু কথার কথাই হয়ে থাকবে, অরুণিমা দেখে যেতে পারবে না কিছুই। এমন রোগে পড়েছে যার চিকিৎসা নেই। ধীরে-ধীরে শুকিয়ে একদিন বিছানার সঙ্গে মিশে সোজা খালকূলে শ্মশানে গিয়ে উঠবে!

পাশ্চ সামনে থেকে সরে গেল, পুলকেশের মনে হয়, একবার গিয়ে দেখে, ছেলে কেন এখানে হঠাৎ এসেছিল। তারপর কী মনে করে গেল না। বসে থাকল এই ভেতরের ঘরের খাটে পা ঝুলিয়ে। অরুণিমার আজ পর্যন্ত সব কাজ ঠিকঠাকমতো হয়েছে। পাশ্চ কোনো কিছুই বাকি রাখেনি। আজকে আত্মীয়-বান্ধব-প্রতিবেশীসহ জ্ঞাতিগুপ্তির লোকজন যারা আসবে, তাদের চিড়ে-কলা-দই খাওয়ানোও ছেলে কোন ফাঁকে তদারকি করেছে। পুলকেশের কাছে বসা তার দুই মামাতো-পিসাতো

ভাইকে এসে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে গেছে, তারা চা খাবে কিনা! তারপর আবার চলে গেছে। একটু বাদে এসে এই ঘর থেকে পেছনে-লাগোয়া রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে তারপর এসে জানতে চেয়েছে, কে কে চায়ে চিনি খাবে, কে খাবে না, আর পুলকেশকে এখন আবার চা দেবে কি না। পুলকেশ বোঝে, ছেলে চায় বাপ তার ভাইদের সঙ্গে আলাপে-আড্ডায় থাকুক। তাতে অন্তত একটু চাপা থাকবে। কিন্তু পুলকেশ জানে, বোঝে সে যথেষ্টই চাপা আছে। মৃত্যুর মতো সত্য এই দুনিয়ায় আর নেই। ‘জন্মিলে মরিতে হইবে, অমর কে কোথা কবে?’ কবির এই অমর বাণী তার জানা। ভাগবৎ পাঠের আসরে কিংবা গীতার দুই-একটা অধ্যায় পাঠ তো তার শোনা আছে। সেই মৃত্যুর অঙ্ককারে লীন হয়ে গেছে তার অরুণিমা। এ তো বাস্তব সত্য। তিলে-তিলে সেই মৃত্যু। প্রতিদিন একটু-একটু করে এগিয়ে যাওয়া। সে-কথা কলকাতার ডাক্তার ফিরিয়ে দেওয়ার পর, সে আর তার দুই ছেলে অরুণেশ আর প্রণবশের কাছে চরম সত্য হয়ে উঠেছিল। তারা জানত, এই দিন আসবে। পৃথিবী থাকবে পৃথিবীর মতো, এই দুনিয়াদারিতে প্রতিদিন সূর্য ওঠে, সেভাবেই উঠবে তার পরের দিন, এমনকি সে যখন থাকবে না, সেদিনও। সেই দিনটির দিকে অরুণিমার প্রতিটি দিন একটু-একটু করে এগিয়ে যাওয়া তো তাদের মনে নেওয়া। তার মনে নেওয়া, পাশুর মনে নেওয়া, গুপ্তির লোকজনের প্রস্তুতি নেওয়া। এমনকি বড়োসড়ো মানুষটা শুকিয়ে প্রায় কাঠ হয়ে যাওয়ায় তার ভাইপোরা কেউ-কেউ অরুণিমাকে পোড়াতে কোন আমগাছটা কাটতে হবে, তাতে তাদের খুড়ি বা জেটি ঠিকঠাক পড়বে কি-না, তা নিয়েও হিসাব করেছে। সে হিসাবে এই মৃত্যু তো কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।

কিন্তু কোথেকে পুলকেশের মনে উড়ে আসে সেই কথা, মৃত্যু যত দ্রুতই হোক, তাদের পূর্বপ্রস্তুতির অংশই হোক, তবু আকস্মিক হওয়াই যেন ছিল ভালো। তাহলে যে অরুণিমা থাকত তার চোখের সামনে, সে সেই প্রতিমা! তা না, ধীরে-ধীরে মানুষ ক্ষয়ে গেল, তাকে অসহায় করে দিয়ে গেল, নিঃশ্ব করে দিয়ে গেল, ছেলেটাকে দুই বছর ভোগাল, পাশ করার পর কোথাও চাকরির জন্যে চেষ্টা করতে পারেনি। না পারুক, জোয়ান ছেলে, জলেখালে পড়ার কোনো কারণ নেই, তা দেখে গেছে। কিন্তু তাদের সামনে থেকে যে-মানুষটা চলে গেল, সে-মানুষটাকে তো কোনোভাবেই মনে রাখতে চায়নি পুলকেশ!

চায়ে ছোট্ট চুমুক দিয়ে পুলকেশের মামাতো ভাই ধনঞ্জয় বলে, ‘বোঝাল না বড়দা, তোমার এই ছোড়ো ছ’লডার গুণের কোনো অন্ত নেই —’

‘হয় ভাইডি। ও ছেলো বইলেই বাঁচি রইচি —’

পুলকেশের কথা শেষ হওয়ার আগে ধনঞ্জয় রান্নাঘরের দিকে হাঁক দেয়, ‘রান্নাঘরে কারে টের পায়, এটু চিনি নিয়ে আয়?’

সেখানে পাশ্চ ছিল। সে জানতে চায়, ‘ও কা, কী লাগবে?’

‘এটু চিনি দে। চা বানাইচো ফাইন, কিন্তু বাবিচিস আমি মনে হয় তোর বাবার মতন চিনি কোম খাই —’

পাশ্চ একটা চামচে চিনি আনতে-আনতে বলে, ‘র-চার আবার ভালো মন্দ কী কাকা? এয়া বানালিই হয়।’

ধনঞ্জয় বলে, ‘হয়, সবাই পারে নিকি? আমারে দিয়ে সারাজীবনেও হলো না। আমি বানালি হয় পানসে হবে আর নয় কড়া।’

পুলকেশ ধনঞ্জয়ের সঙ্গে পাশ্চর আলাপ শোনে। তার ডান দিকে চেয়ারে বসা পিসতুতো ভাই নিখিলের চুপচাপ বসে থাকা দেখে। পাশ্চ একবার নিখিলের দিকে তাকিয়েছে, তার চিনি কম বেশি হয়েছে কি-না, সেই ইঙ্গিত করে। আর এর ভেতরে থেকেও পুলকেশ যে এই চা খেতে-খেতে পুরো ঘটনার বাইরে চলে গেছে, তা বোঝা যায়, যখন এই একই সময়ে পাশ্চ, ধনঞ্জয় আর নিখিল কথা বলছে, কিন্তু পুলকেশ যেন এর ভেতরে নেই। অথবা, আছে কিন্তু এই মুহূর্তে সে এখান থেকে সরে গেছিল। যদিও তাই মুহূর্তে হয়তো স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক। পুলকেশ জানে না।

যেমন, এইমাত্র ধনঞ্জয় অজ্ঞাতে পুলকেশকে সেখানে নিয়ে গেল। অথবা, ধনঞ্জয় তো এর কিছুই জানে না, এটা তার পিসিবাড়ি, এখানে সে কদিনই-বা এসেছে। যদি জানত, এই যে ধনঞ্জয় যেমন চায়ে চিনি চাইল, এমন হয়েছে এই বাড়িতে চা ঢোকার পরে, এমন রংচায়ে পুলকেশের বাবা চুমুক দিয়ে অরুণিমার উদ্দেশে হাঁক দিত, ‘কী রায়ের ঝি, তোমার বাবার বাড়ির দেশে চিনিটিনি কোম নাকি?’

পুলকেশের বাবার এই রায়ের ঝি ডাকটার অর্থ হলো, আবদার। তখন তার স্নেহ ঝরে পড়ছে। একই কথা বলত, ‘চা বানাইচো ফাইন, খালি এটু চিনি কম!’ অরুণিমা একটা চা-চামচে চিনি নিয়ে শ্বশুরের দিকে এগিয়ে আসত। যদি এমন আবদারের প্রসঙ্গ না আসত তাহলে পুলকেশের বাবা অরুণিমাকে বউমা ডাকত। এই আবদারের কারণও ওই, পুলকেশের বাবা চায়ে বেশি চিনি পছন্দ করত, আর অরুণিমা চাইত শ্বশুরের চায়ের কাপে চিনি কম দিতে।

এখন একমাত্র পুলকেশ ছাড়া বাকি সবার অজ্ঞাতে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কেউ জানল, তাতে পুলকেশ এই জায়গা থেকে সরে পুরো ঘটনায় আবার অরুণিমার কাছে পৌঁছে গেল। ওদিকে পাশ্চ এই পেছনের ঘর থেকে মাঝখানের বড়ো ঘর, তারপর সামনের বারান্দা হয়ে উঠানের দিকে গেলে, ধনঞ্জয় বলে, ‘বড়দা, তুমি কথার মাঝখানে কোতায় হারাইয়ে যাও?’

এ-কথায় চট করে এখানে ফেরেনি পুলকেশ, এমনিতেই সে এখানেই ছিল। যদিও কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না, সে এখানেই ছিল, এই সমস্ত কিছুর ভেতরেই, আবার এখান থেকে হঠাৎ একটু বাইরে অন্যত্র, অরুণিমার কাছাকাছি অথবা অরুণিমাকে নিয়ে ভাবনায় অন্যত্র চলে গিয়েছিল। এটা কি অন্যত্র যাওয়া বলে? হারিয়ে যাওয়া মোটেও নয়। সব কথাই শুনছিল সে। তাছাড়া, এই বিষয়ে এখন আর অত শোকতাপ নেই তার। এক প্রকার আয়োজনের ভেতর দিয়েই চলে গেছে অরুণিমা। দিনে-দিনে তিলে-তিলে, তাদের প্রত্যেককে তৈরি করে, তারপরে। এমনকি পাশ্চর কাছ থেকে বিদায়ও নিয়ে, নিজের কাছে বসিয়ে অরুণেশকে ভাত খাইয়ে, যদিও সেই ভাত-মাছ কোনোটাই তার রান্না করা নয়, তবু অমন আনন্দের চোখে কেনোদিন অরুণেশের খাওয়ার দিকে সত্যি তাকায়নি অরুণিমা। সেই দৃশ্যটা কেন যে বারবার চোখে ভাসে পুলকেশের, সে জানে না। ছেলেটা আজ ব্যাঙ্গালুরুতে কী করছে? দশার মন্ত্র পড়েছে তো? একবার ভেবেছে পাশ্চকে ফোন করতে বলবে। পাশ্চ ফোন করলে অরুণ কেটে দিয়ে ব্যাক করবে। তখন জানতে চাইবে। সবকিছু ঠিকঠাক করেছে কি-না। শুনেছে ওখানে খুঁজলে বাঙালি পাবে। আবার এও ভেবেছে, না, এসব কিছুই সে ছেলের কাছে জানতে চাইবে না। শুধু শুনে ভালো আছে তো। আহা, মা মরা দুটো ভাই। একজনের সামনে তবু বাপ আছে, অন্যজন কোন বিদেশবিড়িয়ে কোন রাজ্যে!

এ-মুহূর্তে অরুণেশ কেমন আছে, কোথায় আছে, কী করছে, এই সমস্ত যে ভাবল, তাতেও পুলকেশ আর তার বড়ো ছেলের মাঝখানে অরুণিমা উপস্থিত। অজ্ঞাতে সেখান থেকে সরে আসতে পুলকেশ ধনঞ্জয় আর নিখিলের কথায় ফেরে। ধনঞ্জয় যে জানতে চেয়েছে, সে-কথার মাঝখানে কোথায় হারায়, তার উত্তরে বলে, ‘হারাব কোথায়? তোগো সামনে বইসে রইচি। সে-জায়গাদে আর গেলাম কোথায়?’

নিখিল চকিতে পুলকেশের মুখের দিকে তাকায়। বাইরে রোদ, পেছনের গাছের পাতায় রোদের ঝিলিক, সেই আলোর ঝলকানি এই ঘরে কিছুটা হলেও ঢোকে। আর, তাতে এই কথাটা বলা মাত্র এমন তীব্র আলোয় পুলকেশের খুব ফরসা মুখখানা বিষাদে ভরে গেল। নিখিল তা ভাবে না। একবারই তাকিয়ে তারপর অপেক্ষা করে এরপর পুলকেশ আর কিছু বলে কি-না। কিন্তু ধনঞ্জয় বড়ো বেশি কথা বলে। কোনো কথা মাটিতে ফেলতে দেয় না। প্রতিটি কথার পিঠেই নিজের কথা বলে সে। যেমন এইমাত্র পুলকেশের গলার

হতাশা আর মুখের বিষাদ কোনো কিছুই সে লক্ষ করেনি। নইলে বলে, 'কোতায় হারাও সে তুমিই জানো। আগে তোমার ধারে বসলি একলা মাতাইয়ে রাখতা সারাবাড়ি।'

নিখিলের মনে হয়, এ-কথায় হয়তো পুলকেশকে একটু অন্যদিকে ফেরানো যাবে। সে বলে, 'হয়, ধনঞ্জয়দা কইচে ঠিকই, আপনি পান এট্টা-এট্টা মুখে দেতেন, আর এডা-ওডা কতো কিছু নিয়ে গল্প করতেন।'

'আর কইস না ভাইডি', পুলকেশ জানায়, 'সেইয়ে নিয়ে তোর বউদি কি আমারে কোমদিন কথা শুনাইচে। কইত, 'বাপ ঘরে দুইটে ভাত থুইয়ে গেইচে, সেই জনি এইরাম ফুলো কথা কইয়ে জীবন কাটাইয়ে দিতি পারলাম!' 'ক' ভাইডি, এই কথা আমারে কওয়া যায়, আমি নাকি কিছু করতাম না?'

আবারো পুলকেশের কথায় অরুণিমা। কিন্তু পুলকেশ অরুণিমার ওই উম্মার কথাটা এমনভাবে বলল, তাতে নিখিল বা ধনঞ্জয় না হেসে পারল না। এমনকি এর সঙ্গে সে আরো জানায়, 'কতা তো কইত গলা নিচে রাইখে, কিন্তু সেইয়ের মদি ঠায়াস দিতি ছাড়ত না।'

ধনঞ্জয় গলা তুলে হাসে। নিখিল এদের চেয়ে বয়সে বেশ ছোট। ধনঞ্জয়ের এমন হাসির কারণ ঠিক বুঝতে পারে না। ধনঞ্জয়ের হাসিতে জোগাল দিয়েছে পুলকেশও। যদিও তা মুহূর্তমাত্র। সেখানে এখন বিষাদ ধরা না পড়লেও, ওই কথার বাকিটুকু আছে, 'একদিন কয়, আমারে কও মা দুগ্গার মতন দশখান হাত, সেই উছলায় নিজেরে মনে ভোলানাথ শিবঠাকুর ভাবো, না?'

এই বলে হাসে পুলকেশ। হাসিতে চোখের কোনা খানিকটা কুঁচকে গেল। ছোটদা ততো ভাইদের সামনে একটু সলজ্জ এই হাসি। তাতে এবার নিখিল কোনো বিষাদ পেল না, কিন্তু অরুণিমাকে হারানোর বেদনা হয়তো আছে। সে নিয়ে কিছু বলবে ভেবেছিল সে, কিন্তু তার আগে ধনঞ্জয় বলে, 'দুগ্গা প্রতিমা খালি, তার চাইয়েও সুন্দর!' সে নিখিলকে জানায়, কারণ অরুণিমা আর পুলকেশের যখন বিয়ে হয়েছে নিখিল তখনো হাফপ্যান্ট পরে। তাই নিখিলকে বোঝানোর জন্যে ধনঞ্জয় বলে চলে, 'নতুন বউ হইয়ে আসার পর পিসিবাড়ি আইসে বউদির সঙ্গে কত রাজ্যের ইয়ার্কি মারছি!'

'তাই নাকি?' নিখিল বলে, 'দেইহে তো মনে হত বউদি কোনো ইয়ার্কি-টিয়ার্কি জানত না!'

'ও তো তোগো সাতে। আমাগো সাতে কতায় রস ছেলো।'

'ওরে সেয়া ছেল, মানুষটা সুন্দর মুখের কতাও ছেল সুন্দর। আমাগো এই বাড়িঘরের কেউর সাতে কোনোদিনও গলা উঁচু করে কতা কইনি। কিমান কও, হাইলে কও সবার সাতে ভালো ব্যবহার করত। ছাত্রীরা কত ভালোবাসত।' এবার নিখিলের উদ্দেশ্যে বলে পুলকেশ, 'তোর ছোটবুন, আমাগো নিভা তো —'

নিখিল বলে, 'হয়, নিভা তো সারাডা জীবন বউদির পড়ানোর কতা কয়। ওরে যখন মোবাইলে সংবাদটা দেলাম, কী কান্না যে কান্দল। ঢাকায় রইচে আসতে পারবে না, তোমারে কইতে কইচে। পাশুরে যেন এটু বুজাইয়ে কই...'

যদিও নিখিলই চাইছিল অরুণিমার প্রসঙ্গ থেকে পুলকেশকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু এখন নিজের অজ্ঞাতেই সে জড়িয়ে যাচ্ছে, শুধু সে কেন, ধনঞ্জয়ও তো সেই প্রসঙ্গের ভেতরই ঘুরপাক খাচ্ছে। অথবা, এই মুহূর্তে তাদের পক্ষে অন্য কোনো প্রসঙ্গে যাওয়া অজ্ঞাত কারণে সম্ভব হচ্ছে না। অথবা, তারা জানে না, না চাইলেও ওই প্রসঙ্গই তাদের ঘিরে ধরছে বারবার।

এ-সময় আবার পাশুর আসে। একবারে আসেনি। দরজার বাইরে একটুকু দাঁড়িয়েছিল যেন ধনঞ্জয়ের চোখে সে পড়ে। ধনঞ্জয় পাশুরকে ওখানে দেখে জানতে চায়, 'ও বা কিছু কবি নাকি?'

'হঁ, ও কা, বাবারে এট্টা কতা কওয়ার ছেল।'

'ক, মাস্টার্স পাশ ছওয়াল বাপ-খুড়ার কতার মদি না আইসে দরজায় দাঁড়াইয়ে রইচিস?'

'এয়াও ওয়ার মায়ের শেখানো', পুলকেশ বলে, 'ক, ও পাশুর, ও

বা, কী কবি?'

'দাদারে এট্টা ফোন করবা না, ভারতে তো এহোন আড়াইটা বাজে?'

নিখিল পাশুর মুখের দিকে তাকায়, ছেলেটা ইন্ডিয়ায় না বলে বলল ভারতে। কথাটা একেবারে কাটা-কাটা। নিশ্চিত এইভাবে বউদি ওকে বলত, 'তোর দাদারে এট্টা ফোন কর ও পাশুর, ভারতে এহোন কয়টা বাজে, অফিস ছুটি হইচে?'

পাশুর নিখিলের তাকানোটা খেয়াল করেছে। হ্যাঁ, তাই, সে-কথা জানতেও চাইল, 'ও কা, ওইভাবে তাকাইলা কী জনি আমার কথা শুনে? ভারতে কইচি সেই জনি? আসলে মা এইভাবে কইত আমারে!'

নিখিল এতে কোনো ধন্দে পড়েনি। কিন্তু সে যে-কথা ভেবেছিল এখন পাশুর অরুণেশকে ফোন করতে চাওয়ায়, তাই ছেলেটা হরহর করে বলে গেল।

এদিকে পাশুর ফোন করতে চাওয়ার কথা শুনে পুলকেশ একবার পাশুর দিকে একবার ধনঞ্জয়ের দিকে তাকিয়েছে। এখন ফোন করবে না পরে করবে। তা বুঝে নিতে পুলকেশ পাশুর কাছে জানতে চাইল, 'আর কেউ আসপে না?'

ধনঞ্জয় বলে, 'আইজকে আর আসপে কেডা, যা আসার আইচে মানুষজোন।'

ধনঞ্জয় এইসব তদারকে ওস্তাদ। তার একটা হিসাব আছে। দশার মন্ত্রে আত্মীয়-প্রতিবেশী যা আসার বেলা থাকতেই এসেছে। চিড়ে-মুড়ি দই-কলা যা খাওয়ার খেয়েছে। দূরের কেউ আজ আসবে না, আসলে ফোনে জানাত। যদি আসে পরশু-তরঙ, মাছ-তেল স্পর্শের দিন। সেদিনও দূরের কেউ আসবে না। কারণ শ্রাদ্দ খাওন এখন হবে না। বৃষ্টি-বাদলার সম্ভাবনা। তাছাড়া অরুণেশ এখন আসতেও পারবে না। পৌষের শেষাশেষি ছাড়া ও কাজের আপাতত কোনো সম্ভাবনা নেই। সেসব তো এই কয়দিন বেশ কয়েকবার আলাপ করেছে ধনঞ্জয়সহ পুলকেশ জগতিগুপ্তির ভাইদের সঙ্গে, পাশুর মতামত নেওয়া হয়েছে।

সে-প্রসঙ্গ এখন উঠছে না, পুলকেশ জানতে চেয়েছে এখন আর কেউ আসবে কিনা। পাশুর বলেছে, না আর কারো আসার তেমন সম্ভাবনা নেই। এদিনের সব ভালোমতো হয়েছে একথা অরুণেশকে জানানো যায়। অথবা, আরো পরে জানানো যায়। নিখিলের মনে হলো, পাশুর হয়তো এখন অরুণেশের সঙ্গে কথা বলে মায়ের উদ্দেশ্যে তাদের কর্তব্যকে ভাগ করে নিতে চাইছে। আজকের মতো সব কাজ শেষ হওয়ায়, পাশুরকে কোনো অসহায়বোধ ঘিরে ধরেছে না তো। এতগুলো দিন এই মাকে নিয়েই ছিল, মায়ের গুণ্ণায় গত দুটো বছর ছেলেটা যেভাবে লেগেছিল এখন হয়তো তার মনে হচ্ছে, সেই সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারল। আর তাতে কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতার বোধ তৈরি হয়েছে। এই পর্যন্ত ভেবে নিখিলের মনে হলো, এইসব যে ভাবছে, ছেলেটা তা আবার বুঝে গেল না তো?

ধনঞ্জয় পুলকেশকে বলল, 'বড়দা এটা কিছু কইয়ে দেও। ছেলেটা দাঁড়াইয়ে রইচে —'

'কবো কী? তোরা কী মনে করিস, এহোন ফোন করবে, না পরে?'

'বোঝা ও নিখিল কা, বাবার এই দোটানা স্বভাব কোনোদিন গেল না। আইজকে মা থাকলি দেত এক ঝাড়ি।'

পাশুর কথায় সবাই একটু হাসির সুযোগ পায়। 'আচ্ছা, আরো ঘণ্টাখানেক বাদে করিস —' ধনঞ্জয় বলে।

পুলকেশও তাতে সায় দেয়, 'সেই ভালো —'

একথা বলল ঠিকই পুলকেশ। বলার পরপর পাশুর তার সামনে থেকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে। এখনই আবার চা দেবে কিনা জানতে চাইবে। অনেকখানিক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে নিখিল এসেছে। নিখিলের আসাটা পাশুর, পুলকেশসহ সবার কাছেই অপ্রত্যাশিত। একটু পরেই আবার উঠবে, বলবে, যাই। এসেছিলাম, দেখে গেলাম। সব ভালোমতো হয়েছে। আর পাশুর জানে, জানত অরুণিমাও, নিখিল চা পছন্দ করে। তাই রান্নাঘরে প্রতিবেশী ঘরের মেয়েটিকে আবার তাদের চা দিতে বলে পাশুর বেরিয়ে গেল। কিন্তু তখনো পুলকেশের কানে পাশুর

ওই কথাটা। আজ অরুণিমা থাকলে তাকে এই দোটানা নিয়ে ঝাড়ি দিত।

নিখিল লক্ষ করেছে, পাশ্চ একথা বলার পরপর আবারো অন্যমনস্ক হয়েছে পুলকেশ। আবার পুলকেশ অন্যমনস্ক হয়ে মুহূর্তেই অরুণিমার মুখখানা দেখে নিয়েছে। কী বলত তাকে? ভেবেছে সে। কিন্তু এখন নির্দিষ্ট কোনো কারণ ভাবতে পারে না। কতবার কত কারণে অরুণিমা তাকে গলা নিচু করে ঝাড়ি দিয়েছে। অরুণেশ কোনোদিনই কাছে নেই, কিন্তু পাশ্চ তো তার বাপকে মায়ের নিচু গলায় দেওয়া সেইসব ঝাড়ি শুনতে-শুনতে বড়ো হয়েছে। এখন সেই কথা বলে গেল।

একেবারে শেষদিকে, কলকাতার ডাক্তাররা ফিরিয়ে দেওয়ার পর, যখন অরুণিমার গলার স্বর ফ্যাসফেসে, মুখখানা ফুলে গেছে, চশমাটা চোখে দেওয়ার পর চোখদুটো মনে হতো কত গভীরে প্রায় কোটরে ঢুকে গেছে, সে-অবস্থায়ও এই টানা চোখদুটো একটু বড়ো করে পুলকেশকে একটা কিছু বলত। সেবার বলেছিল, কী একটা পরীক্ষা করানো নিয়ে। পাশ্চ জেনে এসেছে, নতুন হওয়া সুন্দরবন ক্লিনিকে এটা ভালো হয়। ওদিকে পুলকেশকে ধনঞ্জয় বলেছিল, এই চেকআপ খানজাহান ক্লিনিকে করানো ভালো। এ নিয়ে বাপে-ছেলেতে তর্ক হয়নি। পুলকেশ কোনোদিনও তর্ক করার মানুষ না; কিন্তু পাশ্চ যতই বলুক ধনঞ্জয় বলেছে অন্য ক্লিনিকের কথা, এখন যদি সুন্দরবন ডায়াগনস্টিকে চেকআপ করায় তাহলে ধনঞ্জয় কী ভাববে? এই কথা অরুণিমার সামনে বলতেই, পুলকেশ একেবারে মিনমিনে গলায় বলেছে, বলতেই অরুণিমা নিচু গলায় বলেছিল, ‘যাও, হাটে যাও, দরবার বসাও। তারপর মানুষ কোনদিকে বেশি রায় দেয়, সেই মতো ক্লিনিক ঠিক কইরো। তোমার এই দোটানা স্বভাব গেল না! ছাতার এক ব্লাড টেস্ট...। দুইদিন বাদে যাব মইরে, আর এহোন বাপ-পোয় ক্লিনিক নিয়ে আছে।’

আগের কথাটুকু পর্যন্ত যদি এখন মনে পড়ত তাহলে পুলকেশের জন্যে একপ্রকার আনন্দেরই হতো। পাশ্চ সে-কথার সামান্য শুনিয়ো গেছে, কিন্তু ওই কথার পরের টুক! অরুণিমা তখনই বুঝে গেছে, জেনে গিয়েছিল সে আর বেশিদিন নেই, নাকি কলকাতার ডাক্তাররা ফিরিয়ে দেওয়ার পরে সে নিজেতে নিজে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল, নাকি দুরারোগ্য ব্যাধির রোগীরা এক সময়ে জেনে যায়, সে আর কোনোভাবেই ভালো হবে না। তাই যদি না-হয়, তাহলে ওইদিন অমনভাবে অরুণিমা ওকথা বলেছিল কেন? আর কখনো কিন্তু বলেনি। ওদিনও কি তবে বলত না, শুধু তার আর পাশ্চর কথাগুলো শুনে ফেলেছিল বলে, ওভাবে বলেছে।

পুলকেশের মুখখানায় আবার বিষাদের ছায়া পড়ল। কিন্তু ধনঞ্জয় তা লক্ষ করেনি। অথবা, ধনঞ্জয় ওই কথার পরপরই মোবাইল ধরতে একবার বাইরে গেছে। এখন ফিরে এসেছে। নিখিল বুঝল, পুলকেশ এখন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল হয়তো, ধনঞ্জয় আসার সঙ্গে-সঙ্গে আবার ফিরে এলো। তখনই সে বলল, ‘ও ধলাই, তোর মনে আছে, এই মাস ছয়েক আগে একটা ব্লাড টেস্ট করানোর কথা?’

‘হঁ — আমি কইলাম খানজাহান ক্লিনিক —’

‘হ। পাশ্চ কইল সুন্দরবন। সেইয়ে নিয়ে আমরা বাপ-পোয় য়হোন কী করব ভাবদিচি, তখন তোর বউদি ওই কথা কইল, এহোন পাশ্চ যা কইয়ে গেল —’

শুনে নিখিল হা-হা শব্দে হাসে। তারপর একেবারেই যেন অপ্রাসঙ্গিক কথা ঘোরানো দরকার এমনভাবে বলল, ‘তয় মাইনষে যে কয় —’

‘মানষি কী কয়?’

‘মানষি কয় ভাগ্যবানের মরে বউ, অভাগার মরে গরু।’

‘ও এই কথা?’ ধনঞ্জয় বলে।

‘শুনি তো —’

‘কৃষিবাদা আর্চে আইচকাল, সবই তো জমিজমা বান্দা লাগায়, তা’লি অভাগার গরু মরলি কী বা না মরলি বা কী? তয় বউ সতি ভাগ্যবানের মরে!’

‘কেন, তুমি সেইয়ে চাও?’ নিখিল ধনঞ্জয়ের কাছে জানতে চায়।

‘না। কথা উঠেইচিস তুই। কেন, পুলকেশদারে আবার বিয়ে দিবি নিকি?’

‘না, সেয়া কইনি —’

কথার মোড় ঘুরেছে। পুলকেশের মুখখানা দেখে বোঝা যায়, তার দুই মামাতো-পিসাতো ভাইয়ের এই আলাপ এখন চললে চলুক। নিখিলও যেন তাই চাইছিল। তাতে এতক্ষণের পরিস্থিতির গুমোট দশাটা কিছুটা হলেও কাটে। তাছাড়া অনেকক্ষণ কথা বলা হলো, এখন উঠতে হবে। ধনঞ্জয় যদি তাকে মোটরবাইকের পেছনে বসিয়ে একটানে বাসস্ট্যান্ডে দিয়ে আসে, তাহলে সে সন্ধ্যার আগে শহরে চলে যেতে পারে। এই কথা থামতে-থামতেই উঠতে হবে। ধনঞ্জয়দা উঠলে হয়। নিখিল ভাবে।

ধনঞ্জয় জানতে চায়, ‘তা’লি কী কইচিস —’

‘কইচি, —’ নিখিল বলতে গিয়েও বলল না। সে বলতে চেয়েছিল, বউ মরলে যদি মানুষ ভাগ্যবানই হবে, তাহলে পুলকেশদারে এইরকম অভাগা করে দিয়েছে কেন?

কে জানে, যেন নিখিলের সে-ভাবনা পুলকেশ বুঝে গেল। তাদের প্রায় অবাধ করে দিয়ে বলতে থাকে, ‘কৃষিবাদার কথা ক’লি, ওয়া নেই। সেই গ্রামই আর গ্রাম নেই। চাইর দিক কী পরিবর্তন হইয়ে গেইচে। আমার তো মাঝে-মাঝে মনে হয়, কোন নতুন দুনিয়ায় আইসে পড়লাম। সব কীরাম যেন লাগে, অপরিচিত, মনে হয় এতদিন সব এক রকম ছেলে, হঠাৎ দুনিয়াদারির সব পালটাইয়ে গেইচে।’

ধনঞ্জয় মাঝখানে বলতে গিয়েছে, ‘কীরাম?’ বলেছেও, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে নিখিল তাকে হাত নেড়ে থামায়।

পুলকেশ বলে চলে, ‘আসলে আমার মনে হয়, আমি পালটাইয়ে গেইচি... আইজকাল আর কিছুই নতুন ঠেকে না।’

নিখিল পুলকেশের এই থামার জন্যে অপেক্ষা করছিল। থামতেই বলে, ‘দাদা, আমার যাওয়া লাগে, দিন কয়েকের মদি এদিক আসলি আবার আসপানে —’

‘যাবি। আয় তয়। তোরে পাইয়ে কয়ডা কথা কব ভাবিলাম, হলো না। আবার আসিস —’

নিখিলের মনে হয়, হঠাৎ যাওয়ার কথা বলে উঠে পড়েছে নাকি? অথবা, বসবে আরো কিছুক্ষণ? তবু ধনঞ্জয়কে সে বলে, ‘ধলাইদা, তোমার হাতে কাজ না থাকলি চলো আমারে একটানা দিয়ে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত দিয়ে আসো।’

‘দাঁড়া, দুই মিনিট। ওই বাড়ির অনুপরে কল দিতি কইচি পাশ্চুরে, ও তোরে দিয়ে আসপেনে।’

‘বয় তয়।’ পুলকেশ বলে।

‘না। বাইরোই। বইসে তো থাকলাম কত সোমায় —’

তিনজনে উঠানে নামার উদ্যোগ নিতে, পাশ্চ উঠান থেকে বলে, ‘অনুপ সামনের রাস্তায় আইচে ধলাই কা। চাবি দাও —’

ধনঞ্জয় চাবি দিতে-দিতে বলে, ‘আমি আসতিচি, গিয়ারে এটা সমস্যা, ওরে কইয়ে দি, পারলি এটু মেকাররে দেখাইয়ে নিয়ে আসপে —’

পাশ্চ এগিয়ে যেতে, পুলকেশ নিখিলকে বলে, ‘আবার আসিস ভাইডি। তুই আসলি কত ভালো ঠেহে —’

নিখিল মাথা নাড়তেই পুলকেশ বলতে থাকে, ‘কেমন বদল শুনবি? এই যে বাড়ি ঘরদোর সব ঠেকায় কি একেবারে নতুন।’ পুলকেশ উঠানে বাড়ির চৌহদ্দি দেখায়, ‘মনে হয়, এয়ার কিছুই চিনি না আমি। কিন্তু রাইতে যেই শুইয়ে পড়ি, আমি শুইতাম ওই খাটের ভিতরের দিক। এহোনও সেইহেনে শুই, আর মনে হয়, বাইর পাশে তোর বউদি শুইয়ে রইচে!’

শুনতে-শুনতে নিখিল আর ধনঞ্জয় সামনে হাঁটে। ইচ্ছে করেই দাঁড়ায় না। নিখিল পুলকেশের দিকে হাত নাড়তেই, ধনঞ্জয় নিখিলকে বলে, ‘কী বুঝলি, পুলকদা তার সোনার পিণ্ডিমা নিয়ে আছে!’

নিখিল কিছু বলে না। তার মনে হলো, অরুণিমার মৃত্যুতে চারপাশ মিলিয়ে চরম নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরেছে পুলকেশকে। □



ছেলেটা আসলে মরতোই

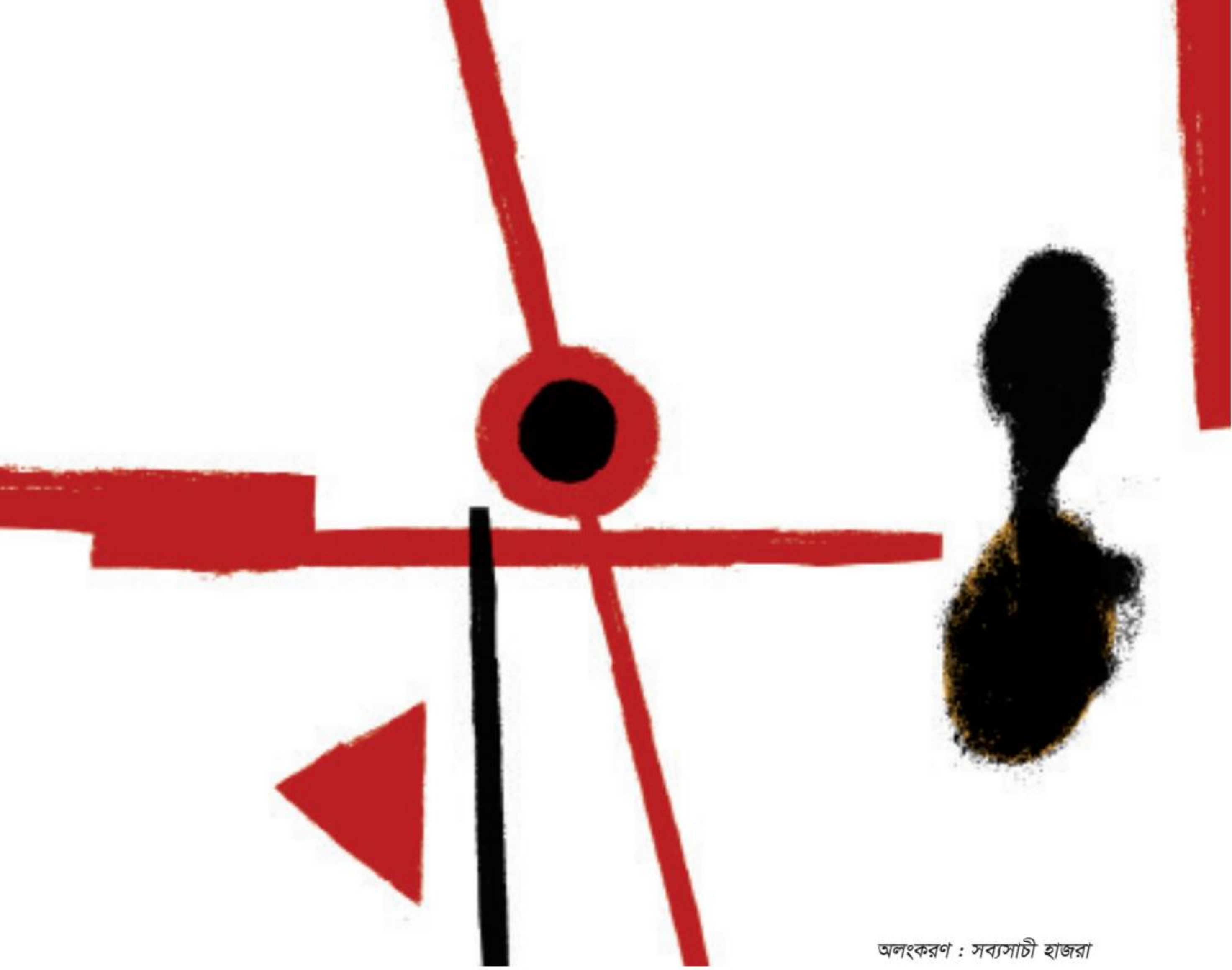
মহীবুল আজিজ



মরস না ক্যান তুই! তুই মরলে আমার হাড়টা জুড়াইতো। তুই মরলে তোর দাদার কবরের পাশে তোরে খাদায়া আইসা আমি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তাম।

আকাশে-বাতাসে ছোট-বড় ঢেউ তুলে যেতে-যেতে আমেনার এই কথার টুকরো-টুকরা এ-বাড়ি ও-বাড়ি হয়ে বাড়ির পেছনের এজমালি পুকুরটার ওপর দিয়ে বিলের দিকে চলে যায়। তখন প্রখর রোদের বিলে অন্যের ক্ষেতে কামলা-খাটা আমেনার স্বামী বাহারুলের কানে তা কি পৌছায়! পৌছালে সে নির্ধাৎ তার প্রতিবাদ জানাতো সঙ্গে-সঙ্গে। ঘরে থাকলে সে-ও চোঁচিয়ে বলতো, মর-মর কয়্যা তুমি তো পোলাডারে হাচা-হাচাই মাইর্যা ফালাইবা! আমেনাও দমবার পাত্র নয়। সে বলতো, তুমি তো হারাডা দিন নিড়ানি-খুরপি লইয়া ক্ষেতে থাকো। পোলার কাণ্ড-কারখানার তুমি কি জানো!

কাণ্ড-কারখানা কথাটা শুনলে মনে হতে পারে, যার সম্পর্কে কথাটা বলা হচ্ছে সে এই দুনিয়ার



অলংকরণ : সব্যসাচী হাজরা

প্রতাপশালী কোনো মানুষ। আসলে সে মাত্র চোদ্দো বছরের এক কিশোর। নিমপুর গ্রামের মৃধাবাড়ির ছেলে নিশান — এটুকু বললেই তার সম্পর্কে অনেকটা বলা হয়; কিন্তু তার জননী আমেনার অষ্টপ্রহরের জীবনটা যেন তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে তখনছ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। বলা যায়, নিজের কর্মগুণে সে-নিশান যতটা না পরিচিতি পেয়েছে তার চাইতেও তার নিজেরই মা আমেনার সগর্জ ঘোষণা তাকে অঞ্চলটিতে ব্যাপক পরিচিতি এনে দিয়েছে। মৃধাবাড়ির প্রায় সকলেরই এখন ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তারা জানে যে, নিশানের জন্মদাত্রী স্বয়ং তার সন্তানের মৃত্যু কামনা করে। জগতে এমন ঘটনা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়, যেহেতু নিশান আমেনার স্বর্গর্ভজাত সন্তানই। লোকজনের কেউ-কেউ আড়ালে হাসে, বেচারি মা ছেলের দস্যুপনায় অতিষ্ঠ হয়ে তার মৃত্যু-কামনা করে বটে। করে মনের রাগ কমায়। দিনের-দিনের ক্ষুধা-অভাব আর কষ্টের জ্বালা মেটায় কিন্তু ভেতরে-ভেতরে, গিয়ে দেখো সে প্রার্থনা করে — ছেলেটা আমার শতায়ু হোক।

ঠিক কবে থেকে আমেনার এই মৃত্যু-কামনার আরম্ভ, সেটা দুম করে বলে দেওয়া মুশকিল। কেননা, লোকজনের মনে পড়ে, আরো বহুকাল আগে তারা শুনেছিল, নিশানের মা ‘মর-মর’ গর্জনে তার বেঁচে-থাকা ছেলেটাকে কথার চাপেই মেরে ফেলে আর কি! ছেলে তো মরেই না, বরং সে দপদপিয়ে বাড়তে থাকে। বাড়তে-বাড়তে সাত থেকে একদিন চোদ্দো হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে

বৈশাখ মাস তীব্রতর হয়ে ওঠে
নতুন আগুনের আঁচে। আমেনা
খেয়াল করে, তার ছেলে
নিশান দিন-দিন কেমন যেন
অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, কখনো-
কখনো মনে হয় অচেনা।

জনশ্রুতি সত্য হলে সাত বছর বয়সেই নিশানের কর্মদক্ষতার নজির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কামলা খেটে ফেরা বাহারুল কেবল পুকুরঘাট থেকে ফিরে একটা পাটি বিছিয়ে বসেছে ভাত খাবে বলে। ভাপ-ওঠা গরম ভাত, টাকি মাছের ঝোল আর ঢোলকলমির শাক — এসবের ওপর তীব্র এক পরত আঁচের ঝাঁঝ লেপে দেয় আমেনা, তোমার পোলা আইজক্যা সিরাজ মিয়ার বাগান থিক্যা মিষ্টিআলু চুরি কর্যা খাইছে। এক মুহূর্ত কথাটা শোনে বাহারুল। আসলে শোনার চেষ্টা করে। পুত্র-সম্পর্কিত এমন প্রতিবেদন সেটাই প্রথম। ফলে কথাটা তার কানে ঢুকলেও করোটিতে ঢোকে না। ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ছেলে কোথায় কাঁচুমাচু হয়ে তাকে বলবে, ভুল হইছে আর করম না — তা না, ছেলে বলে, আমার নিড়ানি নাই খুরপি নাই, আমি ক্যামনে মাটির নিচ থিক্যা আলু তুলি? কিন্তু নিশানের চৌর্যবৃত্তির সাক্ষী জনৈক রহিম বলে, আরে কিসের নিড়ানি-খুরপি হ্যাঁ, তার হাতের আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়্যা বাদামি রঙের মিষ্টিআলু তুল্যা খাইয়া নিল, কী আশ্চর্য!

একা আমেনা কেন বাহারুলেরও তাতে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কথা। কেননা, নিশান-সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি সত্য হলে প্রথমে মৃধাবাড়ি তারপর নিমপুর গ্রাম হয়ে ধরো মীরগঞ্জ রাখালিয়া শ্যামগঞ্জ এবং আরো-আরো কাছের-দূরের যত গ্রাম আছে সর্বত্র আমেনা আর বাহারুলের যে-পরিচিতি ছড়িয়ে পড়বে তাতে তাদের এতদধ্বলে সমূহ সংকটেই পড়ার কথা। সেই সংকটময়তা তাদের অভাবগন্ততার পর্বকে প্রলম্বিতই করে তুলবে। লোকজন বলবে, আমেনাকে দেখিয়ে লোকজন বলবে, ওই দেখো চোরের মা যায়! বাহারুলকে দেখিয়ে তারা বলবে, ওই দেখো চোরের বাপ যায় এবং আমেনা ও বাহারুলকে দেখিয়ে তারা বলবে, ওই দেখো চোরের মা-বাপ যায়! নিশান যতই নিজেকে নিরপরাধ বলে স্বীকারোক্তি দিক না কেন, কালপরম্পরায় তার তৎপরতায় আমেনা-বাহারুলের জীবনের ঝুঁকি বাড়তেই থাকে। লোকজন যে সবসময় ছেলেটাকে অকুস্থলে দেখতে পায় তা হয়তো নয় কিন্তু তারা ধরেই নেয়, কারো গাছ থেকে ডাব-সুপারি-নারকেল চুরি গেলে, কারো ক্ষেতের মাটির গর্ভ থেকে আলু-হলুদ-মিষ্টিআলু জনান্তিকে সরিয়ে নেওয়া হলে, কারো গাছ থেকে কামরাঙা-পেয়ারা-লেবু-তেঁতুল খোওয়া গেলে তাদের অধিকাংশ মনে-মনে সন্দেহের তির নিশানের দিকেই ছোড়ে এবং তাদের অপরাংশ প্রকাশ্যে দায় চাপায় নিশানের ঘাড়ে। সেই দায় নিশানের ঘাড়ে তত বোঝা না হলেও সেটা আমেনার ঘাড়ে বিশাল ভারী পাথরের মতো চেপে বসে। তখন সবকিছুর একমাত্র সমাধান হিসেবে আমেনা ছেলের মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। চুরি যাওয়া লোকেদের তাতে ক্ষতিপূরণ না হলেও তারা মনে-মনে আমেনার স্ব-সন্তানের মৃত্যুকামনাকে আন্তরিক বলেই গ্রহণ করে। তাদের কেউ-কেউ কিছুক্ষণের জন্যে চুরি-যাওয়া বস্তুর শোক সামলে উলটো আমেনার জন্যেই কোথাও একধরনের সহানুভূতি অনুভব করতে শুরু করে। তারা ভাবে, ছেলেটা মেয়েলোকটার জীবনটা কাহিল আর বরবাদ করে দিলো। এমন সন্তান না থাকাই ভালো। কিন্তু অনেক রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চারপাশে গহিন আঁধার আর স্বপ্ন চাঁদের আলো ঘুমন্ত নিশানের অবয়বে যে-উদ্ভাসন তোলে, তাতে আমেনার ভেতরটা গলে যেতে থাকে। তার মনে হয়, দুনিয়ার সব লোক একজোট হয়ে তার আদরের সন্তানটাকে চোর বানাবার তালে আছে। অথচ গভীর দৃষ্টিতে দেখলে তার এই ছেলেটাই তাকে দুনিয়া টুঁড়ে এনে দেবে ভবিষ্যতের অবলম্বন। শোনা যায় কি যায় না স্বরে আমেনা বলে, পরান আমার কবে তুই বড় হবি ক তো দেহি! আমেনার সেই নিভৃত উচ্চারণ কারো কানে যায় না। এমনকি তার স্বামী বাহারুলের কানেও না। দিনভর নিড়ানি-খুরপিব্যস্ত শ্রমিক বাহারুল তখন ঘুমের ঘোরে মাঠভর্তি ফসলের স্তূপ থেকে অবিরাম ফসল কেটে-কেটে গোলা ভরিয়ে তুলেছে। হয়তো ঘুম ভাঙলে পর সে বুঝবে সব ফসল তোলার মধ্যে স্বপ্ন থাকে না। এত ফসল সে

রাখলোটা কই! তার তো গোলাই নেই!

বৈশাখ মাস তীব্রতর হয়ে ওঠে নতুন আগুনের আঁচে। আমেনা খেয়াল করে, তার ছেলে নিশান দিন-দিন কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, কখনো-কখনো মনে হয় অচেনা। সারাদিন কই-কই যায়, কই-কই থাকে তার নেই ঠিক। একদিন প্রতিবেশী ফাতেমার মায়ের কাছে জানা যায়, নিশানকে দেখা গেছে পাশের মিয়াবাড়িতে — ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেডিও শুনতে। তার এই দাঁড়িয়ে থাকাটা একটি অনুল্লেখযোগ্য নিভৃত পর্বেরই সীমাবদ্ধ থাকতো, যদি না ভিড়েরই কেউ একজন ‘ওই চোর’ বলে চৈঁচিয়ে উঠতো। সবাই তখন এদিক-ওদিক তাকায় চোরের সন্ধানে কিন্তু তারা চোর খুঁজে পায় না। শেষে তাদের এই বোধ জাগে, নিশান নামের মৃধাবাড়ির ছেলেটাকে চোর বলে সম্বোধন করলে তার সম্পর্কে নতুনভাবে যেহেতু আর কিছুই জানার থাকে না, তারা রেডিওতেই মনোনিবিষ্ট থাকে। অথবা তারা বুঝতে পারে, চুরির চাইতেও ডাকাতির গুরুত্ব অধিক — গোটা দেশটাকেই ডাকাতির মাধ্যমে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ভয়ংকর বন্দোবস্ত যখন চারদিকে চলমান, তখন নিতান্ত অপটু একটি কিশোরের এসব টুকটাকির কোনোই মানে হয় না। কাজেই তারা জল্পাদের দরবারের ব্যঙ্গ-গলা শুনতে থাকে মনোযোগ দিয়ে।

সেদিন দুপুরবেলা আমেনা পুকুরঘাট থেকে ঘরে ঢোকামাত্র ছেলে নিশান তার গলা জড়িয়ে ধরে আবদারি ঢংয়ে। গলা জড়িয়ে ধরে সুর করে-করে সে বলতে থাকে, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে! আমেনার মাথায় কিছুই ঢোকে না এসব। তার মনে হয় নিজেকে শান্ত ছেলে বলে নিশান হয়তো আমেনাকে তার দুরন্তপনার ইতিহাসে আসন্ন কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু ‘আমরা’ শব্দের ব্যঞ্জনা আমেনার মনে ফের একটা আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে। কারা এই ‘আমরা’, কেন এই ‘আমরা’ — তাহলে ‘আমরা’ আসলেই কে বা কারা! তার বা তাদের সঙ্গে তার ছেলে নিশানের সম্পর্কই বা কী! এই ‘আমরা’ থাকেই বা কোথায় — ‘আমরা’ কি নিশানকে বাদ দিয়ে, না তাকে সঙ্গে নিয়েই! মাথার ভেতরে চক্কর দিয়ে ওঠে আমেনার। চোদ্দো বছরের ছেলেটা তার আয়ু মনে হতে থাকে দশ বছর কমিয়ে দিয়েছে। যখন-তখন ঘরের বার হয়ে যায়, যখন-তখন তাকে লোকেরা ভিড়ের মধ্যে আবিষ্কার করে — সে রেডিও শোনে। আর সবচাইতে বিস্ময়কর — একদিন ঘুমের মধ্যে তার বিড়বিড় শুনে ভীত আমেনা তার স্বামী বাহারুলকে জিজ্ঞেস করে, ছেলেটা কি পাগল হয়ে গেল, ঘুমের মধ্যে কীসব কথা বলে! শুনে বাহারুল বলে, ভয়ের কিছু নাই, এইডা হইলো নতুন মন্ত্র, ডাকাতি ঠ্যাকানোর মন্ত্র, পোলায় তোমার ‘জয়বাংলা’ কয় ঘুমের মধ্যে। গোটা দ্যাশের মানুষ অহন ‘জয়বাংলা’ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। অহন ‘জয়বাংলা’ ছাড়া বাঁচনের আর কোনো পথ নাই।

আমেনার ভীতি কাটে। আবার নতুন ধরনের ভয়ও আঁকড়ে ধরে। শোনা যায় শহরের যুদ্ধ শিগগির দেশগেরামের ভেতরেও ঢুকতে শুরু করবে। পাকিস্তান থেকে ভয়ংকর সব অস্ত্র নিয়ে আসা হয়েছে মানুষ মারার — বাঙালিকে মেরে শেষ করে তবে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিজেদের দেশে ফিরে যাবে। বাঙালিও সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তারা পাকিস্তানিদের ঠেকাবে। এসব কথা আমেনার মধ্যে ভাবান্তর ঘটায়। কিন্তু সে শঙ্কিত বোধ করতে শুরু করে তার ছেলেটার জন্যে। সে যে এই রেডিও শুনতে যায়, যারা রেডিও শোনে আর বাঙালির পোলা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাকিস্তানিরা মারা পড়েছে শুনে উল্লাস করে, হাততালি দেয়, আনন্দে ফেটে পড়ে, তাদের সামনে কোনো বিপদ অপেক্ষা করছে না তো! হঠাৎ যদি একদিন পাকিস্তানিরা এসে যারা রেডিও শুনতে যায়, ভিড় করে, তাদেরকে ঘেরাও দিয়ে বলে, হারামজাদা জয়বাংলার দল, তোদের দিন শেষ! — তখন কি তার মাত্র চোদ্দো বছরের ছেলেটা, নিশান, পারবে কি বাঁচতে! আমেনার শঙ্কাটা গাঢ় হয়ে তাকে চেপে ধরে। বাড়ি থেকে, গ্রাম থেকে, নিমপুর ছাড়াও রাখালিয়া, মীরগঞ্জ,

রামগঞ্জ, শ্যামগঞ্জ এসব এলাকা থেকে যুবক-ছোকরাদের অনেকেই নিখোঁজ হয়ে যায়। কোথাও তাদের হদিস থাকে না। কেবল হঠাৎ-হঠাৎ গুনতে পাওয়া যায়, কাছের-দূরের গ্রামের নিখোঁজ ছেলেদের খোঁজ মিলেছে। তারা পাকিস্তানি সেনাদের মেরে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছে, কিংবা পাকিস্তানিদের মারতে গিয়ে অনেক লড়াই চালিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেরা মারা পড়েছে। আমেনার শঙ্কা হলেও নিশানের বয়সের কারণে সে একটু স্বস্তিও বোধ করে। যারা ইতোমধ্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা পড়েছে এবং যারা কাছের-দূরের গ্রাম থেকে হঠাৎ-হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে তাদের সকলেই যুবক বয়সী। তার মানে দাঁড়ায়, তারা নিশানের চাইতে কম করে হলেও চার বছরের বড়। কাজেই ছেলের বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বা তার কখনো-কখনো রেডিও গুনতে গিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত করে ফেলা এসব আর আমেনার উদ্বেগের সীমানায় ঢোকে না। তবে যুদ্ধ যদি গ্রামে ঢুকে পড়ে, ঢুকে গায়ের কাছে এসে পড়ে, তখন সে আমেনা, বাহারুল, নিশান কিংবা মৃধাবাড়ি ও নিমপুরের লোকেদের কী পরিণতি হবে!

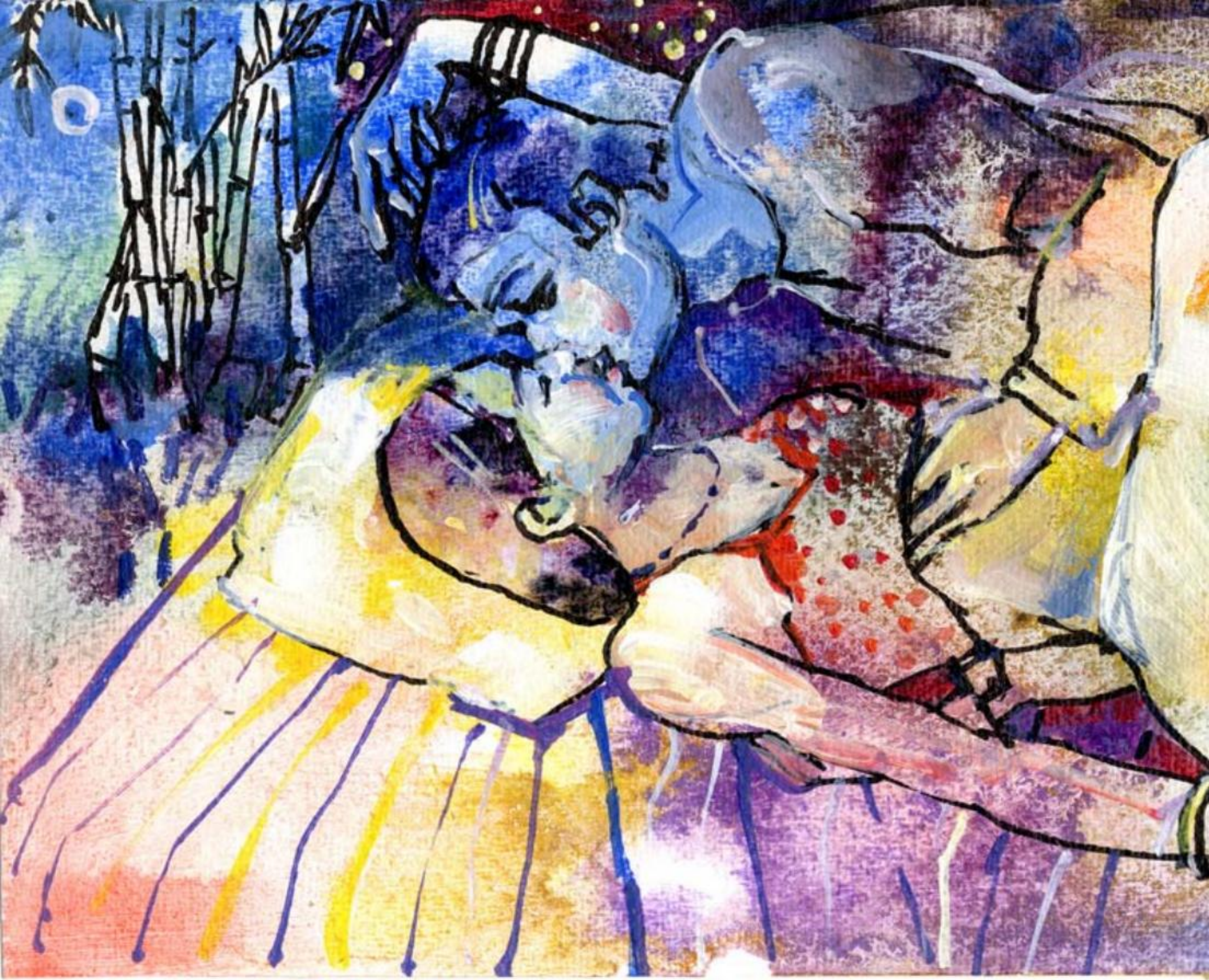
সেদিন সকালটা ছিল ভাদ্রের মেঘরোদের পটভূমিতে মিশ্র, দুপুরটা তাতানো আর বারুদের গন্ধ ও বিবিধ মৃত্যুর প্রসঙ্গে দাহ্যময়। সেই দাহ্যতা অপরাহ্নের রূপকে করাল করে তুললে মীরগঞ্জের ছোট কাসেম হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে ঢোকে মৃধাবাড়িতে। সে খোঁজ করে নিশানের বাপ বাহারুলকে। বাহারুল কেবলই কাউনের পাতলা জাউ মুখে তুলেছে, একটু পরেই সে ফের নিড়ানি-খুরপি হাতে ক্ষেত্রকর্মে যোগ দেবে। জাউ তার সামনেই পড়ে থাকে। শুনেই জ্ঞান হারায় আমেনা। ছোট কাসেম তাদের জানায়, নিশান পাকিস্তানি সেনাদের গুলি খেয়ে মারা পড়েছে। পাকিস্তানি সেনা, ছেলে মারা গেছে গুলি খেয়ে কথাগুলো ঠিক-ঠিক বাহারুলের মাথায় ঢোকে না। কদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, পাকিস্তানি সেনারা ক্রমশ অভ্যন্তরের দিকে এগোবে। সে-অবস্থায় সবাই স্থিরও করে রেখেছিল, নিমপুর ছেড়ে রাখালিয়ায় বা আরো নিরাপদ রাখালিয়ার ভেতর দিয়ে রসুলপুরের দিকে চলে যাবে। একটা বস্তায় আপৎকালীন সঞ্চয়স্বরূপ চিড়ে-গুড়ও পুরে রাখা আছে। এখন লোকে যদি বলে পাকিস্তানি সেনার গুলিতে ছেলে মারা পড়েছে তাহলে সে-ও প্রশ্ন করতে পারে, পাকিস্তানি সেনাই বা এলো কখন আর তার ছেলেই বা মারা পড়ল কখন, কীভাবে? মরতে হলে তো তাকে পাকিস্তানি সেনাদের অস্ত্রের নাগালে পড়তে হবে। আর সম্মুখযুদ্ধে সে মরবে কেন! তার মতো চোন্দো বছরের একটা ছেলের পক্ষে তো যুদ্ধ ব্যাপারটাই খাপ খায় না। তবে কি ছেলে তার সম্পূর্ণ নিরীহ অবস্থাতেই কোথাও মারা পড়ল? চকিতে একটা আশঙ্কা বাহারুলের মাথায় চক্রাকারে ঘোরে, কেউ কি তাকে ধরে নিয়ে গেল নাকি সেই রেডিও-শোনা লোকেদের জল্পাদের দরবার বা শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে শোনা অবস্থাতেই আচমকা হামলা করে মেরে ফেলল হানাদারের দল!

ততক্ষণে বাহারুলের ছোট ঘরে ভিড় জমে যায়। প্রতিবেশীদের তৎপরতায় আমেনার জ্ঞান ফেরে বটে; কিন্তু তার অভিব্যক্তির আভাসে কেউ জীবনের প্রতীক খুঁজে পায় না। ছেলের মৃত্যুসংবাদে ছেলের মৃত্যু বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়েও আমেনা মৃতবৎ পড়ে থাকে। বাহারুলকে সান্ত্বনা জোগায় কেউ-কেউ — ভাই রে, কে যে কখন মরি অহন কি তার কোনো ঠিক আছে! ছেলে তোমার না আমগোই মরছে! মর্যা আমগো নিমপুর গ্রামের একজন শহিদের খাতায় নাম লেহাইছে, তোমার পোলা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হইছে, আল্লায় হ্যারে অবশ্য-অবশ্য ভেস্তু নসিব করবো! পাড়াগাঁর লোকজন সর্বদাই উদ্যোগী। তারা সত্য খবর মিথ্যে খবর সবই দ্রুত সংগ্রহ ও প্রচারে পারদর্শী। তারা সত্যই নিশানের লাশটাকেও হাজির করে। মাথায় গামছাবান্ধা রসুলপুরের একজন কৃষকের নেতৃত্বে জনাচারেক লোক নিশানের মৃতদেহটাকে বয়ে নিয়ে আসে। সকালবেলা যে-ছেলেটি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে নিজেকে শান্ত ছেলে বলে ঘোষণা দিয়েছিল

এই সন্ধেতে সে আসলেই সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে। তার আর অশান্ত হওয়ার কোনোই উপায় নেই। গুলি তার মাথার খুলিটাকে পরিচয়শূন্য অবস্থায় নিয়ে গেছে। রক্তলিপ্ত তার শরীরটা একটি করুণাখণ্ড হয়ে সবার সামনে উপস্থিত হলে এই প্রথম নিজের জড়স্থিরতা ভেঙে কান্নায় ভেসে যেতে থাকে তার মা, বাহারুলের স্ত্রী — আমেনা।

প্রতিবেশী আর সমব্যথীরা ধরাধরি করে আমেনাকে ধাতস্থ করার চেষ্টা চালাতে থাকে। বাহারুল তার ছেলে নিশানের রক্তমাখা শরীরটাকে ঘরের মেঝেতে শুইয়ে দেয়। খানিকটা কালচে শুকনো রক্ত আর বাহারুলের অভক্ষ্য কাউনের জাউ মিশে কেমন যেন একটা ঝাপসা অবর্ণনীয় শোকের পটভূমি রচনা করে। সবাইকে গুনিয়ে-গুনিয়ে বর্ণনা দেয় রসুলপুরের কৃষক লোকটা — চোন্দো বছরে যোদ্ধা হওয়া যায় না, কিন্তু এই পোলাডা হইছে। অহনতক আমরা চোন্দো বছরের কাউরে ছনি নাই শহিদ অইতে, এই পোলাডা হইছে! তারপর সে সবিস্তারে উপস্থাপন করে নিমপুরের মৃধাবাড়ির বাহারুল মৃধার একমাত্র সন্তান নিশান মৃধার প্রথমে যোদ্ধা এবং শেষে শহিদ হওয়ার বৃত্তান্ত। সবাই জানতো, যে-কোনো দিন পাকিস্তানি সেনারা এসে পড়বে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিও একসময়ে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। মুক্তিযোদ্ধারাও তাদের প্রতিরোধ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ভেতরে-ভেতরে। কিন্তু এর মধ্যে মৃধাবাড়ির কিশোর নিশানটা যে কীভাবে জড়িয়ে পড়ল তা একমাত্র সে-ই জানতো। শোনা যাচ্ছিল তারা মীরগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলে ক্যাম্প গড়বে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের প্রথম কনভয়টা। হয়তো জনা সাত-আটেক পাকিস্তানি সেনা ছিল সেই কনভয়ে। তবে পথনির্দেশক দুয়েকজন বাঙালিও নাকি সঙ্গে ছিল, এমন কথা নিমপুর এবং প্রতিবেশী গ্রামের সকলেই বলাবলি করে। যেইমাত্র কনভয়টা মীরগঞ্জের বড় রাস্তার মাথার বটগাছটার কাছে পৌঁছায় তখনই বিকট শব্দে বোমা ফাটে। ভয়ংকর শব্দে হুড়মুড়িয়ে কনভয়টা ছিটকে গিয়ে পড়ে সন্নিহিত খালে। আঘাত-শ্রাবণের জল-জমে-থাকা ভাদ্রের খাল মুহূর্তেই কনভয়টিকে গ্রহণ করে এবং খেনেড আর সলিল এই দুয়ের শিকারে পরিণত হয়ে সেনারা অনতিবিলম্বে মৃত হয়ে যায়। খেনেড ফাটিয়ে দ্রুত কেটে পড়ছিল নিশান। ততক্ষণে দ্বিতীয় কনভয়টা সন্নিহিত এসে পড়ে এবং দ্রুত ধাবমান নিশানের মস্তক ভেদ করে চলে যায় পাকিস্তানি সেনার এসএমজি বা এলএমজির গুলি। সবকিছুর নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রাচীন সেই বটের গাছ।

স্মৃতিত বাহারুলের বোধশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। নীরবে-নিভৃতে কী করে ছেলে তার যোদ্ধা হয়ে যায়! তাহলে যোদ্ধা হওয়া এতই সহজ! আর সে ভেবেই যাচ্ছিল, যুদ্ধ করতে গিয়ে এ-কদিনে যারা মারা পড়েছে তারা সবাই কমপক্ষে আঠারো। তার চোন্দোর ছেলে নিশান কী করে এক লাফে আঠারো হয়ে গেল! কোনোভাবেই হিসাব মেলে না তার। সবটাই এক অমীমাংসিত ধাঁধার মতো লাগে তার। সেই ধাঁধাকে আরো ঘোরালো করে তোলে তার স্ত্রী আমেনার প্রলম্বিত বিলাপ। স্ত্রীকে কী বলে শান্ত করবে বাহারুল! তবু কোন বোধে কে জানে, রাগ না ক্ষোভ না দুঃখ না বেদনা, কেউ বলতে পারে না, হয়তো পারে না বাহারুল নিজেও, বিলাপ আর কথকতার ভঙ্গিতে হয়তো নিজেকে হয়তো আমেনাকে হয়তো বিধাতাকে গুনিয়ে-গুনিয়ে বলতে থাকে — তুমিই তো ছেলে মরতে কইছিলি, হারাডা জীবন তোমার মুহে ছনলাম, মরস না ক্যান, তুই মরস না ক্যান! অহন হাচাই তোমার পোলা মরছে — মইর্যা গেছে! অশ্রু লবণ লালা ইত্যাদি মিলেমিশে আমেনার চেহারা তার চিরপরিচিতির বাইরে চলে গেছে এরই মধ্যে। কিন্তু তাও তার কান্নার সঞ্চয় কমে না। কাঁদতে-কাঁদতে দুই হাতে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে সে বলতে থাকে — হ গো হ, পোলারে আমি মরতে কইছি, আমিই হ্যারে মরতে কইছি, কিন্তুক ক্যামনে মরবো হেইডা কই নাই, তয় আজ হ্যা-ই আমারে দ্যাহাইয়া দিয়া গেল, ক্যামনে মরতে অয়! □



অনন্তকে যে পেয়েছিল আর যে পায়নি

হুমায়ূন মালিক



মুখটি তার আর দোলনচাঁপার মতো গৌর চিকন নেই — একদা রবিঠাকুর থেকে যে-উপমাটি ধার করে আমি তাকে চিঠিতে লিখি, তা তখন তার জন্য যথার্থই ছিল; কিন্তু পঁচিশ বছর পর ও এখন এক গোলাপে প্রস্ফুটিত — গোলাপি আভায় অভিজাত। আগে মুখটি তার ছিল একটুখানি ওভাল শেপে, এখন তা গোল, ভরাট। তাকে দেখে ধারণা করা যায়, অন্তত দশ বছর গোলাপটি ফোটার পর তার মধ্যে সময় থেমে গেছে, না হলে এতদিনে তা নেতিয়ে যেত। আমি তাকে চিনতেই পারতাম না, যদি-না ফোনের সিদ্ধান্তমতো ও পরত পিঙ্ক কামিজ আর জলপাই রঙের সালোয়ার। কিন্তু তাকে আমার চিনতে



অলংকরণ : রণজিৎ দাশ

না পারা তার চেহারার এমন পরিবর্তনের জন্যই কি! আমার স্মৃতিশক্তির দায়ও আছে নিশ্চয়ই। আমি যখন তাকে বলছিলাম, আমার পরনে থাকবে কফি কালারের... আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে ও বলে, বামন, তোমারে চিনতে আমার পৈতা লাগবে! আমি কফিরং ব্লেজার দূরে, কোনো ব্লেজারই পরিণি; তবু আমাকে দেখলে ওর চিনে ফেলা অসম্ভব নয়। ইউনিভার্সিটিতে যে স্বাতিকে আমার টাইপ বোধ হওয়ায় তা তাকে বললে (আদতে সেক্স-টাইপ!) ও বিষয়টাকে আমার-তার প্রেমলাভের চালাকি বলে পরিহাস করে বহু বছর পর দুবাই এয়ারপোর্টে সেই স্বাতির ভরাট শরীর আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও আমি তাকে ততক্ষণই চিনে উঠতে পারি না, যতক্ষণ না ও তার পরিচয় দেয়; যদিও ততদিনে ও এই মেঘলার মতো এতটা পালটে যায়নি। মেঘলা এখন তীব্র প্রতীক্ষার মধ্যে তার আড়ালে থাকা আমাকে কলের পর কল দিচ্ছে আর তার দশ গজের মধ্যে আমার সেটি মিউট। কিন্তু তার সঙ্গে আমার এহেন আচরণ কেন! প্রেমিক স্বভাব বড় ধূর্ত — কৃষ্ণের লক্ষ্য দক্ষিণে হলে তিনি পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়াবেন এবং চলতে শুরু করতেন উত্তরদিকে! অথচ আমার কাছে মেঘলার বহু বছর আগের একটি চুম্বনের প্রতিদান পাওনা আছে এবং তাকে তা দিতেই মূলত এবার আমার এই শহরে আসা। ও এমন এক চুম্বনের দাবি না করলেও মনে করে আমার কাছে তার জীবনের পরম জিম্মি রয়ে গেছে। আমারও কি তার কাছে

সবে যৌবনপুষ্ট এক অনাস্রাত শরীর আমাকে মাতাল করে তুললেও তাকে তখন বিয়ে করার চিন্তা দূরে, ভবিষ্যতেও তাকে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন দেখতে পারি না। অবশ্য এরই মধ্য আমি তার প্রেমে দিশেহারা।

কিছু পাওয়ার নেই, শুধুই প্রতিদান দিতে আসা! এদিকে তাকে দূরে, দীর্ঘ জীবনে একটা পরিপূর্ণ চুম্বন কাউকেই কি দেওয়া সম্ভব হয়েছে আমার! সে জ্যেষ্ঠের এক ঝড়ো সন্ধ্যা। এমন না বলে আসা দুর্যোগই বরং তখন মেঘলাকে যুক্তি দেখায় যে, এই দশা কোনো অভিসার অন্যের চোখে পড়ার আশঙ্কা কমিয়ে দিলো, ওই প্রাকৃতিক আর অবশিষ্ট সামাজিক ঝুঁকির মধ্যে সে এক অ্যাডভেঞ্চার। ঝড়ে-বৃষ্টিতে দুর্লভ স্পর্শে জড়িয়ে থাকার ভেতর বিদ্যুৎ চমকে সে আমার মুখ-গাল এক পলক দেখল। দেখে আমার পুরো ডান গালটি বাজ পড়ার তুমুল শব্দের মধ্যে তার অধরোষ্ঠে পোরার প্রয়াসে যে-চুম্বন করে তা নিছক পরিপূর্ণ নয়, পূর্ণতা ছাড়িয়ে। অদ্ভুত এক আবেশ-শিহরণের মধ্যে আমি বুঝি, চুম্বনই হতে পারে অনুভূতি প্রকাশের যথার্থ মাধ্যম। কিন্তু আমি তাকে তার চুম্বনের প্রতিদান দিতে গেলে (তার প্রকৃতি কী হতো কে জানে!) চোখে পড়ে অদূরে তার বাবা, হাতে দশাসই রামদা-উদ্যত। আমি দে দৌড় — ন্যারো এসকেপ। আমার ব্যাপারে তার বাবার বিশ্বাস, তথাকথিত বড়লোকের পোলা তার সুন্দরী মেয়ের দেহের জন্য প্রেমিকের ভেক নিচ্ছে। তার ওপর আমার মা ভদ্রলোককে সরাসরি ছেলেধরার অপবাদ দেওয়ায় তিনি এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ যে, আমাকে জায়গামতো পেয়ে গেলে খুনখারাবি ঘটান। এদিকে আমি তার নাগালের বাইরে থাকতে পারলেও মেঘলা তো আর পারে না। সেই সন্ধ্যায়ই তিনি তার অচরিতার্থ ক্রোধ ঢালেন মেয়ের শরীরে এবং তা চলতে থাকে। অতঃপর তা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে গিয়ে চূড়া ছোঁয়। মেঘলা তার বাবা-মার প্রবল চাপের মুখেও তাতে নারাজ থাকার কথা আমাকে গোপন চিঠিতে জানায়। ও আমাকে পরিপূর্ণভাবে পেতে আমাদের বিয়েকেই অপরিহার্য জ্ঞান করে; কিন্তু সবে যৌবনপুষ্ট এক অনাঘ্রাত শরীর আমাকে মাতাল করে তুললেও তাকে তখন বিয়ে করার চিন্তা দূরে, ভবিষ্যতেও তাকে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন দেখতে পারি না। অবশ্য এরই মধ্যে আমি তার প্রেমে দিশেহারা। এর মধ্যে অবশ্য মেঘলার নানা প্ররোচনাও ছিল, যেমন ওই চুম্বন, যেমন বহু প্রতিকূলতার মধ্যে যে দু-তিনবার মেঘলার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছে ও প্রতিবারই আমার হাত নিয়ে তার বুকে রেখেছে — হয়তো তার যা কিছু পরমধন তা আমাকে দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া। তবে জেনেটিক্যাল বা পরিবেশগত যে-কোনো কারণেই হোক, আমার বিশ্বাস, আমার মধ্যে অনন্য এক কামুক পুরুষ আত্মগোপন করে আছে। সে-পুরুষের কৈশোর নিজে-নিজেই পুলকের সন্ধান পেয়ে যাওয়ার পর থেকে দিনে কয়েকবার হস্তমৈথুন করে। তখন স্থলনের বয়স হয়নি। এরই মধ্যে বয়ঃসন্ধি পার হই এবং লোকমুখে শুনে-শুনে এ-কর্মের জন্য পাপ ও স্বাস্থ্যচিন্তায় মগজ আক্রান্ত। কিন্তু সে-ভয়ে তা না করলে, যদিও ভয়ের কঠিন বাঁধটি হামেশাই ভাঙে, কখনো না ভাঙলে অতৃপ্তি স্বপ্নদোষে গড়ায় আর তার মাত্রা অস্বাভাবিক ঠেকলে কবিরাজ-ডাক্তার, তাবিজ-কবজে উদ্ধার খুঁজে-খুঁজে আমি হতাশ। তারই মধ্যে সবে যখন আমি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে, তখন আমার সামনে মেঘলা এক সেক্স-আইকন হিসেবে উদিত।

কিন্তু আমার পক্ষে তখন তার ওই এক চুম্বনের প্রতিদানই দেওয়া সম্ভব হয় না। চাপে কিংবা এমন অবস্থা থেকে রেহাই পেতে, এমনও হতে পারে, এর মধ্যে পাত্রের গাড়ি-বাড়ির ডাকে দশম শ্রেণির ছাত্রী মেঘলার স্বপ্নও বাঁক বদল করে। কিন্তু দুর্লভ সেই সেক্স-আইকন অন্যের ভোগ্যা হবে — তীব্র ঈর্ষায় আমি জ্বলি। অ্যাসিড মেরে তা বিনাশের ভূত আমাতে আছর করে, নেশা করে দেবদাসের মতো নষ্ট হয়ে যাওয়ার আত্মপীড়নেও আক্রান্ত হই। কখনো শিল্পী, লেখক বা সুরকার হয়ে কালজয়ী এক ট্র্যাজিক সৃষ্টির অঙ্গীকারেও রক্ত তোলপাড়। আমি তাকে লিখি, বিয়ে যদি বসো আমি তোমার

চিঠিপত্র-ছবি সব তোমার বরকে দেখিয়ে তোমার সংসার ধ্বংস করে দেবো। জবাব আসে, আমি জানি তুমি কখনো আমাকে বিয়ে করবে না, তুমি আমাকে একটা পশুর মতো শুধু তোমার ভালোবাসার বলি করবে। তো তাই করো — সত্যি আমার বাঁচিবার আর সাধ নাই। ওই চিঠিতে তার মনের কথা প্রকাশ করতে যে-গান ও লেখে তার স্মৃতি মনে এলে তার সঙ্গে আজো সেই গান আসে — বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি, বড় দাগা পেয়ে বাসনা তেজেছি... এর জবাবে কী লেখা? ঠিক করতে-করতে ওর বিয়ে হয়ে যায়। এর পর আমি দ্য গ্রেট গ্যাটসবাইর বাই হয়ে ডেইজি কিংবা লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরার এরিজা হয়ে ফার্মিনার জন্য চির বা দীর্ঘকাল কুমার থাকতে পারতাম। আমি তেমন কোনো পথে যাই না বা যেতে পারি না কিন্তু তখন আমার, এমনকি মেঘলা তোমারও নিশ্চয়ই জানা ছিল না কোনো প্রেম কোনো এক টাইম-লাইনে শেষ হয়ে যেতে পারে আবার নাও পারে। এরই মধ্যে আমার জীবনে এমন কোনো মুহূর্ত আসেনি যখন আমি তোমাকে ভুলে ছিলাম — তুমি আছ আমার চেতনায় নিরবচ্ছিন্ন। ভেতরে-ভেতরে হয়তো তোমার জন্য আমার মধ্যে এক প্রতীক্ষা কিংবা এক চিরকুমারের বসবাস; অন্তত দিবা — আমার জীবন পর্যবেক্ষণ তেমনটাই বলে। তাকে চুমোয়-চুমোয় খুশি করতে গেলে সে কখনো বলে এসব তুমি মনতে না ঠোঁটতে দিতাছ, কখনো কয় — এই চুমুটা তুমি মনতে দিলেও আমারে দেও নাই, দিছ মেঘলারে।

ধীরে-ধীরে দিবা সন্দেহবাতিক্ষান্তই হয়ে পড়ে। গান শুনলে, কবিতা পড়লে ভাবত, আমি চলে গেছি তার ওই সতীনের কাছে। কবিতা পড়ছি, অকস্মাৎ বইটা টেনে নিয়ে ছুড়ে ফেলে, লাইটের সুইচ অফ করে বলল, আমি এখন ঘুমাব। ল্যাপটপে কাজ করতে-করতে গান শুনছি চটা গলায় বলল, গান বন্ধ করো।

কেন!

আমার পড়ার ডিস্টার্ব হচ্ছে।

আমি কি তবে গানও শুনতে পারব না?

অত গান শোনার শখ হলে কানে ইয়ারফোন লাগায়া শোন।

এরপর যখন ইয়ারফোন দিয়ে গান শুনছি হঠাৎ — কই শুনছ না, স্যালাইন আনো। আনবা কেন! তুমি তো চাও আমি মরি, বলে ছোঁ মেরে ইয়ারফোন টেনে নিতে গিয়ে তা ছিঁড়েই ফেলে।

এদিকে এমন আচরণ, তার ওপর দিনে-দিনে তার শরীর আমার কাছে যেমন নিয়মিত আহারের ডাল-ভাত হয়ে যাচ্ছিল, তাতে আমার অবচেতন হয়তো মেঘলাকেই, নয়তো তৃতীয় শরীর বা বৈচিত্র্যের সন্ধান ছিল। কিন্তু একটি পূর্ণ চুম্বনের ঠোঁট, গাল তথা দেহ সত্যি দুর্লভ। এক্ষেত্রে শুধু অঙ্গই নিশ্চয় শেষ কথা নয়, তা-ই হলে দিবার যে-শরীর তাতে ও-ই তার আধার হয়ে উঠতে পারত। এদিকে ও সঙ্গে থাকার পরও পথেঘাটে আমার দৃষ্টি যেমন নানা নারীর বুক-পাছার মতো বিশেষ অঙ্গের টানে অনিয়ন্ত্রিত আর আমার দু-এক ছাত্রী যখন আমার প্রণোদনা কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ায় বাসায় আসে বা ফোনে খোঁজখবর করে, তখন ও ক্রমে প্রচণ্ড বদরাগী হয়ে ওঠে। ও আমাতে এক বহুচারী পুরুষের সন্ধান পায়। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দশদিনের এসকারশন থেকে মধ্যরাতে ফিরে তার পাশে শুয়েছি, ও আমাকে জড়িয়ে চুমো খেতে থাকে। তাতে আমার ক্লান্ত শরীর সাড়া না দিলে সে বলে, কোনো ছাত্রী তোমারে তৃপ্ত করছে আমি জানি।

রাস্তাঘাট, মার্কেট, অনুষ্ঠানাদিতে সুযোগ পেলেই ও তরুণ থেকে মধ্যবয়সী পুরুষের সঙ্গে গল্প জমাতে সচেষ্ট। দু-তিনবার এমন হয় যে, বাসার ফোনে রিং হলো কিন্তু আমি রিসিভার তুলে হ্যালাও বলতেই কাট। আমার অনুপস্থিতিতে বাসা থেকে কোথাও গিয়ে সময় কাটিয়ে দু-একবার আমার কাছে ও ধরাও পড়ে। দিবা কি

ব্যভিচারী হয়ে উঠল! নাকি এ প্রতিহিংসা দেখানোর পাতানো খেলা! নিজেকে কেমন ওথেলো-ওথেলো লাগে!

এদিকে পাড়া-পড়শিও ঠাহর পাচ্ছিল, এক পুরুষ তার ঘরে অনবরত নারীর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারা হয়তো এর এক জঘন্য পরিণতি দেখার প্রতীক্ষায়। তবে এক সময় আমার বিশ্বাস জন্মে, এই আচরণ দিবার শেষ অস্ত্র এবং দিনে-দিনে তা ভোঁতা হয়ে আসবে।

কিন্তু এক সকালে সে তার নিজের জিনিসপত্র দুটি লাগেজে গোছগাছ করে আমার মুখোমুখি দাঁড়ায়, আমি যাচ্ছি। চাইলে তুমি অনিন্দিতাকে রাখতে পারো।

এরই মধ্যে দিবা যে তাকে একতরফা ভালোবেসে এতকাল কুমারী হয়ে তারই প্রতীক্ষায় থাকা প্রেমিকের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে তা আমি টেরই পাইনি।

আমি আমাদের মেয়ে অনিন্দিতাকে আমার মাকে গছিয়ে কেমন সর্বস্বান্ত হয়ে যাই!

দিবার পেছনে পড়ে থাকে আমার সাধ্য-সাধনায় কেনা কখানি শাড়ি-গয়না-ফার্নিচারের দশ বছরের একটা দুর্বহ সংসার। আর থাকে প্রায় প্রথম থেকে অসংলগ্ন, অসম, ছেঁড়াফাঁড়া, ছুঁইছুঁই করে ছুঁতে না পারা এক দেহজ সম্পর্কের খণ্ড-বিখণ্ড।

মেঘলার শরীর, শরীরের আবেগ, চুম্বন সবই এখন তার ওই প্রেমিকের — এই দুঃসহ যন্ত্রণা, তীব্র দেহজ তিয়াস, অপমান-ঘ্রানি-পরিতাপ-অনুশোচনা-অভিমান-ক্ষোভ যখন আমায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে আর তাতে জীবনের অবসান ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ দেখা যায় না অথচ সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব তো তখন আমি মেঘলাকেই খুঁজলাম, সম্পূর্ণ অনাস্থা, অনিশ্চয়তা নিয়ে।

এঘাট-ওঘাট ছুটে তার ফোন নম্বর জোগাড় করে যখন কথা বলার শুরু, তখন থেকে শেষের কবিতার বউ ঘরের ঘটিভরা প্রয়োজনের জল আর ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা প্রেমিকা পুকুরভরা জলে অবাধ আনন্দ-সাঁতারের দর্শনটার ভাঙচুর হতে থাকে। রবিবাবু, যার দেহ না আগে পাওয়া গেল, না ভবিষ্যতে পাওয়ার কথা আছে তেমন ফানুসে তৈরি নারীকে চেতনে লালনের আদর্শ নিয়ে বাঁচার মতো পরিহাস আর কী হতে পারে!

এখন মেঘলায় এ শুধু আমার সম্পন্ন এক চুম্বনের আধার তথা যৌনদেবীকে খোঁজা নয়, শেষ আশ্রয়েরও সন্ধান যেন।

যে-মেঘলা এখন আমার আওতার মধ্যে, সে বাস্তবত কেমন আশ্রয়! আদৌ কি আশ্রয়! আমার সঙ্গে একবার দেখা — দেখার মধ্য দিয়ে যা কিছুই ঘটুক তাকে আবার তার সংসারে ফিরে যেতে হবে। মাধ্যমিকে পড়া ছেলে, উচ্চমাধ্যমিকে পড়া মেয়েকে তার পরকীয়ার কলঙ্কে ভাসিয়ে সে তো এখন নতুন করে ঘর বাঁধতে পারে না। তা পারা উচিত কি! এদিকে মেঘলার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ হওয়ার পর থেকে দিবার সঙ্গে আমার দশ বছরের সম্পর্ক অদ্ভুত সব প্রশ্নে বিদ্ধ হতে থাকে। পরিশেষে যা জবাব আসে তার মর্ম যেন এই, যে বিয়ে এমন দীর্ঘ সময়েও একটা পরিপূর্ণ যৌনসুখ দিতে অসমর্থ তা কোনো বিয়েই নয়। এক পরিপূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্ক আমার জীবনের কাছে পাওনা আছে।

এখন তবে মেঘলা থেকে আমি কী পেতে পারি? ওই শরীর! হ্যাঁ। আর যাই হোক এতদিনে এ কখন যৌনতার এক উর্বর ক্ষেত্র হয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষমাণ। আদৌ কি তা! দিবার মধ্যে গত দশ বছরে যা পাইনি, এখন মেঘলাতে তা পাওয়া কি সম্ভব! আর মেঘলাই কি শুধু একজনা মানে তার হাজবেন্ডের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে? কোনো অতৃপ্তি থেকে কিংবা বৈচিত্র্যের পিয়াসে কি কারো সঙ্গে মজেনি? অথবা দেয়নি সাড়া কোনো পরম পুরুষে? তারপরও সে যে চরম ও পরম সুখটি পেয়েছে তা কি নিশ্চয় করে বলা যায়!

কোথায় যেন পড়েছে একদা বিমল কর, সম্ভবত বিমল কর সমরেশ কী সুনীলকে একান্তে ডেকে কন, জানিস সারাজীবনেও পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটা সেব্র করতে পারলাম না। এমন অতৃপ্তি — যেন তা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো এক মৌলিক দাবি, পরম চাহিদা, যা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা ও অনেকের কাছেই শুনেছে। শ্রেণিচেতনা নিয়ে মতভেদ থাকলেও শ্রেণি মূলত দুটিই — শোষক ও শোষিত, পাপী ও পুণ্যবান, তাজমহল দেখার আগের ও পরের মানুষ, যারা কোকিলের গানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে আর যারা পারে না, যারা দেহভোগে পরমকে পেয়েছে এবং যারা পায়নি। তার মনে কয় বিষয়টা নিয়ে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থা বা কোনো এনজিওর মতো একটা জরিপ ও করে বসে আছে। এ আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় বটে। যেমন — রোকন তার জীবনের সবচেয়ে তৃপ্ত যৌন-সুখটা পেয়েছে পাড়ার সুন্দরতমা বাবলিতে, কিন্তু আশ্চর্য, তা কিনা বাস্তবে নয়, স্বপ্নে।

রফিকুল্লা তার বৈচিত্র্যময় যৌনজীবনে পরমানন্দকে পেয়েছে গেলমানের মতো সুন্দর এক বালকে।

আমি আমার বান্ধবী দীনােকে আমার সঙ্গে একবেলা শোয়ার প্রস্তাব দিলে ও চোখেমুখে কৌতূহল ফুটিয়ে কয়, তোর বউরে পাঠায়ে দিস। আমার জীবনে পরমানন্দগুলো আমি পাইছি আমাদের ফ্রেন্ড রশিদের মেয়ে জিনিয়ার সঙ্গে মিলনে — ব্লু, দ্য ওয়ারমেস্ট কালার।

আর রশিদ তো এক নাদুসনুদুস হিজড়ার সঙ্গে লেগেছিল পাগলের মতো।

সাইফুলের প্রিয় পেশন মাস্টারবেসন, বিয়ের মধ্য দিয়ে কল্পনায় দীর্ঘকাল যাকে ইচ্ছা তাকে ভোগ এক ক্ষীণকায় নারীতে স্কুইচ হয়ে পড়ে।

তার বন্ধুদের মধ্যে এক জটিল দেহচেতনাদারি মেহেদী। সেই কৈশোরেই সে তার সমবয়সী কাজের মেয়েকে পাছবাড়ির ঝোপে ডেকে নিয়ে সেব্র করার চেষ্টা করে কিন্তু গায়েগতরে সেভাবে কাবু করতে না পারা কিংবা আয়ত্তে আনা সম্ভব হলেও মেয়েটির হরমোনাল সাপোর্ট না পাওয়ায় তা সম্ভব হয় না। তবে শ্রেণিবদ্ধ রঞ্জুকে পাল্টা সুযোগ দেওয়ার শর্তে একতরফা মজা লুটে কথা না রাখায় আর তাকে বাগে পায় না। নানা অচরিতার্থতার মধ্যে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতিটা তার পতিতালয়ের। তার স্ত্রীর কাছ থেকে যে-যে কারণে পরম সুখটা ও পায়নি, তার একটি চুম্বন-সংকট — মুখে দুর্গন্ধ। আর পতিতালয়ে তার অভিজ্ঞতাটা এমন যে, কোনো বণিতাই তাকে রিল্যাক্স দশায় মিলিত হতে দিতে নারাজ। এর পেছনে হয়তো মাসিদের চাপই প্রধান। কিন্তু রিয়া নামের বা নামদারি টসটসে যুবতী তার অধীরতাকে থমকে দিয়ে বলে, এরই মধ্যে নিশ্চয়ই বহু নারী নিংড়ে অনেক মধু আপনে খাইছেন, আজ আপনারা আমি আপনার মুখে তুলে এমন মধু খাওয়াব —

যখন আমি কলেজে ফাস্ট ইয়ারে, আমার সংমার ভাই অনার্সের ছাত্র রাসেল আমাকে বাড়িতে একা পেয়ে জড়িয়ে ধরে। আমাকে কোনো জবরদস্তি করে না ও। যুবতী মেহেদীর ঠোঁটে চুমো খেতে-খেতে তার নিজের কথা এমন অবলীলায় বলে চলে, যেন সে এতদিনে এমন কাউকে পেয়েছে যাকে ও তার সব খুলে বলতে পারে। রিয়া মেহেদীর শার্ট-গেঞ্জি, তার নিজের ব্লাউজ-ব্রা খোলে — অতঃপর তার উন্মুক্ত স্তন মেহেদীর খালি বুকে চেপে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। তাদের গভীর ভালোলাগার মাঝে দুজনার সম্পর্ক তৈরি হওয়ার অন্তরায় যে সং মামা-ভাগির এক কৃত্রিম দেয়াল রাসেল তা তাকে বুঝিয়ে বলে। সেও তা বোঝে কিন্তু বাস্তবের জাল অতিক্রম করতে বাধে, আবার দিনে-দিনে গোপন স্পর্শ ও কথায় গলতেও থাকে। গল্পটা এই পর্যন্ত পৌছতে-পৌছতে রিয়া তার নিজের শাড়ি-পেটিকোট, মেহেদীর প্যান্ট, আন্ডার-প্যান্ট খুলে ফেলে।

এক পর্যায়ে রাসেলের সঙ্গে সে পালায়। কিন্তু গাঁটের টাকা শেষ হলে তাকে হোটেলে ফেলে সে পালায়। ও পড়ে হোটেলের লোক, পুলিশ আর নারী দালালের খপ্পরে। এভাবে মান-সম্মান হারা তারও যেন আর সংসার সংসার, আপন গাঁয়ে ফেরার উপায় থাকে না। কয়েক মাস আগে তার ঠাই হলো এখানে। আর এতদিনে ও মেহেদীর মধ্যে সুঠামদেহী এক যথার্থ কামুককে পেল।

এদিকে মেঘলা শুধু আমার কাছ থেকে কেন একটি সম্পন্ন চুম্বন হয়তো তার হাজবেদ বা অন্য কারো কাছ থেকেও পায়নি। পেলে এত বছর পর আমার ডাকে আজ এমন সাড়া দিত! কিন্তু ইতোমধ্যে মেঘলার কতবার কতজনার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে, আদৌ শুধু তার স্বামীর সঙ্গে অতৃপ্ত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবন পার হচ্ছে কিনা এ নিয়ে সে কোনো কূলেও পৌঁছতে পারে না। অবশ্য এর সঙ্গে আরো কত জটিল অনুষঙ্গই না থাকতে পারে।

এখন তার ত্যক্ত-বিরক্ত মুখে যা ফুটছে তা আমাকে মহাকর্ষে টানে। কিন্তু কী তা — ভেদ করতে গিয়ে তার কাম-লাবণ্য-পেটা বাহু, বুক, নিতম্বের বিপরীতে তলপেটাম্বলের সঙ্গে এর এক কামজ ঐক্য খুঁজে পায়। সব মিলিয়ে মনে হয় সে এখন দারুণ উপভোগ্য হতে পারে, কারণ দোলনচাঁপার কুমারী শরীর, চোখে-মুখে বাঁধ ভাঙার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকলেও অভিজ্ঞতাপুষ্ট না হওয়ায় ও-দেহে এমন তোলপাড় করা নদী ছিল না। তখন হয়তো জীবনের ঝুঁকি নিলেও দোলনচাঁপাকে আমি পেতাম না; কিন্তু এখন তা পূর্ণ প্রস্তুতিতে গোলাপ হয়ে আমার নাগালের মধ্যে অথচ তাকে কিনা তুচ্ছ, অর্থহীন করে দুর্বীর এক আকর্ষণে টানছে সুবর্ণা।

দশটা থেকে একটা সুবর্ণার পরীক্ষা, তাই এর সকালের অংশটাকেই মেঘলার অভিসারের সুযোগ হিসেবে নেই। মেঘে-মেঘে আর যানজটে তা যে বারোটা বাজাবে কে জানত! আর পরীক্ষা শেষে ফেরার পর তার ভাই ও ভাবি না ফেরা বিকেল ৫টা পর্যন্ত মেঘলা বাসায় একা। অথচ এখন মেঘলার সঙ্গে দেখা করলেই এই সুযোগের সময় সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তো মেঘলা, এতকাল ধরে তোমার জন্য বয়ে আনা আমার চুম্বন এরই মধ্যে কোনো জাদুকাঠির ছোঁয়ায় শুধু একবার তোমাকে দেখার মধ্য নিঃশেষ হয়ে গেল!

সুবর্ণার পছন্দ টি-শার্ট, ফতুয়া — আমি আকাশরং নীলের মধ্যে মেঘের বিচিত্র ছোপ টি-শার্ট পরে এসেছি মেঘলার কাছে। কিন্তু সুবর্ণা এখনো এক সাধনা মাত্র। এই সাধনায় সাফল্য বাস্তবের বিবেচনায় অসম্ভব, আর এখানে অস্বাভাবিক কিছু সুযোগ যদি আসে তাতেও আমার মূল লক্ষ্য ভেদ হওয়া অনিশ্চিত। তো এই অনিশ্চয়তারই পথে যদি যাত্রা করতে হয় তবে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শুধু সময় অপরচুনিটিকে অসম্ভবের ওপারে ঠেলে দিতে পারে।

তো আমি মেঘলাকে দেখা না দিয়েই সুবর্ণার উদ্দেশ্যে রিকশায় চড়ি।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর রিকশা থেকে নামার সময় সে অস্বস্তি বোধ করে — এখনো যদি মেঘলা আসাদ মার্কেটের মুখে অপেক্ষায় থেকে থাকে, তবে তার প্রতীক্ষার সময় দেড় ঘণ্টা পেরোল। এ কেমন বিবেকহীনতা!

মেঘলা...

কও!

আমি ডিসিশন চেক করছি।

মানে!

মেঘলার কণ্ঠ থেকে একটা ধাক্কা আমাতে প্রশ্ন জাগায় — এভাবে সরাসরি বলা ঠিক হচ্ছে! আবার সিদ্ধান্ত আমি পালটেছি সেটা ঠিক কিন্তু এই পালটানো তো শেষ কথা নাও হতে পারে। সুবর্ণাকে নিয়ে যা ভাবছি তা অচিরেই এক উজ্জট ধারণা বলে প্রমাণ হতে পারে। কিংবা একটা সুন্দর ফানুস কোন খোঁচায় যে চুপসে যাবে! আর

তাতে মেঘলাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান হতে পারে হঠকারিতা — বড় অনুশোচনার। তবে ভালোবাসার, যৌনতার নিজস্ব এক শক্তি আছে যা আপাত অসম্ভবকে জয় করতে সমর্থ। তবু মেঘলার বিস্ময়ের জবাবে আমি ঝুঁকি নিই না —

মানে... একটা ঝামেলা হইছে।

আমি টেনশনে ছিলাম — কোনো অ্যান্ড্রিডেন্ট হইলো কিনা! তো ঝামেলাটা কী?

ওই অ্যান্ড্রিডেন্টের মতোই; এখনো আমি তার চক্করে। ডোন্ট ওরি — পরে আমি তোমারে সব বলব।

আমারে কিন্তু দুর্ভাবনায় রাখলা।

মনে হচ্ছে আমি মেঘলাকে শূন্যে ঝুলিয়ে এ-বেলায়, এ-বয়সে সুবর্ণা নামের এক দিবাস্বপ্নের ঘোরে সিঁড়ি ভাঙছি।

ডোর-বেল বাজাতে হাত বাড়ানো এরই মধ্যে দরজা খোলে সুবর্ণা। আমি কলের পর কল দিচ্ছি কিন্তু রিসিভ করছেন না, টেনশন হচ্ছিল ভারি।

আমি কোনো জবাব দিতে পারছিলাম না, কারণ আমি এমনভাবেই তার দৃষ্টিবিদ্ধ ছিলাম যেমনটি পাখির দুই ঠোঁটের করাতে ধরা পড়া একটি প্রজাপতি।

ফোন ধরেন নাই কেন! কী হইছিল?

আমি যে তার জন্য কী ফেলে কীভাবে ছুটছি তা কি সুবর্ণা জানে!

আমার দৃষ্টি মার্বেলের মতো তার চোখ থেকে ভরাট বুক গড়িয়ে ক্ষণিক স্থির হতে না হতেই ও ঘুরে ভেতরের দিকে এগোয়। এই বেহায়া-দৃষ্টি তার গলা, বুক, বাহু, নিতম্ব, উরু চষে তাকে ক্রমশ জাগরিত করে — তার দেহভঙ্গি আমাকে তাই জানান দেয় বুঝি!

আমার দেহচেতন কি জন্ম-জন্মান্তর ধরে এরই তেপ্টায় জ্বলছে!

খাবেন তো?

হ্যাঁ।

হাত-মুখ ধুয়ে আসেন।

বুয়া রান্নাবান্না সেরে, খেয়ে এরই মধ্যে বিদায় হয়েছে। রকিব, তার বউ দুজনই যথারীতি অফিসে। এ সময় তারও এভাবে এখানে ফেরার কথা ছিল না আর তার ফেরার এই দুরভিসন্ধিতে সুবর্ণার কোনো যোগসাজশও নেই কিন্তু কাল বিকেলে এ-বাসায় এসে আজ সকাল পর্যন্ত থাকার সময়টুকুতে এই যুবতীকে দেখে-দেখে তার দেহে যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় তাতে সেও আক্রান্ত বলেই ও-ও নিশ্চয়ই চেয়েছিল তার ভাই-ভাবির অলঙ্কে সে এভাবেই আসুক, সেজন্যই তাকে তার বারবার ফোন।

খাবার টেবিলে চামিচ ধরা তার ডান হাতটা আমি বাঁ-হাতে চেপে ধরার সুযোগ নিয়ে বলি, আর দিও না, আর...

একটা শিহরণ আমি তার মধ্যে টের পাই। খাওয়ায় ওঠা-বসা-হাত ধোয়া ইত্যাদির মধ্যে আমি একবার তার উরু, একবার বুক ঘেঁষার সুযোগ নিই।

ও কি মেঘলা কিংবা দিবার চেয়ে সুন্দরী? সুবর্ণার সৌন্দর্যে অন্য এক মহিমা — নিপুণ শিল্পীর গড়া দেবী প্রতিমা ও, শিল্পী তাকে প্রাণের মহিমাও দিয়েছে — তাতে শি ইজ আউটস্ট্যান্ডিং!

ও কোন তল্লাটের সে-ই যুবতী যার জন্য বুড়োরা ক্রিন সেভ করে পাকা চুলে কালি দেয়, তারা সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যসচেতন হয় — তাতে তাদের আয়ু বাড়বে, যুবক বিষপানের মতো নেশা করে দেবদাস হয়, কেউ কোকিলকণ্ঠ হয়, তাকে নিয়ে লেখা কারো কবিতা খ্যাতি পেয়ে সংক্রামক ব্যাধির মতো হৃদয়ে-হৃদয়ে ছড়ায় — কবি অমর হয়। আমার কী হবে!

খাওয়ার পর ভাতঘুমের অজুহাতে বিছানায় গিয়ে পুরুষের সেই পুরনো ছল। দাও, তোমার হাতটা দেখি।

কী দেখবেন! ও হাতটা ঠিক বাড়ায়, নিশ্চই হস্তরেখা নয়!

আমি তার হাতটা ধরতেই জ্বরের কাঁপুনির মতো একটা শিহরণ তার শরীরে ছড়িয়ে যায় — আমি তাতে সংক্রমিত।

এরই মধ্যে সে কেমন তটস্থও — সমস্ত প্রাণিজগতে যেমন, ভেতরে মিলনের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রী প্রাণীরা এসকেপ করতে ছোট্টে, অচেতনে এই ভয় যে কপিলের দায়টা তো তাকেই বহন করতে হবে।

দায়মুক্তির চাবি যে আমি বহন করে এনেছি সে-কথা সহসাই সুবর্ণাকে বলতে সংকোচ লাগে! আমাকে আতঙ্ক তাড়া করে, যে-কোনো সময় রকিব বা তার বউ চলে আসতে পারে। সুবর্ণা জানিয়েছে, তারই বিয়ে-সংক্রান্ত কাজে সন্ধ্যার ট্রেনে আজ ভাই-ভাবি ঢাকা যাচ্ছে।

এরপর আমি একটি চুম্বনের অনুমতি চাইলে ও না, না, না বলে সামান্য সরে যায়। আমি হাত বাড়িয়ে তার নাক টিপে ধরে নাড়া দিই। এরপর কাছে সরে গিয়ে তার দুই কাঁধে দুই হাত রেখে গলার পেছনভাগ আঙুলে জড়িয়ে মুখটি আমার মুখ বরাবর টেনে এনে ঠোঁটে চুমো খাই। তার অধর আমার অধরোষ্ঠে নেই, তারপর ওপরের ঠোঁট। এর মধ্য দিয়ে আমার অবাধ চুমোর উপদ্রব — এমন উপদ্রবের তীব্র আবেশে ও আমাতে ঢলে পড়ে।

আমি তাকে শুইয়ে দিই।

আমি তার কামিজের বোতাম খুলতে থাকলে সে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু যে-কারণে খোলা — তার বুক উদাম করা তাতে লজ্জা-ভয়ে ও অদ্ভুত সুন্দরে সংকুচিত।

স্তনের আকৃতি গম্বুজের — প্রাচীন বাৎসায়ন থেকে অদ্যাবধি এ-কথা সচল কিন্তু তা যে এমন এক অসাধারণ স্থাপত্য হতে পারে তার প্রমাণ তার বুক।

সুবর্ণা হয়তো কামকলায় অভিজ্ঞ কোনো নারী নয়। আদৌ সে বাৎসায়ন পড়েছে কিনা!

বাৎসায়ন কিংবা তার নামে সমন্বিত প্রজ্ঞায় পুরুষচৈতন্যের আধিপত্যের উর্ধ্বে আমি সুবর্ণার সুখকে সমান গুরুত্ব দিতে চাই।

কামকলায় এমন অভিজ্ঞ নিশ্চয়ই সুবর্ণা নয় যে, প্রথম দফায়ই তেমন এক সম্পন্ন সুখের যৌথ উদ্যাপন সম্ভব।

কিন্তু এ কি তার প্রথম দফা? ইজ শি ভার্জিন?

এটাই কি তোমার প্রথম? সুবর্ণাকে ও প্রশ্ন করতে পারে, এমন প্রশ্নের জবাবও সত্য হবে, না মিথ্যা তা বলা অসম্ভব বরং তা তাকে একটা চোবান দিয়ে এক বিব্রতকর দশায় ফেলে দেওয়া হতে পারে। তাই প্রশ্নটা না করে ও অন্যদিকে —

আমি তার পাজামা খুলে দেখি গোপনাজের প্রদীপে শিখা লেলিহান। তা থেকে আমার গোপন — সারা অঙ্গে পুলকের আগুন ধরে যাক।

তার প্রদীপশিখায় আমার ক্ষুদ্রাঙ্গ স্পর্শ করার সঙ্গে-সঙ্গে গভীর এক ধ্বনিতে সুবর্ণা আহ্ বলে উঠলে আমি আতঙ্কিত কিংবা বিব্রত — এ কি সতিচ্ছদ ফাঁড়ার যন্ত্রণা! না — এ নিশ্চয়ই গোপন প্রদেশে প্রথম বা উন্মুখ স্পর্শ-উদ্ভূত এক পরম শীতকার।

আমি তাকে এক স্বাভাবিক দশায় নিতে তৎপর। আমি তার তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে আমার বৃদ্ধাঙুল রেখে তার যোনির পেশি সংকুচিত-প্রসারিত করার পদ্ধতি বোঝাই। কিন্তু চেষ্টা করেও ও তা পারে না, দিবা ওই মুদ্রায় অপূর্ব এক পুলক আমাতে ছড়িয়ে দিত। পূর্বসূরির হারানো চরিত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটায় শুধু গুটিকয় মানুষই যেমন তার কান নাড়াতে পারে এটা হয়তো তেমন কোনো ব্যাপার। কিংবা সুবর্ণা আনাড়ি বলে...

তবু আমি তথা আমরা পরম আত্মতৃপ্তির সাধনা করি — ধরতে-ধরতে তা ধরা দিচ্ছে না যে! তার পরও এরই মধ্যে আমি যেখানে পৌছি সে এক অভিনব গন্তব্য, নতুনতর প্রাপ্তি। হয়তো জগতের আয়তনের মতো এ-সুখটাই অনন্ত, যার শেষ নেই, শেষ

বলে তাই সেটিকে পরিপূর্ণতার আয়ত্তে আনা যায় না। এই সুখের প্রশ্নে পারফেকশনিস্ট হওয়া বাতুলতা মাত্র। কিংবা স্বপ্নে বা কল্পনায়ই কেবল এর চূড়া স্পর্শ করা যেতে পারে।

রকিব বাসায় ঢুকে তাকে দেখে এরই মধ্যে সুবর্ণার সর্বনাশ হয়ে গেল কিনা তেমন এক আশঙ্কায় বেচয়েন।

মেঘলার সঙ্গে দেখা করতে আসছি বিষয়টা আমি কয়েকদিন আগে রকিবকে জানিয়ে তার বাসায় আশ্রয় পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলে ও আমাকে স্বাগত জানায়। এখন তার বেচয়েন দশার বিপরীতে আমি স্বাভাবিক থাকায় সচেতন। তাকে জানাই, সকালে স্বামী বাসায় থাকায় মেঘলা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পিছিয়ে নিয়েছে বিকেলে। তো বিকেলে তার সঙ্গে আমার দেখা হোক আর না-ই হোক সন্ধ্যার বাসে আজ আমাকে ফিরতেই হচ্ছে, কারণ মেয়ে আমার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

আমি মেঘলাকে নিয়ে আকুলতা, অনিশ্চয়তা, টেনশন দেখিয়ে বিকেলে রকিব, তার বউয়ের কাছ থেকে বিদায় হই।

ওরা সন্ধ্যার ট্রেন ধরতে বাসা থেকে বেরোনোর পরপর সুবর্ণা আমায় ফোন করে।

সুবর্ণা, আমি একটু সময় নিচ্ছি — ট্রেনটা স্টেশন ছাড়ুক।

আমি যখন সুবর্ণার উদ্দেশে হোটেল থেকে বেরোচ্ছি তখন সন্ধ্যা সাড়ে আটটা। এখন অনাহূত কেউ ওই বাসায় না এলেই আমাদের মোক্ষ লাভ।

ড্রইংরুমে ঢুকে সুবর্ণাকে দেখেই বুঝি ফ্ল্যাটে আজ ও একা বলে স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, পরম এক আনন্দ উদ্যাপনের জন্য উদযীব। এক সম্পন্ন সুখের জন্য আমি সারাক্ষণ নানা আসন-কামকলায় হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। তার সুগঠিত নিতম্ব দেখে আমি পশুদের সন্তোষকলায় তাড়িত। একদা দিবার নিতম্বও আমাকে পশ্চাদান্দ হয়ে, এমনকি গরু-ঘোড়ার কায়দায় রমণে প্ররোচিত করে। কিন্তু বাস্তবে কোনো বৈচিত্র্য বা বাড়তি কোনো সুখ তাতে মেলেনি; হয়তো তা এজন্য যে, সেই সময়টাতেও আমরা ভেতরে-ভেতরে সন্দেহ, অসন্তোষ নিয়ে বিবদমান। সুবর্ণার ক্ষেত্রে প্রথমবার তেমন কোনো পরিকল্পনা দূরে, খুব একটা চিন্তা-ভাবনারই অবকাশ ছিল না। আমি তার শরীর ও সৌন্দর্যের ঘোরে পড়ি। ঘোরের মধ্যে শঙ্কাও — যদি ধরা পড়ে যাই! হয়তো ভয়-ভালোবাসা মিলিয়ে সে এক অভিনব সুখও।

এরই মধ্যে আমি বারকয়েক তাকে জড়িয়ে ধরি, চুমো খাই, ব্রার ভেতর দিয়ে হাত দিয়ে নগ্ন সুটোল বুকের স্বাদ নিই।

খাওয়া-দাওয়া-দাঁত ব্রাশ ইত্যাদি সারা হলে ও আমাকে তার ভাই-ভাবির বেডরুমে নিয়ে যায়। খাটে চোখ যেতেই বুঝি পিঙ্ক প্রিন্টের গোলাপে আকীর্ণ বিছানা-বালিশে ফ্রেশ শয্যাটি ওরই পাতা। কিন্তু আমার কেন পাটক্ষেত, বাঁশবনে নিবিড় দৃশ্যের কথা মনে আসে!

বিছানায় পাটক্ষেতের নিবিড়তা আনতে আমার অচেতন থেকে হাত বাড়িয়ে কেউ লাইট অফ করে। অতঃপর এক সান্ন্য আঁধারে তা সুবর্ণাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে।

তোমার গায়ের কোথায় হাত দিলে তুমি সবচেয়ে বেশি মজা পাও।

যেখানেই হাত দাও। তুমি যেখানেই হাত দাও সেখান থেকে এক গভীর পুলক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেন তোমার হাতে জাদু আছে!

কেমিস্ট্রি অব সেক্স। হয়তো আমার স্পর্শ তার বড়ই কাক্ষিক তাই এমনটি ঘটে। কিংবা —

আমার হাত কোমল নয়, হয়তো এ জন্মগত কিংবা ছোটবেলায় বালতি টেনে বাগানে পানি ঢালা বা রিং ঝুলে লম্বা হওয়ার সাধনা থেকে এ হতে পারে; কিন্তু এই কঠিন হাত যখন তার বুক, উরু,

বাহু, পেট মর্দন-মস্থন করে, দেহের যত্রতত্র হাতড়ে ফেরে ও পুলকে খেইহারা, বুঝে উঠতে পারে না তার সবচেয়ে সুখের উৎস কোথায়! মেঘলা নিশ্চয়ই সবচেয়ে সুখ পেত বুকে হাত পড়লে যে-কারণে সুযোগ পেলেই সে আমার হাত নিয়ে...

কিন্তু অর্গাজম!

আমি জানি স্থূল পুরুষের মতো নারী দ্রুত সে চূড়ায় উঠতে পারে না, চায় না কিংবা তার কাছে পথের আনন্দ, বাঁকে-বাঁকে সৌন্দর্য উপভোগ ততোধিক চাওয়ার। আমি ভালোবাসার কথা বলতে-বলতে আবার পাহাড়ের পাদদেশে নেমে যাত্রা শুরু করি — বহুদূর আসিয়া মর্দ রওনা হইল।

এ পর্যায়ে আমার মনে হয়, সুবর্ণার একুশ বছরের চূড়ান্ত যৌবন কামকলায় অভিজ্ঞ এমনই এক পুরুষ চেয়েছিল, অনাড়ি তরুণ, যুবক নয়।

সুখের গিরিপথ বাইতে-বাইতে আমার মনে কয় আসলে এ এমন এক সুখ যা অশেষ এবং কেউ বলতে পারবে না আমি তাকে সম্পূর্ণ পেয়েছি। সুবর্ণার দেহের অক্লিসন্ধি খুলে দেখতে-দেখতে আমি উপলব্ধি করি, এই দেহ এমন এক শিল্প যে, এই শিল্পদর্শন কখনো শেষ হওয়ার নয়। এভাবে দেখতে-দেখতে বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আমার মনে হয় রূপে-কামে ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠা। এমন এক সুন্দরীকে চুম্বনে, পীড়নে, মর্দনে, মস্থনে এক মাতাল লীলার মগ্নতায় আমার মনে হতে থাকে এ এমন এক রস, যা যতই পান করো সাধ মেটার নয়। বাস্তবে তাই কারো মধ্যে পূর্ণ তৃপ্তি বা শেষ না-পাওয়াই এই সাধনার সার।

সুবর্ণা তুমি আসলে এক ছর।

আপনে!

আপনে না, তুমি।

তুমি তবে জান্নাতি পুরুষ।

কোন পুণ্যবলে যে আমি বেহেশত আর তোমারে পাইলাম!

আর আমি যে এমন ভোগ্যা ছর জন্ম পেলাম!

কেন, তুমি কি সমান এনজয় করছো না!

নিশ্চয়ই!

যেহেতু তুমি ছর আর আমি জান্নাতবাসী সেহেতু জানো নিশ্চয়ই আমাদের এই সুখ কোনো অর্গাজমে নিঃশেষ হওয়ার নয়।

কিন্তু এ আমাদের ইহজনম।

আমরা অন্তত আজ রাতভর তা উদ্‌যাপন করব।

দিবা ও আমি দু-একবার এটা সারারাত দীর্ঘায়িত করতে গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হয় তৃপ্ত, না হয় ক্লান্ত হয়ে ইতি টেনেছি।

আজো হয়তো তা ভোররাত পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু এরই ভেতর আমরা যে-পর্যায়ে পৌঁছেছি তাতে সুবর্ণাতে-আমাতে এখন এক পরিপূর্ণ সুখ উদ্‌যাপন নিশ্চয়ই সম্ভব।

এরই মধ্যে ও আমার গালে এমনভাবে অধরোষ্ঠ চেপে চুমো খায় যে, জোকের মতো সে আমা থেকে জীবনের পরম গুণে নিচ্ছে! তাহলে...

আমি সুবর্ণার ঠোঁটে, গালে তথা মুখে চুমো খেতে থাকি। এসব তা-ই যা আমি বহু বছর আগের জ্যৈষ্ঠের এক ঝড়ো সন্ধ্যা থেকে অধরোষ্ঠে বইয়ে বেড়াচ্ছি — এ আমার এক বড় অপ্রাপ্তি, তৃষ্ণা উদ্ভূত অমিয়।

আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত চুম্বন-পীড়ন-কম্পন-মস্থনের মধ্য দিয়ে আমার অধিত, অর্জিত, ব্যবহৃত — পরিকল্পিত কামকলা হারিয়ে যায়। অবশ্য বাৎসায়ন এমন স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক মিলনকেই উত্তম বিবেচনা করেন। দিবার ক্ষেত্রে আমি তার দেহে আমার কোনো প্রিয় সেক্সি নায়িকা বা পথেঘাটে দেখা নারীর স্তন-বাহু-পাছা-উরু সংস্থাপন করে নিতাম কিন্তু সুবর্ণার কামজ দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যা নিয়ে এখন আমি মত্ত তার কাছে সেসবও নসি। আমরা এগোই। কখনো উড়ে, কখনো ছুটে, কখনো ধীরে ফুলফাগুনের মৌসুম আলোরিত করে, কখনো উত্তাল এক নদীর ঢেউ নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াসের অশেষ পুলকে আমরা এমন এক পরম সুখের জগতে পৌঁছি যেখান থেকে কেউ কোনোভাবেই ফিরে আসতে চায় না, চাইতে পারে না।

সম্মোহনের জগৎ থেকে আমাদের ধোঁয়া-ধূলির দুনিয়ায় ফিরে আসতে হয়।

সুবর্ণা, আমরা নিশ্চয়ই বিয়ে করতে পারি।

কেন!

এই পরম পাওয়াকে আমি অব্যাহত রাখতে চাই।

নো, তোমার সঙ্গে আমার বিয়েকে বাস্তবতার সিংহভাগ সূচকই সাপোর্ট করে না। আর তুমি জানো, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আমার হবু বরকে রিসিভ করতেই ভাইয়া-ভাবি এখন এয়ারপোর্টে।

তুমি এসব পণ্ড করে আমার সঙ্গে পালাও।

অ্যাবসার্ড। তুমি যে কেন জীবনের এমন দুর্লভ পাওয়াকে বিনাশ করে দিতে চাও! □

বেঙ্গল পাবলিকেশন্স
থেকে সদ্য প্রকাশিত
হয়েছে দুটি
উল্লেখযোগ্য বই

সংগ্রহে রাখার মতো



বেঙ্গল পাবলিকেশন্স
প্লেট ২, সিভিল এডিরিশন, সিটি বরোকপার্ট এলাকা,
কলকাতা, ৭০০-১২৩৯, বঙ্গদেশ
ফোন : ৩৬৫২৬৮৭২১১, ৩৬৫২৬৮৭২০০

www.bengalpublications.com /bengalpublications

প্রাতিষ্ঠান :



বেঙ্গল গ্যালারি অফ ফাইন আর্টস
Bengal Gallery of Fine Arts



অনলাইনে অর্ডার করুন :



ই-বুক :





হরবোলার হৃদয়বৃত্তান্ত

রফিকুর রশীদ



রুটা ছিল তার পাতার বাঁশি দিয়ে।

আমি তো খুব কাছে থেকে দেখেছি তাকে, বলতে গেলে তার সব পরিবর্তনই ঘটেছে আমার চোখের সামনে, ফলে তাকে অবিশ্বাস করার মতো কিছুই খুঁজে পাইনি আমি। সেই ছোটবেলা থেকে বাঁশি বাজাতে দেখেছি। স্রেফ পাতার বাঁশি। গাছের পাতা জড়িয়ে ভাঁজ করে বিশেষ কৌশলে হাতের মুঠোয় পুরে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিলেই বেজে ওঠে — পৌ... পৌ...। বেজে ওঠে মানে সবার হাতেই বেজে উঠবে! অসম্ভব! আমি গোপনে এবং প্রকাশ্যে কতভাবে চেষ্টা করেছি, পারিনি। রাগে-দুঃখে বাঁশির পাতা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার করেছি। নুরু হেসেছে। আমার দুর্দশা দেখে তার নাকি হাসি পায়। সে হাসে। আবার সবার চোখের অগোচরে আমার কাঁধে হাত রেখে কত সহজে প্রস্তাব রাখে — চলো যাই কাজলাপাড়ে, বাঁশি ধরা শিখিয়ে দেব।



অনংকল্প : নির্ভর ঠাকুরদাস

কাজলা আমাদের বাড়ির পাশের নদী। নামেই শুধু নদী। সেই কবে নদীচরিত্র হারিয়ে বৃদ্ধা নারীর মতো বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে নির্বিকার। তবু আমরা সেই নদীপাড়ে পুটুশ বনে যাই দিনের আলোয় কিংবা জোছনারাতে। নুরু আমাকে পাখির ডিম পেড়ে দেয়, ফড়িং কিংবা প্রজাপতি ধরে দেয়, তাই বলে বাঁশি বাজানোও শেখাবে! বয়সে দু-এক বছরের বড় হলেও সে আমার জোতদার পিতার এক পাল গরু চরানো রাখাল বই তো নয়! সেই রাস্তা ধরে মিয়াভাই আমাকে ডাকে, কখনো-বা নাম ধরেও ডাকে, কিন্তু সেটা বাড়ির বড়দের সামনে কিছুতেই নয়। প্রভু-ভৃত্যের এমন মাখামাখি কেই-বা পছন্দ করে। অগত্যা বড়দের চোখ ফাঁকি দিয়েই আমরা কাজলাপাড়ে যাই, পাতার বাঁশি বাজানোর কৌশল শেখার চেষ্টা করি।

সেসব কৌশলের কিছুই আমার শেখা হয়নি। কিন্তু আমার বিস্ময়বিমুগ্ন চোখের সামনে নুরু ঠিকই পাতার বাঁশি বাজায়, পল্লিগীতি-ভাওয়াইয়া গানের সুর তোলে; অবাক কাণ্ড হচ্ছে এক সময় আর বাঁশিও লাগে না তার, শুধু হাতের মুঠোয় মুখের ফুঁ দিয়েই বাঁশির মতো বাজিয়ে শোনায়ে। কিছুদিন পর দেখা গেল গানের সুর শুধু নয়, সে আবদুল আলীম, নীনা হামিদ, ফেরদৌসী বেগমের কণ্ঠ নকল করে তাঁদের বিখ্যাত গানগুলো দিব্যি গেয়ে শোনাচ্ছে। হুবহু সেই কণ্ঠ, সেই সুর। নারী-পুরুষ কণ্ঠ দুই-ই সে নকল করতে পারে। একদিন আবদুল জব্বারের বিখ্যাত গান 'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়'ও নামিয়ে

পাতার বাঁশি বাজানোর কালে
বেশ দু-চারটি ইতর প্রাণীর কণ্ঠ
নকল করে নুরু সবাইকে চমকে
দেয়। গরুর হা ম্বা, কুকুরের
ঘেউ-ঘেউ কিংবা বেড়ালের
মিউ-মিউ ধ্বনি সবাই শোনে,
কিন্তু ওই প্রাণীগুলো কি সবসময়
একই রকম অনুভূতি প্রকাশ
করে, নাকি একই কথা বলে!

দিলো। এসব দেখে-শুনে কোনো মানুষের চোখ কপালে না উঠে পারে!

পাতার বাঁশি বাজানোর কালে বেশ দু-চারটি ইতর প্রাণীর কণ্ঠ নকল করে নুরু সবাইকে চমকে দেয়। গরুর হা মা, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ কিংবা বেড়ালের মিউ-মিউ ধ্বনি সবাই শোনে, কিন্তু ওই প্রাণীগুলো কি সবসময় একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করে, নাকি একই কথা বলে! ক্রোধে উন্মত্ত কুকুর শত্রুকে তাড়া করার সময় যে ধ্বনি উচ্চারণ করে, স্নেহে বিগলিত কুকুরমাতা সন্তানকে স্তন্যদানের সময় নিশ্চয় সেই একই ধ্বনি উচ্চারণ করে না। হোক ইতর প্রাণী, তবু তাদের ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতির মধ্যে পার্থক্যটুকুও শনাক্ত করে নুরু এবং তা হুবহু নকল করে শোনায়ে। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে কখনো-কখনো সে প্রমাণ করেও দেখায়। ঠিক চ্যালেঞ্জ নয়, আমার মা একবারে আবদারে গলায় নুরুকে বলে — ঘুঘুপাখি কি বিরান হয়ি গেল হা বাপ! গলায় গয়না-আঁকা ঘুঘু দেখিনি কদিন!

তা বটে, মাঠে যথেষ্ট পরিমাণ কীটনাশক ছিটানোর ফলে ঘুঘুসহ নানা পাখিপাখালি বিরান হওয়ার পথে। আমাদের উঠানে কিংবা ঝাঁকড়া গাছের ডালে পাখিদের আনাগোনা একেবারে কমে গেছে। নুরু একগাল হেসে বলল, ঘুঘু দ্যাখপেন নাকি ঘুঘুর ফাঁদ দ্যাখপেন চাচি-মা?

ফাঁদ আর কী দেখব! তুই আমাকে ঘুঘু দ্যাখা দিনি!

ব্যস। হাতের মুঠোয় বাঁকা ঠোঁট লাগিয়ে ঘুঘুর কণ্ঠে ডেকে ওঠে নুরু। আশপাশে ছড়িয়ে থাকা ঘুঘুপাখি এসে উঠোন ভরে যায়। রান্নাঘর থেকে চাল এনে তাদের খেতে দেয় মা। ঘুঘুরা খুশিতে ডেকে ওঠে, ঘুঘুর ঘু ...।

নুরু এসব কাণ্ডকীর্তি দেখে কে না অবাক হয়! আমরা ছেলে-ছোকরার দল তো তার পেছনে লেগেই থাকি, নানাভাবে উদ্ভাস্ত করি। দিনের শেষে হাঁস-মুরগির ঘরে ফেরার সময় তখনো হয়তো হয়নি, অথচ আমরা আবদার করে বসি — নুরু মিয়া, দেখাও তোমার কেরামতি, হাঁস-মুরগি ডাকো দেখি!

নুরু মুখে হাসির বিভা! বড়ই রহস্যময় সে হাসি।

আমরা অপরিসীম কৌতূহলে তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে সে ঋষিবৎ ঔদাসীনে জানায়,

মাথা খারাপ! অবলা পশুপাখিকে জ্বালাতন কত্তি হয় না।

জবাব শুনে আমরা অবাক। আমার মা এগিয়ে এসে বলে,

জ্বালাতন কিসির বাপ! উরা কি খাঁচায় ওঠপে না?

এখনো বেলা ডুবিনি যে চাচি-মা!

তা হোক। তুমি ডাকো। আমি চাড্ডি খাতি দিই।

তারপর তো খাঁচায় ওঠপে!

অগত্যা নুরুকে রাজি হতেই হয়। হাতের মুঠোয় মুখ ঠেকিয়ে নানান রকম ধ্বনি তোলে। হাঁসের ডাক। মুরগির ডাক। নকল, তবু কত অবিকল। বিভ্রান্ত হাঁস-মুরগি ডাক শুনে ছুটে চলে আসে উঠানে। থমকে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক কী যেন খোঁজে। আমার মা ওদের ভাষা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, দ্রুত হাতে চালের খুঁদ ছিটিয়ে দেয়, ধানের কুঁড়ো মাখিয়ে দেয় পরম মমতায়। তারপর আবার নুরু সামনে দাঁড়িয়ে শুধায়,

সোলেমান নবীর নাম জানো তো নুরু?

নুরু ভীষণ লজ্জা পায়। ঘাড়মাথা চুলকিয়ে নিতিবিত্তি করে বলে,

কী যে বোলেন চাচি-মা! কুথায় নবী পয়গম্বরের কথা! অপবিত্র মুখি তাদের নাম নিয়া চলে! হঠাৎ দাঁতের ফাঁকে জিভ কাটে নুরু, ওই নাম করলি আমি গুনাগার হয়ি যাব মা।

এই ঘটনার পর থেকে আমার মায়ের আচরণে একটু একটু পরিবর্তন চোখে পড়ে। আশৈশব সে শুনে এসেছে সোলেমান নবীর কুদরতি ক্ষমতার কথা — তিনি নাকি পশুপাখির ভাষা বুঝতেন; এখন নিজ বাড়ির রাখালের মধ্যে সেই অলৌকিক গুণের স্ক্রুণ ঘটতে দেখে তো চমকে ওঠারই কথা! সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে যায়,

কোনো ধর্মসভায় নাকি কার কাছে যেন শুনেছিল — যুগে-যুগে নবী পরগম্বর-অবতারদের অনেকেই নাকি রাখাল রূপে এসেছেন এই পৃথিবীতে; সেই কেচ্ছা মনে পড়তেই আমাদের অতিচেনা নুরু দিকে সমীহভরা চোখে তাকায়, আবার অতি সঙ্গোপনে আমাকে নুরু সঙ্গে মিশতে নিষেধও করে।

যদূর মনে পড়ে, এ-জীবনে মায়ের নিষেধ মান্য করার চেয়ে অমান্য করাতেই অধিক আনন্দ পেয়েছি। এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাছাড়া কোন অপরাধের জন্য নুরুর সঙ্গ আমাকে পরিহার করতে হবে সেটাই তো আমার স্পষ্ট নয়, অকারণে একটা আদেশ জারি করলেই হলো! নুরু কি আমাকে গরু চরানোর প্ররোচনা দেয়। বরং লেখাপড়া করতে না পারার জন্য সে দুঃখ করে, আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়, আমার বইয়ের পাতা উলটিয়ে ছবি দেখে, অতিশৈশবের বর্ণ পরিচয় ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, শব্দ শব্দের বানান ভেঙে-ভেঙে শিখিয়ে দিলে খুশি হয়; নুরুকে তো আমার ভালোই লাগে। তাকে আমি ত্যাগ করব কোন দোষে!

সত্যিকারের কথা বলতে কী, বেশ কয়েক বছর পর এই নুরুই আমাদের সবাইকে ত্যাগ করে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। আমি তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র। নুরুও টের বড় হয়েছে। আমাদের বাড়ির বাঁধা মাইনের রাখাল-কৃষাণ আর নয়। কী জানি কোন অদৃশ্য শর্তে আমার জ্যোতদার বাবা মাঠঘাট দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার ওপরে ছেড়ে দিয়েছে। দিনে-দিনে সে প্রায় বাড়ির ছেলের মর্যাদা অর্জন করেছে। অচিরেই সেই ছেলের বিয়েথা দিয়ে সংসারী করার ভাবনাও আমার মা ভাবছে বলে শুনতে পাই। এখানে এসে তার প্রবল আপত্তি।

কেন, আপত্তি কিসের?

ততদিনে আমাদের নুরুর নাম ডাক চারদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে ‘নকল-নুরু’ হিসেবে। যে-কোনো কণ্ঠস্বর চমৎকারভাবে নকল করতে পারে এবং নকল কণ্ঠে বিখ্যাত শিল্পীর গান গেয়ে শোনাতে পারে বলেই মানুষের মুখে-মুখে তার এই নামকরণ হয়ে যায়। খ্যাতির সঙ্গে বেশ স্বীকৃতিও আসতে শুরু করে। একবার ইউনিভার্সিটি থেকেই খবর পেলাম — আমাদের নুরু নাকি কোন এক সার্কাস পার্টিতে ভিড়ে গেছে, তার ওই নকল কণ্ঠস্বর শোনানোর জন্য ভালো মাইনে দেবে। মাকে বলে গেছে শীতের দুমাস কাটিয়ে সে আবার ফিরে আসবে। আমি ভাবি, ফিরে এলেই হয়, আমাদের ভার্টিটির অডিটরিয়ামে তার একটা শো করাব। আমার মুখে সে অনেক গল্প শুনেছে ভার্টিটির, কত কিছু নিয়ে যে কৌতূহল তার সীমা-পরিসীমা নেই, সেই নুরু একবার বৃহৎ পরিমণ্ডলে বেড়িয়ে গেলে নিশ্চয় খুব খুশি হবে। আমার বন্ধুমহলে নুরুর বিষয়ে বিস্তার আলোচনা হয়, তাকে নিয়ে একটা শো করানোর বিষয়ে সবাই একমত। এখন সে এলেই হয়।

আমার মায়ের অনুযোগের ধারা থেকে টের পাই, নুরু শিগগিরই বিয়ে করবে না। সার্কাস দলের ছুফরিদের সঙ্গে ঢলাঢলি করলে কি তার চরিত্রের ঠিক থাকে! তার আবার বিয়েথার কী দরকার!

নুরু প্রতি অপত্যস্নেহের আধিক্যবশত মায়ের এই অনুযোগ, সে-কথা সহজেই বোঝা যায়। অথচ নুরু ঠিক একদিন সার্কাস দল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। এখানে আসা ছাড়া জগৎ-সংসারে নিরাপদে এবং নিরুদ্বেগে দাঁড়ানোর আর কোনো জায়গা নেই। পিতৃমাতৃহীন অনাথ শৈশব থেকে এই বাড়িকেই তার ঠিকানা বলে জেনেছে। দুমাসের জন্য সার্কাস দলে গিয়ে তার চোখ-মুখ বেশ খুলেছে, প্যান্ট-শার্ট, জুতো-মোজা পরে বেশ ফুলবাবুর মতো ভাব হয়েছে, তাই বলে আপন ঠিকানা ভুলে যাবে সে! সার্কাস-ফেরত নকল-নুরুকে দেখতে আসে অনেক লোক। উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নতুন শেখা সেই সব ক্রীড়া-কসরৎ দেখিয়ে অতিসহজেই সে সবার চোখে-মুখে তাক লাগিয়ে দেয়। আর খইফোটা উনুনের মতো তার মুখে কথার ফুলঝুরি তো ফুটতেই থাকে। উঁচু গলায় ঘোষণা

দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয় — অল্পদিনেই সে ইন্ডিয়া চলে যাবে।
ইন্ডিয়া! ইন্ডিয়া কেন?

বেশ গুরুগম্ভীর চালে ঘাড়মাথা ঝাঁকায়। গৌফের আড়ালে হাসে। তারপর বলে, মক্কা না গেলি হজ করা হয়!

এমন ঘোরপ্যাঁচের কথার মাথামুণ্ডু অনেকেই বুঝতে পারে না। তারা পুরনো অভ্যাসমারফিক নকল-নুরুর কাছে দাবি জানায় ইতরপ্রাণীর নকল কণ্ঠস্বর শোনার জন্য। কেউ বা সার্কাসের বাঘের গর্জন শুনতে চায়। সবাইকে অবাক করে আমার চাচাতো বোন আয়েশা হঠাৎ আবদার জানায় — পাতার বাঁশি বাজাও না নুরু ভাই!

যে-মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে, রেজাল্ট বেরোলেই তিন মাইল দূরের কলেজে ভর্তি হবে, তার কেন বাঁশির সুর শোনার আহ্বাদ! নকল-নুরু সবার সব দাবি পূরণ করে অম্লান বদনে, আয়েশার বেলায় এসে জানায়, সে আর বাঁশি বাজাবে না, তবে গান শোনাবে। হেমন্তের গান। হেমন্ত মুখার্জির গলা নকল করে সে গাইতে শুরু করে — ‘যে বাঁশি ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বলো...।’

যার জন্য নুরু এই গান গাওয়া সেই আয়েশা গান শেষ হওয়ার

সে আমি খুব ভালো করে জানি, কলম ধরে লিখতে গেলেই যত গোলমাল। তার হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষর আমার খুব চেনা। বাক্য গঠনও খুবই কাঁচা। পুরো বাক্যপাঠের পর মনে-মনে জোড়াতালি দিয়ে তার এক প্রকার অর্থ দাঁড় করে নিতে হয়। বহু সাধ্য-সাধনায় আমিও সেই চিঠির মর্মোদ্ধার করি। খুব সাদামাটা কথায় সে জানাতে চেষ্টা করেছে — বাড়ি ছেড়ে না গিয়ে তার কোনো উপায় ছিল না। কেন তাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, সে-কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য কেউ যেন খুঁজে-খুঁজে হয়রান না হন। এমনকি আমিও যেন চেষ্টা না করি। কখনো সম্ভব হলে সে নাকি নিজে থেকেই বাড়ি ফিরে আসবে। কী একটা যেন — শেষ কথা আমাকে জানাতে চেয়েও পারছে না বলে খুব দুঃখ তার। নুরু লেখা সেই চিঠি আমি কতবার যে উলটেপালটে পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। অথচ বহুদিন পর আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে — খামের ওপরের ঠিকানাটুকু সে নিজের হাতে লিখে। কেমন যেন মেয়েলি অক্ষর গঠন। অন্য কারো কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়েছে। এই অন্যটা যে কে, তা আর আমার খুঁচিয়ে বের করার ইচ্ছা হয়নি। নুরুর জন্য অনেকদিন আমার বুকের ভেতরে যন্ত্রণার বুদ্ধদ উঠেছে, নুরুর নাম ধরে মাকেও কাঁদতে দেখেছি, তবু আমি নুরুকে খুঁজে বের

বহু সাধ্য-সাধনায় আমিও সেই চিঠির মর্মোদ্ধার করি। খুব সাদামাটা কথায় সে জানাতে চেষ্টা করেছে — বাড়ি ছেড়ে না গিয়ে তার কোনো উপায় ছিল না। কেন তাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, সে-কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য কেউ যেন খুঁজে-খুঁজে হয়রান না হন।

আগেই সহসা ফুঁপিয়ে ওঠে এবং আমার মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়, এ-গান আমার ভালো লাগছে না বড়মা। অন্য গান গাইতে বলো। মেয়ের কথা অবাক হয়ে শোনে আমার মা, কিন্তু নুরুকে সেদিন কিছুই বলে না। আরো দু-তিন দিন পর রাতের খাবার সামনে বেড়ে মা জিজ্ঞেস করে, হা বাপ নুরু, তুই ইন্ডিয়া যাবি কেন?

জবাব না দিয়ে ভাত খেতে থাকে নুরু। বেশ কয়েক গ্রাস খাবার পর নুরু বলে, ইন্ডিয়ায় গুরু আছে যে!

কিসের গুরু?

আমি যেসব জিনিস নকল করে শোনাই ও দেখাই, এসব আরো ভালো কইরি শিখতি হলি গুরু ধরতি হবে।

চমকে ওঠে আমার মা। দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে,
ওসব আর শিখতি হবে না। তুই আমার কাছেই থাক।

খাঁচায় আটকেপড়া পাখির মতো ডানা ঝাপটায় নুরু,
আমি তালি মিয়াভাইয়ের কাছে যাব।

আচ্ছা তাই যাস। সে আসুক আগে।

মিয়াভাই কবে বাড়ি আসবে চাচি-মা?

সামনে তার পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে তো একবার আসবেই।

আচ্ছা আসুক।

সেদিন মুখে আসুক বললেও নুরু প্রকৃতপক্ষে আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। অবশ্য কবুল করাই ভালো, পরীক্ষার আগে আমারও বাড়ি আসা হয়ে ওঠেনি। এসেছি পরীক্ষার পরপরই। ততদিন আমাদের নকল-নুরু সবার অলক্ষে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। আমার সরল মা তবু বিশ্বাস করে বসে আছে, নুরু হয়তো আমার কাছেই গেছে। আমার জন্য কদিন নাকি খুব ছটফট করছিল সে। তা হবেও হয়তো-বা। অন্তরের সেই ছটফটানি থেকে সে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। নুরুর হাতের চিঠি। ব্যাপারটা আমার কাছে যেমন কৌতূহলের, তেমন বিস্ময়ের। সামান্য অক্ষরজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনের সময় মানুষ এভাবে চিঠি লিখতেও পারে! নুরু বাংলা ভাষায় লেখা গদ্য-পদ্য বেশ ঝরঝর করে রিডিং পড়তে শিখেছে,

করার চেষ্টা করিনি। এমনকি আমার চাচাতো বোন আয়েশা একদিন ছলোছলো চোখে আমার কাছে জানতে চায় — নুরুভাই তা হলে তুমার কাছেও যায়নি মিয়াভাই! আমি চোখ তুলে আয়েশার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটি শুনেছি মাত্র, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছি, কোনো উত্তর দিতে পারিনি।

দুই

না, লোকে যাকে নকল-নুরু বলে, আমাদের সেই নুরুর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হয়নি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে জীবনের ধুলোবালির আন্তরগে ঢাকা পড়ে গেছে তার চিরসবুজ মুখের আদল। অথচ কে জানত — জীবনের মধ্যবেলা পেরিয়ে এসে আমার সেই বাল্য সহচর নুরুকে দেখতে হবে টেলিভিশনের পর্দায়! এখন সে আর নকল-নুরু নয়, বিনোদন ম্যাগাজিনের জনপ্রিয় উপস্থাপক তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন ‘নুরুল ইসলাম হরবোলা’ এই নামে। নাম যা-ই হোক, আমার দুচোখের পাতা পড়ে না, বেশভূষার আড়ালের মানুষটিকে আমি ঠিকই চিনতে পারি, এ আমাদের হারানো নুরুই বটে। উপস্থাপকের দ্রুতলয়ের প্রশ্নের উত্তরে কেমন টকাস-টকাস করে কথা বলছে! চমৎকার উপস্থাপনার গুণেই হবে হয়তো, এই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটি বরাবরই জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আমার পক্ষে সব অনুষ্ঠান দেখা হয়ে ওঠে না, তবে মাসের এই বিশেষ দিনটিতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে টিভির সামনে বসে আমার স্ত্রী। হরবোলার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার ছেলেমেয়েরা হাসিতে গড়িয়ে পড়ে, তাদের মায়ের চোখে বিস্ময়ের স্তব্ধ ছায়া। এ সময় আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে — দ্যাখো-দ্যাখো, লোকটার একই মুখে কত রকম ভাষা! আমিও অবাক হওয়ার ভান করি — তাই তো! ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!

উপস্থাপক তখন জানতে চাইছেন,

আপনার এ-বিদ্যা আপনি শিখলেন কোথায়?

নুরুর কী স্বতঃস্ফূর্ত জবাব,

প্রকৃতির কাছ থেকে।
বলেন কী! কোনো গুরু নেই আপনার?
হ্যাঁ, আছে। অনেক পরে গুরুর সন্ধান পেয়েছি।
কী নাম তার? কোথায় থাকেন?
দুহাত কপালে ঠেকিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুর নাম
উচ্চারণ করে,
শ্রী শুভেন্দু বিশ্বাস। জন্ম তাঁর এই বাংলাদেশেই, থাকেন
তিনি কলকাতায়।
বাংলাদেশেই জন্ম?
হ্যাঁ। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে গড়াই নদীর পাড়ে জন্ম।
দেশ ভাগের পর ওপারে চলে যান। কলকাতায় গিয়েই তিনি আসল
গুরুদেবের সন্ধান পান।
আসল গুরুদেব! সেটা আবার কে?
শ্রী রবিন ভট্টাচার্য। আমি তাঁকে দেখিনি। শুনেছি তিনি বোলপুর-
শান্তিনিকেতনে নকল গলায় ডেকে-ডেকে পাখপাখালিদের বিভ্রান্ত
করতেন। স্বয়ং কবিগুরু নাকি কাছে ডেকে তাঁকে আশীর্বাদ করে
বলেছিলেন — হরবোলা। হরেকরকম বোল।
অ। তাহলে এই জন্য আপনার নাম নুরুল ইসলাম হরবোলা?
জি, হরবোলা হচ্ছে কবিগুরুর দেওয়া নাম।
আপনি তাহলে কলকাতায় গিয়ে গুরুর কাছে শিক্ষা নিয়েছেন?
আমি মূর্খ মানুষ, শিক্ষা নেব কী করে? সামান্য গুরুসেবা করেছি
মাত্র। আমার গুরু লেখাপড়া জানা মানুষ। হরবোলার কলাকৌশল
নিয়ে বই লিখেছেন।
তাই নাকি! বই পড়েও শেখা যাবে এসব!
গুরুদেব তো তাই বলেন। তিনি একটা হরবোলার ইশকুল
খুলবেন। সেইখানে আমাকে থাকতে বলেন। মূর্খ মানুষ সেখানে কী
করবে বলুন দেখি!
আপনি এই গুরুদেবের সন্ধান পেলেন কেমন করে?
একগাল হাসি ছড়িয়ে নুরুল জানায়,
শখের বশে কদিন ভিড়েছিলাম সার্কাস পার্টিতে। সেইখানে
আমার কলাকৌশল দেখে কুমারখালীর এক সাংবাদিক শুভেন্দু
বিশ্বাসের সন্ধান দেন। দুহাত কপালে তুলে বলে, আমার গুরুদেব
তো মানুষ নন, দেবতা। তিনি সব উজাড় করে দিতে চান; কিন্তু
আমি যে মূর্খ! আমি সেসব নেব কী করে? নেবার মতো পাত্র আছে
আমার?
উপস্থাপক একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,
বারবার নিজেকে মূর্খ বলছেন কেন? আপনার শৈশব-কৈশোরের
কথা বলুন।
অবলীলায় ঘোষণা করে নুরুল,
আমি ছিলাম মাঠের রাখাল। লেখাপড়ার সুযোগ আর পেলাম
কোথায়? ছিল এক মিয়াভাই, তার কাছেই সামান্য হাতেখড়ি।
আমারই দোষে তাকে হারিয়েছি। লেখাপড়া হবে কেমন করে! ওই
অক্ষর চিনি বানান করা পর্যন্তই।
এত কথা শুনতে-শুনতে আমার দুচোখ ঝাপসা হয়ে আছে। কণ্ঠ
রোধ করে দাঁড়ায় বাষ্পীয় পিণ্ড। বুকের ভেতর থেকে উথলে ওঠে
অভিমান — কে তোর মিয়াভাই? চাচি-মা কিংবা মিয়াভাইকে ভুলে
গেলে তোর কি ক্ষতি!
উপস্থাপক এতক্ষণে হঠাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে সরে আসেন।
জানতে চান, আপনার এই হরবোলা-জীবনের গুরু হয়েছিল কী
দিয়ে?
পাতার বাঁশি দিয়ে। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে টের পাই — ইচ্ছে
করলে শব্দকে পালটে ফেলা যায়।
আজ কি আমরা একটুখানি পাতার বাঁশি বাজানো শুনব?

না। অনেক আগেই বাঁশি ছেড়ে দিয়েছি। অন্য কিছু বলুন।
পশুপাখির বিচিত্র ডাক আমরা শুনেছি আপনার কণ্ঠে, এই ডাক
শুনে পশুপাখি কি কাছে আসে?
একগাল হেসে সে জানায়,
তাহলে স্টুডিওর বাইরে আসুন। ঢাকা শহরের কাকেদের ডেকে
আনি।
এরপর সত্যি-সত্যি স্টুডিওর বাইরে ধারণ করা দৃশ্য দেখানো
হয়। নুরুল ইসলাম হরবোলা মুখের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে কা-কা ধ্বনি
উচ্চারণ করতেই উড়ে আসে রাজ্যের যত কাক। কর্কশ কা-কা রবে
কান পাতা দায়। অগত্য উপস্থাপক অনুরোধ জানান — তাড়ান
ওদের তাড়ান।
আবার বিচিত্র ধ্বনিতে নুরুল তাড়িয়ে দেয় কাকদের।
নুরুল কণ্ঠের ধ্বনিতে কী তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় কে জানে,
কাকেরা আবার কা-কা রব তুলে উড়ে যায়, শিলকড়ইয়ের ডালে
বসে দোল খায়, ডাস্টবিনে বসে ঠোট ডুবিয়ে দেয় আবর্জনায়।
কাকদের হামলা থেকে সদ্য উদ্ধার পাওয়া উপস্থাপক পাঞ্জাবির
কোনা ঝেড়ে-ঝেড়ে সাফছুতরো হয়ে নুরুল ইসলাম হরবোলার দিকে
তাকান, ঠোটের কোণে একটুখানি সলজ্জ হাসি ঝুলিয়ে বলেন,
আপনার এই নকল ডাকেরই এমন শক্তি!
হরবোলার তো সবই নকল।
সবই নকল?
হ্যাঁ, এক সময় তো আমাকে সবাই ‘নকল-নুরুল’ বলেই ডাকত!
তাই নাকি!
তবে আর বলেছি কী! এই যে আমার মাথার চুল, নকল চুল।
চোখদুটো অপারেশন করানো, মানেই নকল চোখ। মুখের দাঁত,
সেও নকল, বাঁধানো দাঁত, মানেই নকল হাসি। আর বুকের মধ্যে
হার্ট আছে, সেখানে পেসমেকার বসানো সারা। কাজেই ওই হার্টও
নকল। তাহলে আর বাকি থাকল কী!
উপস্থাপকও মোটেই রসিকতায় কম যান না। তিনি এবার
সোজা দর্শকের দিকে দুহাত নেড়ে বলেন — প্রিয় দর্শকবৃন্দ,
আপনারা নিশ্চয়ই জানেন হার্ট মানে শুধু হৃৎপিণ্ড নয়, হার্ট মানে
হৃদয়ও। আমাদের বিশ্বাস — নুরুল ইসলাম হরবোলার হৃদয়টা
নিশ্চয় নকল নয়।
অনুষ্ঠানের যবনিকা টানার প্রস্তুতি নিচ্ছেন উপস্থাপক। জনপ্রিয়
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তিনি হরবোলা-শিল্পী নুরুল
ইসলামের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তার দীর্ঘায়ু কমানো
করেন; অভিনন্দন জানান। কিন্তু আমাদের নকল-নুরুল সহসা তখন
হৃদয়বৃত্তান্ত মেলে ধরে। কেমন অবলীলায় সে সবাইকে জানিয়ে দেয়
— অনেক বছর আগে বর্ষণমুখর এক গ্রামীণ সন্ধ্যায় তার হৃদয়
হারিয়ে যায়। সেই হৃদয়টা মোটেই নকল ছিল না, সেটা ছিল টকটকে
লাল জবার মতো। হৃদয় হারিয়ে নিঃশ্বাস হওয়ার পর সে দেশত্যাগের
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে জানতে পেরেছি,
যাকে হৃদয় দিয়ে তার এমন ফতুর হওয়া, সেও নাকি নিঃসংশয় হতে
পারেনি — নকল-নুরুল হৃদয়টা আসল ছিল কিনা!
ঘড়ির কাঁটা বলে দিচ্ছে অনুষ্ঠানের সময়সীমা একেবারে শেষ
প্রান্তে। ফলে সব আয়োজন গুটাতেই হয় উপস্থাপককে। কোথা
থেকে এত আস্থা খুঁজে পান তিনিই জানেন, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে
দর্শকদের জানিয়ে দেন — আমরা বিশ্বাস করি, হরবোলা নুরুল
ইসলামের সেদিনের হারানো হৃদয়টা ছিল আসল ও অকৃত্রিম হৃদয়।
সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি।
অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে ধীরে-ধীরে ফেড হয়ে আসে দৃশ্য
এবং শব্দ। ঝাপসা হয়ে আসা টিভি পর্দাতেই আমি খুঁজি সেই মুখ,
যে আমাদের নকল-নুরুল আসল হৃদয়টাকে চিনতে পারেনি। আমি
কি চিনি তাকে, সেই নারীকে? □



তিমিরের তীরে

মনি হায়দার



আপনার আসমান আলীকে চিনতে পারবেন না।
না, আসমান আলী কোনো আশ্চর্য প্রদীপ পায়নি। কিংবা হয়নি কোনো
মন্ত্রী-টন্ত্রী। মানুষ হিসেবে ঠিকই আছে। রক্ত, মাংস, কাম, ক্রোধ-রিপু মিলিয়ে
আগের মতোই আসমান আলী আছে আসমান আলীর মতোই। প্রশ্ন হচ্ছে

— কী এমন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটল যে আমরা, পরিচিতজনেরা আজ আসমান আলীকে চিনতে
পারছি না?

হ্যাঁ, পরিবর্তন তো কিছুটা হয়েছেই।

অবশ্য পরিবর্তনটা বাহ্যিক। অর্থাৎ বাইরের পোশাকে-আশাকে এক আকর্ষণীয় পরিবর্তন
এসেছে তার। সাধারণত তাকে, আমাদের আসমান আলীকে আমরা যে পোশাক-আশাকে দেখি,
আজকে দেখছি ব্যতিক্রম। মতিঝিলে একটি মাল্টিপারপাস কোম্পানির খ্যাতিমান এমডির নিজস্ব



অলংকরণ : ফরিদা জামান

পিয়ন আসমান আলী। কোম্পানির এমডি মাহমুদ হোসেন বিশেষ স্নেহ করেন আসমান আলীকে। সে-কারণে অফিসের অন্যান্য বড়কর্তা থেকে আরম্ভ করে আসমান আলীর নিজের শ্রেণির অন্যান্য পিয়ন, চাপরাশি-ঝাড়ুদার সবাই একটু ঈর্ষাই করে থাকে। বাঁকা চোখে দেখে। মাঝেমধ্যে নানা প্রকার কুরূচিপূর্ণ মন্তব্যও করে পেছনে। আসমান আলী শোনে এবং বোঝে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। কারণ উপভোগ করে। আপন মনে বলে — শালারা, তোমাগো গা চুলকায় পরের ভালো দেখলে?

বড় অফিসের কাজকর্মই আলাদা। অন্যরকম। যেমন বড় সাহেব, মাঝারি সাহেব, ছোট সাহেব — যত রকম সাহেব আছে তারা অফিসে কি পোশাক পরে আসল কি আসল না, তাতে কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু শালার পিয়ন, চাপরাশির গোষ্ঠীর যদি কেউ একদিন অফিস থেকে দেওয়া পোশাক না পরে আসে একশ টাকা ফাইন। এমনকি চাকরিও চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। মাস ছয়েক আগে ফারহাত হোসেনের চাকরিটা নট হয়ে গেল। কারণ সে অফিসের পোশাক পরে আসেনি। ওকে একটা কৈফিয়তেরও সুযোগ দেওয়া হয়নি। বেচারা ফারহাত কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল। ফারহাত হোসেনের পরিণতি দেখে অফিসের চাপরাশি, পিয়ন, আরদালি প্রত্যেকে অফিসের দেওয়া জামা-প্যান্ট পরেই আসে।

জয়তুন বেগমের তীব্র
তাড়াহুড়োয়, দাপাদাপিতে
তাজবিরজ্ঞ স্বামী কৃষক
মোহাম্মদ সাদেক আলী
মার্দাসীর বাজার, ইকড়ি বাজার,
তেলিখালী বাজারে ঘুরে সব
ঠিকঠাক কিনে আনে।

আসমান আলী প্রতিদিন সকাল নটায় অফিসে আসে। এই অফিসে নির্দিষ্ট সময়ে আসা বিষয়ক যদি কোনো প্রতিযোগিতা হয়, আপনাদের অনেক দিনের চেনা আসমান আলী অনিবার্যভাবে প্রথম পুরস্কারটি পাবে। পাবেই। অফিসে এসে প্রথম কাজ এমডি মাহমুদ হোসেনের বাসায় ফোন করা। মাহমুদ হোসেনের দিনের করণীয় তালিকাটা জেনে নেয়। এমডি কখন অফিসে আসবেন কি আসবেন না, জানান আসমান আলীকে। আসমান আলী বসের দেওয়া আদেশ-নিষেধ-উপদেশ যথাযথ কর্মকর্তাকে পৌঁছে দিয়ে অফিস কক্ষটি ঝাড়ামোছা করে খুব যত্নের সঙ্গে। ঝাড়ামোছার পর সে এক কাপ চা পান করে, অনেকটা আয়েশি ভাবগম্ভীর পরিবেশে। যখন এমডির রুমের সামনে বসে তারিয়ে-তারিয়ে হাতে কাপ-পিরিচ নিয়ে আলতোভাবে ঠোঁটে চুমুক দিয়ে চা পান করে — মনে হয় মৃগয়ায় আসা আধুনিককালের কোনো রাজকুমার হরিণ শিকার শেষে আনমনে চা পানের সঙ্গে বিশ্রাম নিচ্ছে।

আমার আপনার এই আপন, পরিচিত লোকটাকে যদি হঠাৎ অন্য জায়গায় ভিন্ন রকম কেতাদুরস্ত পোশাকে মোড়ানো শরীর দেখে চমকে ওঠেন বা উঠি, সেটাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় বা যাবে বলে মনে হয় না। আর স্বাভাবিক বুদ্ধিমাত্রার মানুষেরা দোষ দিলে মানবেও না কেউ।

বাহুল্য থাক। বলছিলাম আসমান আলীকে চিনতে না পারার প্রসঙ্গে। কেন আপনারা বা আমি, যে আসমান আলীর গল্পটা বলছি — আমরা দুপক্ষই কেন আসমান আলীকে চিনতে পারব না! চিনতে না পারার গল্প যদি আমাকে আনুপাতিক হারে সবটুকু বলতে হয়, তার আগে আসমান আলীর নিজস্ব আরো কিছু ব্যাপার-সাপার বা ব্যক্তিগত জীবনযাপন, সংসার, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি জানা দরকার। আসমান আলীর বয়স কত সেটা দেখে বোঝা বা অনুমান করা কঠিন। তাকে পঁয়ত্রিশ বছর বা আটত্রিশ বছরের একজন মানুষ বলে অনায়াসে চালানো যায়। স্বাস্থ্যটা ভালো। পেটা শরীর, মাথায় হালকা চুল। ডানপাশে দীর্ঘ সিঁথি, নাকটা সুচালো। মুখ — মুখমণ্ডলের তুলনায় একটু ছোটই। চোখদুটো মানানসই। শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট যদি দেখেন আপনারা, তাহলে বয়স প্রায় সাতচল্লিশ বছর। পুরো সাতচল্লিশ হতে মাস তিনেক বাকি। শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট যখন দেখবেনই, তখন কেবল বয়স কেন? শিক্ষাগত যোগ্যতাও দেখে নিন। আসমান আলী ম্যাট্রিক পাশ দ্বিতীয় বিভাগে, যশোর বোর্ড থেকে। ব্যক্তিগত রোজনামচায় জানা যায়, আসমান আলী কেবল ম্যাট্রিক পাশ করেই থামতে চায়নি, সে ডিগ্রি কিংবা মাস্টার ডিগ্রি পাশও করতে চেয়েছিল। কিন্তু ম্যাট্রিকের পর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পরপর তিনবার দিয়ে ব্যর্থতার পর পিতা কৃষক মোহাম্মদ সাদেক আলী (প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদপ্রার্থী নয়) প্রাচীন রূপকথার অনুসরণে রেগেমেগে স্ত্রী জয়তুন বেগমকে বলে — হারামজাদারে আর ভাত দিও না, ছাই দাও।

কৃষক পিতার মুখে আপত্তিজনক উক্তি শ্রবণ করে পিরোজপুর জেলার কচানদীর পাড়ের গ্রাম — বোথলার অভিমানী পুত্র আসমান আলী ঢাকাগামী একটি দোতলা লঞ্চে উঠে বসল সবার অজান্তে। গুরু হলো প্রবাসজীবন। ঢাকা শহরে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসা ছিল আগে থেকেই। সেই দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় তাকে এমডি মাহমুদ হোসেনের কাছে অর্পণ করলে সেখানেই খাসকামরার খাস-চাকরিটা পেয়ে যায়। বাড়িতে মা-বাবা অত বড় ধাড়ি পুত্রের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আসমান আলীর মা জয়তুন বেগম কেঁদেকেটে আকুল। বাবা কৃষক মোহাম্মদ সাদেক আলী কী করবে, পুত্র-সন্ধান কোথায় যাবে বুঝতে পারে না। গ্রামবাসীর পরামর্শে বাবা সাদেক আলী পাড়েরহাটের ইয়াসিন মাওলানার কাছে আসে পুত্র হারিয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত বিষয় অবগত হওয়ার জন্য। সাত-

সাতটা শুক্রবার ঘুরিয়ে অষ্টম শুক্রবারে ইয়াসিন মাওলানা জানায় — কাইল রাতে আমি তোমার পোলার লগে কথা কইছি।

কথা কইছেন? সাদেক আলী নিশ্চিত হতে চায়।

হয়, কইছি — নিশ্চয়তা প্রদান করে ইয়াসিন মাওলানা।

কোথায় আমাগো পোলা আসমান আলী?

কোকাব শহরে।

হেইডা কোথায়?

ইয়াসিন মাওলানা সরাসরি তাকায় সাদেক আলীর দিকে — কোকাব শহর হইল আসমানে, পরিরাজ্যে। তোমাগো পোলা আসমান আলীকে পরিরা লইয়া গেছে। আমি বিশেষ ব্যবস্থায় গভীর রাইতে কথা কইছি হের লগে। হে তো আইতে চায় না। কোকাব শহরে খুব সুখে আছে।

কন কি হুজুর? প্রায় ডুকরে ওঠে কৃষক মোহাম্মদ সাদেক আলী — এই কতা পোলার মায় হোনলে মইরা যাইবে —

একটা কাম করতে পারবা?

কী কাম হুজুর?

তিনটা কালো রঙের খাসি ছাগল, বিশ কেজি সাক্করখানা চাল আর পাঁচটা রাওয়া মোরগ আনতে পারবা?

সাদেক আলী অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ইয়াসিন মাওলানার শাশ্রময় উদ্ভাসিত মুখের দিকে। সে বুঝতে পারছে না, পরিরাজ্যে কোকাব শহর থেকে তার ছেলে আসমান আলীকে নিয়ে আসার সঙ্গে তিনটি কালো রঙের খাসি, বিশ কেজি সাক্করখানা চাল আর পাঁচটা মোরগের সঙ্গে কী সম্পর্ক!

ইয়াসিন মাওলানা বড় বিরক্তি প্রকাশ করে — শোনো, তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে হলে পরিরাজ্যের রানি মোহতারেমা দিলরশ সালসালবিলকে এসব নজরানা দিতে হবে, যদি দিতে পারো ছেলেকে ফিরে পাবে। দিতে না পারলে পাবা না। আর আমারে জ্বালাইও না। এসব কাজ করা কঠিন। দিতে পারলে আগামী শুক্রবার আইসো —

আচ্ছা, একটা দীর্ঘ সালাম প্রদান করে কৃষক মোহাম্মদ সাদেক বাড়িতে ফিরে আসে। জয়তুন বেগমের কাছে সব খুলে বললে জয়তুন বেগম সঙ্গে-সঙ্গে মনস্থির করে ফেলে ইয়াসিন মাওলানা হুজুরে যা-যা চেয়েছে সব দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। নিজের আছে দুটি খাসি এবং অবশ্যই কালো রঙের। মোরগ নাই খোপে একটাও। সব মুরগি।

সুতরাং যা আছে বিক্রি করে পাঁচটি মোরগ কিনবে। আর মাচার তোলা আমন ধানের বীজ বিক্রি করে বিশ কেজি সাক্করখানা চাল কিনবে।

জয়তুন বেগমের তীব্র তাড়াহুড়োয়, দাপাদাপিতে ত্যক্তবিরক্ত স্বামী কৃষক মোহাম্মদ সাদেক আলী মার্দাসীর বাজার, ইকড়ি বাজার, তেলিখালী বাজারে ঘুরে সব ঠিকঠাক কিনে আনে। বুধবার সব বাজার শেষ করে এনেছে, বৃহস্পতিবার দিনটা মাঝখানে, শুক্রবার সকালে তিনটা কালো খাসি, পাঁচটা মোরগ আর বিশ কেজি সাক্করখানা চাল নিয়ে যাত্রা করবে কৃষক মোহাম্মদ সাদেক আলী, পাড়েরহাটে ইয়াসিন মাওলানার বাড়ি। সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার সঙ্গে স্ত্রী জয়তুন বেগমও যাবে।

বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা আচানক গ্রামের ডাক পিয়ন বারেক মিয়া হাজির। হাতে চিঠি এবং সাতশ টাকা। ঘটনা কী? চিঠি খুলে জানা গেল তাদের পুত্র কোকাব শহরে পরিদের রাজ্যে নয়, আছে ঢাকা শহরে। সেখানে একটি বিরাট কোম্পানির এমডি মাহমুদ হোসেনের খাস পিয়ন পোস্টে চাকরি করে। বেতন মাসে দশ হাজার টাকা। চিঠিতে পুত্র — পিতা এবং মাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে না বলে আসার জন্য। দুমাস পর ছুটি নিয়ে সে বাড়ি আসবে — তখন কার জন্য কী আনতে হবে তার লিস্ট পাঠাতে বলেছে। কোথায় পরিরাজ্যে কোকাব আর কোথায় ঢাকা শহর? সব মিলেমিশে

একাকার এখন কৃষক মোহাম্মদ সাদেক আলী ও জয়তুন বেগমের সংসারে। সারা গ্রামে একটা সাড়া পড়ে। কৃষক মোহাম্মদ সাদেক আলীকে এখন গ্রামের মাতুব্বরেরা গ্রাম্য সালিশিতে ডাকে। চেয়ারে বসতে দেয়।

আমি এবং আমার সঙ্গে পাঠকেরা ট্রেন মিস করার কায়দায় গল্পের মূল চরিত্র আসমান আলীকে বাদ দিয়ে আসমান আলীর পিতা এবং মাতাকে নিয়ে অধিক মাতামাতি করেছি। গল্পের স্বার্থেই আমাদের সঠিক জায়গায় অর্থাৎ গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসা দরকার। গল্পের ডালপালা-শাখা বিস্তারের কারণে আমাদের ফিরে যেতেই হচ্ছে গ্রামে, কৃষক মোহাম্মদ সাদেক আলীর দরবারে। পুত্র ঢাকায় বড় অফিসে বড় চাকরি করে, মাস গেলে হাজার টাকা পাঠায়, পুত্রের কাছে কন্যার পিতারা তাদের কন্যাকে অর্পণ করার জন্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই আগ্রহের আতিশয্যের লক্ষ্যে বছরখানেকের মধ্যে আবদুল জব্বারের কন্যা মিস মরিয়মের সঙ্গে আসমান আলীর বিবাহ যথাসময়ে সম্পন্ন হলো।

বিবাহের পর আমাদের গল্পের প্রধান চরিত্র আসমান আলী তার স্ত্রী মরিয়মকে ঢাকায় নিয়ে আসে। বাসা মাদারটেকে। আদরে-ভালোবাসায় অল্পদে সময় গড়িয়ে যায়। বছরে-বছরে তাদের সংসারে বাচ্চা আসতে থাকে। বাচ্চা আসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিন্তু আসমান আলীর অফিসে বেতন বাড়ে না। এখন তাদের অর্থাৎ আসমান আলী এবং তার স্ত্রী মরিয়ম বিবির খামারে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান। চারটি মেয়ে। নাম যথাক্রমে — সোনালি, রূপালি, চৈতালি এবং বৈকালি। সর্বশেষে এসেছে ছেলে। নাম চাঁদ সওদাগর। অভাবে-অভিযোগে হাসি-কান্নায় সংসার মোটামুটি চলে যাচ্ছে আসমান আলীর। কিন্তু — গল্প তো প্রায় শেষ, সেখানে আবার কিন্তু কেন? প্রশ্ন ওঠা সংগত। উত্তরে লিখতে হচ্ছে, আসলে এতক্ষণ গল্পটির কেবল গৌরচন্দ্রিকা হচ্ছিল। ‘কিন্তু’ থেকেই গল্পের মূল আখ্যান শুরু বলা যায়।

সংসার, প্রজনন, যৌনতৃষ্ণার কাতরতা, স্নেহ-মমতা, নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আসা, বসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার বাইরে বা ভেতরেও আলীর নিজস্ব একটা জগৎ আছে। থাকতে পারে। অথবা থাকাটাই স্বাভাবিক। আসমান আলীকে গল্পের শুরুতে চিনতে না পারার কারণ — আসমান আলীর নিজস্ব জগতের দৃশ্যমান দৃশ্যটির জন্য। নিয়মিত যে-পোশাকে অফিসে আসে, বাজার করে, আজকে আমরা দেখছি ভিন্ন পোশাকে। দামি কাপড়ের প্যান্ট এবং সাফারি পরিধান করেছে আসমান আলী। একেবারে ক্লিন শেভ। পায়ের বুট জোড়া চকচক করছে। বোঝা যায় কালি করিয়েছে। নিয়মিত বাসের যাত্রী। হাতে থাকে একটি টিফিন ক্যারিয়ার। কিন্তু এখন দেখছি হাত খালি। সে দুপুরের খাবার খায় অফিসে, বড় সাহেব মাহমুদ হোসেনের খাওয়ার পর প্রায় সময়ে কিছু অবশিষ্ট থাকে — সেই অবশিষ্টের সঙ্গে বাসা থেকে আনা টিফিন ক্যারিয়ারের খাবার মিলিয়ে দিব্যি রাজভোগ খায় আসমান আলী।

বড় সাহেবের খাবারটা আসমান আলীই এনে দেয় তাঁর ইচ্ছে অনুসারে ফাইভ স্টার হোটেল থেকে। কত দিন, কত সময়ে আসমান আলী বড় সাহেবের সঙ্গে এসেছে ফাইভ স্টার হোটলে। কিন্তু কখনো মাহমুদ হোসেনের মতো হোটলে ঢুকে খেতে পারেনি। গাড়ির ড্রাইভার সিকান্দার বখতের সঙ্গে গাড়িতে বসে থেকেছে। কখনো-কখনো ফাইভ স্টার হোটেলের বয় এসে আসমান আলীকে খবর দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেছে। বয়ের পেছনে যেতে-যেতে আসমান আলী ভেবেছে, আজ নিশ্চয়ই বস তাকে বলবেন — আসমান আলী, সারাটা জীবন তো আমাকে এখান থেকে নিয়ে-নিয়ে খাওয়ালি, আজ বস আমার সঙ্গে — খা একদিন।

বসের সামনে দাঁড়াতেই ডান হাতে রান চিবুতে-চিবুতে বাম হাতে কাগজ আর একটা চাবির রিং ধরিয়ে বলেন — এখনই বাসে করে অফিসে যা, এই কাগজটা ম্যানেজারকে দিবি। আর বলবি — আমার

ফিরতে দেবি হবে।

আচ্ছা!

আসমান আলী তীব্র গতিতে চলে আসে ফাইভ স্টার হোটেলের ভেতরের মৌ-মৌ গন্ধের আকর খেয়ে।

মুখে লালা, লোভের তৃষ্ণায় — সাপের লকলকে জিহ্বার মতো গাছ বায় সে। বাসে চড়ে গ্রামে ভিজে ক্ষুধার্ত শরীরে অফিসে পৌঁছে ম্যানেজারকে চাবি বুঝিয়ে নিজের টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বসে আসমান আলী। স্ত্রী মরিয়মের রান্না ডানকিনি মাছের চচ্চড়ি, একটা ডিমের অর্ধেক ভাজা — সঙ্গে দুটুকরো গোল আলু, একদমই ভালো লাগে না আসমান আলীর। মুখের মধ্যে আড়াআড়ি বালির বাঁধ। সবকিছু বালু। বালুময়। নাকের ফুটোয় স্বাদের চুলো জ্বলে দাউ-দাউ লোভে। শালা, জীবনটাই কানামাছির আউলাঝাউলা যুদ্ধ! স্যারের টেবিলের পাশে দাঁড়ানোর পর নাকের ফুটো পার হয়ে স্বাদের স্রোত পৌঁছেছিল রসনার পাতিলে। সবকিছু বৃথা।

সারাটা জীবনভর কেবল স্যারের খাওয়া এভাবে দেখে যাব, নাকে স্বাদ নেব কিন্তু স্বাদের পদ্বপুকুরে ডুবসাঁতার কেটে জিহ্বা এবং মাড়ির সংযোগে রসনার তৃষ্ণা আর মিটাতে পারব না!

আসমান আলী টিফিন ক্যারিয়ার বন্ধ করে। খেতে ইচ্ছে করে না। অথচ পেটে ক্ষুধা আছে।

আমি এখানে, আপনাদের একটু খেই ধরিয়ে সাহায্য করতে পারি — ইতোমধ্যে আমরা আসমান আলীর কাজকর্ম সম্পর্কে জেনে এসেছি। সে একজন খাঁটি অকৃত্রিম ক্রীতদাস। জীবন চলে তার সরলরেখায়। তার মধ্যে আবার তথাকথিত বিপ্লবের ঝড় বইবে কেন, প্রশ্নটা সংগত কারণেই উঠতে পারে। আসলে বিপ্লব-টিপ্লব ওসব কিছু না। লোভ। নিখাত পাশ্চরিত লোভ আর মানুষের ভেতর হয়েনার মতো বসবাস করা প্রতিহিংসার প্রলুব্ধ বাতাস আসমান আলীকে নিয়ে এসেছে এখানে।

কোনখানে?

শেষ পর্যন্ত গল্পটা হবে তো? দেখুন তো কোথাকার পাত্তা কোথায় এসে জড়ো হচ্ছে বোঝা মুশকিল। না, আর কাক খোঁজা নয়, আমরা ফিরে যাই আমাদের আসমান আলীর কাছে। আসমান আলীর মানবিক হয়েনাবোধ, যেটা লুকিয়ে ছিল জন্মাবধি লোভ এবং প্রতিহিংসার ডানার নিচে, সম্প্রতি তারা দুজন জেগে উঠছে। থেকে-থেকে আসমান আলীর মগজ চূড়ায় টোকা দিচ্ছে আর আসমান আলীর ভেতর আরেকজন আসমান আলী জন্ম দিচ্ছে। সে নিজেকে প্রস্তুত করে দিনে-দিনে, পলে-পলে গোপনে গভীর সাবধানে আর একজন মাহমুদ হোসেনের প্রতিপক্ষ হিসেবে। সারাজীবনে না হোক অন্তত একবার, অন্তত একটিবার প্রতিপক্ষ হবেই বসের, বিশাল কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাহমুদ হোসেনের। প্রায় দীর্ঘ এক বছর, বারো মাস, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে, সে, আসমান আলী নিজেকে প্রস্তুত করার পর আজ এখানে পাঁচতারা হোটেলের লনে চাকচিক্য আঁটা পোশাক পরিধান করে গাড়ি থেকে নামল।

গাড়ি থেকে নামার পর আমরা, পাঠক সবাই এবং লেখক আসমান আলীকে অসম্মান করতে পারি না। কথাবার্তায় অবশ্যই তাকে সম্মান জানাব। ব্যাকরণ এখানে প্রয়োজন বা গুরুত্ব হারিয়েছে। কারণ সমাজের, রাষ্ট্রের গাড়িঅলাকে দেখলে সম্মান, আদব-লেহাজের বুকে মাথা নুইয়ে, কখনো-কখনো সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায়, এখানেও আমাদের সেসব সম্মানের অনুষ্ঙ্গ পালন করতে হবে।

আসমান আলী গাড়ি থেকে নেমে পাঁচতারা হোটেলের লনে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে দারোয়ান প্রায় সাষ্টাঙ্গ সালাম জানায় আসমান আলীকে। মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে বাঁহাত পকেটে রেখে ডান হাত সামান্য উঁচু করে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি কাচের দরজার সামনে দাঁড়ান। দাঁড়াতেই দরজা খুলে অপেক্ষমাণ গ্রহরী তাকে আবার সালাম জানায়। তিনি মাথাটা একটু নেড়ে সালাম গ্রহণ করেন এবং কয়েক কদম হেঁটে

টেবিল পর্যবেক্ষণ করে একটি টেবিলে বসে পড়েন। বসার সঙ্গে-সঙ্গে ওয়েটার এগিয়ে এসে মেন্যু বুক খুলে দাঁড়ায়। আসমান আলী মেন্যু বুকে চোখ বুলিয়ে কয়েকটি খাবারের অর্ডার দেন। ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যায়।

আমাদের আসমান আলী চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে গলার কাছে হাঁসফাঁস করা টাইয়ের বাঁধন একটু ঢিলা করেন। চারদিকে তাকান তিনি সহনশীল চোখে, গভীর আয়তদৃষ্টিতে। সামনের টেবিলে একজোড়া কপোত-কপোতী খাবার চাখতে-চাখতে নিজেরা দৃষ্টির সেলুলয়েডে নিজেদের চাটছে লজেন্সের রসে। আসমান আলী ব্যাপারটা দেখেন আর আপন মনে হাসেন। মনে-মনে বলেন — বাছাধনেরা, এই রকম চাখার জীবন আমাদেরও এক সময়ে ছিল। আমরা সেসব পেছনে ফেলে এসেছি। ভাবতে-ভাবতে আসমান আলী দেয়াল-ঘেঁষে আর একটি টেবিলের দিকে তাকান। তিনি দেখতে পান — টেবিলে তার বস এমডি মাহমুদ হোসেনের বন্ধু কায়দুজ্জামান বসে আছেন। সঙ্গে সিনেমার ফ্রুপ মারা এক নায়িকা। নামটা মনে করতে পারছেন না আসমান আলী। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে মনে পড়ে — নায়িকার নাম — মূর্ছনা। মূর্ছনা দেখতে-শুনতে খারাপ না। অন্তত আসমান আলীর চোখে। মাস চারেক আগে এমডি মাহমুদ হোসেন যখন বিদেশে ছিলেন, তখন আমাদের আসমান আলী মতিঝিলের একটি সিনেমা হলে নায়িকা মূর্ছনার একটি ছবি দেখেছিলেন। মূর্ছনা পাছা এবং বুক দুটো দুলিয়ে যখন তা থইথই নাচ আরম্ভ করল পর্দায়, সারা সিনেমা হলটা নড়েচড়ে বসেছিল। তৃতীয় শ্রেণির দর্শকেরা তেজি ঘোড়ার উচ্ছ্বাসে, ফুটবল রেফারির মতো মুখে বাঁশির পরিবর্তে দুআঙুল পুরে অদ্ভুত কৌশলে বাঁশি বাজিয়েছিল। বলা বাহুল্য, আসমান আলীর কানে সে-বাঁশির কর্কশ সুর খারাপ লাগেনি। সেই নায়িকা মূর্ছনা এখন তার সামনে বসা। রূপালি পর্দার আলো-ছায়ার বাইরে একেবারে জীবন্ত রক্তমাংসের নারী, কায়দুজ্জামানের অতিথি? যাবে নাকি একবার কায়দুজ্জামান এবং নায়িকা মূর্ছনার টেবিলে? না, নিজেই পরিকল্পনা বাতিল করে দেয় — স্বগত কণ্ঠে নিজেকে শুনিয়া আসমান আলী বলে — না, যাওয়া ঠিক হবে না।

হঠাৎ কায়দুজ্জামান তাকান আমাদের আজকের অসামান্য অনন্য আসমান আলীর দিকে। আসমান আলী তাকান সাহসের ভেলায় চড়ে, ডাটের সঙ্গে। ডান পায়ের ওপর বাম পা তুলে তুমুল নাচাতে থাকেন। কায়দুজ্জামান কি চিনতে পেরেছেন আসমান আলীকে? পা নাচাতে-নাচাতে ভাবনার দোলনায় দোল খায় আসমান আলী। তার দোলার মধ্য ওয়েটার খাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখে। সাজানো শেষ হলে আসমান আলী পরম আয়েশে খাওয়া আরম্ভ করেন গভীর তপস্যার ঢঙে, আস্তে এবং ধীরে। সামনে দাঁড়ানো নতজানু ওয়েটার। মুরগির মাংসে কামড় বসিয়ে ইশারায় কাছে ডাকেন ওয়েটারকে।

পানি কোথাকার?

স্যার — বিদেশ থেকে আমদানি করা। বোতলজাত পানি।

ও কে।

আসমান আলী আশ্বস্তবোধ করেন। বিশেষভাবে সেক্স ফিল্টার করা বোতলজাত পানি সরবরাহ করা হয়েছে তার জন্য। জীবাণুযুক্ত বাইরের ময়লা পানি অন্তত আজকে, আমাদের আসমান আলী পান করতে পারেন না। সামাজিক পারদরেক্ষায়, তার জীবনের মূল্য অনেক। সেই মূল্যবান জীবন জীবাণুযুক্ত সামান্য পানি পান করে একটি ঝুঁকির বধ্যভূমিতে তিনি দাঁড়াতে পারেন না।

আসমান আলী ধীরেসুস্থে, যথেষ্ট সময় নিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে খাওয়া শেষ করেন। নিজের ওপর এক অবিশ্বাস্য আস্থা হিমালয়ের মতো অনুভব করেন তিনি, আসমান আলী।

খেতে-খেতে আপন মনে বলেন — দেখে যাও মাহমুদ হোসেন, তোমরা প্রতিদিন খেতে পারো, খাও। কিন্তু আসমান আলী একদিন হলেও খেতে পারে। ভেতরে, শরীরের অবকাঠামোর মধ্যে দীর্ঘদিনের বুনো জন্তুব প্রতিশোধের বাজপাখি, কথার নিঃশব্দ উচ্চারণের ফাঁকে

ঠোট নড়ে ওঠে। দাঁত এবং ঠোটের ফাঁকে দু-একটি শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

কিছু বললেন, স্যার? ওয়েটার জিজ্ঞেস করে ঠোট নড়তে এবং অস্পষ্ট কথা বলতে দেখে।

নাহ।

খাওয়া শেষে আসমান আলী আয়েশ করে এক কাপ চা পান করেন। চা পান শেষে ওয়েটার বিল নিয়ে আসে। বিলের ওপর আলতো চোখ বুলিয়ে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পকেট থেকে টাকা বের করে বিলের প্লেটে রাখেন। ওয়েটার প্লেটটি নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ দেখেন — প্লেটে একটি একশ টাকার নোট, সঙ্গে কয়েকটি খুচরো টাকা।

হাত ইশারায় টাকাটা ওয়েটারকে নিয়ে যেতে বললে ওয়েটার দীর্ঘ, বিগলিত ক্রীতদাসসুলভ হাসি বমি করতে-করতে, হাত কপালে ঠেকাতে-ঠেকাতে আড়ালে চলে যায়। আসমান আলী গান্ধীরের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং চারদিকে একবার চোখ বুলায়। তিনি দেখতে পান যে, কায়দুজ্জামান এবং নায়িকা মূর্ছনা টেবিলে নেই। গেল কোথায়?

যাক যেখানে খুশি সেখানে, তাতে আমার কী! এই জাতীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ করে আসমান আলী সিংহ পৌরুষে গেটের দিকে হাঁটতে থাকেন।

আসমান আলী গেটের দিকে হাঁটতে থাকুক, এই ফাঁকে গেট পার হওয়ার আগে আমরা, পাঠক এবং লেখক মিলে আসমান আলীর হিসাবটা কষে ফেলি। আশা করি পাঠকেরা আমার সঙ্গে একমত হবেন এবং হিসাব মিলাতে যোগ-গুণ-ভাগ করতে বসবেন। আসমান আলীর বেতন মাসে দশ হাজার টাকা ছিল। চাকরির বয়স তিন বছরে আরো দুহাজার টাকা বেড়েছে। আর ফাও বা টিপস ইত্যাদি ধরে আরো পাঁচশো টাকা। মাসে সর্বমোট বারো-তেরো হাজার টাকার মালিক সে। এর মধ্যেই টেনেহিঁচড়ে বাসা ভাড়া, থাকা-খাওয়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ, হাটবাজার ইত্যাদি চলে। সেই আসমান আলী আজকে একবেলা খেয়ে বিল দিয়েছে সাড়ে নয় হাজার টাকা। বকশিশও দিয়েছে তিনশো টাকা। এখন হিসাব করে দেখুন, এখন তার কাছে থাকে আড়াই থেকে তিন হাজার ও সামান্য কিছু খুচরা টাকা। আমাদের হিসাব শেষ। চলুন, ফাইভস্টার হোটেলের গেট পার হয়ে আসা আমাদের চিরচেনা সনাতন আসমান আলীর কাছে।

পাঁচতারা হোটেলের গেট পার হওয়ার পর তাকে আর সম্মান জানানোর প্রয়োজন নেই। গেট পার হয়ে আসমান আলী লনে সামান্য সময় দাঁড়ায়। চোখের তারা এবং সেই সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে হোটেলটা দেখে নেয় এক পলক। দেখা শেষে প্রধান সড়কের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে পকেটে হাত ঢোকায়। হাতে একটুকরো কাগজ আবিষ্কার করে। কাগজটা হাতের ওপর চোখের সামনে তোলে। স্ত্রীর দেওয়া বাজারের ফর্দ। স্ত্রীর অসুস্থতার ওষুধ, মেয়ের জামা, কাপড়, ওড়না, নিজের পায়ের স্যান্ডেল, মরিচ, আদা, ডাল, তরকারি, চাল মিলিয়ে প্রায় চার হাজার টাকার হিসাব। বাড়ি ভাড়া আট হাজার টাকা। সাড়ে নয় হাজার টাকা দিয়েছে হোটেলের বিল। এখন পকেটে আছে মাত্র আড়াই থেকে তিন হাজার এবং সামান্য কিছু খুচরা টাকা।

আসমান আলী ফর্দটা দেখে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উষ্ণ আবহাওয়ায় শূন্য তাপমাত্রার ঠান্ডার মধ্যে জমে যায়। কোথায় ছিল সে এতক্ষণ? কী করেছে সে? ইচ্ছে হয় — পেটের মধ্যে চালান করা খাবারদাবার টেনে বের করে প্লেটে সাজিয়ে ফাইভস্টার হোটলে ফিরিয়ে দিয়ে নগদ টাকাটা নিয়ে আসে।

কিন্তু ততক্ষণে পেটের ভাত, মাছ, মাংস বোতলজাত পানি গলে-গলে বিষ্ঠায় রূপান্তর হতে আরম্ভ করেছে। আসমান আলী বিস্ফারিত চোখে প্রতিপক্ষ আপন পেটটার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে এবং আমরাও আগের মতো আসমান আলীকে চিনতে পেরেছি। □



লজ্জিত ঘাস

শাহ্নাজ মুন্নী



হে মস্তুর মধ্যরাত। মৃদুমন্দ ঠান্ডা হাওয়া বইছে। রংপুর শহরের সব মানুষ সারাদিনের কাজকর্ম সেরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রাস্তাঘাটে সুনসান নীরবতা। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরের সামনে এসে থামল একটা অ্যাম্বুলেন্স আর চারটা সরকারি গাড়ি। গাড়িবহরের সামনের সাদা জিপ থেকে দ্রুত নেমে এলেন রংপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রিয়সিঙ্ঘ তালুকদার। অন্য গাড়িগুলোর একটিতে পুলিশের দুজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আরেকটিতে মেয়র কার্যালয়ের সেক্রেটারি ও আরো কয়েকজন লোক। বাকি গাড়িদুটোতে আছেন গোটা দশেক পুলিশ কনস্টেবল ও দুজন তরুণ মৌলবি।

আগেই হয়তো এখানে খবর দেওয়া ছিল। তাই বেশিক্ষণ সময় লাগল না। একটু পরেই,



অলংকরণ : রণজিৎ দাশ

হিমঘরের বরফঠাভা কেবিন থেকে মৃত্যুর ১০ দিন পর বের করে আনা হলো পলিথিনে মোড়ানো একজন মানুষের শক্ত শীতল মৃতদেহ।

মরদেহটি কাঠের কফিনে ভরে দ্রুত তুলে নেওয়া হলো অ্যাম্বুলেন্সে। দাঁড়িয়ে থেকেই চটপট কয়েকটা প্রয়োজনীয় কাগজে সই করলেন প্রিন্সিপাল তালুকদার। তারপর, চাপাস্বরে কারো কাছে জানতে চাইলেন, ‘হয়েছে?’

নিস্তব্ধ রাতে সেই চাপা কথাটাই খুব জোরে শোনা গেল।

‘ইয়েস, স্যার।’ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন সঙ্গে থাকা কেউ একজন।

‘চলেন, তাহলে রওনা দেয়া যাক।’

চারটা গাড়ি আর একটি অ্যাম্বুলেন্স রংপুর শহরের নীরব রাস্তা চিরে দ্রুতবেগে ছুটে চলল তিন কিলোমিটার দূরের মুন্সীপাড়া পৌর কবরস্থানের দিকে। এ-অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো আর বড় কবরস্থান এটি। আগে থেকেই নির্দেশনা থাকায় কবর খুঁড়েই রাখা হয়েছিল।

কাঠের কফিনটা সামনে রেখে জানাজা পড়ানোর প্রস্তুতি নিলেন একজন মৌলবি। পেছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন কয়েকজন মানুষ। তারা মৃতদেহের সঙ্গে আসা পুলিশ ও সরকারি লোকজন, কবরস্থানের তত্ত্বাবধায়ক, গোরখোদক, পাশ্বেবর্তী কেরামতিয়া মসজিদের মুয়াজ্জিন ও কবরস্থানে ঘুরতে থাকা দুয়েকজন ভবঘুরে।

কুনিওর কাছে বাংলাদেশ
মানেই সাইদুরের দেশ।
যেহেতু সাইদুর ভালো
মানুষ তাই তার দেশের
মানুষগুলোও ভালো হবে
বলে বিশ্বাস তার।

‘আল্লাহ্ আকবর’, ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে তাকবির পড়ে উচ্চৈঃস্বরে জানাজার নামাজের নিয়ত করলেন মৌলবি সাহেব। তারপর দোয়া পড়লেন, ‘আল্লাহুম্মাগফিরলি হ্যায্যি না ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়্যিবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা...’

হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, বালক ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে ক্ষমা করো...’

কাতারের একটু পেছনে আলাদা হয়ে একাই দাঁড়িয়ে থাকলেন প্রিয়সিদ্ধু তালুকদার। হাতদুটো শক্ত করে বুকের কাছে বেঁধে, চোখ বন্ধ করে, মনে-মনে প্রার্থনা করলেন,

‘অকারণে খুন হয়ে যাওয়া এই ভিনদেশি মানুষটির আত্মার শান্তি দিও ভগবান।’

কুনিও হোশি ওরফে গোলাম কিবরিয়ার দাফন যখন শেষ হলো, তখন সুবেহ সাদেকের নরম আলো এসে পড়েছে পৃথিবীতে। ছাইরঙা শহরটা সূর্যের আলোয় ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন এসেছিল তেমনভাবেই দ্রুত ফিরে যাচ্ছে একটা অ্যান্ডুলেস ও চারটা সরকারি গাড়ি।

দুই

সাইদুর রহমান যখন প্রথম জাপানে যান, তখন তার ধারণাই ছিল না যে, জাপানের মতো এত ধনী, উন্নত আর আধুনিক দেশেও জীর্ণ, মলিন, পোশাক পরা ভিখিরিগোছের মানুষজন থাকতে পারে। বাংলাদেশের মতো একটা দরিদ্র দেশে দরিদ্র মানুষজন থাকবেন, এ তো জানা কথাই; কিন্তু জাপানে এই দরিদ্র মানুষরা কেন?

তিনি নিজে হতদরিদ্র অবস্থায় সেই ১৯৭৮ সালে বহু ঘাটের পানি খেয়ে শেষ পর্যন্ত জাপানে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন। টোকিও শহরের সেই হাড়-কাঁপানো শীতে একটা অপরিচিত দেশে, আত্মীয়-পরিজনহীন অবস্থায় দয়াপরবশ হয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল স্নেহময়ী বুড়ি তানাকা মেগুমি। কৃতজ্ঞতায় আপ্ত সাইদুর মা ডেকেছিল সেই দয়ালু মমতাময়ী নিঃসন্তান জাপানি বুড়িকে। মা শুধু তাকে আশ্রয়ই দেয়নি, পালিত কন্যা আইকোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, নিজের ছোট রেস্টুরেন্টের ভারও বিশ্বাস করে তুলে দিয়েছিল সাইদুরের হাতে।

মেগুমির প্রত্যাশামতোই সাইদুর যত্ন করে ব্যবসা বাড়িয়েছে, তার হাতে সেই ছোট রেস্টুরেন্ট আরো বড় হয়েছে, কিন্তু বুড়ি মেগুমির উপদেশমতো এখনো সকালবেলা নিজ হাতে দোকান খোলে সাইদুর, কর্মচারীদের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে সে আর আইকো।

ভবঘুরে কুনিও হোশির সঙ্গে তার দেখা হয় একদিন সকালে রেস্টুরেন্ট খোলার সময়। সাইদুর হঠাৎ করে খেয়াল করে, তার রেস্টুরেন্টের দরজা-ঘেঁষে ফুটপাথের ওপর কেউ একজন গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। সাইদুর কাছে গিয়ে, ভালো করে তাকিয়ে দেখে লোকটাকে, শতচ্ছিন্ন একটা কোট গায়ে এক মাঝবয়সী হতদরিদ্র জাপানি, চোখদুটো বন্ধ।

‘নানো ওশিতে ইরো নো দেস কা? কী করছো তুমি এখানে?’

একটু উঁচু গলায় জানতে চায় সাইদুর। ধড়ফড় করে উঠে বসে শুয়ে থাকা জাপানি লোকটা। ভয় পাওয়া গলায় বলে, ‘নানিমো নাইন। ইয়েকোতে তোয়ন্তে মাস। কিছু করছি না, শুয়ে আছি শুধু। ক্ষমা করো।’

সাইদুরের হঠাৎ কেমন মায়া হয়, লোকটার অসহায় শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে, কেন যেন নিজের মৃত বাবার মুখটা মনে পড়ে যায় তার। বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা তীব্র ধাক্কা খায় সে। নরম গলায়

জিজ্ঞেস করে,

‘তাবে মাস তাকা? খেয়েছো কিছু?’

শুকনো মুখে মাথা নাড়ে লোকটা। ‘ইয়ে।’

ভবঘুরে লোকটাকে রেস্টুরেন্টের ভেতর নিয়ে বসায় সাইদুর। আইকোকে ডেকে বলে কিছু খাবার দিতে। বুড়ুমুর মতো গোথাসে খাওয়া শেষ করে লোকটা। এর মধ্যেই সাইদুর প্রশ্ন করে জেনে নেয়, ওর নাম কুনিও হোশি, ধনী দেশের এক গৃহহীন দরিদ্র নাগরিক সে। হিনোহারা গ্রামে বাপের সামান্য জমি পেয়েছিল কুনিও, চাষাবাদও করত। একটা সময় কুসঙ্গে পড়ে মদ আর জুয়ার নেশায় ডুবে যায়। জমি হারায়, একদিন বউও ছেড়ে চলে যায় তাকে। এরপর থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় জাপানের শহরগুলোতে ঘুরে বেড়ায় হোশি। মানুষের বারান্দায়, পার্কে, রেলস্টেশনের বেঞ্চিতে রাত কাটায়। মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে দিনমজুরি করে, কদিন ধরে জুরে ভুগে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে সে, কাজকর্মও করতে পারছে না। তাই অসুস্থ শরীরে রাতে এসে শুয়ে পড়েছে এখানে।

কুনিও হোশিকে আশ্রয় দেয় সাইদুর।

ওষুধ খাওয়ায়, সুস্থ করে তোলে। হোটেলের টুকটাক কাজে এখন সাহায্য করতে পারে বুড়ো লোকটা। কিন্তু সাইদুর তাকে পছন্দ করলেও আইকোর দুচোখের বিষ যেন কুনিও হোশি। সারাক্ষণই গজগজ করে, ‘বুড়িটা একটা মিচকা শয়তান, ভালো মানুষের মতো মুখ করে থাকে এখন, কিন্তু সুযোগ পেলেই দেখবে সব চুরি করে পালাবে, এদের একদম বিশ্বাস করি না আমি।’

সাইদুর বউকে বোঝানোর চেষ্টা করে, ‘দেখো গরিব মানুষ ও। বেচারা থাকুক না আমাদের সঙ্গে...’

‘ইয়ে। না। থাকতে পারব না ও। তাড়াতাড়ি বিদায় করো ওকে।’

গৃহের এই অশান্তির ব্যাপারটা ঠিকই টের পেয়ে যায় বুড়ো। একদিন নিজে থেকেই বলে,

‘মেলা দিন তো থাকলাম বাবা, শরীরটাও ঠিক হয়েছে, এবার বিদায় দেও। অন্য কোথাও যাই।’

‘কই যাবা তুমি?’ সাইদুর জিজ্ঞেস করে।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর চোখ তুলে বলে, ‘পথের মানুষ পথেই ফিরে যাবো।’

সাইদুরের মাথায় হঠাৎ করেই অন্য একটা চিন্তা খেলে যায়। সাত পাঁচ না ভেবেই সে জিজ্ঞেস করে, ‘ওয়াতামিনু কুনিই ইকো না দারোকা? আমার দেশে যাবা?’

বৃদ্ধের চোখে অদ্ভুত এক অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটুও ইতস্তত করে না সে। বলে, ‘হাইয়ি। ইকি মাস।’

কুনিওর কাছে বাংলাদেশ মানাই সাইদুরের দেশ। যেহেতু সাইদুর ভালো মানুষ তাই তার দেশের মানুষগুলোও ভালো হবে বলে বিশ্বাস তার। কুনিওর মতামত পেয়ে সাইদুর আর দেরি করে না, বাংলাদেশে, রংপুরের মুন্সীপাড়ায় তার বন্ধু মিশনকে ফোন করে সে। পরবর্তী ঘটনাগুলো বেশ দ্রুতই ঘটে। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ভিসা নিয়ে প্লেনের টিকিট কেটে এক মাসের মধ্যেই কুনিও হোশি চলে যায় বাংলাদেশে।

ঢাকায় তাকে রিসিভ করে রংপুর নিয়ে যায় মিশন। মুন্সীপাড়ায় দুই রুমের একটা বাসা ঠিক করে দেয়। শরীফ মিয়া নামের এক কিশোরকে ঠিক করে দেয় তার দেখাশোনা আর রান্নাবান্না করে দেওয়ার জন্য।

কুনিও হোশির চেহারাটা হাসি-হাসি। আর গড়পড়তা জাপানিদের মতোই খুব বিনয়ী একটা ভঙ্গি আছে তার। সাইদুর আগে থেকেই

তাকে ‘কেমন আছেন?’, ‘ধন্যবাদ’, ‘ভাত খাব’, ‘পানি খাব’ এমন কিছু সাধারণ বাংলা শিখিয়ে দিয়েছিল। বাকি কথা শেখানোর দায়িত্ব নিল শরীফ মিয়া। মুন্সীপাড়ার লোকজন প্রথম-প্রথম কুনিও হোশির ব্যাপারে বাড়তি কৌতূহল দেখালেও ধীরে-ধীরে সেটা কমে গেল। এলাকায় জাপানি বুড়া হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল হোশি। তবে সবাই জানত তার নাম হিতা কুচি। মুন্সীপাড়ার শিশুরা হিতা কুচির বাংলা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ত। তারা ওকে নিয়ে ছড়া কাটত,

‘হিতা কুচি, গুচি পুচি,
খাও শুধু আলু, লুচি।’

ওদের কথা শুনে হিতা কুচি ওরফে কুনিও হোশিও দাঁত বের করে, চোখ ছোট-ছোট করে হাসত। বাচ্চাদের চকোলেট কিনে দিত।

মিশন ব্যস্ত মানুষ। তবু নিয়মিত কুনিওর খোঁজখবর করে। হাজার হলেও সাইদুরের অতিথি সে। একদিন মিশনের কাছে একটা আবদার করে বসে কুনিও, ভাঙাচোরা বাংলায় বলে, ‘বসে থেকে সময় কাটে না, আমাকে এক টুকরা জমির ব্যবস্থা করে দেও, চাষাবাদ করব।’

মিশন একটু চমকিত হয়। বলে, ‘কী চাষ করতে চাও তুমি?’

হোশি একটু ভাবে। তারপর বলে, ‘এক ধরনের বীজ আছে আমার কাছে। সেই বীজ দিয়ে ঘাস চাষ করতে পারি।’

‘ঘাস? ঘাস তো এমনি-এমনিই জন্মায়। কেউ আবার ঘাস চাষ করে নাকি?’

‘না, না, এটা অন্য জাতের ঘাস। খুব ভালো জিনিস।’

কুনিওকে আর কিছু বলে না মিশন। জাপানে সাইদুরের সঙ্গে কথা বলে সে।

‘দোস্তু, তোর অতিথি তো দেখি চাষাবাস করতে চায়। কী করি?’

সাইদুর বলে, ‘কাজ ছাড়া বসে থাকতে হয়তো বেচারার ভালো লাগছে না। দেখ, যদি আশপাশে খালি জমি পাস, তাহলে লিজ-টিজ নিয়ে দে। চাষাবাদ করতে চাইলে করুক। অসুবিধা কী? টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করিস না, আমি পাঠাব।’

মিশন তার লোকজনকে দিয়ে খোঁজ লাগায়। শেষ পর্যন্ত কাউনিয়া উপজেলার আলুটারি গ্রামে ১২ কাঠার একখণ্ড জমি লিজ নিয়ে দেয় হোশিকে। জমি পেয়ে বুড়ো তো খুব খুশি। নিজেই খালি পায়ে মাটিতে নেমে পড়ে, মুঠো ধরে মাটি তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শোঁকে, কোদাল দিয়ে মাটি কোপায়, কি করে, না করে! আলুটারি গ্রামের শিশু-কিশোররা সে-দৃশ্য দেখে দাঁত বের করে হাসে। বয়স্করাও হাঁটাচলার পথে বুড়োর কাণ্ড দেখে মুচকি হাসে। চায়ের দোকানে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করে, ‘বুড়াটা বোধহয় পাগলা কিসিমের মানুষ! নাইলে কেউ জাপান দেশ ছাইড়ে এই গেরামে আসে!’

চা-পানকারীরা মাথা নাড়িয়ে সায় দেয়। ‘ঠিক কহিছো, বাহে।’

মিশন দুজন দিনমজুর ঠিক করে দেয় হোশির সঙ্গে কাজ করার জন্য। দেখতে-দেখতে জমিটার চেহারা পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথমে হালকা সবুজ আবরণ, তারপর দিনে-দিনে মাঠে সবুজের উঁকিঝুঁকি বাড়তে থাকে, হোশির উৎসাহও পাল্লা দিয়ে বাড়ে, মজুরদের সঙ্গে সেও বসে যায় আগাছা বাছতে, পাইপ দিয়ে ক্ষেতে পানি ছিটায়। গরু-ছাগল, পাখ-পাখালির হাত থেকে বাঁচতে চারদিকে জাল দিয়ে জমি ঘিরে রাখার বন্দোবস্ত করে।

দিনমজুরদের পিঠ চাপড়ে ভাঙা বাংলায় বলে, ‘কুব বালো, কুব্বালো।’

প্রতিদিন সকালবেলা শরীফ মিয়া কুনিওর নাশতা বানিয়ে দেয়। নাশতা শেষ করে একটা রিকশায় চড়ে আলুটারি গ্রামে রওনা দেয়

হোশি। সারাদিন জমিতে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে-আগে মুন্সীপাড়ায় নিজের ডেরায় ফিরে আসে সে।

এদেশের সবকিছু নিয়েই ব্যাপক কৌতূহল কুনিওর। ছোট চোখদুটো মেলে হাসি-হাসি মুখে সবকিছু দেখতে থাকে সে। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করে আশপাশের মানুষ কী বলছে, নিজের সামান্য বাংলা জ্ঞান দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সেসব কথার মর্মার্থ।

বাড়ির পাশের কেরামতিয়া মসজিদ থেকে প্রতিদিনই পাঁচবার ভেসে আসে আজানের শব্দ। হোশি কান পেতে শোনে সেই সুরেলা আওয়াজ। একদিন শরীফকে বলে, ‘এই বাংলা কথাগুলি আমি বুঝতে পারি না। কী কথা এইগুলি?’

শরীফ প্রথমে কুনিওর কথা বুঝতে পারে না। যখন বোঝে তখন সে হেসেই কুটিপাটি।

‘আরে, ওগুলো কি বাংলা কথা যে বুঝতে পারবা? ওগুলো আরবি কথা গো, আরবি কথা...’

শরীফ তাকে বুঝিয়ে বলে কাকে বলে আজান, কাকে বলে নামাজ। কুনিও চোখদুটি বড়-বড় করে শোনে। কিছু হয়তো বোঝে কিছু বোঝে না।

‘তোমার কী ধর্ম? খ্রিস্টান?’

শরীফ টেবিলে ভাত বেড়ে দিতে-দিতে জিজ্ঞেস করে। কুনিও হোশি সঙ্গে-সঙ্গে এ-প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তার হয়তো বলতে ইচ্ছা হয়, পৃথিবীজুড়েই গরিব মানুষের ধর্ম শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করা। সেই সংগ্রাম এতটাই তীব্র যে, প্রচলিত ধর্মবোধ হয়তো তাকে আচ্ছন্ন করে না। যেমনটি হয়েছে তার নিজের বেলায়। ছোটবেলা মা কুনিওকে বলেছিল, ওদের ধর্মের নাম শিন্টো আর দেবতার নাম কামি। ধর্ম মানে তাই কুনিওর কাছে মায়ের কাছে শোনা কয়েকটা গল্প।

সূর্যদেবী ‘আমাতেরাসু’র গল্প বলত মা।

আমাতেরাসু একদিন তার ভাই ঝড়ের দেবতা সুসানুর ওপর রাগ করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল, আর তখন সূর্যের অভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

স্বর্গের দেব-দেবীরা অনেক চেষ্টা করল আমাতেরাসুকে ঝোপের অন্ধকার আড়াল থেকে বের করে আনতে, কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে এলো না আমাতেরাসু। তখন সুসানুর স্ত্রী, আমে-নো-উজুমী, যিনি আনন্দ ও ভোরের দেবী, তিনি উদ্দাম নৃত্য শুরু করলেন, সেই নাচে এমন শব্দ তৈরি হলো যে, লুকিয়ে থাকা আমাতেরাসু কামির কাছে জানতে চাইল, ‘এ কিসের শব্দ? কী ঘটছে স্বর্গরাজ্যে?’ কামি বলল, ‘স্বর্গে তোমার চাইতে ভালো আরেকজন সূর্যদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এ তারই উল্লাসধ্বনি।’

একথা শুনে আমাতেরাসু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, সে রাগ-অভিমান ভুলে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। তাতেই আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ আর পৃথিবী রক্ষা পেল এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে।

ছোটবেলায় শোনা এসব গল্পও এতদিন কীভাবে যেন কুনিও হোশির মনের অতলে চাপা পড়েছিল। ধর্মের প্রসঙ্গ উঠে আসায় মনে পড়ল সেসব, উঠে এলো মনের ওপরের স্তরে।

মা কিছু-কিছু ধর্মাচার পালন করত হয়তো, বউও করত হয়তো, কিন্তু সে নিজে কখনো সেভাবে কোনো আচার-অনুষ্ঠান পালন করেনি, হয়তো ধর্ম তাকে সেভাবে প্রাণিত করতে পারেনি।

‘তুমি কি তাইলে হিন্দু?’ কুনিওকে চুপ করে থাকতে দেখে আবারো শরীফের নির্দোষ জিজ্ঞাসা। কুনিও বলে,

‘না। আমি শিন্টো ছিলাম। এখন কিছুই না।’

শরীফ তার স্বল্পজ্ঞানে কুনিওর কথার মাজেজা বুঝতে পারে না। শিন্টো ব্যাপারটা কি, সেটাও ঠিকমতো বুঝতে না পেরে সে

ফ্যালফ্যাল করে বুড়ো লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘আমাকে তোমার মসজিদে নিবা?’ শরীফকে জিজ্ঞেস করে কুনিও।

শরীফ এবার সমস্যায় পড়ে। মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষকে কি মসজিদে নেওয়া যায়? ইমাম সাহেব তো বলেন, এরা কাফের। কাফেরকে মসজিদে নিয়ে আবার কোন পাপ করে ফেলবে কে জানে?

‘আমি মসজিদে যাইতে চাই। গুজুর বারে যাইব।’ কুনিও বলে।

শুক্রবার শুনে একটু আশ্বস্ত হয় শরীফ। হাতে দুদিন সময় আছে। এর মধ্যে চট করে ইমাম সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেওয়া যাবে।

শরীফের কাছ থেকে কুনিওর মসজিদে আসার আগ্রহের কথা শুনে ডান হাত দিয়ে নিজের লম্বা দাড়িতে বিলি কাটেন ইমাম সাহেব। তারপর বলেন, ‘নিয়া আসিস। বিধর্মীরা সৎ উদ্দেশ্যে নিয়া মসজিদে আসলে ক্ষতি নাই।’

পরের জুম্মাবারে নামাজ শুরু হওয়ার আগেই পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে হোশি গিয়ে হাজির হয় কেরামতিয়া মসজিদে। ইমাম সাহেব তাকে হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে বসান। একে-একে মুসল্লিরা জমা হতে থাকে। তাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। এই বিদেশি বিধর্মী এখানে কী করছে — এই প্রশ্ন সবার মধ্যে।

নামাজ শেষে গোমর ফাঁস করেন স্বয়ং ইমাম সাহেব। তিনি মাইকে ঘোষণা দেন, ‘প্রিয় মুসল্লিগণ, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে, জনাব কুনিও হোশি জাপান দেশের শিন্টো ধর্মের মানুষ। তবে তিনি অদ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়াছেন।’

‘মারহাবা, মারহাবা। সোবহান আল্লাহ। সোবহান আল্লাহ।’

রোল পড়ে যায় মসজিদে। কেউ একজন এসে কুনিওর মাথায় একটা টুপি পরিয়ে দেয়। সবার সামনে কলেমা পড়িয়ে কুনিও হোশিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন ইমাম সাহেব। তার নতুন নাম রাখা হয় গোলাম কিবরিয়া। কয়েকজন তরুণ মুসল্লি অতিউৎসাহে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নও-মুসলিম কুনিওর ছবি তোলে। সম্ভবত একজন বিধর্মীকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করার স্বর্গীয়

উন্মাদনায় তারা উদ্বেলিত হয়।

কুনিও হোশি বা গোলাম কিবরিয়ার আলুটারি ঘামের ক্ষেতে ঘাস কিংবা ঘাসসদৃশ গুল্মগুলো বড় হতে থাকে। কুনিওর চেহারায় হাসি আরো বিস্তৃত হয়। সে হাত দিয়ে গাছের উচ্চতা মাপে আর মাথা ঝুলিয়ে মুচকি-মুচকি হাসে। কখনো-কখনো দিনমজুর আবেদ আলীর পিঠ চাপড়ে দেয়, আর আকাশের দিকে দুই হাত তুলে ভাঙা বাংলায় বলে, ‘পেরেছি, পেরেছি, আমি পেরেছি।’

তারপর আসে সেই দিন। ২০১৫ সালের ৩ অক্টোবর, শনিবার। প্রতিদিনের মতো সেদিনও কুনিও হোশি সকালের নাশতা সেরে বাসা থেকে বেরিয়ে একটু হেঁটে সামনে গিয়ে একটা রিকশা নিয়েছেন। চমৎকার রোদ উঠেছে। বাংলাদেশে এটা শরৎকাল চলছে, জাপানে শরৎ নেই, শরতের সোনালি রোদ গায়ে মেখে কুনিও হোশির রিকশা মাহিগঞ্জ-হারাগাছা সড়ক ছেড়ে আলুটারি মহিষওয়ালা মোড়ে এসে পৌঁছাল।

পরপর তিনটা গুলির শব্দ হলো। হিতা কুচি, কুনিও হোশি বা গোলাম কিবরিয়ার হঠাৎ মনে হলো, তার চোখের ওপর কেউ যেন ঝপ করে কালো একটা পর্দা টেনে দিয়েছে, সূর্যদেবী আমাতেরাসু আবার বুঝি তার ভাইয়ের ওপর রাগ করে চলে গেছে কোনো অন্ধকার ঝোপের আড়ালে, ফলে পৃথিবীতে আচমকা নেমে এসেছে এক আশ্চর্য আঁধার।

... আততায়ীরা সড়কের পাশে মোটরসাইকেলটা দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল, কেউ বলে, তারা মুখোশে তাদের মুখ ঢেকে রেখেছিল।

‘দুর্ভাগ্য মোটরসাইকেলে এসে তাকে তিনটি গুলি করে। একটি গুলি তার বুকে, একটি ডান হাতে এবং আরেকটি কাঁধে বিদ্ধ হয়।’ কাউনিয়া থানার ওসি রেজাউল করিম গণমাধ্যমকে এসব কথা জানান।

তখন শরতের উজ্জ্বল রোদের ওপর একখণ্ড কালো মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে ভ্রান করে দিলো সব আলো, ভয়ের বিষণ্ণ কুয়াশা ঢেকে দিলো আলুটারি ঘামের মাঠে বেড়ে ওঠা ঘাসগুলোর সতেজ মুখ, কিছু ঘাস তখন লজ্জায় মাটিতে মুখ লুকাতে চাইল, কিছু ঘাস মুষড়ে পড়ল ফ্লোড ও ঘৃণায়। □

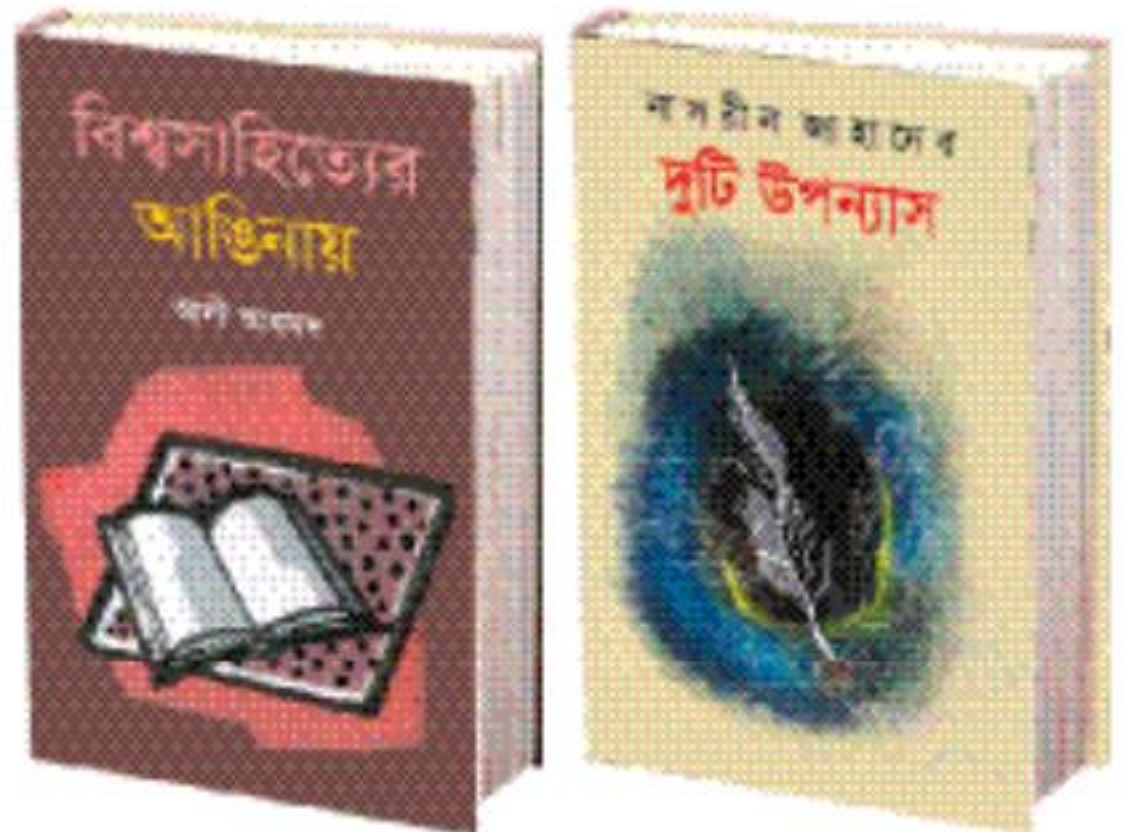
বেঙ্গল পাবলিকেশন্স থেকে সদ্য প্রকাশিত দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

সংগ্রাহে রাখার মতো



বেঙ্গল সেণ্টার
গ্রুপ ২, সিভিল এভিনিউ, বিটি এয়ারপোর্ট রোড,
বিল্ডিং, সেক্টর-১২৯, বালিগঞ্জ
ফোন : ০১৫২১৮৮১১১, ০১৫২১৮৮০০০

www.bengalpublications.com @bengalpublications



প্রাতিষ্ঠান :



বেঙ্গল গ্যালারি অফ ফাইন আর্টস
Bengal Gallery of Fine Arts



অনলাইনে অর্ডার করুন :



ই-বুক :





সুখস্বপ্নের দিন

চন্দন আনোয়ার



ভরা বসন্তের দুপুরের ঘুমে স্বস্তিকর কিছু স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে অথবা স্বপ্নঘোর শেষ না হতেই কোমর ভাঁজ করে উঠে বসতে-বসতে প্রফেসর হোসেন সিদ্ধান্ত নিলেন, এখনি বেরিয়ে পড়বেন। বাথরুমে এক মিনিট, জামা-প্যান্টে এক মিনিট, ৩০ সেকেন্ডে অ্যাপেলের ফিতাওয়ালা স্যাভেলে দুই পা ঢুকিয়ে আড়াই মিনিটের নিশ্বাসরুদ্ধ ব্যস্ততা শেষে প্রায় লাফিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় নিস্তরঙ্গ কণ্ঠে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ সুখস্বপ্ন দেখার দিন, আমি আসছি। সিঁড়ির ধাপে-ধাপে পা ফেলে দ্রুত ধাবমান পদশব্দ তৈরি করে গেটের কাছে পৌঁছে গাড়ির ব্রেককষার মতো শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়ালেন, বিকেল হয়েছে, এখনো ব্যাটা সুখের ঘুম ঘুমায়। আবার নাকও ডাকে। সুখ উছলে পড়ছে। এই ইয়াকুব, এই ব্যাটা, বিকেল হয়ে গেছে, সূর্যটা মুখের ওপরে ডিম পারছে, হুঁশ নেই।

সুখের ঘুম ভেঙে ছেলেটা কিছুতেই চোখ খুলতে চাইছে না। এবার প্রফেসরের কণ্ঠ আদর



অলংকরণ : দিলারা বেগম জলি

মাখানো, ওঠো বাবা! বিকেল হয়ে গেল। ১২-১৩ বছর বয়সী কিশোর ইয়াকুব যেন স্বপ্ন দেখছে, ওর বাবা ইয়াছিন আলী ডাকছে। লাঙল-গরু নিয়ে বিলে যাবার সময় এ-সুরেই ডেকে ঘুম ভাঙাত প্রত্যুষে। ঘুমের মধ্যেই ইয়াকুবের পাতলা কচি ঠোঁটদুটি কলাপাতার মতো কাঁপছে। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে মৃদু হাসির স্ফীত রেখা। ছেলেটি এখন স্বপ্ন দেখছে। আশ্চর্য এক নিমগ্নতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রফেসর। ছোট্ট এক চৌকির ওপরে পাতলা ময়লা কালো রঙের ছেঁড়া একটি চাদর বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে প্রাণভরে স্বপ্ন দেখছে ছেলেটা। বেরিয়ে পড়ার ব্যস্ততার কথা ভুলে যাননি প্রফেসর। এ-মুহূর্তে জাগিয়ে তোলার অর্থই হলো, ওকে স্বপ্নভাঙার কষ্ট দেওয়া। ঘুমন্ত শরীর, নিশ্বাসের ওঠানামার সঙ্গে বুকের খাঁচার ভাঙা-গড়া দেখার পরই চোখে পড়ে, ছেলেটির গলার নিচে কালো মোটা একটি দড়ির দাগ। এ-বয়সেই ফাঁস নিতে গিয়েছিল কি-না? স্বপ্নের মধ্যেই ইয়াকুব হঠাৎ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলে, উঠছি আব্বা, উঠছি। প্রফেসরের সমস্ত শরীর জুড়ে বসন্তের বাতাস দোল খেয়ে যায়; ছেলেটির প্রতি মনোযোগ আরো গভীর হয়; যেন ঘুমিয়ে থাকা ছেলের ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মহাকালের এক বাবা।

বিকেল ফুরিয়ে আসছে, এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রফেসরের ঘন নিশ্বাসের শব্দে চোখের পাতা কিশিৎ মেলেই, প্রফেসর কাকা! শোয়া থেকে জালে আটকা মাছের মতো লাফিয়ে ওঠে ইয়াকুব। গোটে তালা মেরে ঘুমাচ্ছিস, বের

আমার চোখের সামনে তোমার
পাদুটির হাড়-মাংস এক করে
মরিচ বাটার মতো বেটে পিষে
গেল বর্বর ট্রাকটা, তখন তুমি দুই
হাত বাড়িয়েছিলে, দেখেছি আমি,
কাকে ধরতে চেয়েছিলে দুই
হাতে, মেয়েকে? ছেলেকে?
নাকি আমাকে?

হই কী করে? ইয়াকুব বলে, আমরা ডাকলেন না ক্যারে? প্রফেসর বললেন, ডেকেছি কিন্তু তুই তো শুনিছিস, স্বপ্ন দেখছিলি কি-না। ইয়াকুব এবার লজ্জায় জিভ কেটে হেসে ওঠে, ওহ, আপনি ডাকছেন! আমি হুঁতলাম যেন আমার আব্বায় ডাকছেন। প্রতিদিন ঘুমের থে উঠা কামে যাওয়ার সময় আব্বা আমাকে ডাইকা ঘুম ভাঙাইয়া থুইয়া যাইতেন। আব্বাডা আমার মইরা গ্যালো আলসারে। ছেলেটির চোখ ভিজে আসে।

প্রফেসরের ফুসফুস কেঁপে উঠল। প্রায় লংজাম্প দিয়ে গেট পার হয়ে ব্রস্ট পদক্ষেপে গলির সীমানা অতিক্রম করে দাঁড়ালেন চৌরাস্তার মোড়ে। ৫১-৫২ বছর বয়সী, সুঠাম ও দীর্ঘদেহী, নীরোগ প্রফেসরের দেহে এই উপসর্গটি ছয় মাসের; হঠাৎ ফুসফুস কেঁপে ওঠে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। আমার এই সুখস্বপ্ন দেখার দিনে শ্বাসকষ্ট জেগে উঠুক, আমি তা চাই না। বুক টান করে লম্বা দমে নাক দিয়ে শ্বাস টানেন জোরে, ফুসফুস পূর্ণ হলেই তবে বাতাস বের করেন মুখ দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট ঠেকিয়ে শান্তির নিশ্বাস ফেলে পকেটে হাত রেখে দেখেন, মোবাইল ফেলে এসেছেন। ভালোই হলো, সুখস্বপ্নের দিনে কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করুক, আমি তা চাই না।

হেলেপড়া সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর; বিকেলের রোদ পড়েছে ক্লিনসেভ মুখে। এ-সময়, বিপুল কণ্ঠের মিছিল মোড়ে এসে পৌঁছে তার মন পুলকিত হয়ে ওঠে। মানুষের ভিড় তাকে আনন্দ দেয়। নিউমার্কেটের মূল ফটকে, অথবা ব্যস্ততম বিপণিবিতানের ফটকে নিশ্চল প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা তাঁর এক অদ্ভুত নেশা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে করপোরেশনের মেয়রের সুখ-সমৃদ্ধির বক্তৃতা শুনে, বিপুল কণ্ঠের মিছিল আর হাততালি শুনে বিকেল কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব; কিন্তু আজ তার সুখস্বপ্ন দেখার দিন।

মোটাজা, খাটো, লম্বা, মাঝারি, রাগি উদ্ধত তরুণ-তরুণীর বিপ্লবী পদভারে প্রকম্পিত মাটি। মোড়ের চতুর্দিকের প্রবেশপথগুলোতে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে রাইফেল হাতে নিয়ে। এই মুহূর্তে মেয়রের সুখী-সমৃদ্ধ মহানগর গড়ার পরিকল্পনা ও উন্নয়নবিষয়ক বক্তৃতা শোনার চেয়ে নগরবাসীর জন্য জরুরি কাজ নেই। অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে, পাগলের মতো ছুটে আসেন ষাটোত্তর বয়সী এক প্রবীণ। কালো স্বাস্থ্যবান পিস্তল হাতে নিয়ে ত্রুদ্বন্দ্বিতে দাঁড়িয়ে-থাকা যুবক পুলিশ অফিসারের পেছনে হাতজোড় করে, শিরদাঁড়া বাঁকা করে দাঁড়ালেন প্রবীণ, আমার স্ত্রীর অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যথা উঠেছে, এখনি হাসপাতালে না নিলে সর্বনাশ। প্রবীণের দেখাদেখি তিনজন মধ্যবয়সী ও একজন তরুণ হাতে একটি বই নিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ায়। তুখোড় ব্যস্ত পুলিশ অফিসার, তার পেছনে একদল কুকুর দাঁড়িয়েছে বলে মনে করল কি-না কে জানে, মুখ বাঁকিয়ে বাপ তুলে গালি দিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে এমন এক দাবড় দিলো যে, পেছনে ফিরতে গিয়ে পায়ে পা বেঁধে পাষ্টি খেয়ে পড়ে গেল প্রবীণ আর তরুণ; প্রবীণের দিকে পা তুলেছিল কিন্তু কী মনে করে লাথি না মেরে তরুণকে ফুটবলের মতো কিক মারতে-মারতে প্রবেশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মাঝে এনে ফেলে, তরুণকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগই দিলো না, বইটি পৃষ্ঠা খুলে পড়ে আছে। প্রফেসর এগিয়ে গিয়ে প্রবীণকে তুলে আনলেন। ভাবলেন, নিজের পরিচয় দিয়ে পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ করবেন, মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন যেখানে; কিন্তু অনুরোধ করার সময় পেলেন না — স্থূলকায় কালো ঘাড়মোটা হলুদ পাঞ্জাবি ওপরে কোটপরিহিত মেয়র মঞ্চের ওঠে হাত নাড়ছে। প্রবীণের মুখের দিকে তাকানো যায় না; আতঙ্কে কাঁপছে বয়স্ক শরীর। প্রফেসর ভাবলেন, আজ আমার সুখস্বপ্ন দেখার দিন, কোনো প্রকার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাই না। জগতের এই নিয়ম, সুখী হতে হলে নিষ্ঠুর হতে হয়।

প্রফেসর হাঁটছেন শহরের উত্তর দিকের সোজা সড়কটি ধরে। পশ্চিমে হেলেপড়া সূর্যের দিকে মুখ করে ভাবছেন, ফুরিয়ে আসছে, বেলা ফুরিয়ে আসছে, দিন ফুরিয়ে আসছে, ...। কচি ডাবের নোনতা

পানির স্বাদ নেওয়ার জন্য ডাব-বিক্রেতার ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ। পঞ্চাশ টাকায় সবচেয়ে বড় ডাবটি কিনে পাইপ ঢুকিয়ে বুকের ওপরে নিয়ে নোনতা পানির স্বাদ নিতে-নিতে ছেলে মারুফ, মেয়ে মারুফা এবং স্ত্রী মিনুর মুখচ্ছবি ভাবেন, ওরা কেউ কচি ডাবের নোনতা পানি পছন্দ করে না। ওরা পছন্দ করে ডাবের সর ও মিষ্টিপানি। গ্রামের বাড়িতে পুকুরপাড়ে তিনটি নারিকেল গাছ আছে। বারোভূতে খায়। হঠাৎ কী ভাবলেন প্রফেসর, কচি ডাবের নোনতা পানি নয়, যেন সাপের বিষ গলাধঃকরণ করছেন, নীল হয়ে আসে শরীর, হাতের ডাবটা ছুড়ে ফেললেন, রেলের ইঞ্জিনের মতো ঝাঁকুনি দিয়ে চলন্ত গাড়ির মতো শহরটা চলতে শুরু করলে ঘুণেধরা বাঁশের মতো কোমর থেকে ভেঙে পড়ার মুহূর্তে প্রথমে ছেলে মারুফকে, পরে মেয়ে মারুফাকে ডাকলেন, অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি আমি, হারিয়ে যাচ্ছি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি, তুমি কোথায় মিনু? ছেলেমেয়েরা কোথায়, কোথায় গেলি তোরা? দুই হাত দুদিকে প্রসারিত করেন ওদের ধরতে, ওদের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে; ডাব-বিক্রেতা ধরে ফেলে; প্রফেসরের হুঁশ তখনো টনটনে, আমাকে কোথাও শুইয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শাহ পরান বস্ত্রালয়ে এক যুবক স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কাপড় দেখছিল, মানুষের কোলাহল দেখে কৌতূহলবশত একবার উঁকি দিয়েই সামনের জনকে ধাক্কা মেরে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে, আমার স্যার, এম.এ. হোসেন স্যার। বুকের ওপরে লুটিয়ে পড়ে প্রায় চিলের মতো ছো মেরে প্রফেসরের নিখর শরীর তুলে নিয়ে দৌড়াতে লাগল যুবক। নিকটেই মায়ের দোয়া ক্লিনিক। যুবতী ডাক্তার দেখেই চমকে ওঠে, আমার স্যার যে, স্যারকে এ-অবস্থায় পেলেন কোথায়? মুহূর্তের মধ্যে ডাক্তার কন্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেল; যেন নিজের বাবাকে সেবা দিচ্ছে। প্রফেসরের শার্টের বোতাম খুলে, প্রেসার মেপে, বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজেই দৌড়াল স্যালাইনের জন্য। স্যালাইন গুলিয়ে, স্যারের মাথা আপন বুকের ওপরে নিয়ে মুখে ধরে, প্রফেসরের মনে হলো, মেয়ে মারুফার বুক মাথা রেখেছেন। মেয়েটা এতো বড় হয়ে গেল কবে! মেয়েরা বড় হয় কেন? এবার তো বিয়ে দিতে হবে। মিনুর জেদ, মেয়েকে ডাক্তার বানাবে এবং বিয়ে দেবে ডাক্তার ছেলে দেখে। শুনে প্রফেসর হাসেন, চারাগাছ দেখে কি বলা যায় কেমন ফল হবে। মিনু যুক্তি দেখায়, গাছটার শেকড় কোথায় দেখবে না? তোমার মতো একজন মেধাবী মানুষ, বিসিএস দিয়ে টিকেছ, পিএইচ.ডি করেছ, কত বই বের করো, দেশ-বিদেশের পত্রিকায় লেখো, সেমিনারে বক্তৃতা করে বেড়াও, তোমার শত-শত ছাত্রছাত্রী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার; তোমার নিজের মেয়ে ডাক্তার হবে, এ তো সামান্য কথা। প্রফেসরের চোখে-মুখে তৃপ্তির হাসি, চেষ্টা চালিয়ে যাও, আমি আছি তোমার পেছনে। মাথায় মমতার হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে ডাক্তার বলে, স্যারের ঠোঁটে এখনো সেই মৃদু হাসি লেগে আছে। যুবক বলে, ঠিক বলেছেন, স্যার বরাবর হাসিখুশি ছিলেন। ক্লাসে কখনো গম্ভীর মুখ দেখিনি। কোনোদিন রাগ করেছেন বলে মনে পড়ে না।

মিনিট বিশেষ মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসেন প্রফেসর। ডাক্তার ও যুবক হাঁটু ভাঁজ করে বসে প্রফেসরের মুখোমুখি। ডাক্তার বলে, স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন, আমি জয়ন্তী দাশ, আপনি সংক্ষেপে জয়ী বলে ডাকতেন। গত মাসেই এখানকার মেডিক্যাল বদলি হয়ে এসেছি। বিকেলে এই ক্লিনিকে বসি। এবার যুবক বলে, স্যার, আমি ওসমান গণি, একটি মেডিসিন কোম্পানির ফার্মাসিস্ট হিসেবে আছি। আমাকে চিনতে পারছেন স্যার? ডাক্তার ও যুবকের মাথা দুই হাতে টেনে বুকের দুদিকের দুই অলিন্দে ঠেসে ধরেন প্রফেসর, তোমরা বড়ো হওনি দেখছি। আমার ছেলেমেয়েদের কথা আমি কখনো ভুলি না।

অপেক্ষা করার সময় নেই, বেলা ফুরিয়ে আসছে। প্রফেসর উঠে দাঁড়ালে ডাক্তার অনুরোধ করে, স্যার, আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন। আপনার কি মাঝেমধ্যে শ্বাসকষ্ট হয় স্যার? প্রফেসর বললেন, ছ-মাস ধরে হচ্ছে। ডাক্তার ভয় পেয়ে গেল, মাইনর অ্যাটাক হয়ে গেল

হাত কামড়ায়। এটা মেয়েটার ফুচকা খেলা। এ-খেলা খেলতে না দিলে কেঁদে কেটে এক শেষ। প্রফেসরের চোখ চঞ্চল, ঠোঁটে চাপা হাসি স্ফীত, হঠাৎ মুখ হা করে সামনে ঝুঁকে পড়লেন অভ্যাসবশত। পাশের টেবিলের ভদ্রলোকের ছেলেটি শব্দ করে হেসে উঠলে প্রফেসরের হুঁশ ফেরে, মেয়ে তো নেই এখানে। তড়িঘড়ি করে উঠে, ফুচকার বিল মিটিয়ে বেরিয়ে সোজা প্রবেশ করেন পার্কে।

পার্কের বেধিগুলোতে জড়াজড়ি করে বসে আছে প্রেমিক-প্রেমিকা, না-হয় যুবদম্পতি। কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে যে-বেধিটা মিনুর পছন্দের, সে-বেধিতে এক যুবকের কাঁধে মাথা ফেলে এক যুবতী চোখ বুজে আছে; সুখস্বপ্ন দেখছে বোধহয়। মিনুর এ-স্বভাব ছিল না। ওর একটাই স্বভাব ছিল, হঠাৎ দুই হাত দিয়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরত সাপের মতো। বেহুলা-লখিন্দর মিনুর প্রিয় চরিত্র, তাই নদীর কাছে এলেই মনে হয়, বেহুলার ভেলা ভেসে যাচ্ছে নদী দিয়ে। যুবদম্পতিকে অনুরোধ করা যায় কি-না, আমি এ-বেধিটাতে বসতে চাই এক মিনিট। মাথা নাড়িয়ে প্রফেসর সিদ্ধান্ত নিলেন, না, ঠিক হবে না, মোটেই ঠিক হবে না। ওদের এখন সুখস্বপ্ন দেখার দিন; যুবকের কাঁধে মাথা ফেলে যুবতী তার সুখস্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করছে; ছেলেমেয়ে হবে, ছেলেটা বড় হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, মেয়েটা হবে ডাক্তার, সুখে-আনন্দে কাটবে জীবন...

পার্ক থেকে বের হয়ে লাফিয়ে রিকশায় উঠলেন প্রফেসর, ফুল দমে টানো, বিশ মিনিটে পৌছাতে হবে ড্রিম প্রোপার্টিজে; দেখো, সূর্যটার সর্বশরীর ভয়ানক রক্তলাল হয়ে উঠেছে; আত্মহুতি দিচ্ছে, রক্তক্ষরণ হবে না? কে চায় মরতে? নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে কেঁপে ওঠেন ভয়ে, নড়ে ওঠে রিকশা, রক্তরঙে লালে লাল হয়ে উঠেছে শরীর। এক রঙে বাঁধা পড়েছে মরণোন্মুখ সূর্য আর প্রফেসর।

৮০ ফুট প্রশস্ত রাস্তার ধারে ড্রিম প্রোপার্টিজ। রাস্তা থেকে তিন প্লট দূরে প্রফেসরের প্লট। চারকাঠা জমি বর্গাকৃতির, বাউন্ডারি ওয়ালে ঘেরা, জমিতে ছোট-ছোট ২৫-২৬টি মেহগনি গাছ, সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে তিনটি আমগাছের চারা। বাড়ি করার জন্যে কিছু মাটি ফেলতেই হবে। বাউন্ডারি নেই এমন দুটি প্লটে ক্রিকেট খেলছে চারটি ছেলে।

জমির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ শেষে পশ্চিমদিকে মুখ করে পূর্বদিকের বাউন্ডারি ওয়ালের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে বুকভরে শ্বাস নিলেন প্রফেসর। কায়দামাফিক সূর্যাস্ত দেখার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এখন। সূর্যের আগুনের মতো লাল রং ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। 'আগুনের মতো লাল রং' উপমাটি মনে হতেই প্রফেসরের চোখে ভাসে সুখস্মৃতি। যেদিন জমি দেখতে এসেছিলেন, হেমন্তের বিকেল ছিল, মিনুর ফর্সা মুখে সূর্যের আলো পড়ে আগুনের মতো লাল হয়ে উঠেছিল দুটি গাল, ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছিল নাকের ডগায়, গলার ভাঁজে-ভাঁজে; এত ঔজ্জ্বল্য মিনুর শরীরে আর কোনোদিন দেখেননি। এই শহরে একখণ্ড নিজের জমি, নিজের একটি বাড়ি। উফ! বিশ্বাস করতে পারছি না, ওগো স্বপ্ন দেখছি না তো, বলেই প্রফেসরের হাতে জোরে চিমটি কাটে মিনু। প্রফেসর ইস্ করে লাফিয়ে উঠলে বলে, সত্যিই তো স্বপ্ন দেখছি না।

বাসায় ফিরে হঠাৎ প্রফেসরের হাত টেনে নিজের মাথায় নিল মিনু, দিব্যি কাটো, জমি এবার কিনবেই। প্রফেসর হাত টানেন, পাগলি! কৃত্রিম অভিমানে মিনুর গাল ফুলে ওঠে বাতাসভর্তি বেলুনের মতো। মিনুর ঘর্মাক্ত শরীর লতার মতো জড়িয়ে ধরেন প্রফেসর, 'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগলপ্রেমের স্রোতে, অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে'; কৃত্রিম অভিমানে ভেঙে হেসে ওঠে মিনু, ওসব কবিতা-টবিতা শুনিয়ো কাজ হবে না। ছেলেমেয়ে দুটির ভবিষ্যৎ আছে না? উনিশ বছর ধরে সরকারি চাকরি করো, তোমার সহকর্মীদের একজনের নাম বলো শুনি, যে বাড়ি করেনি বা ফ্ল্যাট কেনেনি।

প্যান্ট-শার্ট খুলে খাটের ওপরে আরাম করে বসলেন প্রফেসর, হলো, হলো, চেষ্টা তো করছি। এখন নাস্তাপানি দাও কিছু। ছেলেমেয়েদের খেলা দেখা বন্ধ করে পড়তে বসাও। মিনু পোশাক পালটায়নি, হলো হলো না, এখনি হতে হবে, নইলে আর কোনোদিনই

পারবে না। ছেলেটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে, মেয়েটা মেডিক্যালে ভর্তি হলে কত খরচ আজকাল, জানো? তখন তুমি জমি কিনবে কী করে? হঠাৎ কী হলো মিনুর, চোখ জলময় হয়ে ওঠে, শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে, কত সাধ আমার, নিজের একটা বাড়ি হবে, মনের মতো সাজাব, ছেলেমেয়েরা খেলবে-ঘুরবে স্বাচ্ছন্দ্যে। হাঁটতে-চলতে সর্বক্ষণ মনের মধ্যে বাড়িওয়ালির ভয়, বুড়ি হয়ে গেলাম জেলখানায় থেকে, ছাদে উঠতে হলেও অনুমতি লাগে। প্রফেসর মিনুর হাত ধরে কাছে টানেন; কিন্তু চার কাঠা জমির দাম কত জানো? বেতনের ওপরে দশ লাখ লোন নেওয়ার পরও পাঁচ লাখ টান। বড়জোর দুই লাখ টানাটানি করে জোগাড় সম্ভব, বাকিটা?

মিনু উন্মাদের মতো আলমারির চাবি খোঁজে, কোথায়? কোথায়? আলমারির চাবিটা কোথায় রাখলাম? আর মায়া করে লাভ নেই, স্মৃতি ধরে রেখে লাভ নেই। প্রফেসর ভয় পেলেন, বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, হঠাৎ তোমার কী হলো? এরকম পাগলের মতো করছ কেন? ভ্যানিটি ব্যাগে চাবি ছিল। আলমারি থেকে লাল কাপড়ে মোড়ানো ছোট্ট একটি বক্স বের করে মিনু। খাটের ওপর রেখে বক্সটি হঠাৎ উপগত হয়ে পায়ে ধরতে গেল, কী করছ, এ কী করছ, মাঝপথে ধরে ফেলেন প্রফেসর। মিনুর চোখে নোনা জলের জাফরি কাটা। তোমার পায়ে পড়ি, আমার এই অলঙ্কারগুলি নাও। জীবনে কোনোদিন তোমার কাছে এমন কাঙালের মতো আর কিছু চাইব না। ছেলেমেয়ে দুটির ভবিষ্যৎ... হঠাৎ প্রফেসরের চৈতন্য ফেরে, আমি তো সূর্যাস্ত দেখার জন্যে বসে আছি এখানে।

মাটি বড়ো উর্বরা, ফের প্রফেসর স্মৃতিমগ্ন, মাত্র আট মাসেই দেখো আম গাছগুলো কেমন শক্তপোক্ত, আর কোমর সোজা করে দাঁড়িয়েছে, নতুন পাতা গজিয়েছে ডালপালায়। বাড়ি করার সময় কাটা পড়তে পারে, তাই আমগাছ লাগানোর ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু মিনু বলে, বাড়ির আঙিনায় একটা-দুটা আম-পেয়ারার গাছ থাকবে না, একটু জায়গা থাকবে না লাউ-পুঁইশাকের মাচার জন্যে, ছেলেমেয়েরা সখ করে ফুলের বাগান করতে চাইলে দু-এক হাত জায়গা দিতে পারব না, তা কী করে হয়, বলো? প্রফেসর হেসে বলেন, চার কাঠা জমি তোমার। এ তো দেখছি, এক গজ কাপড় দিয়ে শার্ট-প্যান্ট-পাঞ্জাবি-টুপি বানানোর গল্পের মতো। মিনু প্রতিবাদ করে, একদম ফোঁড়ন কাটবে না, হেঁয়ালি করবে না, সিরিয়াসলি আমার কথা শোনো; ধরো, আমাদের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল; থাকল শুধু ছেলে, আমি আর তুমি; দুই কাঠার ওপর তিনতলার একটি বাড়িই আমাদের জন্য যথেষ্ট। বাকি দুই কাঠায় থাকবে ফলগাছ-সবজির চাষ-ফুলবাগান ইত্যাদি। নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো মাথা নাড়লেন প্রফেসর, করছি কি! চোখের চশমা মুছলেন রুমাল দিয়ে, চোখ দুটি মুছলেন; চোখে পরিষ্কার চশমা দিয়ে বুকুর ওপর দুহাত পেঁচিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন মাত্র, ঠিক তখনি উড়ে এসে পড়ল একটি ক্রিকেট বল, মুহূর্তের মধ্যে ১৩-১৪ বছরের এক ছেলে ছুটে এলো, দৌড়ের ধকল সামলানোর জন্যে একটি আমগাছ ধরে দাঁড়ালে প্রফেসর আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, করো কী বাবা, করো কী, কচি চারাগাছ; আমার ছেলের হাতে লাগানো গাছ। বলটি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন, তুমি বোলার, না ব্যাটসম্যান? ছেলেটি হাঁপিয়ে কূল পাচ্ছে না, আমি অলরাউন্ডার। প্রফেসর আনন্দে নেচে উঠলেন, ছেলের পিঠ চাপড়ে আশীর্বাদ করলেন, মন দিয়ে খেলে যাও, দেখবে, সাকিব আল হাসানের মতো বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার হবে। জানো তো, আমার ছেলেও অলরাউন্ডার।

ছেলেটি বল হাতে পেয়ে দৌড় দিলো।

আমগাছটি সামান্য হেলে পড়েছে। আদুরে হাতে গাছটি সোজা করে দেওয়ার সময় প্রফেসরের মনে পড়ে, ছেলেটির ফজলি আম পছন্দ, মেয়েটির ল্যাংড়া। মিনু বলে, আমাদের পছন্দের কি আছে, ওরাই খাবে, ওদের সন্তানরা খাবে, ওদের পছন্দের গাছ, ওদের হাতেই লাগাক। গাছ লাগানোর দিনে দুই ভাইবোনের সে কি ঝগড়া। ছেলেটা মেয়েটাকে বলে, তুই ল্যাংড়া আম পছন্দ করিস, ল্যাংড়া আমের গাছ

কি-না। স্যার, কালকেই একবার আসুন, আপনার ইসিজি করে দিই। প্রফেসর রুম থেকে বের হতে-হতে বললেন, সে দেখা যাবে। ভালোই হলো তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো; আজ আমার সুখস্বপ্ন দেখার দিন। ডাক্তার-যুবক একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, স্যার, আপনার স্পেশাল ডে? আপনার ম্যারেজ ডে, ছেলেমেয়ের বার্থ ডে, নাকি... প্রত্যুত্তর না দিয়ে লম্বা পা ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।

ডাক্তার বলে, দেখেন ভাই, স্যার এখনো ইয়াং এনার্জিটিক স্মার্ট হাসিখুশি। স্যারের জন্য গর্ব হয়।

প্রধান সড়কে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর। হেলপড়া সূর্যটা বেদম দৌড়াচ্ছে, ধীরে-ধীরে বহুতল ভবনগুলোর আড়ালে চলে যাচ্ছে। এত তেজ, এত আগুন আর এত শক্তি বুকে নিয়ে আত্মাহুতি দেওয়ার এত সাধ তোর! সূর্যাস্তপ্রেমী কোনোদিনই ছিলেন না প্রফেসর, এখন ভাবলেন, নির্জন কোনো একটি স্থানে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে সূর্যাস্ত দেখবেন। নির্জন স্থানের কথা ভাবতেই মনে পড়ল, শহরের উত্তর প্রান্তের সিটি করপোরেশনের সীমানা ঘেঁষে ড্রিম প্রোপার্টিজের চার কাঠা প্লটটির কথা। বছর দেড়েক আগে কিনেছিলেন। দু-তিনটি বাড়ি উঠলেও বাকি সব প্লট প্রায় ফাঁকা। সূর্যাস্ত দেখার জন্য চমৎকার একটি জায়গা। এছাড়া নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখা হবে।

হেঁটে সম্ভব নয়, একটি আটোরিকশা ডাকলেন প্রফেসর। রিকশায় উঠেই ভাবলেন, সামনেই ল্যাবরেটরি স্কুল; এ-স্কুলে ছেলেটাকে ভর্তি করার জন্য টানা দুই বছর সে কি ভয়ানক যুদ্ধ। এরকম যুদ্ধে একটা দেশই দখল করা সম্ভব। রোদ-বৃষ্টি-শীত বলে কথা নেই। তিন-চারটা কোচিংয়ে ঘড়ি ধরে দৌড়ানো, বাসায় প্রাইভেট টিচার, তারপরে নিজে তো আছেই। পারেও মিনু। এমন কঠিন জেদি একরোখা মেয়েমানুষ জীবনে আর দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি। অবশেষে ছেলে যেদিন ল্যাবরেটরি স্কুলে চাপ পেল, খবর নিয়ে গেলেন প্রফেসর, খবর শুনে মিনুর প্রমত্ত আবেগ উছলে উঠে বিপদসীমা অতিক্রম করে। হাত-পা আছাড়ি-পাছাড়ি করে সে কী কান্না। সুখের কান্না। মেয়েটির বয়স তখন এক বছর। সুখস্বপ্নের দিনে প্রফেসরের চোখের কোণেও একফোঁটা অশ্রু জমে ওঠে।

স্কুলের ফটকে এসে দাঁড়াল রিকশা। ছুটির দিন। বাইরে থেকে তাল দিগে পান কিনতে গিয়েছিল গেটম্যান, প্রফেসরকে দেখে ছুটে আসে, স্যার, ছুটির দিনে! প্রফেসর বললেন, এদিক দিয়ে যাচ্ছি, ভাবলাম, ব্যস্ততার জন্যে ছেলের স্কুলে কতদিন আসা হয় না। একবার দেখে যাই। ক্লাসরুমের চাবি তোমার কাছে? গেটম্যান জিজ্ঞাসু-চোখে তাকালে, প্রফেসর বললেন, তেমন কিছু নয়। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসরুমের ফাস্ট বেঞ্চি দেখে যেতে চাই। ছেলেটার আমার একটাই জেদ, ফাস্ট বেঞ্চিতে বসতে হবে। যেদিন ব্যত্যয় হয়, ওর মা খাবার দিতে দেরি করে, সেদিন অর্জুন কুরুক্ষেত্রে আর কী করেছে, তার চেয়ে বেশি শক্তি দেখায়, সেদিন ছেলের কাছে মাফ চেয়ে কূল পায় না মিনু।

ক্লাসরুমের চাবি নেই গেটম্যানের কাছে। অগত্যা মাঠে এক চক্রর দিতে গিয়ে প্রফেসরের শরীর কেমন যেন টাল খেয়ে ওঠে। স্কুলের ক্রিকেট টিমের অলরাউন্ডার ছেলে আমার এই মাঠে কতশতবার দৌড়ায়, আর দেখো, বাপ হয়ে এক চক্রর দিতে পারি না। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যেতে পারে, ভয় নিয়ে মাঠের মধ্যস্থান থেকে গেটের দিকে ছুটে এলেন প্রফেসর। লোহার গেট দিয়ে বের হতে গিয়ে নিচু হতে হবে এ-কথা ভুলে গিয়েছিলেন, কপালে আঘাত খেয়ে ছিটকে পিছু হটেন। দ্বিতীয়বার মাথা নিচু করে বেরিয়ে রিকশায় ওঠেন। কপালে হাত দিয়ে দেখেন ক্রিকেট বলের মতো গোল হয়ে ফুলে উঠেছে।

বুকে মৃদু চাপ, নাক দিয়ে বাতাস নিয়ে কূল পাচ্ছে না ফুসফুস, মাঝেমাঝে মুখ হা করে শ্বাস টানতে হয়। কিছুদূর গেলেই নদীর ধার, সেখানে দাঁড়ালে জলধৌত বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নেওয়া যাবে। মহানগরের সুখী মানুষেরা বিশুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস নিতে, সুখস্বপ্নের গল্পগুজব করতে বিকেল কাটায় নদীর ধারে। প্রফেসর ভাবলেন,

অন্তত পাঁচ মিনিট নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বুকভরে বিশুদ্ধ বাতাস নিতে চাই, প্রবীরের ফুচকা হাউসের দক্ষিণ কোণের সেই বেঞ্চিতে বসে এক প্লেট ফুচকা খেতে চাই, আর পার্কের সেই বেঞ্চিতে বসে পা দোলাতে চাই কিছুক্ষণের জন্যে। সঙ্গে মিনু নেই, ছেলেমেয়ে নেই, আমি একা এসেছি, আমার সুখস্বপ্নের দিন কি-না।

নদীর ধারে পা ফেলাও কঠিন, এত ভিড়। ভিড় ঠেলে দু-পা ফেলার মতো জায়গা তৈরি করে নদীর দিকে মুখ করে বুকভরে বিশুদ্ধ বাতাস নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর; পেছন থেকে ডেকে ওঠে অশরীরী কেউ, কী করছ, নদীর এত কিনারে যেতে নেই, পড়ে যাবে যে। বিরক্তির বলিরেখা ফুটে ওঠে প্রফেসরের কপালে। এখানেও শাসন। বলে এলাম, আজ আমার সুখস্বপ্ন দেখার দিন। লুপ্টিটা উঁচু করে পরো, ঘরের ময়লা সব ঝাড় দিচ্ছ যে; বাথরুমে পানি বেশি করে দাও কেন, হাতটা সাবান দিয়ে তিনবার ধুয়েছ তো, পা-টা ভালোভাবে ধোয়া হয়নি আর একবার ধুয়ে আসো; শব্দ করে হেঁটো না, নিচতলার ওরা বিরক্ত হবে; আর খেতে বসলে তো কথাই নেয়, একমুঠ ভাত বেশি খেলে গলা শিরশির করে এই বুঝি কোপ মারল। এত উৎপাত ঘাড় পেতে মনে নেয় প্রফেসর, তাই বলে, এখানে। এই দিনে। সুখস্বপ্ন দেখার দিনে! মেয়েমানুষটা কি মনে করে আমাকে; পা পিছলে পড়ে যাব নদীতে! কৃষকের ছেলে আমি, পরিশ্রম আর সতর্কতার গুণে এতদূর পৌঁছেছি, আমি এত সহজে খাদে পড়ি না, আমি এত সহজে ভাঙি না। ১২-১৩ বছরের একটি ছেলে ও পাঁচ-ছয় বছরের একটি মেয়ে কণ্ঠ সমস্বরে আব্বু বলে ডেকে উঠলে প্রফেসরের শরীর নড়ে ওঠে, এবার আর ঘাড় না ঘুরিয়ে পারেননি। প্রফেসরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ওদের সুখী বাবা। ছেলেমেয়ে দুটি বাবার দুদিকে দাঁড়ালে প্রফেসর নিজের ছেলেমেয়ের কথা ভাবেন, ছেলেটা ধীরস্থির হলেও মেয়েটা ভীষণ চঞ্চল। নববর্ষের দিন মেয়েটা হারিয়ে গিয়েছিল প্রায়, ভাগ্য ভালো, এক সহকর্মীর ছেলে দেখে ফেলেছিল। কোথায় যাচ্ছিল জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, নদীর ওপারের সূর্যটাকে ধরতে যাচ্ছিল। সূর্যটাকে বাড়ি নিয়ে পুষবে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর হাসলেন। মুহূর্তের মধ্যে কী হলো, নদীর জলবিধৌত বসন্তের বাতাস বৈশাখের তাপদাহে পোড়া বাতাসের মতো তপ্ত হয়ে ওঠে। নদীতে আগুন লেগে গেল নাকি, হঠাৎ গরম বাতাস বইতে শুরু করল। প্রফেসরের তন্দ্রাচ্ছন্ন ফুসফুস জেগে ওঠার জন্যে নড়েচড়ে ওঠে।

নদীর ধার থেকে বের হয়ে প্রবীরের ফুচকা হাউসের দক্ষিণ কোণের সর্বশেষ টেবিলে বসেন প্রফেসর। নিরিবিলি বলে এ-টেবিলটা মিনুর খুব প্রিয়, টেবিলের তিনটি চেয়ার ফাঁকা। এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে নিয়ে বসতে এলে প্রফেসর অনুরোধ করেন, আমি একটু নিরিবিলি চাই। ভদ্রলোক মানতে নারাজ। প্রফেসর এবার ক্ষেপে উঠলেন, আমার স্ত্রী-সন্তান আছে তো, নাকি আমাকে আপনার নিঃসন্তান মনে হয়? ভদ্রলোকও এবার রেগে গেলেন, এ-কথা বললেই তো হয়, আপনার স্ত্রী-সন্তানরা বসবে, আপনি তো বলছেন অন্য কথা। ওয়েটার দৌড়ে আসে, স্যার আপনি? সেই যে ছ-মাস আগে একবার এসেছিলেন বউদি-ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর তো আসেননি। ভদ্রলোক ছেলেকে নিয়ে পাশের টেবিলে বসেছেন। প্রফেসর তখনো উত্তেজিত, ভদ্রলোককে গুনিয়ে ওয়েটারকে আদেশ করেন, চার প্লেট ফুচকা দাও চটজলদি। তোমার বউদির আর মেয়ের প্লেটে টক দেবে বেশি, ছেলের প্লেটে একেবারেই সামান্য, আর আমারটা তো জানোই। নরমাল।

চার প্লেট ফুচকা, চারটি পানির বোতল চারটি চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপরে চমৎকার গোল করে সাজিয়ে রেখেছে ওয়েটার। ফুচকার দিকে তাকিয়ে জোরে শ্বাস ফেলে হেসে ওঠেন প্রফেসর, মিনুর ফুচকা খাওয়ার লোভ একটু বেশিই। ছেলেমেয়েদুটি তো মার চেয়ে বেশি ফুচকা-বিলাসী। নিজের হাতে টক মিশিয়ে প্রথমে মা, তারপর বাবা, তারপর ভাইয়ার মুখে একটা করে ফুচকা তুলে দিয়ে শেষে নিজে মুখে নেবে মেয়ে। ফুচকা তুলে দেওয়ার সময় প্রায় মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় ওর ছোট্ট হাতটি। ছেলেটা বদমায়েশি করে মাঝেমাঝে

ল্যাংড়ার অভিনয় করেও দেখায়। মেয়েটা রেগে আগুন। পাশে দাঁড়িয়ে মেহগনি গাছ গুনে দেখছিল মিনু, হঠাৎ কী হলো, ঠাস করে এক চড় মারল ছেলের গালে, বদমায়েশ, ভাই হয়ে বোনকে অভিশাপ দিচ্ছিস, ও পঙ্গু হলে তো তোকেই সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিনুর চোখ ভিজে আসে, আঁচল দিয়ে বারবার চোখ মোছে, ঘুরেফিরে এসে প্রফেসরকে বলে, ছেলের গায়ে হাত তুললাম। এ তো ভালো কথা না। এত বড় হয়েছে, কোনোদিন হাত তুলিনি, রাগের মাথায় এ কী করলাম আমি। ছেলেটা অবশ্য চড়ের কথা ভুলে গিয়ে কাজে মন দিয়েছে। এবার সম্মিত ফিরে এলে প্রফেসর শরীর ঝাড়া দিয়ে বসেন, আমি এখন নিবিড় মনোযোগ দিয়ে সূর্যাস্ত দেখব।

পেছন থেকে কেউ ডেকে উঠলে আহত পশুর মতো ছটফটিয়ে ওঠেন প্রফেসর। তার পিঁলে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোথায় থেকে উদয় হলেন শরিফ সাহেব। আরে, আপনি এখানে? দুই বছর পরে এখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে ভাবিনি। এখানে প্লট নিয়েছেন নাকি?

এই প্লটটি। নিচু কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

আমি একটা নিয়ে রেখেছি। ভাবছি, দাম বাড়লে বিক্রি করে দেব।

বিরক্তি ও হতাশা আড়াল করা চেষ্টা করেন প্রফেসর, লালমনিরহাট থেকে কবে এলেন, ভাবি-বাচ্চা এসেছে? আজ আমার সুখস্বপ্ন দেখার দিন, এখন সূর্যাস্ত দেখছি, এসব কথা বললে কী ভাবে লোকটি কে জানে।

আপনার তো রাজকপাল। ঘরে-বাইরে জিতে আছেন। সারাজীবন এত পরিশ্রম করে শেষে হেরেই গেলাম কি-না; নিজের মুখোমুখি হলে মনে হয়।

আমার রাজকপাল! কি রকম? প্রফেসরের ঠোঁটের কোণে হাসি।

এই দেখুন, যতবার আপনার প্রমোশন হলো, শহরের কোন একটি কলেজে ঠিকই পদ শূন্য পেলেন। আমার কপাল দেখুন, প্রত্যেকবার প্রমোশনের পরে শহর ছাড়তে হয়। এবার তো লালমনিরহাট থেকে আর ফেরার সম্ভাবনা নেই।

প্রফেসরের ঠোঁটের কোণে এখনো হাসি, ঠিকই বলেছেন, আমি ভাগ্যবান মানুষ।

ভাগ্যবান কাকে বলে, হিরের টুকরো ছেলেমেয়ে, এমন ভাবি, ঘরভরা সুখ, আপনাকে রীতিমতো হিংসে করি। অট্টহাসি দিয়ে সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তের শান্তসুনিবিড় রহস্যঘেরা পরিবেশকে হালকা করে ফেললেন শরিফ সাহেব। আমি কী করব বলুন? আমার কোনো দোষ নেই। উঠতে-বসতে-খেতে-শুতে আপনার ভাবি একই রেকর্ড বাজায়, আমি নাকি আপনার মতো হতে পারিনি। টিউশনি-কোচিং এসবের পেছনে পাগলা হাতির মতো চোখ-কান বন্ধ করে ছুটিছি। আচ্ছা বলুন ভাই, আমি কি এসব করি সাথে? এখানে নগদ টাকায় ছ-কাঠার একটি প্লট, শহরের ভিতরে ছোটখাটো একটা বাড়ি করেছি; প্রফেসর হেসে উঠলেন, সাত কাঠা জমির ওপর টু-ইউনিটের পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টকে আপনি ছোটখাটো বাড়ি বলছেন? শরিফ সাহেব হাসলেন, আপনি দেখি কিছুই খবর রাখেন না, চোখ বন্ধ করে চলাফেরা করেন নাকি, এ-শহরে এখন বিশ-পঁচিশ তলার অ্যাপার্টমেন্ট হরহামেশা উঠছে। প্রফেসর ঘাড় কাত করলেন, তা ঠিক বলেছেন, সেই তুলনায় আপনার বাড়িটা ছোটই বটে।

আপনাকে এতো করে অনুরোধ করলাম, আমার বাড়িতে ওঠেন। অন্যদের চেয়ে ভাড়া কিছু কমিয়ে নেব, আপনি শুনলেন না। এতোদিনের সহকর্মী আপনি, আপনি থাকলে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। ভাড়াটিয়ারা যা জ্বালায়...।

প্রফেসর শুধুমাত্র প্রচ্ছন্ন হাসলেন।

এবার লোন নিয়ে বাড়িটা করে ফেলুন। আর কতদিন থাকবেন পরের বাড়ি। স্বপ্ন ঠেকিয়ে রাখতে নেই। বাড়িটা করে ফেলুন। আপনি হোমলোন পেয়ে যাবেন ইজিলি।

প্রফেসর এবার মুচকি হাসলেন।

আপনার ছেলে তো এবার জেএসসি দেবে, এ-ছেলে ডাক্তার না-হয় ইঞ্জিনিয়ার হবে হেসেথেকে; আবার ক্রিকেট খেলায় অলরাউন্ডার।

পড়াশোনার পাশাপাশি ছেলের এদিকটায় একটু বেশি নজর দিইয়েন? প্রফেসর না শোনার ভান করলেন, কোন দিকটা?

ক্রিকেট খেলা। আমার ছেলেটার জন্য এতো চেষ্টা করছি, এত খরচ করছি, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। লেখাপড়াও এগোবে বলে মনে হয় না। আমার ছেলে পায় বি-গ্রেড, ভাবুন তো? তবে মেয়েটা আমার লক্ষ্মী, পড়াশোনায় যেমন, নাচে-গানেও তেমন। আপনার মেয়ে নাচ-গান শিখছে তো?

আসি ভাই, আর দাঁড়াতে পারছি না, হাঁটার জন্যে পা বাড়ালেন প্রফেসর, আলো কমে আসছে, গভীর অন্ধকার নেমে আসছে, এখনি ফিরতে হবে ঘরে।

প্রফেসর জোরে জোরে হাঁটছেন আর ভাবছেন, রিকশাটাকে ধরে রাখলেই ভালো হতো। কিছুদূর হাঁটার পর রিকশা পেলেন। গলির ভিতরে যখন প্রবেশ করে রিকশা, তখন লোডশেডিং চলছে। সুখস্বপ্ন দেখার দিনে এমন অন্ধকার ভালো লাগে? প্রফেসর ভীষণ বিরক্তি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন। বেরোবার সময় দরজাটা যেভাবে ভিড়িয়ে রেখে গিয়েছেন সেভাবেই আছে। ভেতরে ঢোকান মুখে একবার, স্যান্ডেল খোলার ফাঁকে দুইবার, এবং সমাধিক্ষেত্রের অন্ধকারের মতো নিস্তব্ধ অন্ধকার হাতড়ে মিনুর খাটের কাছে পৌঁছান আগে পর্যন্ত ননস্টপ ডেকে যান, মিনু, মিনু, মিনু শুনছো। সাড়া না পেয়ে প্রফেসর ভাবলেন, অভিমান করেছে নির্ঘাত। বিছানায় হাত ফেলে দেখেন, মিনু নেই। অন্ধকার নাড়িয়ে কেঁপে ওঠে প্রফেসরের শরীর। ঘোলা পানিতে মাছ ধরার মতো খাটের ওপরে, রুমের ফ্লোরে, এমনকি খাটের নিচে হাতড়ে খোঁজেন, নেই, মিনু নেই। অর্ধেকটা শরীর নিয়ে তুমি কোথায় গেলে? হঠাৎ মনে পড়ল, ছেলের ঘরে যেতে পারে, কিন্তু কীভাবে? কেউ কি ঢুকেছিল বাসায়?

বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে চোখ ঝাঁপিয়ে। রুমের কোথাও নেই মিনু।

প্রফেসর দৌড়ে এসে দেখেন, ছেলের বিছানার উপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বইগুলো গুছিয়ে বুকের কাছে নিয়ে খাটে মাথা ফেলে ঘুমিয়ে আছে মিনু।

ও তুমি ছেলের ঘরে! এ-ঘরে এলে কী করে! দেখো কাণ্ড, এখানে এসে আবার ঘুমিয়েও পড়েছে। ছেলেকে পড়তে বসিয়ে খাটের ওপর মাথা দিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়তে। অভ্যাসটা তোমার এখনো গেল না দেখছি! প্রফেসরের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি।

মিনুর নড়াসাদা নেই। প্রফেসর এবার ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন, হাতটা মিনুর পিঠের উপরে রাখলেন, শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা ঠেকল, সামান্য নাড়া দিতেই আলগোছে মিনুর শরীর হেলে পড়ল কোপ-খাওয়া কলাগাছের মতো। ফ্লোরে আসন পেতে বসলেন প্রফেসর; মিনুর নিখর মাথা কোলের ওপর নিয়ে মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, আমি কী এখন কাঁদব মিনু? আমাকে ছেড়ে তুমি ছেলেমেয়েদের কাছে গেছ, আমি কি কাঁদতে পারি? যেদিন কাঁদবার কথা ছিল, সেদিন তো কাঁদতে পারিনি।

ছেলেমেয়ে দুটির জন্যে হাত-পা ছেড়ে কাঁদব, স্বামী হিসেবে তোমার জন্য কাঁদব। সময় পেলাম কই?

চোখের পলকে কি ঘটল। আমি ছিটকে পড়লাম রাস্তার পাশে, তোমার ছেলেমেয়ে একসঙ্গে ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর; ওদের বাঁচাতে তুমিও লাফিয়ে পড়লে রাস্তার ওপর; আমার চোখের সামনে তোমার পাদুটির হাড়-মাংস এক করে মরিচ বাটার মতো বেটে পিষে গেল বর্বর ট্রাকটা, তখন তুমি দুই হাত বাড়িয়েছিলে, দেখেছি আমি, কাকে ধরতে চেয়েছিলে দুই হাতে, মেয়েকে? ছেলেকে? নাকি আমাকে? তোমার ছেলেমেয়ে দুটির চিৎকার ততক্ষণে থেমে গেছে, ওদের কচি দুটি শরীরের ওপর দিয়ে গিয়েছে কি-না ট্রাকের সামনের চাকা দুইটা। ছোট দুটি দেহে এত মাংস, এত রক্ত ছিল, ছোট দুটি মাথায় এত মগজ ছিল, আমার এই দুই হাতে জমিয়ে-কুড়িয়ে কুল পাচ্ছিলাম না, কারা যেন তুলে নিয়ে গেল তোমাকে, আমি ছেলেমেয়ের হাড়-মাংস-মগজ-রক্ত জমা করছি, ছেলেমেয়েকে আলাদা করছি না, আমারই তো শরীর, আলাদা করব কেন? □



খসড়া উপন্যাসের সম্ভাব্য প্রথম পরিচ্ছদ...

মালেকা পারভীন

(এখন শুধু মনে পড়ে, তোমার কথা মনে পড়ে;

তোমার কথা মনে পড়ে

অনেক কথা মনে পড়ে,

এখন শুধু মনে পড়ে, এখন শুধু মনে পড়ে; ...মনে পড়ে — মহাদেব সাহা)



আমার মনে হয়েছিল, আমি একটা প্রায় ডুবন্ত মানুষকে ভেসে উঠতে সাহায্য
করছিলাম। সে-বছরের জানুয়ারির ৩১ তারিখ বা এর কাছাকাছি সময় যেদিন
তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকানোটাও
এড়িয়ে গিয়েছিল। কারণ, তার চোখের ভাষায়-দৃষ্টিপাতে ছিল ধারাবাহিক



অলংকরণ : নির্ভর মৈত্রেয়

কষ্টের অমোচনীয় কাজল — বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো, এলোমেলো। সম্ভবত তার জানা ছিল, মেয়েরা, অথবা কোনো-কোনো বিশেষ গুণের মেয়ে, এ-ধরনের কাজলের পেছনের ধোঁয়াচ্ছন্ন ইতিহাস ধরে ফেলতে পারে।

কলেজের বিশাল খেলার মাঠটার উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। সামান্য দূরত্বে কিছু সময়ের জন্য অনেকটা মুখোমুখি। শেষ জানুয়ারির ভরদুপুরের ঠিক মাঝামাঝি। চোখ খুলে বা বন্ধ করে দিনটা আমি আজও হুবহু দেখতে পাই। আয়নায় নিজের চেহারা দেখার মতো পরিষ্কার, অবিকল একই রকম নিখুঁত স্পষ্টতায়। যদিও মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান দুই যুগেরও বেশি কাল। জীবনের কিছু-কিছু ক্ষণ বা মুহূর্ত বা দিন তার চিরন্তন দাবি নিয়ে সবসময় একই চেহারায় থাকতে পছন্দ করে। এই দিনটিও সেরকম একটি দিন।

অনেকটা জোর করে যে এই সাক্ষাৎটা করিয়ে দিয়েছিল সে ছিল আমাদের কমন ফ্রেন্ড। এই কমন ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় পর্বটাও ছিল বেশ নাটকীয়। একটা সিগারেট কেনার জন্য দু-টাকা বা পাঁচ টাকা চাওয়ার আবদার থেকে। সেই ভুলতে না-পারা জানুয়ারির ঠিক আগের মাসটা ক্যালেন্ডারের হিসাবমতো ডিসেম্বর হওয়ার কথা। আর ওই ডিসেম্বরের এক অদ্ভুত মনোরম নাতিশীতোষ্ণ দুপুরে যখন কলেজের আর্ট ভবনের দক্ষিণ পাশের করিডোর ধরে আমরা কজন বন্ধু মিলে হেঁটে যাচ্ছিলাম মেয়েদের কমন রুমের দিকে, কমন ফ্রেন্ড হবে বলে আমাদের উভয়ের ভাগ্যলিপিতে যার নাম লেখা ছিল সে আচমকা আমার পথ আটকে দাঁড়াল।

সেদিন আমাকে চমকে
দেওয়ার সবটুকু প্রস্তুতি নিয়েই
সে এসেছিল। আমিও তাকে
নিরাশ করিনি। দু-টাকা
নয়, পাঁচ অথবা দশ টাকাই
দিয়েছিলাম। সঙ্গে সুন্দর করে
আল্লাদি মিষ্টি একটা হাসি।

কিন্তু পথ আটকে দাঁড়ানোর মতো হালকা বাহ্যিক চকচকে আড়ম্বর আমার বেশভূষায় বা মুখশ্রীতে ছিল না। বরং সে-সময় আমি ছিলাম মাথা-বুক-পিঠ ওড়নায় পঁচানো দারুণ রক্ষণশীলতার চাদরে মোড়ানো এক সপ্রতিভ তরুণী। কমন ফ্রেন্ডের অভূতপূর্ব নাটকীয়তায় চমৎকৃত ছিলাম। তার নায়কোচিত চেহারা দেখেও, বিশেষ করে তার নিখুঁত ছাঁচে গড়া খাড়া নাকের অভিজাত্য আমাকে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যেতে প্রলুব্ধ করল। যদিও এটাই আমাদের প্রথম পরিচয়।

তবে কথাবার্তার বিনিময় এটা পরিষ্কার করে দিলো যে, ভালো ছাত্রী তকমা গায়ে লেগে থাকার কারণে অন্য আরো অনেকের মতো তার কাছেও আমার পরিচয় লুকানো নয়। আর বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে আমাকে কিছুদিন ধরে অনুসরণ করে যাচ্ছে। আমার পক্ষে এসব জানার কোনো কারণ ছিল না। সে নিজে থেকেই গড়-বড় করে সব বলে যাচ্ছিল। যেহেতু তার প্রথম টোপটা দিয়ে সে আমাকে ভালোমতোই মুগ্ধ করতে পেরেছে বলে আমার সঙ্গে-সঙ্গে সেও বুঝে ফেলেছিল। আর নিজেকে স্মার্ট প্রমাণের খাতিরে বেশ খানিকটা ঢং মেরে অহেতুক কথা বলার প্রবণতা ছিল তার। ধীরে-ধীরে ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়েছিল।

‘এবার, দিন তো, দুটা টাকা বের করে দিন। একটা সিগারেট এ-মুহূর্তে না ফুঁকলেই নয়।’ তার সহজ নির্লজ্জ আবদার।

‘এভাবে মাত্র দু-টাকার জন্য একটা মেয়ের কাছে হাত পাততে লজ্জা করে না আপনার?’ সামান্য খোঁচা দিতে চাইলাম। কিন্তু আমার চোখে-ঠোটে কৌতুকের ঝিলিক। যেন আমি পরিষ্কার প্রশ্ন দিতে চাইছি।

‘না, না, বোনের কাছে টাকা চাইতে আবার লজ্জা কিসের? আপনাকে আমার বোন মানলাম, ধর্ম-বোন। আপত্তি নেই তো?’

নিজের বয়সের প্রায় কাছাকাছি, হয়তো কিছুটা বেশিই হবে, একটা ছেলের কাছ থেকে কোনো প্রেম-ভালোবাসার আবেদন-নিবেদন নয়, একবারে ধর্ম-বোন হওয়ার আহ্বান! সেদিন আমাকে চমকে দেওয়ার সবটুকু প্রস্তুতি নিয়েই সে এসেছিল। আমিও তাকে নিরাশ করিনি। দু-টাকা নয়, পাঁচ অথবা দশ টাকাই দিয়েছিলাম। সঙ্গে সুন্দর করে আল্লাহি মিষ্টি একটা হাসি।

সেই সিনেম্যাটিক মুহূর্তে আমার জানার কোনো উপায় ছিল না যে, একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এই ছেলে এতসব কাণ্ড ঘটাতে এসেছে। সে আমাদের কমন ফ্রেন্ড হয়ে একটা নাটকের সূচনা করবে আর আমরা সেই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্রে নিষ্ফল অভিনয় করে যাব বেশ কিছুটা কাল ধরে। কারণ নাটকটা হঠাৎ করেই এক সময় শেষ হয়ে যাবে মাঝপথে।

কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই, কোনো ধরনের গ্রহণযোগ্য যুক্তি-কারণের দরোজা উন্মুক্ত না রেখে নাটকটির আচমকা যবনিকাপাত ঘটিয়েছিল পুরুষচরিত্রটি, যে ছিল একজন প্রায় ডুবে যাওয়া মানুষ আর ঘটনাচক্রে যার নাম ছিল, থাক এতদিন বাদে নাম-টাম বলে তাকে আজ আর অপ্রস্তুত করে লাভ নেই। আমি আমিই থাকি, সে থাকুক সে। আর এর মাঝে, যদি প্রয়োজন দাবি করে, কমন ফ্রেন্ডসহ অন্য পার্শ্বচরিত্ররা আসা-যাওয়া করতে থাকুক নাটকের কাহিনীতে একটা বিশ্বাসযোগ্য বোধগম্য আরোপের নিমিত্ত।

যাকে আমি প্রথম দেখায় ডুবন্ত মানুষ ভেবেছিলাম সে আসলে কতটা ডুবন্ত ছিল, নাকি ঘটনার অনেকটাই ছিল ফালতু সেন্টিমেন্টালিটিতে ঠাসা, আজ আর জানার সামান্যতম আগ্রহবোধ করি না নিজের ভেতর। এতদিনে বেশ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া নানাবিধ আবেগ ও আরাধনার ব্যাপ্তিকালগুলো একেবারেই সাময়িক। একপর্যায়ে অনুভূতির তীব্রতম গভীরতা আরেক পর্যায়ে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। কিছু ব্যতিক্রম বাদে।

জানুয়ারির সেই আসন্ন বিকেলের অথবা গড়িয়ে যাওয়া দুপুরের আশ্চর্য আলোয় সে আমার দিকে সরাসরি তাকায়নি পর্যন্ত। আমার

এখনো স্পষ্ট মনে আছে। হয়তো আমার অলক্ষে সে আমাকে আগে থেকেই যতটুকু দেখার দেখে নিয়েছিল। ঠিক ওই সময়টাতে যখন আমি গিয়ে তার সামনে হাজির ছিলাম, সে দাঁড়িয়ে থাকল আমার দিক থেকে খানিকটা আড়াআড়িভাবে। এভাবে কোনো ভদ্রছেলের দাঁড়ানোর কথা নয়।

তবে তার অন্যান্য আচরণে তাকে যথেষ্ট পরিশীলিত ও অভিজাত রুচির মনে হয়েছিল। বিশেষ করে তার শরীর থেকে ভেসে আসা হালকা মিষ্টি সুরভির মাদকতা আমাকে বিমোহিত করে ফেলেছিল বেশ কিছু সময়ের জন্য। আজ এত বছর পরে যখন সেই আর-কখনো-ভুলতে-না-পারা ক্ষণটি পুনরাভিনয় করছি মনের পর্দায়, অলৌকিক যোগাযোগে সেই অনুভূতি অবশ্য করা সুবাসটি আমি যেন খুব বেশি করে টের পাচ্ছি! কী অদ্ভুত ব্যাপার!

আর তার মুখে ছিল আপাত রাগি-ক্ষুদ্ধ মুখোশের ওপর আরোপিত গাঙ্গীর্যের এক সুকঠিন থ্রলেপ। কিন্তু যেহেতু সে-সময় তার অন্তর্জগতে প্রবহমান ছিল এক ধারাবাহিক অদৃশ্য রক্তক্ষরণ, তার পক্ষে আমার মতো একটা মেয়ের নিষ্কলুষ চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলাটা সহজ ছিল না মোটে। পারিপার্শ্বিক ও মানসিক জড়তা তার জন্য ব্যাপারটিকে অসম্ভব করে তুলেছিল। আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরপরই তাকে আরো ভালোভাবে জানার এক অদম্য ইচ্ছা আমার ভেতর তৎপর হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য এর আগে কমন ফ্রেন্ড তার সঙ্গে সেই নাটকীয় পরিচয়ের পর থেকেই তার এই বিশেষ বন্ধুটি সম্পর্কে আমাকে বলে আসছিল আর খুব চাইছিল সুযোগমতো কোনো একদিন আমার সঙ্গে পরিচয়পর্বটা ঘটিয়ে দিতে। তার মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখন পর্যন্ত আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও সেরকম কোনো আগ্রহ আমি কখনো দেখিয়েছি বলে মনে পড়ে না। কারণ ইতোমধ্যে আমাদের একটি বেশ বড়সড় সমমনা বন্ধুদল তৈরি হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে নতুন কারো সঙ্গে পরিচিত হতে বা কাউকে বন্ধু হিসেবে পেতে তাই খুব একটা উৎসাহ কাজ করে না।

একদিন না পেরে কমন ফ্রেন্ড বলেই ফেলল, ‘আজ তোর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবো।’

ভাইয়ের হাস্যকর আবদার নিয়ে সে আমাকে রীতিমতো তুই করে ডাকতে শুরু করেছে। মহামুসিবতে পড়ে গেছি। আমাকেও বলেছে তুই করে ডাকতে। সমস্যা হলো, আমি এত সহজে কাউকে তুই বলি না, বলতে পারি না বা চাই না। কেউ-কেউ অনায়াসে, প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই, বলতে পারে। আমাকে দিয়ে তা হয় না। আমি কমন ফ্রেন্ডকে আপনি করেই বলতাম। তাতে একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতাম। এখনো সে-বিশ্বাস অটুট আছে।

যেদিন কমন ফ্রেন্ড তার সেই এত-গল্প-করা বন্ধুকে সত্যি-সত্যি এনে হাজির করল কলেজের খেলার মাঠটার উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে, আমি তখন মাঠের বিপরীত দিকে আমাদের সেকশনের সাত-আটজনের দলটার সঙ্গে দারুণ এক আড্ডায় মশগুল। আমার কোলের ওপর পড়ে আছে শামসুর রাহমানের মাতাল ঋত্বিক, যেহেতু কথায়-কথায়, কারণে-অকারণে, কবিতা তখন নিশ্বাসের মতো সারাক্ষণের সুহৃদ।

সেই অদ্ভুত সময়টাতে সেলিনা, যাকে আমরা লিনা ডাকতাম অথ বা সে নিজেই বন্ধুদের তাকে ওই নামে ডাকতে অনুরোধ করেছিল, আমাদের বলছিল তার একটি সম্ভাব্য ছোট্ট স্বপ্নের কথা। স্কলারশিপের টাকা পেলে সে কী করবে ইত্যাদিবিষয়ক, যদিও তখন পর্যন্ত কলেজের অফিস থেকে জানা যায়নি, কারা-কারা ওই বৃত্তি পাচ্ছে।

କାଳିଓ ୧୬୫
କଳମ

একজোড়া চপ্পল আর তার মাথা-ভর্তি ঘন কঁোকড়া চুল!

কমন ফ্রেন্ড আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো খুবই উৎফুল্লভাবে। তার এত খুশি হওয়ার কারণ সে-মুহূর্তে আমার কাছে পরিষ্কার না হলেও পরে অবশ্য সবই বুঝতে পেরেছি।

‘এই যে আমার বোন তোকে যার কথা বলছিলাম।’

‘আচ্ছা।’ তার ভাবলেশহীন উত্তর, মুখটা সামান্য অন্যদিকে ফিরিয়ে।

‘আর এ হচ্ছে সে যার কথা তোকে এতদিন বলেছি।’ আমি তার নিরাসক্ত জবাবে খানিকটা বিরক্ত হয়েছি। মনে-মনে ভেবেছি, কোনো সৌজন্যবোধ নেই। অথচ ভদ্রতার ধার না ধারা তার সহজ কাঠিন্যের মাঝেই অন্যরকম একটা কিছু দেখতে পেলাম। ভীষণ ভালো লেগে গেল ওকে আমার। সেই মায়ামখিত অলৌকিক দুপুরের মনগলা হৃদয়-হারানো মুহূর্তে!

‘আপনার কথা অনেক শুনেছি। আজ পরিচয় হয়ে ভালো লাগল।’ এবার আমার কিছু বলার পালা।

‘ও আচ্ছা, ধন্যবাদ।’ মানুষ কেমন করে এত বিরস হয় ভেবে পাচ্ছিলাম না।

অবস্থা খুব সুবিধার না দেখে কমন ফ্রেন্ড কথার মোড় ঘোরাতে চাইল।

‘তুই কি তাদের ওই দলে আবার যাবি না আমাদের সঙ্গে আসবি? আমরা একটু সামনের দিকে হাঁটতে যাব, নদীর ধারটায়। চল না হয় আমাদের সঙ্গে।’

আমি তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। সে একবারও আমার দিকে ফিরে তাকায়নি। আমি নিশ্চিত, সে বলতেও পারবে না আমার চোখে চশমা ছিল কি না। কারণ তার চোখের কণ্ট লুকিয়ে রাখতে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখাটাই সে নিরাপদ ভেবেছিল। আমি সঙ্গে যাব না জানাতে ওরা আমাকে মাঠের ওই জায়গাটাতে রেখেই নদীর পাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমি পোলো শাটটার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকলাম। তাকিয়ে থাকলাম তার চলে যাওয়ার পেছন দিকটায়। আর মনে-মনে বললাম, ‘তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে; সেদিন তোমার মুখে থাকবে এক চিলতে হাসি।’

এরপর যেদিন তার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হলো, সেদিন সত্যি-সত্যি সে আমার দিকে তাকিয়ে এমন সুন্দর করে হেসেছিল যার কোনো তুলনা ওই সময় পর্যন্ত আমার কাছে ছিল না। ফাল্গুনের প্রথম সেই দিনে কলেজ জুড়ে ছড়ানো ছিল উৎসবের হই-হুল্লোড়। চারদিকে গান-বাজনা-চিৎকার, হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক, ঝালমুড়ি আর চটপটির সঙ্গে তার সেই আশ্চর্য হৃদয়-মোচড়ানো স্মিত হাসি আমার বুকের মধ্যে সর্বনাশা তুফান বইয়ে দিলো। ভালো ছাত্রীর তকমা লাগানো মেয়েটা সেদিন প্রথমবারের মতো টের পেল, বসন্তের প্রথম দিনের বেড়ুলা বাতাস আজ প্রথম প্রেমের রেণুদল ছড়িয়ে আপ্তত করেছে তার মনের বাগানের গোলাপসকল। সবকিছু ভুলে আজ তার প্রেমে পড়ার দিন, আজ তার গভীরভাবে ভালোবাসা অনুভব করার দিন, আজ তার গলা ছেড়ে গান গাওয়ার দিন। এসব বিস্মিত ভাবনা যখন মনের ভেতর জোর তোলপাড় তুলেছে, বকুলগাছটা থেকে সামান্য তফাতে পোস্টঅফিসের পাশে লাল কাপড় দিয়ে ঘেরাটোপ দেওয়া জায়গায় রাখা সাউন্ড বক্সটা থেকে তখন ফুল ভলিউমে ভেসে আসছে, ‘ও শাম রে তোমার সনে, শাম রে তোমার সনে... আজ পাশা খেলবো রে শাম’

তারপর তার সঙ্গে আমার আরেকবার, তৃতীয়বার দেখা হলো এক রোদগলা উষ্ণ বিকেলের নরম মিষ্টি আলোয়। আমাদের কোয়ার্টারের খোলা বারান্দার সামনে। আগে থেকে কিছু না জানিয়ে ঠিক কী কারণে কমন ফ্রেন্ড তাকে নিয়ে সেদিন আমাদের বাসায় সরাসরি উপস্থিত হয়েছিল আজ আর মনে করতে পারি না। তবে সেটা আমাদের ঘিরে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশই ছিল, আজ

নতুন করে ভাবতে গিয়ে আরো একবার অনুভব করি।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও আমি বারান্দায় বসে কোনো বই বা পত্রিকা পড়ছিলাম। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই কমন ফ্রেন্ড একেবারে বাসার সামনে হাজির; সঙ্গে সে। সামান্য অপ্রস্তুত আমি; কিন্তু তাকে দেখেই মনে-মনে ভীষণ খুশি। একটা আনন্দের ঝিলিক কি আমি তার দুচোখেও খেলে যেতে দেখিনি? হাই পাওয়ারের চশমার কাচের আড়াল থাকা সত্ত্বেও সেই আনন্দের প্রকাশটা ছিল দারুণ স্পষ্ট!

সেদিনের সেই মধ্য ফেব্রুয়ারির শেষ বিকেলের হিমেল রোদের মন ছুঁয়ে যাওয়া স্বর্ণালি আভায় তাদের দুজনকে ড্রইংরুমে এসে বসতে বলে চা-নাশতা আয়োজনের জন্য বাসার ভেতরে আমার প্রস্থান কিছু সময়ের জন্য। যখন ফিরে এলাম, এক অদ্ভুত মায়াকাড়া হাসি ছড়িয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। আমার আরেকবার অপ্রস্তুত হওয়ার পালা। কিন্তু ততক্ষণে জড়তা কাটিয়ে উঠেছি। হালকা কথাবার্তা বিনিময়, স্বভাব অনুযায়ী কমন ফ্রেন্ডের কিছু সস্তা জোকস বলে জোর করে হাসানোর চেষ্টা, চা-বিস্কিট-চানাচুরের ভেতর দিয়ে কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে যাওয়া আর তার পরপরই মাগরিবের আজান পড়তে না পড়তেই বিদায় নেওয়ার জন্য দুজনের একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়া।

অল্প সময়ের এই আলাপচারিতায় সে জেনে গেছে অথবা যে-কোনো প্রকারে হোক আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, সে-সময়টায় আমার ঘাড়ে আছর করে থাকা কবিতার ভূতের বিষয়টা। বলা যায়, সম্ভাব্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে মোড় নেয়, না নেয় বিবেচনায় নিয়েই তাকে আমার কবিতা-প্রেমের পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যিক মনে হয়েছিল। আবার হয়তো এসব কিছুই নয়। ড্রইংরুমে যে-সোফাটায় সে বসেছিল, তার সামনের সেন্টার টেবিলে যেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আগে থেকেই পড়ে ছিল মহাদেব সাহার *মানুষ বড় ক্রন্দন জানে না* নামের কবিতার বইটি। আমি কেবল বুকমার্ক দেওয়া কবিতাটা, ‘তুমি যখন প্রশ্ন করো’ বের করে বইটি তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলাম। আর বইটা খুলেই চোখের সামনে ‘তুমি যখন প্রশ্ন করো/ আমি কি তোমায় ভালোবাসি?/ অন্ধকারে লুকিয়ে মুখ/ আমি নিজের মনেই হাসি’ লাইনগুলো পড়ে কবির মতোই সে আমার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি ফেলে তাকাল আর এমন মিষ্টি করে হাসল যে, আমার সমস্ত চেতন অবশ্য হয়ে যাওয়ার মতো বোধ হলো।

‘কাল দেখা হচ্ছে, তাহলে?’ প্রশ্নটা কমন ফ্রেন্ডের হলেও উত্তরটা আরেকজন আশা করছিল। আমি তার চশমার ভেতর গলে চোখের দিকে তাকিয়ে তা বুঝতে পেরেছিলাম। তার সেই অপলক দৃষ্টিতে ছিল এক নীরব নিবেদন, আশ্চর্য অস্থির এক আহ্বান আর শব্দহীন কিছুর আকৃতি!

‘হ্যাঁ, দেখা হচ্ছে। আপনি আসছেন তো?’ সরাসরি তার চোখে চোখ রেখে আমি জানতে চাইলাম। আবাবো সেই হৃদয়-মোচড়ানো হাসি। আবাবো আমার মনের তীরে শত সহস্র উর্মিমালার এলোমেলো আছড়ে পড়া। আর কঁোকড়ানো চুলের ভেতর অন্যমনস্ক ডান হাতটা ঢুকিয়ে তার বিশেষ ভঙ্গিমায় জানান দেওয়া, ‘আসছি।’

তারপর ঘনায়মান সন্ধ্যার ঈষৎ আলো-অন্ধকারে তাদের দুজনের হারিয়ে যাওয়া সেদিনের মতো। আর আমি চন্দ্রাহতের মতো ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার এক কোণে যেখানে মাঝারি মাপের একটা টব স্নো-বল নামের চন্দ্রমল্লিকার ভারে ভেঙে পড়ছে, সেখানটায় দাঁড়িয়ে কেবল মহাদেব সাহা আওড়ে যেতে থাকি : ‘এতোদিনেও বোঝেনি যে/ আজ বোঝাবো কোন ভরসায়/ না-বলা সেই ছোট্ট কথা/ বলিনি কি কোনো ভাষায়?/ বলিনি কি এই কথাটি/ তোমার দিকে নীরব চেয়ে,/ এই গান কি সারাজীবন/ জীবন দিয়ে যাইনি গেয়ে?...’ □



শিবানি ও সাপ

রাশেদ রহমান

আমি শিবানি। শিবরামের বউ...।
সেদিন আষাঢ়ের তিন, গোদার তিন নম্বর বউ সারাদিন কেঁদে-কেটে
অস্থির। কী জল যে সারাদিন ঢালল চোখের! ওরা সহোদর সাত বোন গোদার
সাত বউ। সবাই বুড়ো হয়েছে। চুল পেকে হয়েছে শনপাটের মতো সাদা। দাঁত
পড়ে গেছে। হাসলে খয়েরি মাড়ি বেরিয়ে আসে।

তো, এই বুড়ো বয়সেও ওরা শ্বশুরবাড়ি যেতে কাঁদে। সে যে কী কান্না? একেবারে
কিশোরী-বউয়ের মতো। যেন চিরতরে বাবার বাড়ি ত্যাগ করছে, আর কোনোদিন নাইওর
আসতে পারবে না। যা হোক, সেদিন গোদার তিন নম্বর বউ, ওরা সাত বোন, সাতদিন
কাঁদতে-কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি যায়; সারাদিন কেঁদে-কেটে, দেশগ্রাম চোখের জলে ভাসিয়ে বিকেলের





অলংকরণ : রোকেয়া সুলতানা

দিকে কান্নাকাটিতে একটু বিরতি দিতেই লোকটা বলল, ‘শিবু, বৃষ্টি ধরেছে, আবার নামতে পারে, এই সুযোগে আমি একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি...।’

লোকটা যে শিবরাম, আমার স্বামী; এটা তো আর কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। শিবরাম আমাকে ‘শিবু’ বলে ডাকে, আমি তো আর — যে-লোকটি আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে তাকে নাম ধরে ডাকতে পারি না। আমি ‘লোকটা’ বলেই চালিয়ে দিই...।

‘বাজার থেকে একটু ঘুরে আসি’ — কথাটির একটি মানে আছে। মানেটা হলো — দু-কলকি গঞ্জিকা সেবন। আমি তেমন একটা লেখাপড়া জানি না। প্রাইমারি পাস করার পর আর স্কুলে যাইনি। লেখাপড়ার চেয়ে পুতুলের সংসার সাজানো, কনে-পুতুলের বিয়ে দেওয়া, বর-পুতুলকে বিয়ে করানোই প্রিয় ছিল আমার। তাছাড়া আমার মা ছিল পাগলাগোছের মানুষ, সংসার সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে পারত না। আমি আমার পুতুলের সংসার সাজাতে-সাজাতে মায়ের সংসারটিও সাজানো শিখে ফেলেছিলাম। ওই কিশোরী-বয়সেই, বলতে গেলে সংসারের হাল ধরেছিলাম আমি। এতে, মা ভীষণ খুশি। তাকে তার বাবার বকুনি খেতে হয় না। ফলটা হলো কী? মা আর

লোকটা যখন বাঁশিতে সুর
তোলে, তখন আমার বুক
কাঁপে। কী যে করুণ-কষ্ট
সুর তোলে বাঁশিতে! লোকে
বলে, শিবরামের বাঁশির
সুর শুনে যার চোখে জল
না-আসে সে নাকি মানুষের
পর্যায়েই পড়ে না।

আমাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করত না। বাবাও বলত না কিছু। সে তার হাটবাজার নিয়ে ব্যস্ত। বাবা হাটবাজারে গজা বিক্রি করে। যাহোক, অল্পবিদ্যার মানুষ আমি, ‘গঞ্জিকা’ শব্দটি মুখে আসতে চায় না, ‘গাঁজা’ বলতেই আরাম পাই; কিন্তু লোকটার জন্যই আমি গঞ্জিকাকে গাঁজা বলতে পারি না, কষ্ট করে হলেও গঞ্জিকাই বলতে হয়। গঞ্জিকাকে গাঁজা বললে, লোকটা আমার চেয়ে তিন ক্লাস বেশি পড়েছে, তাতেই সে বড়ো বিদ্বান; বলে — গঞ্জিকাকে অপমান করা হয়...।

সবতাতাই ভালো লোকটা। আমি কষ্ট পেতে পারি — সজ্ঞানে এ-ধরনের কোনো কাজ সে করে না। দোষ একটাই — গঞ্জিকাসেবী। তবে ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছে, সবই তাঁর কৃপা; লোকটা গঞ্জিকা সেবন করে পরিমিত, কোনোদিন মাতাল হয় না; মাতলামি করে না...।

গোদার বউ সারাদিন কেঁদেছে। ঢল ছিল চোখে। ঘরের বাইরে বেরোনের জো ছিল না। লোকটা সারাদিন ঘরে বসে-বসে বাঁশি বাজিয়েছে। আড়বাঁশি। বংশীবাদক হিসেবে সুনাম আছে লোকটার। সাগর কবিরালের দোহারি করে সে। কবিরালের নাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। কবিরালের সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার বংশীবাদনেরও প্রশংসা করে মানুষ। তা শুনে খুব ভালো লাগে আমার। লোকটার প্রশংসা শুনে আমার বুকের ভেতর ‘শিবরাম’, ‘শিবরাম’ শব্দ ওঠে। আমি দুহাত তুলে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানাই — ‘ভগবান, এই লোকটাকে আমার স্বামী করেছো, পরলোকেও যেন পাই তাকে...।’

কাইতান কিংবা অন্য কোনো কারণে লোকটা হাটে না-গেলে বাড়িতে বসে বাঁশির সুর তোলে। আমার বাবার মতোই লোকটা হাটে-হাটে গজা বিক্রি করে। হাটে গজা বিক্রি করে হাট থেকেই ময়দা-চিনি কিনে আনে। আমরা দুজনে মিলে বাড়িতে গজা বানাই। ময়রা হিসেবেও লোকটার সুনাম আছে...।

সেদিন ঘরে বসে বাঁশি বাজিয়েছে সারাদিন। লোকটা যখন বাঁশিতে সুর তোলে, তখন আমার বুক কাঁপে। কী যে করুণ-কষ্ট সুর তোলে বাঁশিতে! লোকে বলে, শিবরামের বাঁশির সুর শুনে যার চোখে জল না-আসে সে নাকি মানুষের পর্যায়েই পড়ে না। সে একেবারে পাথর দিয়ে তৈরি অমানুষ। গাঁয়ে গানের আসর বসলে আমিও যাই। লোকটার বাঁশির সুর শুনে আমার চোখে অশ্রুপ্লাবন নামে। নিজের চোখের জল মুছতে-মুছতে বলি — ‘ভগবান, লোকে তাহলে মিথ্যে বলে না...।’

লোকটা বাঁশিতে নানা ধরনের সুর তোলে। তবে, কেন জানি না, একটা সুর তার খুবই প্রিয়। সব আসরেই নাকি সে সুরটা তোলে। সে নিজেই তা বলেছে একদিন। সেদিনও বৃষ্টির মধ্যে বারবার ওই সুরটা — ‘আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি/ সুখের সার সে চোখের জলেরে/ তুমি হাস আমি কাঁদি/ বাঁশি বাজুক কদমতলে রে...’, তুলছিল, আর কাঁদছিল সদ্য-মাতৃহারা বালকের মতো...।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে, খালপাড়ে জোড়া কদমগাছ। আষাঢ়-মেঘের জলের ছোঁয়া পেয়েই ফুল ফুটে গুরু করেছে। তিন দিনেই কাঁচা-হলুদ-রঙের ফুলে-ফুলে ভরে গেছে গাছ। বৃষ্টি-ধোয়া বাড়ি ম-ম করেছে ফুলের গন্ধে। এই ফুলের সুবাস গায়ে মেখে, ‘বাঁশি বাজুক কদমতলে রে...’ — গুনগুন করতে-করতে আমি উনুনে হাঁড়ি চাপিয়েছি। লোকটার বাঁশির সুরে, এই গানটির সুর শুনতে-শুনতে; গানটি আমার মনেও গেঁথে গেছে। হঠাৎ-হঠাৎ আমার ভেতরের আমিও গুনগুন করে ওঠে — ‘বাঁশি বাজুক কদমতলে রে...।’

একটানা বৃষ্টি ছিল সারাদিন। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ আর লোকটার বাঁশির সুর আমাকে কেমন যেন অবশ করে ফেলেছিল। দুপুরে রান্নাবান্নার আয়োজন করিনি। আমরা দুজনে কাঁঠাল-মুড়ি খেয়েছি। সুবর্ণ কাঁঠাল খেতে চায় না। চার বছর বয়স হয়ে গেল — এখনো ভাতই ভালো করে খেতে শিখল না। বড়ো যন্ত্রণা হয়েছে ছেলেটাকে নিয়ে। ঘরে দুটো সন্দেশ ছিল, তাই খাইয়েছি ওকে। এখন তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করা দরকার। কে জানে, গোদার বউ আবার কখন কান্না

জুড়ে দেবে... !

সাঁঝ নামার আগেই আমার রান্নাবান্না শেষ। ভাতের সঙ্গে বাজালি মাঝের চচ্চড়ি, শোল মাছের ঝোল আর মুগের ডাল। দুধ তো আছেই। লোকটাকে প্রতিদিনই দুধ দিতে হয়। গঞ্জিকাসেবীদের দুধ না-হলে চলে না। সুবর্ণ ডাল আর দুধ দিয়ে দু-লোকমা ভাত খেয়েছে। মাছও খেতে চায় না ছেলে। কাঁটা বেছে খাইয়ে দিতে চাইলাম, তবু খেলো না। রাত বেশ হয়েছে। গোদার বউ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে আবার। চোখের ঢল নামতে পারে যে-কোনো সময়। আমি খাইনি। স্বামীর আগে খেলে সংসারের অকল্যাণ হয় — বিয়ের দিন মা কানে-কানে বলে দিয়েছে, শ্বশুরবাড়ি এলে — শাশুড়িও শুনিয়েছে এই বেদবাক্য; লোকটা বাড়িতে না-এলে, তাকে না-খাইয়ে আমি খাই কী করে? সংসারের অমঙ্গল হবে যে... !

কিন্তু লোকটা যে আসছে না! রাতও বাড়ছে। কুমারপাড়া মন্দিরে এক প্রহর পরপর ঘন্টা বাজাচ্ছে পুরোহিত। এখন রাতের শেষ প্রহর। তবু লোকটা আসছে না। আমার চোখে ঘুম নেই। স্বামী ‘বাজার থেকে একটু ঘুরে আসছি’ বলে রাতে আর ঘরে না-ফিরলে, কোনো নারীর চোখেই ঘুম থাকে না...।

লোকটা সকালেও এলো না, দুপুরেও না...।

আমি ভেবেছিলাম — লোকটা বৃষ্টির দিন দেখে অন্যদিনের চেয়ে বেশি গঞ্জিকা সেবন করেছিল, তারপর খেয়েছিল মদ। সাগর কবিরাল বানুটি খায়, তার পাল্লায় পড়ে লোকটাও খেতে পারে। গঞ্জিকা ও মদের নেশায় কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে, সকালে ঘুম ভাঙলেই চলে আসবে। কিন্তু সকাল গেল, দুপুর গেল; পরের রাত গেল — লোকটা এলো না...।

লোকটা আর ফিরে আসেনি...।

কোথায় গেল লোকটা... ?

দেশে, পাবনা, যশোর, চাঁদপুর — আরো যেসব গাঁয়ে আমাদের কিংবা লোকটার তরফের আত্মীয়স্বজন আছে, আমার ভাইয়েরা, ভাসুরঠাকুর-দেবরঠাকুরেরা মাস ভরে খোঁজাখুঁজি করল — না, কোথাও লোকটার খোঁজ পাওয়া গেল না। তারপর আরো দুমাস ভারতের আসাম-কোচবিহার — যেখানে-যেখানে আমাদের দুই পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয়স্বজন আছে, সবখানে খোঁজ করা হলো — লোকটার কোনো খোঁজ মিলল না...।

তারপর... ?

তারপর একদিন আমার কানে এলো, পালবাড়ির পুকুরঘাটে, গ্রামে — আমাদের হিন্দুপাড়ায় পালবাড়ির পুকুরটিই বড়ো। সারা বছর জল থাকে, বাঁধানো ঘাট আছে; সেই ঘাটে বসে; বড়ো মন্দিরটিও পালবাড়ি, ওই মন্দিরের পাশে বকুলতলা বসে আমাদের পড়শিরা জাবর কাটে — ‘দেখ, ভগবানের কী বিচার! কচি বয়সেই শিবানিটা বেধবা হয়ে গেলো...।’

বিধবা... !

লোকটার কি মৃত্যু হয়েছে? কীভাবে? আমি কি সিঁথির সিঁদুর মুখে ফেলব? সিঁথির সিঁদুর মুখে গেলে সেই হিন্দু-নারীর তো বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। এই পার্থিব দুনিয়াটা তখন তার কাছে নরকতুল্য। তাহলে আমি এখন কী করব, ভগবান... ?

লোকটা কেন এভাবে বাড়িঘর ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে, সুবর্ণকে ছেড়ে; সুবর্ণা তখন আমার পেটে; সুবর্ণাকে ছেড়ে চলে গেল — এই হিসাব আমি কোনোদিন মেলাতে পারিনি। নিশ্চয়ই আমার কোনো অপরাধ ছিল, কিন্তু কী সেই অপরাধ, কত বড়ো অপরাধ; যা লোকটা আমাকে বলতে পারল না, কিংবা ইচ্ছা করেই বলল না; নিজেই ঘরবিবাগি হলো? বাঁশিতে যারা সুর তোলে, সুর তুলে যারা শিশুর মতো কাঁদে; তারা কি নিজের মনের দুঃখ-কষ্টের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না... ?

বাড়ি ছেড়ে লোকটা বেঁচে গেল নাকি মরল — কে জানে ভগবান।

কিন্তু আমি এখন কী করি? দিন-দিন আমার বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। ওই যে, পড়শিরা বলে — কচি শিবানি, কথাটা তো ঠিক। চোন্দো বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে। পরের বছরই কোলে আসে সুবর্ণ, ওর বয়স কেবল চার; অর্থাৎ গুনে দেখলাম — আমার বয়স এখনো বিশই হয়নি।... তো, এরকম একটি অরক্ষিত কচি শরীর, রাতে আমার ঘরের চালে ঢিল পড়ে, দরজায় টোকা পড়ে; দিনে সাগর কবিরাল আর শিবানিকে নিয়ে গান বাঁধে নতুন কবিরাল; তাহলে আমি বাঁচব কী করে... !

সাগর কবিরাল আগেও আমাদের বাড়িতে আসত। ঘরের বারান্দায় বসে-বসে গান বাঁধত, লোকটা সুর তুলত বাঁশিতে। এখনো কবিরাল আসে। আমার খোঁজখবর নেয়, সুবর্ণ-সুবর্ণাকে আদর করে। ভগবান জানে, তিনিই সাক্ষী — এর বেশি কিছু না। মানুষই তো মানুষের খোঁজখবর করে। বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ায়। সাগর কবিরাল লোকটার বন্ধুমানুষ। সে আমার এই বিপদে পাশে দাঁড়াবে না? দাঁড়াবেই তো। তা ছাড়া, কবিরাল বড়ো নরম-মনের মানুষ, সুন্দর মনের মানুষ। তার সঙ্গে গানের আসরে লড়াই করে না-পেরে, শত্রুতা-সাধনের জন্য যে-গান বেঁধেছে নতুন কবিরাল, এ-গান বাঁধা, এ-গান গাওয়া যে পাপ, মহাপাপ...।

এই, এতদিনে, বহুবীর মনস্থ করেছে; এবার গলায় দড়ি দেব। মাথার কাছে বাঁটি রেখে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো সুখ নেই। কিন্তু সুবর্ণকে বড়ো হতে দেখে, সুবর্ণাকে বড়ো হতে দেখে, ওদের দুই ভাইবোনের জারুলফুলের মতো স্নিগ্ধ মুখ দেখে কাজটা আর করতে পারিনি...।

গোদার বউরা বছরে একদিন কাঁদে, আমি ২০ বছর ধরে প্রতিদিনই কাঁদছি। আমার চোখের জল কেউ দেখে না — এই যা তফাৎ... !

দুই

আমি শিবরাম। শিবানির স্বামী...।

সেদিন ঢল-বর্ষণ ছিল সারাদিন। মাটি-কাঁপানো মেঘগর্জন আকাশে-আকাশে। এরই মধ্যে ঘরের বারান্দায় বসে আমি বাঁশিতে সুর তুলছিলাম। আমার প্রিয় সুর — ‘আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি/ সুখের সার যে চোখের জলে রে...।’ সাগর কবিরাল যখন আসরে এই গীত ধরে, তখন সব দর্শক-শ্রোতার চোখে জল নামে; সবাই বোঝে, সবার মনই বলে — জীবনে ভালোবাসার সুখ, সে শুধুই চোখের জল, আর কিছু না। আমি শিবানিকে ভালোবেসে আরো বিশদ আকারে তা বুঝেছি। তাই তো সাগর কবিরাল এ-গানে সুর তুলতেই আমার চোখেও জলপ্লাবন নামে...।

আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম — বাড়ি থেকে চিরকালের জন্য বেরিয়ে পড়ব। আমার বাড়ি আমার কাছে নরক হয়ে উঠেছে। বাড়ির শোবার ঘরে, রান্নাঘরে, উঠানে — সর্বত্র শুধুই আগুন। সবখানেই জ্বলন্ত চিতা। আমি সেই অগ্নিকুণ্ডে পুড়তে-পুড়তে ছাই হচ্ছি। তবে কেন আর ঘর? কেন আর সংসার? সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়াই তো শ্রেয়...।

বাড়ির সর্বত্র আগুন, অগ্নিকুণ্ড; এটা কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ দেখে না। শিবানি না, সুবর্ণ না, যেটি শিবানির পেটে আছে, সেও না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য এটিই আমার জন্য সুবিধাজনক সময়। কেউ কোনোদিন কিছুই অনুমান করতে পারবে না — বংশীবাদক শিবরাম কেন ঘর-সংসার ছেড়ে পানকৌড়ির মতো ডুব মেরে পালাল... !

সেদিন বিকেলের দিকে, বৃষ্টি একটু ধরে আসতেই, শিবানিকে বললাম — ‘শিবানি, আমি বাজার থেকে একটু ঘুরে আসি...।’ আমার কথা শুনে, শিবানি পেটেরটার জন্য কাঁথা সেলাই করছিল; আমার দিকে তাকাল। তারপর একটু হেসে বলল, ‘এই বিষ্টি-বাদলা মাথায় করেই বাজারে যাবা...?’ আমি কিছু বললাম না। শিবানি জানে, আমি

এখন বাজারে যাবই। আমার গঞ্জিকাসেবনের সময় হয়ে এসেছে। আমি এমনিতেই, প্রত্যেকদিন বিকেলে-সন্ধ্যায় গঞ্জিকাসেবন করি, সেদিন ছিল ঝুম-বৃষ্টি; এই ধরনের বৃষ্টির দিনগুলোতে গঞ্জিকা আরো বেশি করে টানে; সে আর কিছু বলল না; আমি বেরিয়ে পড়লাম...।

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারের পথ না-ধরে সোজা পাকা-সড়কের পথে নামলাম। শিবানি তো আমার মনের কথা জানে না, সে একমনে কাঁথা সেলাই করছে; আমি বাজারের পথ ছেড়ে পাকা সড়কের দিকে যাচ্ছি কিনা — এটা দেখার কথা তার মনে হয়নি। মনে হওয়ার কোনো কারণও ছিল না...।

গঞ্জিকা আমাকে চুম্বকের মতো টানছিল। কিন্তু ওই টান আমি প্রবলবেগে উপেক্ষা করে পাকা-রাস্তায় উঠলাম। আজই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাড়ির সর্বত্র নরকের আগুনের মতো আগুন। আমি আর পারছি না। পাকা-সড়কে উঠে শিবানি-সুবর্ণকে মনে পড়ছিল, শিবানির পেটেরটার কথাও মনে পড়ছিল। কিন্তু তখন আমার মনে জেদ চেপে বসেছে। না, আর বাড়িতে ফিরব না। বাড়িতে ফিরলেই পুড়ে চিতাকাঠের মতো ছাই হয়ে যাব...।

সড়কে উঠে কবিরালের কথাও মনে পড়ছিল। কবিরাল নতুন গান বেঁধেছে — ‘ও আমার মনের মানুষ গো/ তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর...।’ কবিরালের মনের মানুষ যে কে, তা আমি জানি। আমাকে বাঁশিতে সুর তুলতে বলেছে। আজই সুর তোলার কথা ছিল। কিন্তু আমি আর নেই। কবিরাল নতুন বংশীবাদক খুঁজুক...।

আমি কেন ঘর-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম? বলেছি তো — আমি আর পারছিলাম না। পুড়ে ছাইভস্ম হচ্ছিলাম প্রতিদিন। দৃশ্যমান আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা হয়তো সহ্য করা যায়, অদৃশ্য আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন...।

যাই হোক, ভেবে দেখলাম; সবকিছু বলা সমীচীন হবে না। সামান্য কিছু বলি...।

শিবানিকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি। শিবানিও আমাকে, বিয়ের আগে থেকেই ভালোবাসত। অর্থাৎ, আমাদের দুজনের মধ্যে প্রেম ছিল। শিবানির বয়স ছিল কম। তাই ওর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল ফুলের কুঁড়ির ভেতর থেকে সুবাস ছড়ানোর মতো...।

আমরা একই পাড়ার বাসিন্দা। জাতিতেও এক — ময়রা। তাই, দুই পরিবারের সম্মতিতে, সাতপাক ঘুরেই আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমি এখনো শিবানিকে সেই ঝিনুক-তীরের কাশবনে ভালোবাসার মতোই ভালোবাসি। শরতে ওর খোঁপায় গুঁজে দিই কাশফুল, বর্ষায় গুঁজে দিই কদমফুল। শিবানিও আমাকে ভালোবাসে সেই আফোটাবেলার মতোই। এখনো ভোরবেলা বিছানা ছাড়ার সময় আমার পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে, এখনো বিশ্বাস করে — স্বামীকে অভ্যুক্ত রেখে নিজে খেলে সংসারের অকল্যাণ হবে। আমাদের ভালোবাসায় দৃশ্যত কোনো ফাঁকফোকর নেই। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় — আমাদের ভালোবাসার সংসারে একটি সাপ ঢুকেছে; দুধরাজ। শিবানি বাটি ভরে দুধ খাওয়ায় সাপটিকে...!

আমার কেন মনে হবে — কেন সন্দেহ — আমাদের সংসারে সাপ ঢুকেছে; আমি বাঁশিতে ‘আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি/ সুখের সার সে চোখের জলে রে...; সুর তুলে কাঁদি। কিন্তু মনের সন্দেহ দূর করতে পারি না। মনে-মনে ভগবানকে ডাকি, আমার চোখের জলস্রোতে মনের সন্দেহ ভেসে যাক; কিন্তু চোখের জল ফেলাই সার, মনের সন্দেহ দূর হয় না। আমার চোখে-চোখে ভাসে দুধরাজ সাপ; শিবানির হাতে দুধের বাটি...।

এই যে, আমি বাঁশিতে গানের সুর তুলে কাঁদি, শিবানি তো বাইরের সত্যটাকেই দেখে। তার স্বামী শিবরাম বাঁশিতে সুর তোলে কাঁদছে। এটা তার অভ্যাস। বাঁশিতে সুর তোলে আবেগ ধরে রাখতে পারে না — তাই কাঁদে। কিন্তু আমি কষ্টে, ক্রোধে কাঁদি — ভালোবাসার কষ্ট, ভালোবাসার ক্রোধ; শিবানি এটা বোঝে না। কিংবা কে জানে, শিবানি

বুঝেও না-বোঝার ভান করে... !

সাগর কবিয়াল বয়সে আমার চেয়ে দুবছরের ছোট; তারপরও আমার ওস্তাদ সে। বন্ধুও বটে। যারা গীত বাঁধে, আসরে গায় — তাঁরাই তো ওস্তাদ। সেই হিসেবে সাগর কবিয়াল আমার ওস্তাদ। আমি বাঁশিতে ওর গানের দোহার করি। তবে, কবিয়াল আমাকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করে। আসরে নামার আগে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। লোকটা ভালো। বড়োমনের মানুষ। আমাদের বাড়িতে ওর অবাধ যাতায়াত। ও বাড়িতে এলেই শিবানি চা করে দেবে। কিন্তু কবিয়ালের একটা ব্যাপার আমি মেনে নিতে পারি না। শিবানিকে ও ‘ঠাকুরঝি’ ডাকে...।

দিদি না, বউদি না; ঠাকুরঝি কেন... !

কবিয়ালকে একদিন ধরলাম — ‘সাগর, শিবানিকে তুমি দিদি ডাকতে পারো, বউদি ডাকতে পারো — ঠাকুরঝি কেন? ঠাকুরঝি তো শ্যালিকা। শিবানির সঙ্গে তুমি শ্যালিকার সম্পর্ক পাতাও কীভাবে...?’

সাগর কিছু লেখাপড়া জানে। হাইস্কুলেও পড়েছে কিছুদিন। শিক্ষিত কবিয়াল কী যে বলল আমার কথার উত্তরে, আমি ধরতে গেলে অশিক্ষিত মানুষ, প্রাইমারি স্কুলে কদিন মাত্র গেছিলাম; ওর কথার মাথামুণ্ড আমি কিছুই বুঝলাম না। কোন পালা-বইয়ের নায়ক নিতাই কবিয়াল তার বন্ধুর শ্যালিকাকে ঠাকুরঝি ডাকে — তাই সাগর কবিয়ালও আমার বউকে ঠাকুরঝি ডাকবে — এটা কেমন কথা? ভেতরে কোনো গূঢ়তত্ত্ব আছে কিনা, কে জানে! আমার মন বলে,

প্রেমে পড়েছিলাম। ওর তো তখন সেই অর্থে প্রেমে পড়ার বয়সই হয়নি — তবু কেন আমাকে ভালোবাসত, জানি না। সেই মেয়েটি, শিবানি — আমার বউ, আর আমার বউকে নিয়ে গীত রচনা করে সাগর কবিয়াল! শিবানির দীর্ঘ কালো চুল, যাকে বলে — মেঘবরণ চুল, খোঁপা বাঁধলে — খোঁপার চূড়াটিকে রাঙা-ফুলের মতোই মনে হয় — কবিয়াল বলছে — ‘রাঙা কুসুম’। কবিয়াল শিবানিকে ঠাকুরঝি ডাকে — তাও, বুকের ভেতরে নরকের আগুন জ্বলে উঠলেও; দাঁতে কামড় দিয়ে সহ্য করছিলাম; কিন্তু এখন দেখি — শিবানিকে নিয়ে গীতও বাঁধছে কবিয়াল, শিবানিও চায়ের কাপ হাতে দম বন্ধ করে গুনছে সেই গান; আমি আর সহ্য করতে পাছিলাম না। আমার বাঁশিতে তখন আপনাআপনি সুর উঠছিল — ‘আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি/ সুখের সার সে চোখের জলে রে...।’

কবিয়াল গুনগুন করছিল — ‘কালো কেশে রাঙা কুসুম’ — শিবানি চায়ের কাপ ধরেছে কবিয়ালের সামনে, আমার মনে হচ্ছিল — শিবানির হাতে চায়ের কাপ নয়, দুধের বাটি; দুধরাজ সাপটি এখন চুকচুক করে দুধ খাবে...।

সেদিন থেকেই আমি তৈরি হচ্ছিলাম, ঘর-সংসার আর না। ঘরে সাপ ঢুকেছে, সাপটিকে দুধ-কলা খাওয়ায় শিবানি, আমার বউ; কখন সাপটি আমাকে ছোবল মারবে, কে জানে! কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরোতে পারছিলাম না। শিবানি যতই সাপ পুষুক, মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি, আমি সাগর কবিয়ালের মতো গান বাঁধতে পারলে

সেই ঘনঘোর বৃষ্টির দিনের মাসদুয়েক পর, এক সন্ধ্যায় সেদিনও ঝুমঝুমি, সুবর্ণের জ্বর, আমি ওর জন্য ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম, ঠাকুরঝি ককাতে-ককাতে বলল — ‘সাগরদা, আজ রাতে তুমি এখানেই থেকে যাও...।’ ঠাকুরঝির কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, কেন, কী হয়েছে তোমার? রাতে তোমার ঘরে থাকলে রাত পোহানোর আগেই তো গাঁয়ে টিটি পড়ে যাবে...।

কিছু একটা আছে ভেতরে; নইলে আমার কথা শুনে শিবানি কেন হাসতে-হাসতে বলল — ‘দূর, তুমি যে কী লোক না! সাগরদা আমাকে ঠাকুরঝি ডাকে, তাতে কী হয়েছে? ঠাকুরঝি ডাক শুনে তো আমার ভালই লাগে...।’

সাগর কবিয়াল শিবানিকে ‘ঠাকুরঝি’ ডাকে, আর ওই ডাক শুনে আমার ভেতরে পুনের আগুনের মতো আগুন জ্বলে...।

তখনো আমি বাড়ির সর্বত্র আগুন দেখি না, আগুন আমার বুকের ভেতর সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গুয়ে থাকে; আমার ভেতরটা পুড়ে ছারখার করে; কিন্তু আমি টের পাই, এ-আগুন এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সময় এসেছে — একদিন হলোও তাই...।

কবিয়াল নতুন গীত বেঁধেছে। বাঁশিতে সুর তুলতে হবে। সন্ধ্যায় আমাদের উঠোনেই আসর। কৃষ্ণদাও থাকবে। বেহালা বাজায় দাদা। সাগর বিয়ে করেনি। বাড়িতে চা করে দেওয়ার লোক নেই। তাই গানের সুর তোলার আসর আমাদের বাড়িতে বসে বেশি। কদাচিত্ত বাজারে, বটতলা...।

দোতারায় টুংটাং শব্দ তুলে গলা খুলল সাগর কবিয়াল — ‘কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছো কি নয়নে...?’

বলেছি তো, আমার বুকের ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা আগুনের বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে, সাগর কবিয়ালের গান শুনে সেই আগুন বাড়ির সবখানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ঘরের বেড়ায় আগুন, ঘরের চালে আগুন — বাড়ির সব গাছপালাতেও আগুন লেগে গেল। শিবানির গায়ের রং কালো, ওর বড়ো-বড়ো চোখদুটোও কালো। অল্পবয়সী মেয়েটির জামের মতো কালো চোখ দুটি দেখেই আমি ওর

গান বাঁধতাম — ‘ব্রজ-গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে/ হেলে-দুলে ওরে সোনার কমলা’ — সেই শিবানিকে ছেড়ে, সুবর্ণকে ছেড়ে, শিবানির পেটে যেটি আছে — তাকে ছেড়ে, বেরোই কী করে? দীর্ঘদিন ধরেই নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম — শিবানি কি আমাকে আর ভালোবাসে না? আমাকে ভালোবাসলে সাপ পুষবে কেন? কিন্তু শিবানির কথাবার্তা, আচার-আচরণ, রাতের সংসার — কোথাও কোনো বিচ্যুতি আমার চোখে পড়ে না। শিবানি যেন সেই আগের শিবানিই। কিন্তু ঘরে যে-সাপ ঢুকেছে, সাপটির কথা মনে পড়লেই কোথেকে যেন আগুনের গোলা এসে পড়ে আমার মাথায়, চকিতে আমার পুরো শরীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আমি দন্ধ হই জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরের মতো। তারপরও, ঘর ছাড়ার প্রস্তুতি নিয়েও, আগুনে পুড়ে ছারখার হতে-হতেও; ঘরেই ছিলাম। কিন্তু কবিয়াল আবার গান বাঁধল — ‘ও আমার মনের মানুষ গো/ তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর/ ছটায় ছটায় ঝিকিঝিকি তোমার নিশানা/ আমায় হেথা টানে নিরন্তর’ — ওই গীত আমাকে শোনানোর পরই আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম — সব থাক, সবাই সুখে থাক, সুখভাগ্য আমার নেই; আমাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে...।

সেদিনের বর্ষণ দেখে, আমার মনে হয়েছিল — এ-বর্ষণ কালবর্ষণ; সহসা, অন্তত দু-চারদিনে ছুট দেবে না; বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার এই তো সুযোগ... !

এককাপড়ে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে, বাঁশিটি ছিল শুধু হাতে। এখনো, এই বিশ বছর পরও, শিবানিকে যখন মনে পড়ে — আমাকে

শিবানির মনে পড়ে কিনা জানি না; হয়তো মনে পড়ে, নীরবে-নিভৃতে ফেলে চোখের জল; কিংবা এতদিন আমার মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে পরছে সাদা শাড়ি; তখন আমি বাঁশিতে সুর তুলি, পথে-পথে কেঁদে বেড়াই — ‘আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি/ সুখের সে সার চোখের জলে রে...।’

তিন

আমি সাগর। সাগর কবিরাল...।

সেদিন সারাদিন ঝুমঝুটি, বিকেলের দিকে একটু ছুট দিয়েছে; আমি বাজারে কৃষ্ণদার ঘরে বসে আছি, শিবুদার জন্য অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি না-থামলে বাজারের বটতলায় বসতাম। বড়ো বন্যার বছর, বন্যার পানি নেমে গেলে বটচারাটি রোপণ করা হয়। গাছটি বেশ ঝোপাল। গাছটির পিতৃ নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়েছে এখন। এই, এতদিন পর, গাছটি যখন জোয়ান হয়ে উঠেছে, তখন আরো কেউ-কেউ দাবি করছে; তারাই নাকি রোপণ করেছে চারাটি। সে যাই হোক, আমি বাজারে এলে বটতলায়ই বসি; বটতলায় বসেই গীত বাঁধি। এখনো পর্যন্ত যতগুলো গীত বেঁধেছি, আসরে পালায় নেমে যেগুলো বেঁধেছি, তা বাদে — বেশিরভাগ গীতই বেঁধেছি এই বটতলায় বসে। সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি, আগের দুদিনও সারাদিন বৃষ্টি ছিল, বটতলায় বসার জো নেই; কৃষ্ণদার ঘরে বসেছি। কৃষ্ণদা আমার পালার আসরে বেহালা বাজায়, এমনিতে দর্জির কাজ করে। বাজারে ঘরটি তার নিজের। সন্ধ্যায় বা রাতে, মাঝে-মধ্যে তার ঘরেও বসি। নতুন-বাঁধা গীতের সুর তুলি...।

নতুন গীত বেঁধেছি — ‘ও আমার মনের মানুষ গো...।’ শিবুদাকে শুনিয়েছি গীত। সব গীত বাঁধার পরই আগে তাকে শোনাই। সেদিন শিবুদার বাঁশিতে নতুন গীতের সুর তোলার কথা। বিকেলে বাজারে আসবে বলেছে। কিন্তু বিকেল শেষে সন্ধ্যা, তারপর রাত; শিবুদার দেখা নেই। আর বৃষ্টি নামেনি। তাহলে সে আসছে না কেন? বাড়িতে কোনো বিপদ হয়নি তো...?

ভেবেছিলাম, নতুন গীত-বাঁধাকে উপলক্ষ করে শিবুদাকে নিয়ে বানুটি খাব। দাদা গঞ্জিকাসেবন করে, কিন্তু মদ ছুঁয়েও দেখে না। নতুন গীত-বাঁধা উপলক্ষে আমি জোরাজুরি করলে তবেই খায় দু-চার চুমুক। কৃষ্ণদা মদ-গাঁজা কিছুই ছুঁয়ে দেখে না। রাত বাড়ছে। ঘনঘোর বৃষ্টির রাত। বাজারের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। কৃষ্ণদাকেও দোকান বন্ধ করতে হবে। সে একাই বেহালায় সুর তোলার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। কিন্তু বাঁশি ছাড়া সুর তোলা জমে না। কেন যে এলো না শিবুদা! বোতল খুলে ঢকঢক করে বানুটি খেতে শুরু করলাম। বোতল শেষ করেই উঠব। কৃষ্ণদাকে আটকে রাখা ঠিক হচ্ছে না। আমি বাড়িতে গেলেও যা, না-গেলেও তাই। কৃষ্ণদার জন্য তার বউ বসে আছে...।

আমি খালপাড় দিয়ে হাঁটছি। মুখ ভার করা আকাশ মাথার ওপর নেমে এসেছে। আলকাতরার মতো কালো অন্ধকার পথে। কিছুই চোখে দেখছি না। আন্ডাজের ওপর হাঁটছি। শিবুদার খোঁজটা নিয়ে যাই। নতুন গীতের সুর উঠাবে, যেতে চেয়েও গেল না। হঠাৎ বাড়িতে কোনো বিপদ কিংবা কেউ অসুখ-বিসুখে পড়ল কিনা, তাই বা কে জানে...!

— ঠাকুরঝি...।

ঠাকুরঝি জেগেই ছিল। আমার ডাক শুনে একটু কেঁপে উঠল কি? তা কাঁপতে পারে। এখন তো তাকে আমার ডাক দেওয়ার কথা না...।

— সাগরদা তুমি একা? বংশীবাদক কই...?

— শিবুদা তো আজ যায়নি বাজারে। তাই খোঁজ নিতে এলাম...।

— বলো কী সাগরদা? সে তো বাজারের কথা বলে বাঁশি হাতে সেই বিকেলে বেরিয়ে গেল...।

— তাই নাকি? অবাক কাণ্ড! আমি আর কৃষ্ণদা তো তার জন্যই

এই এত রাত পর্যন্ত বসে ছিলাম। ভাবলাম বাড়িতে কোনো বিপদ...।

— না, বাড়িতে কোনো বিপদ হয়নি। বিপদ তো দেখছি তাকে নিয়েই। কী করব এখন সাগরদা...?

— অপেক্ষা করো। কোনো জরুরি কাজে হয়তো দূরে কোথাও গেছে, হয়তো ওখানে বৃষ্টি আছে এখনো, তাই বেরোতে পারছে না। বৃষ্টি ছুট দিলেই এসে পড়বে...।

শিবুদা রাতে আসেনি। পরদিন সকালে না, সন্ধ্যায় না, রাতেও না — শিবুদা এলো না। তারপর একমাস, দুমাস — একবছর, দুবছর — না, শিবুদার কোনো খোঁজ নেই। দেশের আনাচে-কানাচে, আসাম-কুচবিহার-হাওড়া — ব্যর্থ সব খোঁজাখুঁজি। ঠাকুরঝি কত পুজো যে দিলো মন্দিরে-মন্দিরে — ভগবান চোখ মেলে তাকাল না। খোঁজ মিলল না শিবুদার। একটা জলজ্যান্ত মানুষ এভাবে গায়েব হয়ে যেতে পারে — এ যে কল্পনা করাও কঠিন। বিশটি বছর কেটে গেল...।

শিবুদার নিখোঁজ-কাহিনি কিছুদিন সরব আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল গ্রামে...।

— শিবু বোধহয় গুম-খুন হইছে কোথাও...।

— দূর, কী যে কও না? শিবু কি কারো সাত-পাঁচে আছিল? গজা বেচতো আর বাঁশি বাজাইতো। সে গুম-খুন হবে কেন...?

— ব্যবসায় ম্যালা ট্যাকা ঋণ হইতে পারে। ট্যাকার তাগাদায় পলাইছে...।

— হেন্দুগো তো ম্যালা দেবতা। কোনো দেবতার সঙ্গে দেওয়ানা হয়ে মথুরা-বিন্দাবন যাইতে পারে...।

— কামরূপ-কামাক্ষা জাদুর দেশেও তো যাইতে পারে...।

— ভগবান জানে...।

— আল্লায় জানে...।

কেন জানি, আমার মনে কোনো প্রশ্ন জাগত না — শিবুদা কেন ঘর-সংসার ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল? ঠাকুরঝির মতো প্রণয়িনী বউ, চার বছরের ছেলে, বউয়ের পেটে আরেকটি সন্তান — এইসব রেখে কেউ কি সংসার ত্যাগ করে? না করতে পারে? শিবুদা তো করেছে। তাহলে আমরা বাইরের যে সত্য ও সুখ দেখি — এর সব সত্য হয়তো সত্য না, সব সুখ সুখের না। সত্যের ভেতরে মিথ্যা, সুখের ভেতরে দুঃখ-কষ্ট লুকিয়ে থাকে। শিবুদার মনেও হয়তো এমন কষ্ট ছিল, যা আমরা দেখিনি; সেই কষ্টের পাথর-ভার সহিতে না-পেরে সে গৃহত্যাগী হয়েছে...।

শিবুদার বাড়িতে আগে থেকেই আমার অবাধ যাতায়াত। এখন, ঠাকুরঝির এই বিপদের দিনে ওই বাড়িটিই যেন আমার ঠিকানা হয়ে উঠেছে। আমি কবিরাল মানুষ, গীত বাঁধি কিন্তু ঘর বাঁধিনি। সংসারকর্ম ভালো বুঝি না। তারপরও ঠাকুরঝির সংসারের অনেক কিছুই আমাকে দেখতে হয়। ঠাকুরঝির দুই ভাসুর, এক দেবর; তারা যার-যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। শিবুদার নিখোঁজের পর তারা তিন ভাইয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। আর কত? যে-ভাই নিখোঁজ, সে তো গেছেই; তার জন্য তো নিজেদের সংসার ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুরঝির দুই ভাসুর শিবুদার মতোই গজা বানায়, গজা বিক্রি করে। দেবরটা পানিয়া, হাটে-বাজারে পান বিক্রি করে...।

সেই ঘনঘোর বৃষ্টির দিনের মাসদুয়েক পর, এক সন্ধ্যায় সেদিনও ঝুমঝুটি, সুবর্ণর জ্বর, আমি ওর জন্য ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম, ঠাকুরঝি ককাত-ককাতে বলল — ‘সাগরদা, আজ রাতে তুমি এখানেই থেকে যাও...।’

ঠাকুরঝির কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, কেন, কী হয়েছে তোমার? রাতে তোমার ঘরে থাকলে রাত পোহানোর আগেই তো গাঁয়ে ঢিটি পড়ে যাবে...।

আমার কথা শুনে ঠাকুরঝির কষ্ট যেন আরো বেড়ে গেল। কী হয়েছে ঠাকুরঝির? অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সে বলল, ‘যা হবার হবে।’

লোকে যা বলার বলবে, তুমি এখন যেও না। আমার ব্যথা উঠছে। প্রচণ্ড ব্যথা। রাতেই খালাস হবে। এই বৃষ্টির মধ্যে আমি একা মেয়েমানুষ কী করব? ও মাগো, মা...।’

সুবর্ণা। সে-রাতে ঠাকুরঝি কন্যাসন্তান প্রসব করে...।

সেই সুবর্ণার বয়স এখন ষোলো, বিয়ে হচ্ছে। হিন্দু ছেলেমেয়েদের বিয়েতে কত কী যে লাগে, কত যে আচার-অনুষ্ঠান — কোনোকিছুই আমার ভালো করে জানা নেই। তারপরও প্রকৃত কন্যাদাতার মতো আমি সবকিছু গোছানোর চেষ্টা করছি। সুবর্ণাও খাটছে যথেষ্ট। ছোট বোনের বিয়ে, বাবা নেই; কোথাও যেন কোনো ঝুটি-বিচ্যুতি না-ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি আছে ওর।... আর ঠাকুরঝি? একমাত্র মেয়ের বিয়ে — আমরা তার হাসিখুশি মুখ দেখছি, কিন্তু আমরা তো জানি — বাইরে যেসব সত্য আমরা দেখি, সব সত্যই সত্য না; ঠাকুরঝি আসলে সবসময়ই কাঁদছে, কিন্তু সত্যটা এই — তার চোখের জল আমাদের চোখে পড়ে না...।

বিয়ের আর দিনসাতেক বাকি। পঁচিশে আশ্বিন লগ্ন; আমাদের গোছগাছও শেষের দিকে, তখনই ঘটল ঘটনাটি...।

দুবছর ধরে গাঁয়ের এক ছোকরা-ছেলে, মতি, কবিয়াল সেজেছে। আমার সঙ্গে আসরে পালাও করেছে দুবার। চোখের জলে, নাকের জলে কেঁদেছে। কাঁদবে না? কিছু খিস্তিখেউড় ছাড়া আর তো কিছু জানে না। ওই ছোকরা গীত বেঁধেছে, আমাকে আর ঠাকুরঝিকে নিয়ে; ছিঃ ছিঃ, এমন ধারা গীতও কোনো কবিয়াল বাঁধতে পারে — ‘ওলো শিবানি তুই পটের রানী দেখে যা আসিয়া/ সাগর কবিয়াল মরছে যে তোর প্রেমে ফাঁসিয়া...।’

আমার গুরু মধুপুরের রমেশ কবিয়াল। গুরু বলতেন, ‘সাগর, কাউকে ছোট করার জন্য, কারো মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য কোনোদিন গীত বাঁধবে না। গীত মনের আনন্দ-প্রস্রবণ। কিন্তু নিজের আনন্দের জন্য অন্যকে কষ্ট দেওয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই...।’ সেই গুরুবাক্যকে বেদবাক্য মনে করে অক্ষরে-অক্ষরে মনে চলছি। আর মতি, দুদিনের ছোকরা-ছেলে; কে-যে তার গুরু, জানি না; আসরে পালায় হেরে এমন ধারা নোংরা গীত বাঁধল? এখন এই নোংরা গীতের কারণে সুবর্ণার বিয়ে না ভেঙে যায়...?

শিবুদা বাড়িতে থাকতে, ওই বাড়িতে আমার সকাল-সন্ধ্যা ছিল না। আমি গীত বাঁধি, শিবুদা বাঁশিতে সুর তোলে, ঠাকুরঝি চা করে খাওয়ায়; এই তো ছিল অনুষ্ণ। তারপর, শিবুদা নিরুদ্দেশ; এখন ঠাকুরঝি বাঁশিতে সুর তোলে, আসরে দোহারি করে — কই, এই এতদিনে আমরা তো কখনো বিপজ্জনক নৈকট্যে যাইনি। না কথাবার্তায়, না আচার-আচরণে। আমরা পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে গেলে, সুবর্ণা আর সুবর্ণা, ওরা এখন বড়ো হয়েছে; আর কেউ কিছু বুঝুক বা না-বুঝুক — ওরা বুঝত। আমি নিশ্চিত, আমাদের পা পিছলে গেলে, আমরা ওদের হাতে একদিন না একদিন ধরা পড়ে যেতাম...।

তবে, একটা কথা বলি, মতি কবিয়ালের গীত শুনে; এই, এতদিন পর আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে — আমি কি ঠাকুরঝিকে ভালোবাসি না? ঠাকুরঝি কি আমাকে ভালোবাসে না? আমি যদি ঠাকুরঝিকে ভালো না বাসতাম তবে কেন তাকে নিয়ে গীত বাঁধলাম — ‘কালো কেশে রাঙা কুসুম...।’ আমি তো ঠাকুরঝির খোঁপার চূড়ায় জবাফুলের মতো রাঙা কুসুমই ফুটতে দেখি। ঠাকুরঝি যদি আমাকে না-ই ভালোবাসে, তবে কেন আমার বাঁধা গীত — ‘তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি/ জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী...’ সবসময়ই গুনগুন করে...।

আমরা একই গাঁয়ের বাসিন্দা। আমাদের গ্রামটিকে উত্তরে-দক্ষিণে দুভাগ করে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে খাল। বর্ষায় খালটি প্রচণ্ড খরস্রোতা হয়ে উঠলেও শুকনো মৌসুমে পানি থাকে না। যাহোক, খালের উত্তরপাড়ে হিন্দুপাড়া — পালবাড়ি, ময়রাবাড়ি, শীলবাড়ি, বেহারাবাড়ি...। দুর্গাপূজায় পালবাড়িতে কবিগানের আসর

বসে। আমি কৈশোরকাল থেকেই অনুভব করি, আমার করোটিতে গীত আছে, কখনো-কখনো বেরিয়ে আসে; আমি ধরতে পারি, বাঁধতে পারি। তো পূজায় কবিগানের আসর বসলে আমার আর নাওয়া-খাওয়া থাকে না। দিনরাত আসরেই পড়ে থাকি। বড়ো-বড়ো কবিয়াল আসেন, তবে মধুপুরের রমেশ কবিয়ালের গীত শুনলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ইস! আমি যদি এরকম গীত বাঁধতে পারতাম! তার মতো করে আসরে গাইতে পারতাম! সুযোগ পেলেই আমি রমেশ কবিয়ালের কাছাকাছি ঘুরঘুর করি। একদিন তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন — ‘তুমি কোন বাড়ির ছেলে বটে? দেখতে তো ভারি চমৎকার! ঠিক যেন শিবঠাকুর...।’

কাছেই ছিলেন গগন পাল। আমাদের বাড়িতে তাকে দেখেছি। মাকে হাঁড়ি-পাতিল দিয়েছে। আমাকেও বোধকরি চিনেছেন পাল মশাই। বললেন, ‘ও তো মুসলমানপাড়ার, জহুকাকার ছোট ছেলে...।’

‘— কী করো বাবা? লেখাপড়া? চাষবাস...?’

আমার মুখ থেকে কথা ফুটছে না। কী বলব? আমি আসলে কী করি? লেখাপড়া কিংবা চাষবাস কোনোটাই তো করি না। স্কুলে গেছি কদিন, হাইস্কুলেও উঠেছিলাম — এখন আর স্কুলে যাই না। ক্ষেত-খামারের কাজেও যেতে শুরু করিনি। আপাতত বন-বাদাড়ে, নদীর টোকে-টোকে ঘুরে বেড়াই আর গুনগুন করি — ‘সেই মেলাতে কবে যাবো...।’

‘— বলো বাবা — ভয় কীসের...?’

তখন আমার ওপর কোন জোনার ভর করেছিল জানি না — মুখ ফুটে বলে ফেললাম — ‘আমি আপনার মতো গীত বাঁধতে পারি...।’

‘— বলো কী?’ কবিয়াল রমেশ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, ‘নিজের বাঁধা একটা গীত গাও তো দেখি বাবা...।’

আমি ওঁকে মনে-মনে গুরু মেনে, ওঁর পা ছুঁয়ে গীত ধরলাম — ‘সেই মেলাতে কবে যাবো/ ঠিকানা কি হায়রে/ যে-মেলাতে গান থামে না/ রাতের আঁধার নাইরে...।’

কবিয়াল আমাকে জড়িয়ে ধরে অব্যোহাধারায় কাঁদতে লাগলেন...।

তারপর তিন বছর ছিলাম গুরুগৃহে। গুরুর পদসেবা করেছি আর গীত বেঁধেছি। ফিরে এসে, পরের দুর্গাপূজায় পালবাড়ির আসরে নাটোরের নীতেশ কবিয়ালের সঙ্গে দ্বৈরথে নামলাম। কৃষ্ণদা-শিবুদাকে দোহার পেয়েছি। ওরা আগে থেকেই মনের সুখে বেহালা-বাঁশি বাজাত। এখন আমার সঙ্গে দোহারে নেমেছে। নীতেশ কবিয়াল বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, গুণী কবিয়াল। আসর গুরুর অনুমতি দিলেন আমাকে। আমি মনে-মনে গুরু রমেশ কবিয়ালের চরণে প্রণতি জানিয়ে — ‘সেই মেলাতে কবে যাবো...।’ দিয়ে গুরু করে যেই দ্বিতীয় গীতটি — ‘ব্রজ-গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে/ হেলেদুলে ওরে সোনার কমলা/ কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি — / ওহে কুটিল কালো...।’ — ধরেছি, তখনই চোখে পড়ল — একটি কালো-কিশোরী, কচি কলাগাছের মতো সুডৌল শরীর; আসরের সামনের দিকে যারা বসেছে, তাদের পেছনে আরো কজন মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গান শুনছে; ওর কালো চোখ অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে; চোখ দিয়েই যেন আমাকে গিলে খাবে। এই প্রথম একাকী আসরে নেমেছি, কেবল ধরেছি গীত, এই সময়, এই কালো-কিশোরীর আগুনের গোলার মতো চোখের সামনে পড়ে আমি কেমন ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েছি তখন — যদি গীতের তাল কেটে যায়...!

তিন বছর গাঁয়ে ছিলাম না। তার আগে মেয়েটিকে দেখেছি হয়তো; কিন্তু ওই রাতে মেয়েটিকে চিনতে পারিনি। তিন বছরে মেয়েরা অনেক বড়ো হয়ে ওঠে। হঠাৎ দেখলে অচেনা ঠেকে। কিন্তু ওই কিশোরীর কচি কলাগাছের মতো শরীর, জামের মতো কালো বড়ো-বড়ো চোখ ভুলতে পারছি না। মেয়েটি কে...?

বিকলে শিবুদার কাছে খোঁজ মিলল — মেয়েটি ময়রাবাড়ির

সুনীল ময়রার মেয়ে শিবানি...।

তখন আমি একটি কাজ জুটিয়ে নিলাম, গজা খেতে পছন্দ করি না; খাইও না, তবু প্রতিদিনই সুনীল ময়রার বাড়িতে গজা কিনতে যাই যদি মেয়েটির দেখা মেলে...!

না, দেখা মেলে, ঠিক তা বলা যাবে না। তবে দেখি, দূর থেকে দেখি। একটি লালঝুঁটি মোরগের সঙ্গে মেয়েটির খুব খাতির। মোরগটি, যখনই ওই বাড়িতে যাই; সকালে কিংবা দুপুরে, দেখি — মোরগটি ওর পেছনে-পেছনে হাঁটছে। ও কিছুক্ষণ পরপর খুদ ছিটিয়ে দিচ্ছে মোরগটির মুখের সামনে। একদিন দেখি মোরগটি ওর কাঁধে বসে আছে, কাঁধে বসেই ডাকছে — কুকুরে কুক... কুক। তো, কালো-কিশোরী কদাচিৎ আমার দিকে তাকায়, হয়তো মনে-মনে বলে — এই কবিয়াল কত গজা খেতে পারে! প্রতিদিনই গজা কিনতে আসে? নাকি অন্য কিছু ভাবে? মনে-মনে যা ভাবে ভাবুক, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। অন্তত একবার, দূর থেকে হলেও; আমার দিকে তাকালেই হয়। আমি তো ওর চোখ দুটো দেখতেই আসি...।

কদিন পর যে-খবর পেলাম, শিবুদার কাছেই; আমার বুকে যেন অর্জুনের তির এসে লাগল, বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল বিষমাখা তির — কালো-কিশোরীর বিয়ে, বর আমাদের শিবুদা। দাদা

আমি জানতাম না বিয়ের পর, ফিরানিতে এসেই সুবর্ণা ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞেস করেছিল — ‘মা, সাগরকাকার সঙ্গে তোমার আসলে কী সম্পর্ক...?’ হয়তো স্বস্তরবাড়িতে সে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল কিংবা কোনো কানামুখা শুনেছিল — তাই সোজা প্রশ্নটা করেছিল মাকে। ঠাকুরঝি এই পাঁচ বছরে কোনোদিন কথাটি আমাকে বলেনি। সেদিন সুবর্ণার ছোট মেয়ের অনুপ্রাশন, অতিথি বিদায় করে সবকিছু গোছগাছ করতে-করতে রাত এগারোটার মতো বেজে গেছে। সুবর্ণা-সুবর্ণা যার-যার ঘরে। আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি, ঠাকুরঝির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে যাব। ঠাকুরঝি গেল কই? আকাশে সিকি চাঁদের নতুন কনের মতো ঘোমটা দেওয়া আলো। উঠোনে আবছা-আবছা অন্ধকার। ঠাকুরঝি কোথেকে হঠাৎ এসে আমার হাত ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল — ‘আমি আর পারছি না সাগরদা, আমাকে একটা পথ দেখাও...।’

হঠাৎ কান্নাকাটি কেন — কী হয়েছে আবার নতুন করে, ঠাকুরঝি যা সহ্য করতে পারছে না — এখন তো সবকিছুই প্রায় স্বাভাবিক, ঠাকুরঝি সব মেনে নিয়েছে; আমি কিছুই বুঝতে না-পেরে ঠাকুরঝির মুখের দিকে ভাবলাকান্তর মতো তাকাতেই সে বলল — ‘সুবর্ণার স্বস্তরবাড়ির লোকেরা সন্দেহ করে তোমার সঙ্গে আমার গোপন কোনো

শিবানি বউদি কেন আত্মহত্যা করল আমাদের বোধে আসে না। শিবরামদার বাঁশি
শুনিনি, বউদির বাঁশি তো শুনেছি; কী যে মন-আকুল-করা সুর! শিবানি বউদির বাঁশির সুর আর
কোনোদিনই শুনতে পাব না — এই কষ্ট বুকে পুষে যখনই বাজারে যাই, দেখি — সাগর কবিয়াল
বটতলায় বসে চোখ বুজে গান ধরেছে — ‘ভালোবেসে মিটলো না সাধ/ কুলালো না এ-জীবনে।/
হায় — জীবন এতো ছোট কেনে/ এ ভুবনে...?’

নিজেই বলল, মেয়েটির সঙ্গে নাকি তার আগে থেকেই প্রণয় আছে...।

তাই নাকি! তাহলে তো সেদিন পালবাড়ির আসরে কালো-কিশোরী আমার মুখের দিকে নয়, তাকিয়ে ছিল শিবুদার মুখের দিকে। মনের মানুষ বলে কথা...!

যাহোক, আমি কিন্তু একটি অপার সুবিধা পেলাম। শিবুদা আমার গীতের দোহারি করে। ওই বাড়িতে আমার যখন-তখন যাতায়াতে কোনো বাধা নেই। কিশোরী এখন যুবতী হয়ে উঠেছে। তো, এই যুবতী বোঝে কি বোঝে না, জানি না; সুযোগ পেলেই আমি ওর চোখের দিকে তাকাই। একদিন দেখি, শিবুদার বউ, শিবানিও তাকায় আমার চোখের দিকে। তারপর থেকে আমি শিবানিকে ঠাকুরঝি ডাকা শুরু করি...।

ঠাকুরঝিকে আমি কোনোদিন বলিনি, ঠাকুরঝি, তোমাকে আমি ভালোবাসি। ইশারা-ইঙ্গিতেও না। ওই, তার চোখের দিকে, প্রেমাকুল হরিণের মতো তাকানো পর্যন্তই আমার ভালোবাসার বিস্তৃতি। শিবুদাকে আড়াল করে আমার চুরি করে ঠাকুরঝির চোখ দেখা — এই চোখ দেখার অর্থ ঠাকুরঝি কী বুঝত, কী মনে করত, তা সে-ই জানে...।

একটা সময় এসে গেল, যখন, আমি আর পারছি না। মনে হতো এই বুঝি কোনো পাপ করে ফেলব। আবার মনে হতো প্রেম-ভালোবাসায় কোনো পাপ নেই। ঠাকুরঝিও নিশ্চয়ই আমাকে ভালোবাসে। নাহলে শিবুদার বউকে আমি বউদি না-ডেকে ঠাকুরঝি ডাকছি, সে আমাকে ভালো না বাসলে আমার ‘ঠাকুরঝি’ ডাকে সাড়া দেবে কেন...?

তারপরও যখন কোনো পথ খোলা নেই; আমি ঠাকুরঝিকে নিয়ে গীত বাঁধা শুরু করলাম। শিবুদা কি আমার বাঁধা গীতের মর্মকথা বুঝে ফেলেছিল — ঠাকুরঝিকে ভালোবেসেই আমি গীত বেঁধেছি। ঠাকুরঝিও আমাকে ভালোবাসে...।

সম্পর্ক আছে। মতি কবিয়ালের গানটা হয়তো তারা শুনেছিল। তোমার চোখে পড়েনি — সুবর্ণার বড়ো মেয়ের অনুপ্রাশনেও তারা ছিল না, আজো ও-বাড়ির কেউ আসেনি...।’

এবার ঠাকুরঝির হাত ধরলাম, এই প্রথম; বললাম, ‘ঠাকুরঝি, আমাদের সম্পর্ক — সে তো প্রকাশ্যই, গোপন কিছু তো নেই...।’

ঠাকুরঝি কাঁদছিল। কাঁদতে-কাঁদতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে-ঠোঁট রাখল। আমিও ঠাকুরঝিকে সাপের মতো শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরলাম...।

পরদিন সকালে, ঘুম ভাঙতেই কানে এলো — বাড়ির পেছনে শেওড়াগাছে বুলছে ঠাকুরঝি...।

পাদটীকা

আমরা, ২০ বছরের কম বয়সী ছেলেরা, ময়রাবাড়ির বংশীবাদক শিবরামকে কোনোদিন দেখিনি। শুনেছি সে নিরুদ্দেশ। শিবরাম কোথাও বেঁচে আছে কী মরে গেছে তাও কারো জানা নেই। সেদিন ওর বউ, শিবানি বউদি আত্মহত্যা করল। কেউ, কতটা কষ্ট পেলে আত্মহত্যা করে — কে জানে! শিবানি বউদি কেন আত্মহত্যা করল আমাদের বোধে আসে না। শিবরামদার বাঁশি শুনিনি, বউদির বাঁশি তো শুনেছি; কী যে মন-আকুল-করা সুর! শিবানি বউদির বাঁশির সুর আর কোনোদিনই শুনতে পাব না — এই কষ্ট বুকে পুষে যখনই বাজারে যাই, দেখি — সাগর কবিয়াল বটতলায় বসে চোখ বুজে গান ধরেছে — ‘ভালোবেসে মিটলো না সাধ/ কুলালো না এ-জীবনে।/
হায় — জীবন এতো ছোট কেনে/ এ ভুবনে...?’

কবিয়ালের চোখে জলপ্লাবন, কেউ তা দেখে না...!

[ঋণস্বীকার : গল্পে ব্যবহৃত গানগুলো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি উপন্যাস থেকে নেওয়া।] □



এক চিলতে আকাশ

মাহবুব রেজা



অনেকক্ষণ ধরে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে মিলন বুঝল অহেতুক দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই। পনেরো মিনিটের মতো হয়ে গেছে। বাসের দেখা নেই। বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছু দূরে ট্রামের লাইন। এক নম্বর ট্রামটা যেখানে এসে থামে বাসস্ট্যান্ডটা তার খুব কাছেই। রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রামলাইন। কাইয়াতসো থেকে মিলনকে বাসার কাছে গিয়ে নামতে হলে তাকে বাস অথবা ট্রামে যেতে হয়। হেঁটে গেলে মিনিট পনেরোর রাস্তা। বাস-ট্রামে গেলে আর কতক্ষণ? মিলন যখন কাজে যায় তখন সে খুব একটা হাঁটে না। কাজ থেকে বের হয়েও মিলন বাস-ট্রাম কিংবা মেট্রোর জন্য অপেক্ষা করে। হাঁটে না। কারণ মাস পয়লা তাকে মাসিক যাতায়াত কার্ডে গুনে-গুনে ত্রিশ ইউরো ভরতে হয়। অনেকটা ব্যাংক কার্ডের মতো দেখতে। বাস বা ট্রামে টিকেটিং মেশিন থাকে, যেখানে টিকিট পাঞ্চ করতে হয়। মেশিনটা দেখতে ছোটখাটো টিফিন বক্সের মতো। হলুদ রঙের। মেশিনের ওপর একটা



অলংকরণ : অশোক কর্মকার

লম্বা চিকন ফাঁকা জায়গা থাকে, যেখানে টিকিট পাঞ্চ করতে হয়। পাঞ্চ হয়ে যাওয়া টিকেট দিয়ে পরবর্তী পঁচাত্তর মিনিট যাত্রীবাস-ট্রামে মিলানের যে-কোনো প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে পারবে। সময় শেষ হয়ে গেলে আবার নতুন করে টিকিট কাটো। ইতালিতে ঢুকে অন্য বাঙালিরা সাধারণত যা করে প্রথম-প্রথম মিলনও তাই করত। একসঙ্গে দু-তিনটা টিকিট কিনে শার্টের পকেটে রেখে দিত। বাস বা ট্রামে উঠলে আইকার মতো টিকিট পাঞ্চ করার ছোট মেশিনটার আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকত। বাস, ট্রামের হাতলে ধরে মিলনকে সামনের স্টপেজের দিকে শকুনের মতো তাকিয়ে থাকতে হতো। টিকিট-চেকাররা পালা করে একেকদিন একেক স্টপেজে দলবেঁধে কাঁধে চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাস-ট্রাম স্টপেজে এসে থামলে টিকিট-চেকাররা ত্বরিতগতিতে সবগুলো দরোজা আগলে রেখে নিপাট ভদ্রলোকের মতো যাত্রীদের বিনীতভাবে সালুতে (শুভেচ্ছা) জানিয়ে বলে, সিনোরে, সিনোরিনা পেরফাভোরে, দাই তুও বিলিয়েন্তো (জনাব, জনাবা দয়া করে তোমার টিকিটটা কি আমাদের দেখাবে)? দূর থেকে শকুনদৃষ্টিতে টিকিট-চেকারদের দেখামাত্র মিলন ভদ্রলোকের মতো টিকিট-মেশিনে ঢুকিয়ে টিকিট পাঞ্চ করে দিত। টিকিট-চেকার দেখে মিলনের অমন তড়িঘড়ি করে টিকিট পাঞ্চ করা দেখে ইতালিয়ানরা নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে মুখ টিপে পরিহাসের হাসি হাসত। ব্যাপারটা কয়েকবার খেয়াল করে মিলনের কাছে খুব অপমানজনক মনে হয়েছিল। তারপর সে যাতায়াতের

মিলান সেন্ট্রাল স্টেশনের পাশে
কাইয়াতসো। রাস্তার দুপাশে
সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো
আমলের পাথরের বাড়িঘর।
তিনতলা-চারতলা। প্রত্যেক বাড়ির
সামনে কমন ঝুলবারান্দা। প্রশস্ত
জানালা। জানালায় ফুলের টব।

জন্য মাসিক কার্ড বানিয়ে নিয়েছে। চেকারদের সঙ্গে এরকম চোর-পুলিশ খেলা তার পছন্দ নয়। মানিব্যাগের টাকা-পয়সার সঙ্গে ভেতরে সেই কার্ডটাও থাকে। বাস-ট্রাম-মেট্রোতে উঠে মেশিনের সামনে হাতে মানিব্যাগ নিয়ে ছুঁয়ে দিলেই মেশিন শব্দ করে জানান দেয়। মিলনকে যাতায়াতের এই মাসিক কার্ড করার জন্য পরিবহন যোগাযোগ অফিসে গিয়ে কড়কড়ে চল্লিশ ইউরো গুনে-গুনে দিতে হয়েছিল। সঙ্গে নিজের স্ট্যাম্প সাইজ ছবিও। চল্লিশ ইউরো খরচ করে মিলনের এই রাজসিক হাবভাব দেখে ওর রুমের কুইচ্চামারা-আবুল বলেছিল,

মিয়াভাই হুদা কামে এতগুলি টাহা জলে ঢাললেন।

বাস-ট্রামে উইঠা চোরেগো মতো ড্রাইভারের পেছনে খাড়ায়া থাকন আমার ভালো লাগে না।

হেইল্লাইগা আপনে চল্লিশ ইউরো দিয়া কার্ড বানাইবেন! চল্লিশ ইউরোতে বাংলা টাহায় কত হয় জানেন? বলে আবুল ইউরোর সঙ্গে বাংলা টাকার গুণ করতে শুরু করল। তারপর বলল, পেরায় চাইর হাজার টাহা! ও মোর খোদা!

কুইচ্চামারার লোকজন টাকাকে টাকা বলতে পারে না। বলে টাহা। আর কথায়-কথায় বলে, ‘ও মোর খোদা’ — এসব ওদের মুদ্রাদোষ।

আবুলের বিস্ময়ভরা কৌতূহলে মিলন কোনো কথা বলল না। তবে ভেতরে-ভেতরে নিঃশব্দে বলল,

আরে পা ফাটার দল, তরা প্যাক-কাদা থিকা উইঠা আইছস। টাকা শহর না দেইখা রাশিয়া দিয়া টারজান ভিসায় ইতালি আইছস। কথাগুলো মিলনের ভেতরেই রইল। শোনা গেল না।

বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মিলনের মেজাজ নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে খারাপ হয়ে গেল। মিলান সেন্ট্রাল স্টেশনের পাশে কাইয়াতসো। রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো আমলের পাথরের বাড়িঘর। তিনতলা-চারতলা। প্রত্যেক বাড়ির সামনে কমন বুলবারান্দা। প্রশস্ত জানালা। জানালায় ফুলের টব। রঙিন বাহারি ফুলে দূর থেকে জানালাকে এক চিলতে বুলন্ত বাগান বলে ভ্রম হয়। বাড়িঘরের নিচে দোকানপাট। বার। আলিমেন্টারি। গ্রোসারি শপ। টেলিফোন-ইন্টারনেট শপ। ইন্ডিয়ান পাথরের গহনার দোকান। রেস্তোরাঁ চিনেজি। বিদেশিদের কোলাহল। ব্যস্ত রাস্তায় রোমানিয়া-আলবেনিয়া-ইউক্রেনের জিপ্সারি দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিপ্সারি মানে হলো ভবঘুরে। বাস্তহারার। স্টেশন, মেট্রোর নিচে, রেললাইনের ধারে, পার্কে, পরিত্যক্ত বাড়ি, খোলা জায়গায় এরা নিজেদের মতো কাঠ, পলিথিন, তেরপল দিয়ে অস্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরি করে কোনোরকমে থাকে। পতিতাবৃত্তি, মাদক বিক্রি আর ছোটখাটো অপরাধের সঙ্গে এরা নিজেদের জড়িয়ে রাখে।

মিলন জিপ্সারিদের এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে। পথচলতি মানুষকে নানা বিভ্রম্বনায় ফেলতে ওস্তাদ এরা। তবে অল্পবয়সী জিপ্সারি মেয়েগুলোকে দেখলে ওর ভালোই লাগে।

হঠাৎ ব্যস্ত রাস্তার মাঝখানে কোথেকে ময়লা পোশাকের এক মানুষ এসে উপস্থিত। বেশ লম্বা-চওড়া। সে করল কি, প্যান্টের চেইন খুলে জননতন্ত্র বের করে উঁচিয়ে ধরল। তারপর তীব্র বাজে ভাষায় বিদেশি অভিবাসীদের চোদোগোষ্ঠী উদ্ধার করে গালাগাল শুরু করে দিলো, বাস্তারদো তুগো জ্বৈনরি। বাই ভিয়া তুগো (বিদেশিরা সব জারজের দল। তোরা সব তোদের দেশে ভাগ) বলে মানুষটা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। দেখতে-দেখতে ব্যস্ত রাস্তার গাড়ি, হোন্ডা সব থেমে গেল।

অনাকাজ্জিত এ-ঘটনায় বাড়িঘরের জানালা, বারান্দা দিয়ে উৎসুক মানুষজন রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে যা হওয়ার তা-ই হবে। একটু পর রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। গ্যাঞ্জাম হবে। এ-ধরনের ঘটনা ঘটর সঙ্গে-সঙ্গে আশপাশের বাড়িঘরের লোকজন

নিজ দায়িত্বে পুলিশকে খবর দিয়ে দেয়। খবর পেয়ে দ্রুত বিকট আওয়াজ তুলে গাড়ির বহর নিয়ে চলে আসে ক্যারাবিনিয়েরি। বাঙালিদের কাছে ক্যারা মামু।

মিলন ঘটনা দেখে বুঝে ফেলে বাড়ি যেতে তার আরো দেরি হবে। মেজাজটা আরো একপ্রস্থ খারাপ হয়ে গেল তার। পকেট থেকে মার্লবোরো রোসসো বের করে ধরাল। রোসসো মানে লাল। ইতালিতে মার্লবোরো রোসসো খায় ছেলেরা। আর মেয়েরা খায় মার্লবোরো বিয়ানকো। বিয়ানকো মানে সাদা। মোবাইল বের করে সময় দেখল মিলন। বেলা এগারোটা বিশ। রাস্তা থেকে নেমে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল মিলন। মিলনের সারাশরীর ভারী হয়ে আছে। পা আর চলতে চাইছে না। মাথা ঘুরছে। গতকাল সন্ধ্যা ছয়টা থেকে একটানা ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত নাইট ক্লাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজ করেছে। এই বারে মিলনের কাজ হলো বারিস্তার (যে মদ বানায়) পেছনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করা। ককটেল বানানোর সময় বারিস্তার কখন কোন বোতল লাগে দ্রুত তার জোগান দেওয়া। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে মালপত্র এনে শোকেস ভর্তি করে রাখা। কখনো-কখনো বরফ শেষ হয়ে গেলে মেশিন থেকে বালতি ভরে-ভরে ছোট-ছোট চৌকোনা বরফের টুকরো আনা। কাজ শেষে আধাঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে হেঁটে সকালের প্রথম মেট্রো ধরে পত্রিকা বিলি করার কাজ সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত। এই কাজটা তাকে করতে হয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। পত্রিকা বিলি করার পর বাস-ট্রামের জন্য আবারও দাঁড়িয়ে থাকা। আজো সে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মিলন অধৈর্য হয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মিলনের মনে হয়, ও বুঝি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে একসময় ঘোড়াই না হয়ে যায়!

রাস্তা থেকে ফুটপাথে নেমে মিলন ক্রান্ত ঘোড়ার মতো ধীরপায়ে হাঁটতে থাকে। হেলেদুলে কাইয়াতসোকে পেছনে ফেলে মিলন ভিয়া বেনিনির দিকে এগোতে থাকে। সোয়া এগারোটোর সকালবেলাকে মিলনের কাছে মনে হয় যেন মধ্যদুপুর! ছোট-ছোট চারকোনা পাথর দিয়ে বানানো রাস্তা। হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তার দিকে ভালো করে তাকালে মনে হবে যেন মাটি ফুঁড়ে পাথরের টুকরোগুলো মানুষের মতো দাঁত বের করে হাসছে। মিলনের মাথা ঝিমঝিম করছে। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে আসছে। একটানা ষোলো-সতেরো ঘণ্টা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজ করার ধকলটা মানিয়ে নেওয়া কঠিন। মিলন দ্রুত পা চালায়। ঘরে ঢুকে জম্পেস একটা গোসল দিয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টার একটা ঘুম দিতে হবে তাকে। ঘুম থেকে উঠে নাকে-মুখে দুটো ভাত খেয়ে আবার তাকে ছুটতে হবে কাজে। সারারাত কাজ। তারপর ভোর সাড়ে চারটার দিকে আধাঘণ্টা নামকাওয়াস্তে বারের ছড়ানো-ছিটানো টেবিল-চেয়ারে গুয়ে-বসে বিশ্রামের নামে কোনোরকম মুরগির রানীক্ষেত স্টাইলে ঝিম মেরে থাকা। পত্রিকা বিলির কাজ শেষ করে বাড়ি।

সন্দের আগে-আগে ঘর থেকে বেরিয়ে মিলন প্রথমে বাড়ির সামনে তাবাক্কি থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কেনে, কড়া করে এক কাপ কাফে খায়। দোকান থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ভিয়া ক্রেসপির সরু রাস্তা ধরে হেঁটে-হেঁটে চলে আসে ট্রাম স্টপেজে। এতটুকু পথ পেরিয়ে আসতে অনেক বাঙালির সঙ্গে তার দেখা হয়। ইচ্ছে করেই সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। মিলনকে কেউ কিছু বললে সে শুধু মুখে হালকা একটা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে। কী হয়েছে, আজকাল মানুষের সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

কী কথা বলবে? ঘুরেফিরে এর বদনাম ওর কাছে। ওর বদনাম এর কাছে। কাঁহাতক এসব ভালো লাগে? তাই মিলন আজকাল খুব সযতনে এখানকার বাঙালিদের এড়িয়ে চলে। এদেরকে যত এড়িয়ে চলা যায় নিজের জন্য তত ভালো। এড়িয়ে চললেও মিলন কিন্তু মুখে প্লাস্টিক ফুলের মতো একটা কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে রাখে। বাঙালিদের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলার চেয়ে মুখের কোনায় ঝুলিয়ে রাখা মোনালিসা মার্কা হাসিটি সমানভাবে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

মিলনের এই হাসি নিয়ে পেছনে অনেকে কথা বলাবলি করে। তাতে মিলনের কিছু যায়-আসে না। ইতালিয়ানরা আলতু-ফালতু বা অপ্রয়োজনীয় কথা শুনে হাত-মুখ নেড়ে যেমন বলে, কী কিছু ম্যায়নে ফ্রেগা (তার কথা শুনে আমার কী বয় আকার বা ল হবে)।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশের বেশ কয়েকটা গাড়ি পুরো এলাকা ঘিরে ফেলল। পাগলমতো লোকটা এর মধ্যে ইট দিয়ে দুটো গাড়ির কাচ ভেঙে ফেলেছে। ইট হাতে নিয়ে আরো গাড়ির কাচ ভাঙবে বলে হুংকার দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করছে। গাড়ি-বাস-ভেসপা সব থেমে আছে। বিদেশি অভিবাসীদের চোদ্দোগোষ্ঠী উদ্ধার করে পাগলের অশ্লীল গালাগাল চলছে। মিলনের কান অবধি এসে কথাগুলো ভেঙেচুরে যাচ্ছে। অভিবাসীদের যন্ত্রণায় ইউরোপের মানুষরা আজ যারপরনাই বিরক্ত। বেকার সমস্যা বাড়ছে। পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অভিবাসী জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত হারে। মিলান, রোম, বোলোনিয়া, মানতোভা, ভিচেনসা, মোদেনা, পাদোভা, কোমো, লোদি, বেরগামো, ফৌজ্জাসহ ইতালির যে-কোনো শহরে-উপশহরের রাস্তাঘাটে বের হলে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ান গাড়ির মতো মোটা-তাগড়া অ্যারাবিয়ান আর আফ্রিকান মহিলারা স্বামী নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তাদের পেটে বাচ্চা, বুকে বাচ্চা, হাতে বাচ্চা, কোমরে বাচ্চা, পেছনে বাচ্চা। সামনে বাচ্চা। খালি বাচ্চা আর বাচ্চা। এসব মহিলা যেন একেকটা জলজ্যান্ত বাচ্চার গাছ, রাস্তাজুড়ে যেন তরতাজা বাচ্চাদের মিছিল। মিলনের সঙ্গে নাইট ক্লাবে কাজ করে থ্রেসিয়া। সিসিলির মেয়ে। থ্রেসিয়া ক্যাশ মেশিনটাইন করে। মালিকের খুব কাছের লোক। রাস্তাঘাটে বিদেশিদের গণ্ডায়-গণ্ডায় বাচ্চাকাচ্চা আর বিশালদেহী মহিলাদের দেখে থ্রেসিয়া মিলনের কাছে উৎসুক হয়ে জানতে চায়, মিলন, অ্যারাবিয়ান মহিলাদের কি সঙ্গম ছাড়াই বাচ্চাকাচ্চা হয়! এরা সারাদিন কাজ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে রাতেরবেলা কীভাবে সময় পায় ওই কাজ করার!

থ্রেসিয়ার কথায় মিলন হাসতে-হাসতে ওর সঙ্গে রসিকতা করে, তুমি যদি আমার ঘরের বউ হইতা তাইলে তো আমি প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা কইরা দেখাইতে পারতাম। অহন আমি তোমারে কেমনে বুঝাই বলে মিলন থ্রেসিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

থ্রেসিয়াও কম যায় না। ওর বাবা তুর্কি। থ্রেসিয়া হেসে বলল, মিলান তুই ওই কাজ অ্যারাবিয়ানদের মতো এত বেশি করতে পারবি না। মাথা ঘুইরা পইরা যাইবি। কারণ তুই হইলি ইন্ডিয়ান। ওই কাজে আরবদের ওপরে কেউ নাই বলে থ্রেসিয়া কিছুটা স্ফোভ বেড়ে অন্য ইউরোপিয়ানরা যেরকম করে বলে সেরকম করে বলল, অ্যারাবিয়ানরা যখন নিজের দেশে থাকে তখন প্রোডাকশনে যায় না। আমাদের দেশে এলে ওরা ওদের শিশুর সর্বোচ্চ ব্যবহার করে। নয় মাস ঘুরতে না ঘুরতে ওরা পেট ফেড়ে বাচ্চা বের করে! ওদের জন্যই আজ আমাদের এ-অবস্থা। আমরা বেকার। আমাদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। কাজের জন্য আমাদের জার্মান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ছুটে হয়।

কোয়েস্তো ননে জুসতো (এটা খুব অন্যায়) বলে থ্রেসিয়া পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করে, মিলান তু ছেই মুলতো জেনটিলে। মি পিয়াসে কুজি... (মিলন তুই খুব ভালো ছেলে। তোর মতো ছেলে আমি পছন্দ করি)। থ্রেসিয়ার চেহারার মধ্যে তখন পাহাড়, অরণ্য আর সমুদ্রঘেরা সিসিলিয়ান নির্মল সৌন্দর্য খেলা করে। থ্রেসিয়া মিলন উচ্চারণ করতে পারে না। প্রথম ও যেদিন বারের কাজে ঢোকে, তখন লুকা মিলনকে থ্রেসিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে থ্রেসিয়া বলল,

কমেইস্তাই মিলান (তুমি কেমন আছো মিলন)? বলে থ্রেসিয়া একটু হাসল, তু আই সেনতিতো নমে দি মিলান কুন্ডেরা (তুমি কি মিলান কুন্ডেরার নাম শুনেছ)?

মিলন যে খুব ভালো করে মিলান কুন্ডেরাকে চেনে সেটা সে বুঝিয়ে দিয়ে থ্রেসিয়াকে বলল,

প্রাগ শহরে কেটেছে কুন্ডেরার অনেক সময়। ওর লেখা পড়ে আমি দুবার প্রাগে গিয়েছি। মি পিয়াসে প্রাহা।

চেক প্রজাতন্ত্রে প্রাগকে প্রাহা বলে।

মিলনের কথা শুনে থ্রেসিয়ার চোখ কপালে উঠে গেল! থ্রেসিয়া মুগ্ধতার মিশেলে বলল,

ব্রাভো, আংকে তু ছেই মুলতো ইনতিলিজেন্টে! এরপর থেকে বারের কাজে থ্রেসিয়া মিলনকে আর দশজনের চেয়ে একটু অন্য চোখে দেখে। সময়ে অসময়ে থ্রেসিয়া এসে মিলনকে জিজ্ঞেস করে জানতে চায় ওর কাজে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কী-না।

দুই

মিলন কাইয়াতসো ছেড়ে হেঁটে-হেঁটে বাসার খুব কাছাকাছি চলে আসে। সিগারেটের দোকান দেখে মিলনের খুব কাফে খেতে ইচ্ছে করল। মিলনের এই এক বদভ্যাস। কাফের দোকান দেখলে এককাপ কাফে না খেলে তার চলে না। মাথা এখনো ঝিমঝিম করছে। সারামুখ করলার মতো তেতো হয়ে আছে। শরীর ব্যথা। পা আর চলতে চাচ্ছে না। কাফে খেলে যদি একটু ভালো লাগে। সিগারেটের দোকান মানে তাবাক্কি। এসব দোকানে কাফে, হালকা খাবার-দাবার, পানীয় পাওয়া যায়। সিগারেট নিয়ে এক ইউরোর কয়েন ক্যাশে দিয়ে এক কাপ কাফে মাক্সিয়াতো দিতে বলল, কাফে বানিয়ে দিলো অল্পবয়েসি এক মেয়ে। মেয়েটার বয়স আর কত? সতেরো-আঠারো। দেখলে মালুম করা যায়। মিলন মেয়েটাকে দেখে আন্দাজ করে নিতে পারে, মেয়েটা ইতালির কোনো অঞ্চলের। অঞ্চলভেদে ইতালির মানুষজনকে বোঝা যায়।

কাফের কাপ মিলনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মেয়েটি মিলনকে বলল,

তু ছেই ইনডিয়ানো?

মিলন মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক জবাব দিয়ে মেয়েটাকে পাল্টা বলল,

আংকে তু ছেই নাপোলিতানো!

মিলনের অনুমান শতভাগ সঠিক হয়েছে জানিয়ে গর্ব করার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি,

পেরকে নো! ইয়ো সনো নাপোলিতানো। কমে নো (কেন নয়! আমি নেপোলির মানুষ)!

মিলন কাফে খেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। অনেকটা পথ হেঁটে-হেঁটে তাকে এখন ঘরে যেতে হবে। হাঁটতেও ইচ্ছে করছে না। কিছুটা পথ গিয়ে সে পেছনে তাকাল। না বাস-ট্রামের কোনো দেখা নেই।

ব্যাপার কী?

আজ কী সপেরো (হরতাল) নাকি!

ইতালিতে বাস-ট্রাম-ট্রেনে হরহামেশা সপেরো লেগেই থাকে। চার ঘণ্টার সপেরো। ছয় ঘণ্টার সপেরো। আট ঘণ্টার সপেরো। দশ ঘণ্টার সপেরো। তবে সপেরোর আগে কর্তৃপক্ষ সবাইকে আগে থেকে জানিয়ে দেয়। সপেরোর সময় সবই চলে তবে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক কম। বাস-ট্রামের বিলম্ব দেখে মিলনের সপেরোর কথা মনে পড়ে গেল। হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির দরজার সামনে এসে সে টের পেল মোবাইলে মেসেজ টোন।

একটা মেসেজ নয়, পরপর দুটো।

মোবাইল বের করে দেখল। পরপর চারটা মেসেজ এসে জমা হয়ে আছে। ফোর মেসেজ রিসিভড। এতক্ষণ খেয়ালই করেনি মিলন, ওপেন করল সে। ঢাকা থেকে চারটা মেসেজই পাঠিয়েছে সুলতানা। একটা রাত তিনটা বিশ মিনিটে, একটা ভোর পাঁচটা আটচল্লিশ মিনিটে আর দুইটা এই মাত্র। সর্বশেষ মেসেজে সুলতানা লিখেছে, ঈদের দিনে তোমার ফোন না পেয়ে ছেলে আমাকে বলেছে, বাবাকে কি তুমি বকাঝকা করেছ? ছেলেটার জন্য ফোন দিও প্রিজ! সুলতানা।

মিলনের বাসার নিচে ফোনের দোকান। মালিক মিশরের। সঙ্গে ফ্যাক্স-ইন্টারনেট-ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন। সুলতানার মেসেজ পড়ে মিলনের একবার মনে হলো, ফোনের দোকানে ঢুকে দেশে ফোন দিয়ে কথা বলবে ছেলের সঙ্গে। ছেলেটার চেহারা মিলনের সামনে ভেসে উঠল।

এই ক-বছরে কত বড় হয়ে উঠল পুত্র!

মিলনের মাথা ঘুরছে। ঘুমে চোখ লেগে আসছে। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। এগারোটা পঁয়তাল্লিশ। তার মানে দেশে এখন বিকেল পৌনে চারটা। বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মিলন। কাঠের বড় দরোজার পাশে লম্বা চারকোনা বক্সমতো একটা বোর্ড। তাতে বাড়ির ভাড়াটীদের কলিংবেলের বোতাম-সুইচ। তার নিচে ছোট করে ভাড়াটিয়াদের নাম। সুইচের মাঝখানে ছিদ্রালা সাউন্ডবক্স। বোতাম-সুইচে চাপ দিলে ওপর থেকে সংকেত বেজে উঠবে। বাড়ির ভেতর থেকে রিসিভার তুলে বাড়ির মালিক আগত মানুষের সঙ্গে কথা বলে যদি বোঝেন যে আগন্তুক তার পরিচিত তাহলে খট করে শব্দ হয়ে দরোজা খুলে যাবে।

মিলন বোতাম-সুইচে চাপ দিতে যাবে তার আগেই দেখল খট শব্দে দরোজা খুলে গেল। মিলনের মাথাটা তখনো ঝিম মেরে আছে। দরোজার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট ছেলে মাথা বের করে উঁকি দিয়ে মুখ বের করে বাবা বলে মিলনের হাত ধরে দরোজার ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। মিলনের পা আর চলছে না।

এত দেরি করে বাড়ি ফিরলে যে! তোমার বিচার হবে। তাড়াতাড়ি ঘরে চলো বলে ছেলেটি তার হাত ধরে টানতে-টানতে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। মিলন চারতলা বাড়ির দোতলায় থাকে। তিনদিকে পাঁচ-ছয় তলার পুরনো ফ্ল্যাটবাড়ি। মাঝখানে খালিমতো জায়গা। চারতলা বাড়ির প্রত্যেক তলায় টানা চিকন বারান্দা। বারান্দার ঘিলে ঝোলানো ফুলের টব। শুকোতে দেওয়া কাপড়-চোপড়।

মিলন টের পায় ছেলেটি তাকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে টেনে ওপরে নিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় হঠাৎ মিলনের মাথাটা চক্কর মেরে উঠলে সে মাঝ সিঁড়িতে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গেল। মিলনের মনে হলো রেলিং থেকে এখুনি তার হাত ছুটে যাবে। সে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে। সিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়ল সে।

ছেলেটি তখন মিলনকে শক্ত করে ধরে বলল, বাবা তোমার খারাপ লাগছে? বসে পড়লে যে! আমি আছি না? আমার হাত ধরো বলে ছেলেটি তার হাত বাড়িয়ে ধরল মিলনের সামনে।

মিলন দেখল তার সামনে মেলে-ধরা রংধনুর ঔজ্জ্বল্যে মোড়ানো একটি হাত। সেই হাত ধরে মিলন বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর মিলন পাঁড় মাতালের মতো হেলতে-দুলতে তার ঘরের দরোজা পর্যন্ত চলে এলো। সারারাতের ক্লান্তি তার শরীরকে ভেঙেচুরে দিচ্ছিল। টলতে-টলতে লম্বা চিকন বারান্দা হয়ে মিলন কোনোমতে দরোজা পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। দরোজার কাছে এসে মিলন অবাক হয়ে দেখল তার ঘরের দরোজা বন্ধ। বাইরে থেকে তালা মারা। দরোজা বন্ধ দেখে সে একা দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মিলন পেছনে তাকাল। না, তার আশপাশে কেউ নেই। তাহলে কে তাকে নিচের দরোজা খুলে দিল? কে-ই বা তাকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নিয়ে এলো? সিঁড়িতে বসে পড়ার পর তাকে কে অমন করে বলেছিল, বাবা, তোমার খারাপ লাগছে? বসে পড়লে যে!

মিলন পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলল। ঘরে ঢুকে মিলন দরজার পাশে রাখা লম্বা সোফায় বসে কোনোমতে পা থেকে জুতা-মোজা খুলে লম্বা হয়ে মরার মতো শুয়ে পড়ল দরজা হালকা ভিড়িয়ে।

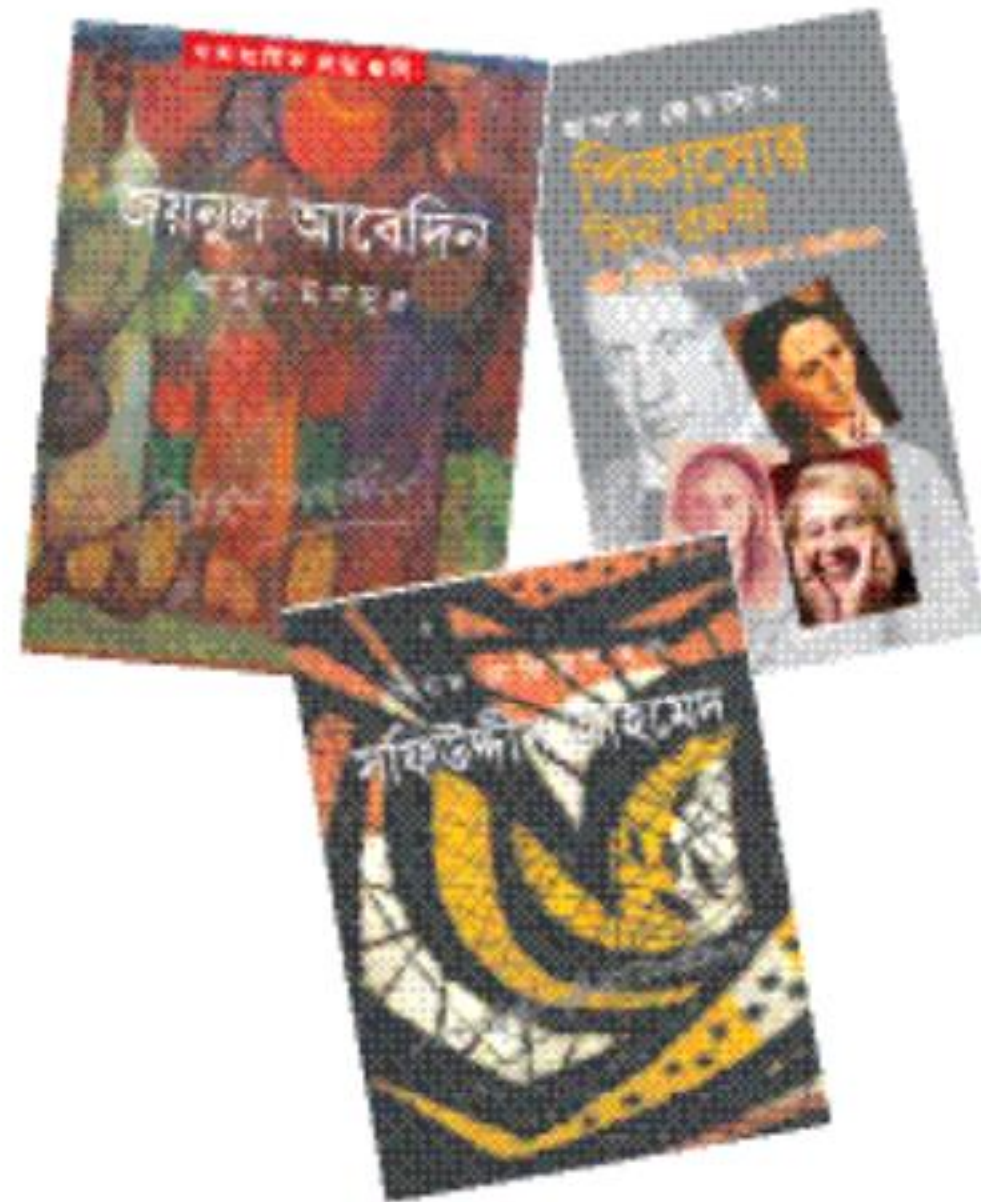
ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে ভিড়িয়ে রাখা দুই পাল্লা দরোজার ফাঁকফোকর দিয়ে এক চিলতে আকাশ এসে আছড়ে পড়ল মিলনের চোখে। □

ভালো বই হোক ভালো বন্ধু

চিত্রকলা বিষয়ক তিনটি বই



বঙ্গ প্রকাশন
৩০১, মিডিয়া এলিয়েন্স, মিউজিক সেন্টার রোড
শিল্পকলা, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন : ০১৪৪১৬৬১১১, ০১৪৪১৬৬৬০০
www.bengalpublications.com /bengal_publications



প্রতিষ্ঠান :



বঙ্গ প্রকাশন
৩০১, মিডিয়া এলিয়েন্স, মিউজিক সেন্টার রোড
শিল্পকলা, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ



অনলাইনে অর্ডার করুন :



ই-বুক :



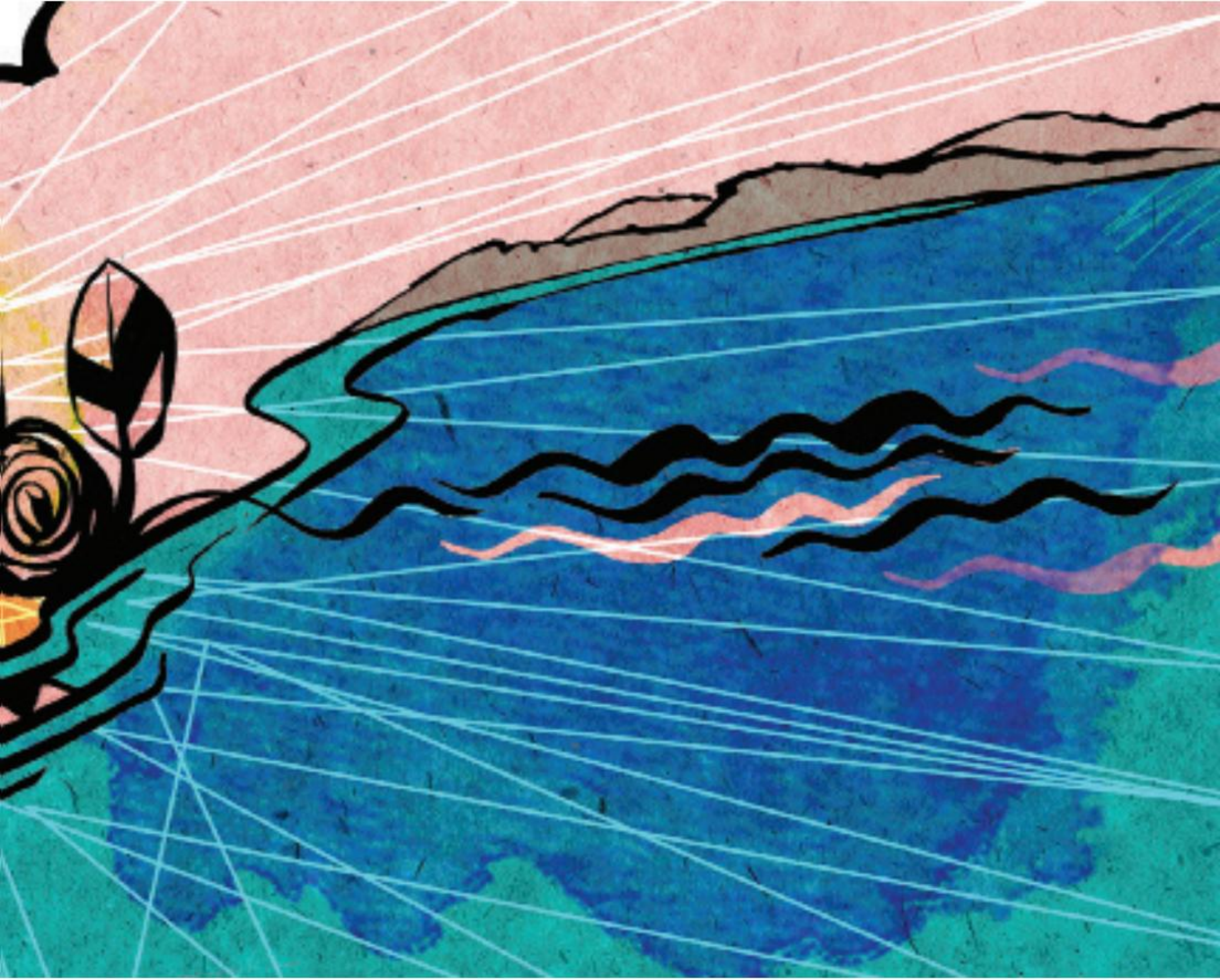


অবিশ্বাসের পিনিস

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম



বস্টিতে গোছানোর কাজ আগাতে চায় না। পায়ের তলায় প্যাচপেচে কাদায় গোড়ালি বসে, মাটির চুলার নিচ থেকে পানি উঠে। গত কদিনে প্রায় মাইল দশ ভেঙে একেবারে ধানক্ষেতের শেষে বসতভিটের গুরুতে এসেছে নদী, থেকে-থেকেই নামছে নয়নশ্রীর জমি। বর্ষার গুরুতে এবার নাই হয়ে গেল পাশের আলাদী গ্রামটা। আর একটা বানে নামবে এখানকার ভিটেমাটি, ঠিক এমন সময় ঘটনাটা ঘটল। খবর পেয়ে ঘরদোর খুলে নেওয়ার কাজ ফেলে নয়নশ্রীর মানুষ ঘোর সন্ধ্যার মুখে তারও চেয়ে বেশি অন্ধকার পানির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নদী পাড়ের মানুষ আবেগি। সকালে টেটা-বল্লম নিয়ে রাগের মাথায় যার প্রাণ সংহারে ছুটল সন্ধ্যায় তারই কাঁধে হাত রেখে পাড় ধরে গেল বেসুরো গলায় গানের কলি গুনগুন করে। তারা মুখে-মুখে ছড়া বানায় আর মাটি হারানোর সান্ত্বনা খোঁজে কল্পনায়। নীল জ্যোৎস্নায় মাঝরাতে নদীতে ভাসা অলৌকিক পিনিসের গল্প করে। অবিশ্বাসী মানুষটাও হিজল গাছের নিচে বাঁশের বেঞ্চে



অলংকরণ : আবু হাসান

বনে সেই গল্প বারবার শোনে। খেতের আল ধরে চলতে-চলতে ছুটে-আসা বুনা বাতাসে নিজের অজান্তে তাকায় নদীর দিকে। সত্যি কি কেউ আছে! যদি দেখা যায়! খলখল করা জ্যোৎস্নার ভেতর কত রকম নৌকা যায়-আসে, ছইয়ের ভেতরে কুপি জ্বলে। তারপর মানুষ ঘুমালে নদী জাগে, নৌকা কমে তখন দূর দিয়ে দু-একটা ছোট-বড় নৌকা যায় পানি কেটে-কেটে। অবিশ্বাসী বোঝার চেষ্টা করে ওর মধ্যে কোনোটা সেই পিনিস কিনা? কিন্তু আজ সন্ধ্যায় যারা জড়ো হয়েছে তাদের মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস মিলেমিশে গেছে। পদ্মার ভাঙনের পাড়ে দাঁড়ানো মানুষরা শুনল জলের ঘূর্ণির ভেতর থেকে, সাঁই-সাঁই বাতাস কেটে গুরু হয়েছে সন্ধ্যার আজান। সেই শব্দ ইস্রাফিলের শিঙ্গায় ফুৎকারের কথা মনে করায়। এমন সময়েও আসেনি শুধু একজন। অবিশ্বাস্য পরাজয় আর অভিমানে নিজের ভেতর একা সাঁতরাচ্ছে, ডুবে মরছে বারবার সে।

ঘরের দাওয়ায় ভেজা মাটির ওপর পা রেখে এক ঠায় বসে আছে সুখী। সকালেও সে গোছগাছে ব্যস্ত ছিল। গাছগুলোর জন্য মায়া হচ্ছিল কিন্তু সেসব ছাড়তে হবে অগত্যা ওপরের কয়েকটা টিন খুলে নেওয়ার কথা ভেবেছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা শেষ হয়ে অন্ধকার জমছে দ্রুত। বাতাসের বেগ ঠাহর হয় না তবে মন্দ বোঝা যায়। যখন-তখন গুরু হলে এই

অন্ধকারে নদীর ভেতরই ডুবে মরতে হবে তবু সে বসে রইল। নড়ল না, উঠল না, চেয়ারের ওপর গাঁট বেঁধে রাখা কাপড়ের পোটলাটা পড়ে গেল স্যাঁতসেঁতে মাটিতে কিন্তু সে ফিরেও তাকাল না। এতদিনের নিজের ঘরটা এক মুহূর্তে অপরিচিত হয়ে গেছে। মাণ্ডকের ঘর সুখীর নিজের হয়েছে এই বর্ষায় বছর তিন হলো। অমত ছিল না বিয়েতে তবে একটা মানুষের সঙ্গে থাকার আগে কতটুকুই বা তাকে জানা যায় আর নিজে কি চাই তাই-বা কতটা স্পষ্ট হয় মানুষের নিজের কাছেই? উঠোনওয়ালা বড় টিনের ঘর, মাঠে ফসলের জমি। দেখতে-শুনতে নখর কার্তিক না হলেও খানিকটা ঝাঁকরা চুলের ভেতর থেকে যে বড়-বড় দুটো চোখ দেখা যায় তাতে বেশ ঢক আছে। কখনো-সখনো চলতি পথে খালি গলার গান শুনে বেশ লেগেছিল মানুষটাকে। নুরুদ্দিন কাজি বিয়ের প্রস্তাব বাপের সামনে তুললে কোনো সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি সুখী। অবশ্য কেই-বা তার মতামতের তোয়াক্কা করেছে?

— বিয়ের দিনেও ঝড়-বৃষ্টি ছিল। বউ নিয়ে আসার পর এই গ্রামের মানুষজন বলেছিল, মেঘ রাশির কন্যা, কপাইলা বউ পাইছে মাণ্ডকে। মেহমানজন চলে যাওয়ার পর রাতে ঘরে ঢুকে নতুন মানুষ অবাক করে বলল। আচ্ছা বউ তোর গলায় গান আসে?

— না। কিন্তু আপনি ভালো গান শুনছি।

— মানুষের মুখে না নিজের কানে?

— এহ বইয়া গেছে। প্রস্তাব কে পাঠাইছিল শুনি?
নতুন বউকে মাণ্ডকের ভালো লাগে। কী সুন্দর কথার পর গুছিয়ে কথা বলে মেয়েটা। বউ তোরে দিয়া কবির গান করাব। ভালো ঝগড়া করতে পারবি।

সুখী চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। এমন কথা সে বাপের জন্মে শোনেনি। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে দিয়ে কবির গান করাতে চায়। তার ওপর ঘরে ঢুকেই এমন করে তুই-তুকারি করছে যেন কতদিনের পরিচয়। সুখী দ্রুত জবাব দেয়।

— আমি গান করতে যাব আর আপনি রান্না কইরা খাওয়াবেন?

— খাওয়াইলাম।

— আচ্ছা সত্যি কি আপনি এমন?

— কেমন আমি?

— বুঝতে পারতিছি না কেমন যেন তালগোল পাকায় যাইতেছে।

মাণ্ডক হো-হো করে হেসে উঠে বলে ডরাইছস? মজা করছি। এমন বউরে কেউ বাড়ির বাইরে নেয়? আয় একটা গান শুনাই তোরে। ততক্ষণে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি থেমে ফকফকা জ্যোৎস্না উঠেছে। মানুষটা সৌরবিদ্যুতে জ্বলতে থাকা বাতি নিভিয়ে দেয়। সুখী শিহরণে কাপড়টা ভালো করে জড়িয়ে বসে গায়ের সঙ্গে। কিন্তু নতুন মানুষ সেদিকে না যেয়ে উঠে ঘরের জানালা খুলে জ্যোৎস্না ঢুকতে দেয়। উঠোনে তখনো এখানে-ওখানে পানি জমে আছে। সেই পানির মধ্যে আকাশের নীল রঙা আলো থই-থই করছে। মানুষটা গান ধরে... নদীতে তুফান আইলে কূল ভাইসা যায়, দ্যাখা যায়। বুকের ভিতর তুফান আইলে মানুষ ভাইসা যায়, দেখানোর নাই উপায়... সুখী ততক্ষণে বিস্ময়ের চৌকাঠ পেরিয়েছে। বুঝতে পারে, মানুষটা অন্যরকম। প্রথম-প্রথম বেশ লাগত এসব খেয়াল। একদিন হঠাৎ দুপুরে এসেই বলে, আচ্ছা সুখী মাছ ধরছোস খালে কোনোদিন?

— ধরছি না?

— কি ধরছোস, ইলশা মাছ? বলে নিজেই হো-হো করে হাসল।

— যান খালি আজাইরা কথা, খালে ইলশা আপনি ধরছেন।

— মজা করলাম। কি মাছ ধরছোস?

— বর্ষার পানি গুরু হইলে চিংড়ি আর বাম মাছে ছাল ছাড়াইতে কাদার ভেতর আসে না? সেই সময় হাত দিলেই মাছ পাওয়া যায়। আবার অল্প পানির ভেতর গামছা দিয়া পুড়ি ধরছি কত। একটা ছড়া কইতাম তখন আমরা, অলি ছলি গাঙের ছলি/ পুড়ি মাছে লইলরে/ বুইড়া বেড়া তামুক খায়/ ফুটকি দিয়া নৈছা যায়।

— সুখীর মুখে ছড়া শুনে আমোদ পায় মাণ্ডক।

কিন্তু সংসার শুধু শব্দ কথা তামাশায় চলে না। যত পুরনো হতে থাকল সুখীর হিসাব জ্ঞান বাড়ল কিন্তু যার সঙ্গে সেই হিসাব করবে সেই মানুষটা বদলাল না। কোনোকিছু নিয়ে বেশি কথা বললেই নদীর ঘাটে যেয়ে বসে থাকে। খন্দের নেই তাও মাঝরাতে দোকান খুলে তাকিয়ে থাকে। অমন দেখলে সুখীও বিশেষ কিছু আর বলে না। তবু দিন খুব তো খারাপ যায়নি। কাল রাতেও স্বাভাবিক ছিল সবকিছু। প্রতিদিনের মতো মাটির দিকে তাকিয়ে বাড়ি ফিরেছে কি যেন বিড়বিড় করতে-করতে। আচ্ছা আপনি কী দ্যাখেন মাটিতে?

— মাটি দেখি।

— এই রাত্রে বেলা প্রত্যেকদিন মাটি দেখার কী হইছে?

— জমিন শুনি। ঘাট থিকা নামার পর পাও গুনতে-গুনতে আসি আর মাপি, নদী কতটা কাছে আইছে।

সুখী অবাক হয় বটে তবে সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে আবার নিজের কাজে যায়। ইদানীং কেন যেন মনে হয় নিজের দায় এড়াতে এসব ভাবের কথা বলে। এমন সব মারেফতি কথায় মানুষজন মুগ্ধ হয়, সেই মুগ্ধতা উপভোগ করে। আসলে ভেতরটা ফাঁপা। কী একটা তাইরে নাইরে দোকান নদীর ঘাটে আগলে বসে থাকে। আর সারাদিন খালি গাল-গল্প, গান-বাজনার ধান্দা। বাপের তালুক ছিল বলে গায়ে এমন বাতাস লাগিয়ে খেতে পারছে। কিন্তু রাজার ধনও তো ফুরায়। আর এই কি পুরুষ মানুষ! পুরুষের থাকবে নিজের নারী ও জমিনের দখলের ভাবনা অথচ এ কেমন মানুষ! শরীরে রাগ নাই, অন্ধকারে হাঁক নাই,

কোনোদিন বাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, কেউ এসেছিল কিনা? কোনোকিছু যত্ন না করলে কি তা নিজের থাকে? দু-একবার সুখী জানতেও চেয়েছে। আচ্ছা এই যে আমি সারাটা দিন খালি বাড়িতে থাকি, আপনি একটা খালি দোকানের অজুহাত দিয়া সারা দিন নদীর ঘাটে। কত কিছুই ত হইতে পারে।

— কী হইতে পারে, ডাকাইত? যা চায় সব দিয়া দিবি।

— সব ডাকাত একরকম হয় না। আশ্চর্য মানুষ আপনি।

মাণ্ডক হাসতে-হাসতে বলে... বউ আমারে ভয় দেখাস?

— সেই ক্ষমতা আমার নাই। আপনি কত জ্ঞানী মানুষ। গুনলাম ওই পাড়ে নাকি বড় প্লাস্টিকের কারখানা বানাইতেছে। কত মানুষ কাজে যাইতেছে। আপনি এই ছাতার দোকান তুইলা ফ্যাক্টরিতে কাম নিতে পারেন না?

— কে কইছে ফ্যাক্টরির কথা?

— আপনার বন্ধু আইছিল খবর নিতে।

— তাই ডাকাইতের ডর দেখাইলি? সুখী বেগম শোনে, এই যে ফ্যাক্টরি হইতেছে এইটা নদীর মরণ। সাদা পানি কালো হবে, দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়ায় পড়ব। যারা কাম করে তাদের শরীরে চামড়া পইচা উঠব।

— আপনি ত সব জাইনা বইসা আছেন।

— আরো গুনবি? নদীর পাড় ভাঙব।

— সে তো প্রতিবছরই কোনো না কোনো গ্রাম তলানোর খবর পাই। ফ্যাক্টরির দোষ দেন কেন?

— আমার দোস্ত তোর মাথাটা খাইছে। এসব ফ্যাক্টরি বানাইলে নদী বাঁচানো যায় না। আর শোন পানিরও রাগ আছে। সে প্রতিশোধ নিবে না?

— কী সব কথা আপনার? স্রোত বাড়লে বর্ষাকালে এমনি ভাঙন হয়।

— তোরে বোঝানো যায় না। পানির ভেতর যিনি আছেন তিনি মানবেন না।

— কে আছে পানির ভেতর?

— আছেন একজন। মেলা রাইতে সে পিনিস নিয়া বাইর হয়। দুনিয়ার সমস্ত পানির মালিক সে। আল্লাহপাক তারে দায়িত্ব দিছেন।

— হ আর আপনারে আইসা বলছে সেই খবর।

— বলছেই তো। সবাইরে তো কয় না। কয়জন বুঝে সেই কথা? এই যে নদীর ধারে বইসা থাকি, এমনি? তারে দেখতে ইচ্ছা করে। পাপী বান্দা আমি, ওপরওয়ালার সঙ্গে কোনোদিন দ্যাখা হইব কি না জানি না কিন্তু সেই তাঁর উছিলায় যদি স্রষ্টার রূপ দর্শন করা যায়।

— আপনি শরিয়ত-বেদাতি কথা কন। ধর্মে পয়গম্বর ছাড়া কাউরে মানা কিন্তু শিরক।

— বাপ-দাদার আমল থিকা তারও পূর্বপুরুষ কত কত কাল ধইরা যারা নদীর সঙ্গে বুইঝা আসতেছে, তুফানের ভেতর নৌকা নিয়া বাইর হইছে আবার নদীই তাগো বসতের মাটি দিছে, ফলমূলের গাছ দিছে, বাতাস দিয়া ভাসায় নিছে তারা ভাঙনের মুখে শিল্পি দিয়া মানত কইরা নদীর পথ ঠেকাইছে সেই বিশ্বাসের কোনো দাম নাই? আমি তো মানি পানির নিচে যে আছে তারে উনিই পাঠাইছেন উছিলা দিয়া।

সুখী অবিশ্বাস আর আত্মহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

— তার নাম হজরত খোয়াইজ খিজির। তিনি পানির নিচে বইসা সব দেখতেছেন। তুই যদি হুদাই পানি নষ্ট করোস তাইলেও সে হিসাব রাখবে। রোজ হাশরের মাঠে পানি-পানি কইরা চিৎকার করবি কিন্তু পাবি না।

— টিউবওয়েলের পানির মধ্যেও আপনার খোয়াইজ খিজির আছে?

এমন ব্যঙ্গ সুখীর কাছ থেকে আশা করেনি মাণ্ডক। আহত হয়ে বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তুই আসলে আমারে কোনোদিন বুঝোস নাই।

— কেমনে বুঝলেন?

— এই যে তামাশা করলি। বুঝলে অন্তত আমার মতো কইরা

আমার ভাবনা ভাবতি।

— আচ্ছা হইছে বাসি নাই। এখন বলেন, আপনার খোয়াইজ খিজির আর কী কী করছে?

— সে কিছুই করে নাই, সে শুধু এক ফোঁটা পানিরও হিসাব রাখে। এইগুলো সবই বিশ্বাসের ব্যাপার। নদী ভাঙনের সময় আগে মুরকির খোয়াইজ খিজিরের নামে মানত করত। অনেক জায়গায় কিন্তু সত্যি একেবারে পাড়ে আইসা আচমকা ভাঙন থাইমাও গেছে।

— ইহ দুনিয়া ভাইদা তোলপাড় হইলো আর উনি আছেন ওনার বিশ্বাস নিয়া।

— বিশ্বাসই তো সব বউ। এই যে এতটুকু দুইটা চোখ দিয়া কত বড়-বড় মাঠঘাট দ্যাখোস, আকাশ দ্যাখোস, কেমনে দ্যাখোস? তোর চোখ কি এইগুলার চেয়ে বড়?

— ঘরের ভেতর বান আইসা ভাসায় নিলে আর এইসব মারেফতি জ্ঞানে কাম হবে না।

— এইভাবে কথা কেন কস তুই? বলে ব্যথিত চোখে তাকিয়ে রইল মাণ্ডক।

সুখীরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে দিনে-দিনে। সংসারে নতুন মুখ আসল না, মানুষটার খেয়ালিপনা কমল না। এখন ঘর-বাড়ি সব ভেসে যাওয়ার মুখেও সে আছে তার আকাশ-বাতাস ভাবনা নিয়া। সুখী একটু রাগ নিয়েই বলল —

— নদীর ভাব-গতি ভালো না। আপনি সময় থাকতে সব সরায় নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

— এই গ্রাম ভাঙব না।

— কেমনে বলেন এই কথা? আলাদীপুরা নাই হইয়া গেল চোখের সামনে, তাও বলেন?

— কই কারণ ওই গ্রামে একজনও ছিল না যে তারে বিশ্বাস করছে। বিশ্বাস কইরা কান্নাকাটি করছে।

— আপনে থাকেন আপনার বিশ্বাস নিয়া। আপনার দোস্তরে খবর দিছি ভ্যান ঠিক করার। মনোহরদি নিয়া তুলব যা-যা বাঁচানো যায়।

— তুই ঘরের মানুষ আমার বিশ্বাস নষ্ট করবি? আমি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

— কইলাম তো আপনার এত বিশ্বাস থাকলে বইসা-বইসাই আটকান ভাঙন। আপনেরে দিয়া যে কিছু হবে না, সেইটা আরো আগে বুঝলে ভালো হইত। মানুষের সঙ্গ থাকাও কিছু পরিবর্তন হয়। আপনার হয় নাই।

এই বাক্য শোনার সঙ্গে-সঙ্গে মাণ্ডকের চেহারার রং বদলে গেল। সে বিশ্বাস করতে পারছে না, সুখী কবে ভেতরে-ভেতরে এমন পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে গেছে? কে বানাল তাকে সংসারি? মাণ্ডক চাপা গর্জনে বলল, কী বুঝাস তুই?

— আপনি দেখতেছেন না সবাই নিরাপদে যাইতেছে? বন্ধুরে দেইখা কিছু শিখেন। সে ফ্যাক্টরিতে কাম নিছে। ঘর-বাড়ি সরানোর কাজও শেষ।

— সুখী এই ঘরে সন্তানাদি নাই। কার জন্যে এত সংসারি হইছিস তুই? অন্যের গায়ের রঙিন কাপড়, ফ্যাক্টরির বেতনের মোবাইল ফোন দেইখা চোখে রং লাগছে? আমি খালি এই টিনের একটা ঘর নিয়া ভাবি না, ভাবি পুরা গ্রামটা নিয়া।

আপনি যাই বলেন, আমার ভাবনা আমার কাছে। কাউরে দেইখা যদি নিজের সংসার আগলাইতে ইচ্ছা হয় সেইটা অন্যায় না। যা ইচ্ছা ভাবেন আপনে। আমি সরানোর ব্যবস্থা করতেছি। দুপুরের দিকে তাদের আলাপ হওয়ার পরপরই চারপাশে অন্ধকার করে ভেঙেচুরে বাতাস গুরু হয়েছে, তারপরই বৃষ্টি। বৃষ্টিতে পানি জমল উঠানে। আশ্চর্য মানুষটা কেমন নির্বিকার বসে রইল বারান্দার খুঁটির সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে। কিছুক্ষণ পর উৎফুল্ল হয়ে ডাকল সুখীকে। সুখী ততক্ষণে গোছানোর কাজ সারছে ঘরের ভেতর।

— সুখী দেখ-দেখ ব্যাঙ আইছে আম গাছটার নিচে, আর দ্যাখ ওই যে কলমি গাছের পাতার ডগায় একটা লাল ফড়িং বসছে। দেখতেছোস?

— দেখছি, তাতে কী হইল?

— এইসব হইলো এই গ্রাম ভাঙব না তার আলামত। মানুষ না বুঝলেও পশুপাখি টের পায়।

সুখীর রাগ এতক্ষণে সীমা ছাড়িয়েছে। সেই যে মানুষটা এক বিশ্বাস নিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে, গোছগাছের একটা কাজেও হাত দিলো না। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, আপনি আসলে একটা স্বার্থপর মানুষ। নিজের সুখ ছাড়া কিছু বুঝেন না, গতরের কাম করতে আপনার ভালো লাগে না তাই এইসব ফাও কথা কইয়া সইরা থাকেন। যাওনের সময় দেখব আপনি কী করেন। কথা শেষ হওয়ার আগেই খবর এলো, মাণ্ডকের বন্ধু দৌড়াতে-দৌড়াতে এসেছে নদীর খবর নিয়ে। পদ্মা একেবারে ধারে আইসা পড়ছে। যা-যা নেওয়ার এখনি সব নিয়ে না সরলে আর কিছুই বাঁচানো যাবে না। সুখী, মাণ্ডককে তাড়া দিতে-দিতে নিজেই দু-একটা জিনিস হাতে নিয়ে তুলতে চাইল দোস্ত। সেই জানাল দক্ষিণ দিকের বুড়ো হিজল গাছটার অর্ধেক শিকড় পানিতে চলে গেছে, অর্ধেকটা মাটির সঙ্গে। সুখীও এই খবরে দ্রুত জিনিসপত্রগুলোর ব্যবস্থা করতে চাইল। চালের টিনগুলো আর খোলার সময় পাওয়া গেল না, গরু দুটোর দড়ি খুলতে হবে, সব মাল ভ্যানে তুলতে হবে এদিকে আকাশ ছাইরঙা হয়ে গেছে। মাণ্ডককে এবার অনুনয়ের সুরে বলল সুখী।

— আপনার দুইটা পায়ে ধরি আমি, ভাবের ভেতর থিকা বাইর হন দ্যাখেন সবাই যাইতেছে।

— মাণ্ডক এতক্ষণ সব দেখছিল এবার ঘোর লাগা কণ্ঠে বলল, সুখী একটু শিল্পি রানতে পারবি?

— শিল্পি দিয়া কী আমার ফয়তা খাওয়াবেন আপনে? খাওয়ানোর মানুষও পাবেন না গ্রামে।

— থাক সুখী, অবিশ্বাসীর হাতের শিল্পিতে হবে না। চাল কোথায়?

— ঘরের চাইলে হয় না অন্তত দশ বাড়ির মুঠা চাউল লাগে।

— এখন আমার একলারটাতেই হবে।

মানুষটা নিজে ভিজে চুলো জ্বালাল কসরত করে। রান্না করল এক ঘরের চালের শিল্পি। সুখী ততক্ষণে বেশ কিছু জিনিসপত্র তুলে ফেলেছে। মাণ্ডকের সেদিকে কোনো হুঁশ নেই। সে কলাপাতা কেটে নিয়ে এলো। তারপর সেই পাতায় শিল্পি ঢেলে সুখীর সঙ্গে কোনো কথা না বলে চলে গেল নদীর ঘাটে। সুখী হতবাক হয়ে গেছে, তার ধারণা ছিল মানুষের প্রাণের মায়া সবচেয়ে কঠিন মায়া। গোছগাছে হাত না দিলেও শেষ মুহূর্তে মাণ্ডক তার সঙ্গে ঠিকই ভ্যানে উঠবে। এদিকে বাতাসের আওয়াজ বাড়ছে, নারিকেল গাছগুলো দুলতে-দুলতে হেলে যাচ্ছে এমনকি এখান থেকেই নদীর ডাক শোনা যাচ্ছে। মানুষটা কিনা ঠিক এই মুহূর্তে সব ফেলে সেই নদীর দিকেই ছুটল। সুখী একবার জিনিসপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে ছুটল খেয়ালি মানুষটার পিছু-পিছু। কিছুদূর ডাকতে-ডাকতে হাঁপিয়ে ফিরে এসেছে। ভ্যানওয়ালার এতক্ষণ বসে থাকার সময় নাই। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সে চলে গেছে। তখন থেকে সুখী ঘরের দরজার সামনে বসে আছে।

ঘাট থেকে এসে একজন খবর দিলো, মামি কি সর্বনাশ হইতেছে। এই বানের পানির ভেতর মামা হাতে যেন কি নিয়া নদীতে নাইমা গেছে। কত নিষেধ করেছে, সবাই সে থামে নাই। সুখী কিছুই বলল না। যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল। ঘাট থেকে খবর নিয়ে যে এসেছিল সে অবাক হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে গেছে দৌড়ে। অন্ধকার জমাট বেঁধেছে তাও তো অনেকক্ষণ। নদীর পাড় থেকে মানুষজন দু-একজন করে ফিরছে। একজন এসে জানিয়ে গেল, ভাঙন থেমেছে। সেই বলল, কী আশ্চর্য, এইরমও হয়! গাছের গুঁড়িটা অর্ধেক হয় ভাসতেছে। আকস্মিক নদীর বান সড়সড় কইরা নাইমা যাইতেছে ভাটার দিকে, কী মনে হইল জানেন ভাবি? মনে হইল বিশাল বড় একখান নৌকা যাইতে-যাইতে হঠাৎ মুখ ঘুরায়া নিল অন্যদিক, এমন জীবনেও দেখি নাই। কেমনে হইল এমন আশ্চর্য ঘটনা। নদীর গতক দেইখা বিশ্বাস হয় এই যাত্রায় নয়নশ্রী মাফ পাইছে। তার মুখের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল সুখী। মানুষটার কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছে না। ফিরলে তার কাছেই আসত তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে মানুষটা এখনো আছে, হয়তো শুধু বিশ্বাসের ভেতর আছে। □



বর্ণিল ক্যানভাস

ওয়াহিদা নূর আফজা



বারিধারা তখনো থরে-থরে দালানকোঠা, বিপণিবিতান, রেস্টুরেন্ট আর বিদেশি দূতাবাসে ভরে ওঠেনি। বিকেল হলেই আমরা বান্ধবীরা, মূলত তালাত আর আমি, শৌ-শৌ করে সাইকেল ছুটিয়ে আমেরিকান দূতাবাস পর্যন্ত ছুটে যেতে পারতাম অনায়াসে। তারপর হঠাৎ করে জানি কী হয়ে গেল। খালি জায়গাগুলোর গর্ভ চিরে দুমদুম করে এক-একটা প্যালাস তৈরি হলো। নিরিবিলি শান্ত-স্নিগ্ধ এলাকাটি ভরে গেল লোকে-লোকারণ্যে। তাও ভালো আমাদের পাশের প্লটটি অনেকদিন খালি ছিল। শেষ পর্যন্ত সেখানে যখন একটা লাল ইটের দোতলা বাড়ি উঠল তখন আমার এ-লেভেল দেওয়ার আর ছয় মাস বাকি। বাড়িটার নাম নিভৃতি। কিন্তু আমরা চিনলাম হাই সাহেবের বাড়ি বলে। সে-সময়টা আমি বড্ড একা। খুব লাজুক আর অন্তর্মুখী। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আর তেমনটি যাই না। ওদের



হাইচাই, লেইট নাইট পার্টি, সিসা ক্লাব, আড্ডা সব কিছুতেই আমি বড় অর্বাচীন। তাই গোত্রছাড়া। একমাত্র বান্ধবী তালাত। ও একটা পার্টি অ্যানিমেল। আমার জন্য ওর সময় খুব একটা নেই। আমার সেই একাকিত্বের সময়টাতে প্রথম সে-ছেলেটিকে দেখি। হাই সাহেবের বাড়ির দোতলা গাড়িবারান্দার ওপরে। বুঝলাম দুবাড়ির দোতলায় আমরা দুজন পাশাপাশি ঘরের বারান্দা। আমাদের ঘর-বারান্দা মুখোমুখি। আমরা দুজনই একই বয়সী। কিংবা হয়তো আমার থেকে একটু বড়ই হবে। সে দারুণ ফিট। বারান্দায় বেরোলে তার সঙ্গে দেখা হতো। কিন্তু কখনো কথা হতো না। কেন? বোধহয় আমরা একই মাত্রার অহংকারী ছিলাম। কিংবা ওর হয়তো কোনো আগ্রহ ছিল না। বিপরীত লিঙ্গ দেখলে কথা বলা যাবে না, এরকম কোনো মূল্যবোধের সঙ্গে তো আমরা পরিচিত নই। গ্রিন হেরাল্ডে ও-লেভেলের সময়েও তো শর্টস পরে ছিলুর সঙ্গে টেনিস খেলতাম। ছিলু ছিল আমার প্রথম ক্রাশ। নাচ জানা কোনো ছেলেকে বিশ্বাস করতে নেই। ছিলু এখন নাজিফার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো ছেলেটি ম্যানারাতে পড়েছে। ছেলেটির মা কোনো হালাক্কা পার্টির দলনেত্রী, যেখানে মহিলারা হিসাব কষে বলছেন কে কতবার হজে গেলেন কিংবা কার কতটা আধুনিক সৌদি মডেলের বোরখা আছে, আর আছে দুবাই থেকে সদ্য কেনা ডায়মন্ডের সেট। নতুন পয়সা হওয়া এখনকার বড়লোকদের যা হচ্ছে আরকি! সেদিন আব্বুর কথা শুনে

আব্বুর যত ভয় এর মধ্যে
যদি একটা ভুল প্রেম-ট্রেন
করে বসি। হয়তো ওকে
নিয়েই ভয়টা কাজ করে।
তাই আজকাল প্রায়ই ডাইনিং
টেবিলে হাই সাহেবের
পরিবারের প্রসঙ্গ চলে আসে।

অবশ্য তা মনে হলো না। হাই সাহেবদের দুই প্রজন্মের ব্যবসা। ওনার প্রথম স্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে পিএইচডি করেছেন। ছম প্রথম স্ত্রী এখানে একটি প্রশ্ন থাকে বইকি। কিন্তু তাই বলে কি তার কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে নেই? তাহলে কি ধরে নেব সে আসলে গে? একজন সমকামী? আমার প্রতি কোনো আকর্ষণবোধ করে না? এই চিন্তাটা অবশ্য তালাত আমার মাথায় ঢুকিয়েছে। একদিন আমার ঘর থেকে ওকে দেখে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, ‘দেখ, দেখ, সাফা, গে’দের মতো বাম কানে একটা দুল পরে আছে।’ নানারকম চটকদার কথা বলে তালাত প্রায়ই ওভারস্মার্ট ভাব করে। তাই ওর কথা আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না। তবে এ-কথাটি বিশ্বাস করলাম। আমার প্রতি ওর এত নিস্পৃহ আচরণের একটা ব্যাখ্যা দরকার ছিল। অন্তত আমার অহমকে একটা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হলেও। তা সে যা হয় হোক — তারপরও কি আমরা বন্ধু হতে পারি না? শুধুই বন্ধু? সেও তো আমার মতোই। কোনো হই-হুল্লোড় দলবাজিতে নেই। নির্জনতায় বিশ্বাসী। ভোরবেলায় বারান্দায় এসে যোগীর মতো যোগব্যায়াম করে। আর বাদবাকি সময় যতটুকু দেখি হাতে থাকে বই। কখনো ওকে হাতে বই ছাড়া দেখিনি। কী অত পড়ে? অথচ সেদিন আবু ডাইনিং টেবিলে বলছিলেন যে, হাই সাহেবের ছেলেটা নাকি কোনো ডিগ্রি না নিয়েই লন্ডন থেকে ফিরে এসেছে। গত এক বছর ধরে বাসাতেই বসে আছে। তারপর আক্ষেপ করে বললেন, যাদের অফুরন্ত সুযোগ তারা অবলীলায় সে-সুযোগটা নষ্ট করছে। আর যাদের হাজারটা অসুবিধা রয়েছে দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত তারাই লেখাপড়াটা শেষ করছে। আবুকে অনেক কষ্ট করে ওপরে উঠতে হয়েছে। আমাদের সে-গল্প প্রায়ই শুনতে হয়। আমি মাথাটা নিচু করে ছিলাম। চোখাচোখি হলেই আবু হয়তো আবার আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে শুরু করবেন। তিনি চান আমি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ি। তারপর আবু একটা পত্রিকা বের করবেন। আমি হব সেটার সম্পাদক। আর ভাইয়া দেখবে গার্মেন্টসের ব্যবসা। আশির দশকে আবু এটি শুরু করেছিলেন। সে-সময় আমাদের খুব অভাব আর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে এর পালে হাওয়া লাগে। ঠিক হয়ে আছে ভাইয়া এর হাল ধরবে। এর মধ্যে আমি নেই। সহজ হিসাব। মসনদ পাক্কা। এ-লেভেলের পর লন্ডন যাচ্ছি লেখাপড়া করতে তা ঠিকঠাক হয়ে আছে। আবুর যত ভয় এর মধ্যে যদি একটা ভুল প্রেম-ট্রেন করে বসি। হয়তো ওকে নিয়েই ভয়টা কাজ করে। তাই আজকাল প্রায়ই ডাইনিং টেবিলে হাই সাহেবের পরিবারের প্রসঙ্গ চলে আসে। শিল্পমস্ত্রীর সঙ্গে হাই সাহেবের নাকি তেমন ভালো সম্পর্ক যাচ্ছে না। বি-ঘরানার লোক বলে এ-ঘরানার পার্টিকে ঠিকমতো চাঁদা দেননি। সামনেই নাকি পত্রিকাগুলোতে ঋণখেলাপির তালিকায় ভদ্রলোকের নাম উঠবে। তা ঋণখেলাপি এ-বিষয়টি আবুর কাছে খুব একটা বড় বিষয় নয়, পত্রিকায় নাম ছাপানোটা ব্র্যান্ডনেমের ওপর ব্রণের কালো দাগের মতো। হাই সাহেবের প্রথম স্ত্রীর প্রসঙ্গও আসে। সে-মহিলার মৃত্যু নিয়ে বাজারে অনেক গুজব আছে। ছেলেটি হচ্ছে সেই প্রথম স্ত্রীর সন্তান। গুজবটা কিন্তু মারাত্মক রকমের ভয়ংকর। বুঝতে পারছি আবু আমাকে খুব পরোক্ষভাবে সাবধান করে দিচ্ছেন। এতকিছুর দরকার ছিল না। ছেলেটির আমার ওপর কোনো আঘাত নেই। বরং আবু এতসব গল্প বলে ওর ওপর, ওর প্রতি আমার আঘাতটা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক আঘাত নয়, এক ধরনের মায়া। আহা, ওর তাহলে নিজের মা নেই! হাই সাহেবের বর্তমান স্ত্রী খুবই সুন্দরী। একসময় ভদ্রলোকের সেক্রেটারি ছিলেন। এখানেই রহস্য আরো ঘোরাল হয়েছে। এতসব রহস্য ছাড়িয়ে আমার শুধু মনে হয়, আহা! এজন্য বুঝি ও এমন একা। সবার থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখে। এখন তো

ভার্সিটিই ছেড়ে দিয়েছে। মাঝেমধ্যে কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। যায় কোথায়? অবশ্য ছেলেমানুষ। ওরা তো যে-কোনো সময়ই ডানা মেলতে পারে। পুরো আকাশ জুড়ে উড়ে বেড়াতে পারে। তারপর যখন ইচ্ছা হবে তখন ডেরায় ফিরবে। আচ্ছা মাঝেমধ্যে আমাকে নিয়ে উড়তে পারে না? আমি একদমই বিরক্ত করব না। শুধু পাশে থাকব। বিশাল আকাশটাকে একটু কাছ থেকে দেখব। একদিন রাতে ছাদে গিয়ে দেখি ওদের ছাদের ওপর সে উপুড় হয়ে শুয়ে অন্ধকার আকাশের তারা দেখছে। একদম ধ্যানস্থ মূনির মতো নিশ্চুপ হয়ে তারা দেখা। এই নাগরিক জঙ্গলে আমাদের দুছাদের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। একটু ডাকলেই সে শুনতে পেত। কিন্তু এত কাছাকাছি থেকেও দূরত্ব যে অসীম। কীভাবে এই অপরিচয়ের অসীমতা ভাঙা যায়? গে না হলে লন্ডনে চলে যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে একটু এপেটাইজার টাইপের প্রেম করলে মন্দ হতো না। এরকম ধ্যানমগ্ন ছেলেরা খুব গভীর হৃদয়ের হয়। হয়তো-বা সে কবিও। এই মুহূর্তে যদি ওর পাশে থাকতে পারতাম তাহলে হয়তো আমাকে অনেক কবিতা শোনাত।

দুই

সেবার শীতের শেষে পাহাড় কাঞ্চনপুরে চলে গেলাম। সেখানে আবুর একটা বাগানবাড়ি আছে। তার পাশ দিয়ে তুরাগ নদ বয়ে যাচ্ছে। শান্ত-সম্মোহিত শ্রোত সেখানে ধীরে-ধীরে বয়। গোখুলির সময় হরেক রঙের পাল তোলা নৌকা আর দূর থেকে ভেসে আসা মাঝির ভাটিয়ালি সুর পরিবেশটাকে সম্মোহিত করে তোলে। অনেকটা আমার বাড়ির পাশের বাড়ির পড়শির মতো। হায়, সব আরশিনগরের বাসিন্দাকেই কেন মরীচিকা হতে হবে? ধরাছোঁয়ার বাইরে। মায়াবী গোখুলি খুব দ্রুতই রূপ করে অন্ধকার হয়ে যায়। আমি ফিরে আসি বাংলাতে। অনেকটা দিন কয়েক থাকব এখানে। আবুকে বললাম নিরিবিলি কোথাও যেতে চাই। পড়াশোনায় মনঃসংযোগের জন্য। ইদানীং আমারও খুব ধ্যানস্থ হওয়ার ইচ্ছা জাগে। হয়তো ওকে দেখে এমনটা হয়েছে। ঢাকায় থাকলেই বন্ধু-বান্ধবদের হুল্লা চাইলেও খুব একটা এড়ানো যায় না। বিশেষ করে তালাত আমাকে প্রায়ই ডলের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছে। রেস্টুরেন্টে খেতে যাও তো নয় দুম করে কলকাতা গিয়ে হিন্দি মুভি দেখে আস। এবার ওরা চেপে ধরল দুবাইয়ে যাওয়ার জন্য। একটা বড় কনসার্ট আছে। আমার ভয় এতসব কিছু করলে পড়শির থেকে দূরে সরে যাব। পড়শি হয়তো জানেই না যে, সে আমাকে কীভাবে প্রভাবিত করছে। এখন আমার খুব বই পড়তে ভালো লাগে। স্ট্যান্ডিনবেক আর হেমিংওয়েতে নেশা হয়ে গেছে। কিংবা গভীর রাতে ছাদে চলে যাই আকাশের তারা দেখতে। দুদিন ধরে ওকে দেখছি না। আর তাতেই আমার উধাও হওয়ার ইচ্ছেটা জাগল। পাহাড় কাঞ্চনপুরের এ-বাংলোটাতে মামণি আসেন না। আবু আসেন। আবুর জীবনেও অনেক রহস্য আছে। সেসব নিয়ে মাঝেমধ্যে মামণির সঙ্গে আবুর খুব ঝগড়া হয়। বিশেষ করে আবুর একটা লম্বা বিদেশ ট্যুরের পরে। আমি সেসব না-শোনার ভান করি। আবুর কাছ থেকে দামি কোনো উপহার পেয়ে মামণিও আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। আমরা আসলে সবাই এক অদ্ভুত নিরাপত্তার শেকলে বাঁধা পড়ে আছি। পাহাড় কাঞ্চনপুর তাই আমার কাছে দুদিনের মুক্তি। খুব নিরিবিলি এখানটা। চারপাশে এখনো ছোট এক টুকরো বন জেগে আছে। দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ালে শান্ত-শ্লিষ্ট তুরাগ নদের রূপালি শ্রোত কুলকুল শব্দে বইতে দেখা যায়। তার ও-পাশে বাসন্তী বাতাসে ঢেউ-খেলানো সবুজ ধানক্ষেত। এই এপ্রিলে গেটের পাশের মস্ত বড় মল্লয়া গাছটার ফুল থেকে চারদিকে মাতাল হাওয়া ছুটছে। কিছুক্ষণ দুচোখ বন্ধ করে ভাবি, জীবনটা কি ঠিক এ-মুহূর্তে স্থির হয়ে থাকতে পারে না? তখনই বন্ধ চোখের পর্দার ওপর ওর ছবি ভেসে ওঠে।

কী যন্ত্রণা! মানুষ কি একা ভালো থাকতে পারে? বিশেষ করে এই বয়সটাতে? একটা সময় আবু আর মামণির মতো ঝগড়া করতে হবে জেনেও? অস্থিরতা না দুঃখবোধ জানি না কোনটি আমাকে ধ্যে নিয়ে যায় তুরাগ নদের কাছে। হাঁটতে শুরু করি নদের পাশ ঘেঁষে। একা-একাই। মানা করার পরও দেখি কেয়ারটেকার সাহেব একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমার সঙ্গে হাঁটছেন। কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাই পেছনের দৃশ্যপট। এগিয়ে যাই সামনে। থমকে দাঁড়াই নদীটার বাঁকের মুখে এসে। আমার সামনে ও দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্ন না বাস্তব! একদম সিনেম্যাটিক। অনেকে হয়তো বলবে, এমন কাকতালীয় ঘটনা বাস্তবে সচরাচর ঘটে না; কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল এমনটা ঘটাই কথা ছিল। এটিই স্বাভাবিক। কারণ আমরা তো একই বলয়ের। একই ক্লাস। আমাদের আবুদের ইনভেস্টমেন্ট প্যাটার্নটা তো এরকমই হওয়ার কথা। তুরাগ নদের পাশে আমাদের মতো আরো অনেকের বাংলা আছে। ওদেরও।

তিন

জানলাম ওর নাম। আরো জানলাম ও ছবি আঁকে। লেখালেখি করে। হাই সাহেবের এই বাংলাটা আসলে ওর ছবি আঁকার একটা স্টুডিও। দোতলায় একটা বিশাল হলঘর। প্রথমটায় টারপেন্টাইন, লিনসিড অয়েল আর অয়েল পেইন্টের মিশেলে একটা বোটকা গন্ধ নাকে এসে লাগে। কিছুক্ষণ পর তা সয়ে আসে। আসলে চারপাশের ক্যানভাসগুলোতে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে সম্মোহিত হয়ে যাই। এক-একটা ক্যানভাস এক একটা গল্প বলছে। দুটোতে শুধু পাহাড় কাঞ্চনপুর। সবুজ বন, ঢেউ-খেলানো ধানক্ষেত, তুরাগ নদ আর তাতে লাল-নীল-হলুদ পাল তোলা নৌকা। আর বাকিগুলোতে

এরপর থেকে আমার প্রতিদিনের রুটিন হলো পিকাসোর স্টুডিওতে চলে আসা। আমি ওর সোফায় আধশোয়া হয়ে বই পড়তে থাকি। আর পিকাসো একমনে ছবি আঁকতে থাকে। মাঝে-মাঝে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হই। ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে দেখি সে আমার মাথার কাছে বসে আছে। আমাকে জাগতে দেখে দুজনের জন্য স্বচ্ছ কাপে চায়ের লিকার নিয়ে আসে। এর রং আর ম-ম সুগন্ধ দুটোই আমার কাছে অপরিচিত। জানতে চাই এর রহস্য। তখন পিকাসো ওর মায়ের কথা বলতে শুরু করে। ওর নানার চা-বাগান আছে। ওর মায়ের ছিল নানারকম চায়ের ব্লেণ্ড তৈরি করা। পিকাসোও এখন তা চালিয়ে যায়। এই লিকারে আছে গ্রিন টি, পের্পে, কমলার খোসা, রোজমেরি, দারুচিনি আর আনারসের নির্যাস। এরকম এখন প্রায়ই হয়। ধ্যান ভেঙে পিকাসো একটা সময় আমার সোফায় এসে বসে। তারপর টুকটাক কথাবার্তা। আনা ক্যারেনিনার প্রথম লাইনটি আমাদের দুজনেরই খুব প্রিয়।

‘All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.’

আমরা আমাদের ডিসফাংশনাল পরিবারের গল্পগুলো খুব অবলীলায় বলে যাই। এর মধ্যে পিকাসো আমাকে রং চেনায়। আনন্দের রং শেখায়, বেদনায় রং চেনায়। লাল আর বেগুনির মিশেলে ওই কোনার ছবিটা কেন এত প্রাণপ্রাচুর্যময় তা আর বুঝতে বাকি থাকে না। নিবিষ্ট মনে শুনে যাই উনিশ শতকে প্যারিসে ঘটে যাওয়া বিমূর্ত শিল্পের বিপ্লব। বোঝানোর চেষ্টা করে এর ভাষা। বিপ্লবের পেছনের সংগ্রাম। কীভাবে একদল পাগলা আর্টিস্ট মানুষের মন থেকে পেইন্টিং সম্পর্কে সনাতনী ধারণাটা পালটে দিয়েছিলেন। সে-সময় তাঁদের ছবি দেখে সমালোচকরা মানসিক রোগীর পাগলামো

ধূসরতা বেদনার রং। পিকাসোই আমাকে তা চিনিচ্ছে। আমরা এখন কথা দিয়ে রঙের খেলা খেলতে পারি। ওর ধ্যানমগ্নতার রং নীল। নদের পাড় ঘেঁষে আমরা যখন এক-এক করে ধানক্ষেত আর সরষে ক্ষেতের আইল দিয়ে চলি, তখন একরাশ সবুজ আর হলুদ আমাদের আনন্দময় সময়গুলোকে রঙিন করে তোলে।

আবস্ট্রাক্ট আর্ট। একটা ক্যানভাসে যতসব অঙ্ককার এসে জমে গেছে। সেখানে তাকালে কেমন জানি মন খারাপ করে ওঠে। আবার তার পাশের ক্যানভাসটাই একদম অন্য গল্প শোনাচ্ছে। সেখানে খুব সবুজ আর হলুদের ছটা। মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। আমি বিহ্বল দর্শক। ক্যানভাস থেকে ক্যানভাসে ছুটতে থাকি আর স্থবির হয়ে পড়ি। ওর নাম দিই পিকাসো। পিকাসো আমার ছেলেমানুষি দেখে হাসে। তারপর আবার ছবি আঁকায় নিবিষ্ট হয়। ছবি আঁকার স্টুডিওর পাশের রুমটা ওর লাইব্রেরি। ফ্লোর থেকে সিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত বুকশেলফে থরে-থরে সাজানো বই। সেখানে আছে প্রেটো, অ্যারিস্টটল, মিশেল ফুকো, ক্যান্ট, ডারউইন, বারট্রান্ড রাসেল, দস্তয়েভস্কি, জন স্টুয়ার্ট মিল, ভার্জিনিয়া উলফ, রুমি, শাদি, থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল আরো কত জানা-অজানা লেখকদের বই। প্যারিসের ইম্প্রেশনিজম আর বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ওপর বই দুটি পাশাপাশি। সেখান থেকে আমি টলস্টয়ের আনা ক্যারেনিনা টেনে নিই। ওর স্টুডিও রুমের সোফার ওপর আলতো করে শুয়ে পড়তে শুরু করি। পিকাসো তখন নিবিষ্ট হয় ওর ক্যানভাসে। ওকে দেখলে আমার তুরাগ নদের কথা মনে হয়। স্রোতস্বী আবার মগ্ন। একজন পুরোপুরি ধ্যানী মানুষ।

বলতেন। আমি জিজ্ঞেস করি, ও আচ্ছা, তুমি ভার্সিটি ছাড়লে কেন? সে বলে, ‘না, ওই আর্কিটেকচার আমাকে দিয়ে হবে না।’ ‘তাহলে তুমি অন্য কিছু পড়ো। যা ভালো লাগে তাই।’ ‘তাই তো পড়ছি। তুমিই তো বলো, ভালো ছাত্রের মতো প্রতিটি বই আমি দাগিয়ে রাখি। মার্জিনে নোট টুকে রাখি।’ ‘কিন্তু এসব তো তোমাকে কোনো ডিগ্রি দেবে না।’ পিকাসো চুপ। ‘তুমি কি সারাজীবন ছবি এঁকে যাবে? তোমার আবু আর বিজনেস দেখবে না?’

‘আমার জীবনের জন্য কারো কিছু আটকে থাকবে না।’ কথাগুলো বলার সময় পিকাসোর চারপাশ ধূসর হয়ে আসে। ধূসরতা বেদনার রং। পিকাসোই আমাকে তা চিনিচ্ছে। আমরা এখন কথা দিয়ে রঙের খেলা খেলতে পারি। ওর ধ্যানমগ্নতার রং নীল। নদের পাড় ঘেঁষে আমরা যখন এক-এক করে ধানক্ষেত আর সরষে ক্ষেতের আইল দিয়ে চলি, তখন একরাশ সবুজ আর হলুদ আমাদের আনন্দময় সময়গুলোকে রঙিন করে তোলে। এর মধ্যেই আমরা আমাদের বেদনার কথা বলি। স্বপ্নের কথা বলি। পিকাসো ওর মাকে নিজের চোখের সামনে আত্মহত্যা করতে দেখেছে।

গনগনে আগুনের মধ্যে ওর মা পুড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারি, মাকে বাঁচাতে না পারার বেদনা ভোলার জন্য ও একটি ভিন্ন পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। সে-পৃথিবীতে কারো প্রবেশের অনুমতি নেই। এমনকি আমারও। গত কয়েকদিন আমাকে চুপচাপ অপেক্ষা করে যেতে হয়েছে কখন সে তার ওই ভুবন ছেড়ে আমার কাছে আসবে। যখন আসে তখন আমার পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে। আমি প্রতীক্ষায় থাকি। প্রত্যাশাহীন এক অনন্ত প্রতীক্ষা। যার শেষ কোথায় তা জানা নেই। এই অনিশ্চয়তাকে আমাকে আরো স্থির হতে শেখায়। একসময় আমার যাওয়ার সময় হয়। এক যোগীর কাছে দীক্ষা নিয়ে এক অন্য আমি অবশেষে আবার নাগরিক জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

অনুভব করি পিকাসো আমাকে ভালোবাসা চিনিয়েছে। প্রত্যাশাহীন ভালোবাসা।

চার

একদিন কলেজ থেকে বের হয়ে দেখি পিকাসো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে একটু হাসল। লাজুক হাসি। অপ্রস্তুত ভাবভঙ্গি। যেন অজুহাত খুঁজছে এদিকটায় ভুল করে চলে আসার। আমি বললাম, ‘আমার কেন জানি মনে হতো একদিন তোমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখব।’

পিকাসো সহজ হয়। জানাল দূর গ্যালারিতে ওর প্রদর্শনী চলছে। আজকেই শেষ দিন। অভিমানী হতে গিয়ে হলাম না। যাক, বাবা, তাও তো এলো। আমাকে নিয়ে গেল দূর গ্যালারিতে। পাহাড় কাঞ্চনপুরে ওকে এই ছবিগুলো আঁকতে দেখেছিলাম। জানলাম, ওর সব ছবি বিক্রি হয়ে গেছে। কানেকশন একটা শক্তিশালী মাধ্যম। পিকাসোর সমাজের বাসিন্দারা ওর ছবি কেনার সামর্থ্য রাখে। আমিই তো কিনতাম। কিন্তু আর তো কোনো ছবি বাকি নেই। এবার সত্যি-সত্যিই অভিমানী হলাম। ‘আমার জন্য একটা পেইন্টিংও রাখলে না?’

‘সব ছবি এখানে আনি। কয়েকটা এখনো স্টুডিওতে রয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা তোমাকে দেখাতে চাচ্ছিলাম।’

‘আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। গ্যালারিতে আনবে কবে?’

‘আজকে প্রদর্শনীর শেষ দিন না? আর তো এখানে আনা হবে না।’

‘তাহলে চলো এই শুক্রবার পাহাড় কাঞ্চনপুরে যাই।’

‘আমি একমাস পর প্যারিস চলে যাচ্ছি। পেইন্টিংয়ের ওপর পড়তে। আর কালকে যাচ্ছি ইন্ডিয়াতে।’

স্তুভিত আমি এতটুকু বুঝলাম প্রচণ্ডরকম এই অন্তর্মুখী মানুষটার সঙ্গে রাগ দেখিয়ে, অভিমান করে কোনো লাভ নেই। আর তা ছাড়া আমরা তো জানি না আমাদের সম্পর্কটা কীরকম। সে-বিষয়ে আমাদের মধ্যে তো কোনো কথা হয়নি। প্রত্যাশাহীন সম্পর্ককে প্রত্যাশার বেড়াজালে বাঁধতে নেই।

‘ইশ! একদিনের জন্য যদি এয়ারপোর্টটা বিকল হয়ে যেত!’ খুব মৃদু স্বরে কথাটা বলে ফেললাম। এর থেকে আমার আর কী চাওয়ার থাকতে পারে?

পরদিন কলেজে ঢোকার সময় দেখি পিকাসো ঠিক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গেলাম। বিস্ময়াভিভূত আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে খুব অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে পিকাসো বলে উঠল, ‘ফ্লাইটটা একদিন পেছলাম। কালকে ভোরে যাব।’

এরপর আর দেরি না করে কলেজ পালিয়ে পিকাসোর গাড়িতে করে আমরা পাহাড় কাঞ্চনপুরের দিকে ছুটে গেলাম।

পিকাসো আমাকে সাহসী করে তুলল। জীবনে এই প্রথম নিয়ম ভাঙলাম।

পাঁচ

এই সেই গ্যালারি। পিকাসোর প্রার্থনার স্থান। রুমে ঢুকতেই অভ্যর্থনা করে ল্যানসিড অয়েল আর তেলরঙের মিশেলে এক মিষ্টি মিহি গন্ধ। দেয়ালের চারপাশে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে থরে-থরে ক্যানভাস। আগের থেকে এখন ক্যানভাসের সংখ্যা অনেক কম। সবই অসমাপ্ত অথবা অব্যবহৃত। শুধু ইজেলের ওপর রাখা ক্যানভাসটা সম্পূর্ণ। পিকাসো আমাকে অবাক করতে চেয়েছিল। এবং আমি সত্যি-সত্যিই অবাক হই। আশ্চর্য! ক্যানভাসের মধ্যে আমার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। সচরাচর যেভাবে আমি এ-ঘরের সোফাটায় আধশোয়া অবস্থায় থাকতাম, ছবিতেও সেরকম। পেছনে এই ঘরের বড় জানালাটা। সেখানটায় নীল আকাশ আর লাল কৃষ্ণচূড়া। বাইরে এতো উজ্জ্বল রং আর ভেতরটা কেমন যেন ধূসর। পিকাসো আমাকে এমন বিষণ্ণ আঁকল কেন? ও কি তবে আমার মনের ভেতরটা দেখতে পায়? আনমনা উদাস দৃষ্টিতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার লম্বা চুলগুলো মেঝেতে লুটাচ্ছে। সাইড টেবিলে খোলা বই। যে-কটা দিন এখানে এসেছিলাম তখন ঘুণাঙ্করেও বুঝতে পারিনি পিকাসো আমাকে এত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। হয়তো এটাই প্রকৃত শিল্পীর ধর্ম। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না, তাঁদের উদাসীনতাকেই সাধারণ মানুষের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা অনেকটা সিঁকু সেচে মুক্তা আনার মতো। ছবিতে আমার অভিব্যক্তির প্রতিটি রেখা মুক্তার মতো প্রখর, উজ্জ্বল। প্রায় স্বচ্ছ মসলিনে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। অনেকটা বট্টেসেলির এলিগরি অব স্প্রিংয়ের অঙ্গরাদের মতো। স্বচ্ছতার আচ্ছাদনে পবিত্র অবয়ব। নিজের ছবির মুখোমুখি হয়ে বাস্তবের এই আমার চোখের দুকোণ চিকচিক করে উঠল। অনুভব করলাম সেখানে পিকাসোর স্পর্শ। ওর মুখ আমার মুখের খুব কাছে চলে আসে। খেয়াল করলাম পিকাসোর বাম কানে কোনো দুলের চিহ্ন নেই। তালাতটা আসলেই খুব চাপাবাজ। ততক্ষণে আমার অশ্রুবিন্দুর ওপর ও তার ঠোঁট চেপে ধরেছে। আমি সম্মোহিত। আমি প্রস্তুত। ওর দুহাতের কোলের মধ্যে করে সেই সোফায় নিমজ্জিত হলাম। এ এক অন্য তুরাগ! এখন সেখানে তীব্র জলোচ্ছ্বাস। কখনো-বা আমাকে ভাসাচ্ছে আবার ডুবাচ্ছে। কখনো-বা শক্ত করে পিকাসোকে জড়িয়ে ধরি যাতে এ-যাত্রায় আমরা বিচ্ছিন্ন না-হয়ে পড়ি। এ এক অদ্ভুত আবেশ! ভেসে আসে দূর থেকে সেতারের ঝংকার। ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে আছড়ে পড়ে সোনালি রোদ। স্রোত, সুর আর মিষ্টি আলোয় স্নাত হতে-হতে এক প্রশান্তিময় আচ্ছন্নতা আমাকে অবশ করে ফেলে। একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমার যখন ঘুম ভাঙে তখন বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আমি জানলাম, প্রেম কী! ওহ পিকাসো!

ছয়

পিকাসো গাড়ি চালিয়ে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। এর আগে কখনোই এতো রাত করিনি। আমার বান্ধবীরা করেছে। কিন্তু আমি একদমই ভীতু। আমার শৈশবের মধ্যবিন্দু আচ্ছাদন এখনো আমাকে অনেক হাতছানি থেকে টেনে ধরে রাখে। আবার তারুণ্যের বৈভবতার প্রেক্ষাপট অনেক মধ্যবিন্দু মূল্যবোধকেই এড়িয়ে চলার সাহস দেখাতে পারে। এই যেমন পিকাসোর বাংলাতে আজ একটি নিয়ম ভাঙলাম — রক্ষণশীল সমাজের মধ্যবিন্দুর নিয়ম। পাশ্চাত্যের সাহিত্য আর চলচ্চিত্রে প্রভাবিত হওয়া আমার চারপাশের ইংরেজি মিডিয়ামের বান্ধবীরা এরকম নিয়ম অহরহই ভাঙছে। তাই কোনো অপরাধবোধ নেই। বোধের উৎস তার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা। তাই কেউ দুর্নীতি করেও ভালো থাকে, সহকর্মীরা করেছে বলে। আবার অনেকে বন্ধুমহলে গর্ব করে নিজেদের করা

ধর্মণের সংখ্যা গোনে — একেবারে অনুতাপহীন মানসিকতায়। মানুষ পরিবেশ গড়ে। আবার সেই পরিবেশ গড়ে মানুষ। আমি প্রথাবিরোধী নই। আমি আজকে আমার পরিবেশের কোনো নিয়ম ভাঙিনি। তবে সংকোচ যে কিছুটা নেই, তা নয়। প্রথম তো। তাই এ-মুহূর্তে বাড়ি ফিরে আব্বুর মুখোমুখি হতে চাই না। গেটের সামনে থেমে পিকাসোকে বলেছিলাম চলে যেতে। কিন্তু ও ভদ্রছেলের মতো আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। আর তখনই আব্বু দরজাটা খুললেন। আমাকে এড়িয়ে পিকাসোর দিকে তাকিয়ে একটি সৌজন্যসূচক হাসি দিলেন। তাকে ঘরের ভেতর আসার আহ্বান জানালেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পিকাসো আব্বুকে অনুসরণ করে লিভিং রুমে ঢুকল। আমাদের এ-রুমটায় দেয়ালের চারপাশে জয়নুল আবেদিন, শাহাবুদ্দিন, কালীদাস আর ফিদা হুসেনের ছবি টানানো আছে। সবকটিই অরিজিনাল। শাহাবুদ্দিনের পেইন্টিংটা আব্বু প্যারিস থেকে কিনে এনেছিলেন। গত বছর। আব্বু খুব যে একটা চিত্রকলা বোঝেন, তা নয়। পুরো ব্যাপারটাই সোশ্যাল স্ট্যাটাস। দেয়ালে থাকতে হবে বিখ্যাত আঁকিয়েদের অরিজিনাল। মেঝেতে থাকতে হবে পারসিয়ান কার্পেট, লেনে বেলজিয়াম ঘাস আর গ্যারেজে নিদেনপক্ষে মার্সিডিজ। এখন অবশ্য তাতেও কুলাচ্ছে না। আব্বুর এক বন্ধু নাকি একটা ট্যাক্সি ফ্রি পোরশে কিনেছে। ঘরে ঢুকে পিকাসো বিভোর হয়ে জয়নুল আবেদিনের ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের ছবি। মৃতপ্রায় মা রাস্তায় শুয়ে আছে। পাশে বোধহয় তার ছেলে আর একটি কাক। মাথার ওপর উড়ছে একটি শকুন। দু-দুটো পাখি আর দু-দুটো মানুষ। ছবির পাখি দুটো সুস্থ-সবল কিন্তু মানুষ দুজন কংকালসার। কী অদ্ভুত! দুর্ভিক্ষে পাখিদের পোয়াবারো। মানুষ মরলে ওদের ভোজ শুরু হয়। আব্বু পিকাসোর পেছনে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘ছবিটা ১৯৪২ সালের। জয়নুল আবেদিনের। অরিজিনাল। এই ছবিটি আমি সংগ্রহ করি।’

ওখান থেকে চলে আসি। আব্বু এরপর চিত্রকলা নিয়ে যত কথা বলবেন সব আমার জানা আছে। ঘড়ি ধরে বলতে পারব পাক্কা বিশ মিনিট লাগবে। ফ্রেশ হয়ে আসতে-আসতে লিভিংরুমে ঢুকে দেখলাম পিকাসো এর মধ্যে চলে গেছে। সোফায় আব্বু চুপচাপ একা বসে আছে। আমাকে দেখেও না দেখার ভান করলেন। আমি স্তম্ভিত! আব্বু কি আমার সঙ্গে সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট শুরু করেছে? হ্যাঁ, তাই-ই। প্রায় একমাস আব্বু আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না, দেখেও না দেখার ভান করলেন। এ এক নরকবাস! যেদিন নীরবতা ভাঙলেন তার পরদিন আমাকে সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে গেলেন। আব্বুর সেক্রেটারি মিস রমিতাকে বোধহয় আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিছু সস্তা দরের কাপড় পরে অ্যাপ্রোন জড়িয়ে আমাকে একদম গার্মেন্টকর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে হলো। এটাকে আমি একদিনের অ্যাডভেঞ্চার হিসেবেই নিলাম। কিন্তু রাতে ডিনারের টেবিলে বিষয়টি অন্যদিকে গড়াল। আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেমন কাটল আজকে সারাদিন?’

‘বেশ ভালো। একটা পিকনিক ভাব।’

‘এটি কিন্তু একদিনের পিকনিক নয়। পারবে তুমি সারাজীবন এমন কাটাতে?’

আমি খুব অবাক দৃষ্টিতে আব্বুর দিকে তাকালাম। আব্বু কখনো আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলেনি।

‘একজন আর্টিস্টের বউ এর থেকে ভালো জীবন কাটাতে পারে না। হাই সাহেবের অবস্থা খুব পড়তির দিকে। গুজব আছে সম্পত্তি সব নিলামে উঠছে। যদি কিছু রাখতে পারে তো ছোট ছেলেটা সব পাবে। বড় ছেলেটার না সে বুদ্ধি আছে, না আছে কোনো বাস্তব জ্ঞান। ছবি এঁকে আর কয় পয়সা পাওয়া যায়? তাও যদি কোনো বিখ্যাত আর্টিস্ট হতো?’

‘আব্বু, কেউ তো একদিনে বিখ্যাত হয় না।’

‘কেমন লাগবে তোমার যখন দেখবে যে তোমার ছবি এঁকে-এঁকে বাইরে বিক্রি করছে? তাও আবার যেই সেই ছবি না, একেবারে ন্যুড — তুমি বুদ্ধিমান মেয়ে। বুঝতে পারছ নিশ্চয় কী বলতে চাচ্ছি।’

‘এটা কী বলছ তুমি?’

আব্বু তার সব সময়ের সহকারী এখলাসকে ডাক দিলেন। এখলাস একটা বড় ক্যানভাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমার সেই ছবিটা। পিকাসো এটি তার স্টুডিওতে এঁকেছিল। একদম আমাকে না জানিয়ে। তারপর এই ছবিটার সামনে আমরা। অদ্ভুত ব্যাপার যে, পরিবেশ একটি ছবির আবেদনকেও সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে। পিকাসোর স্টুডিওতে আমার শরীরে জড়ানো স্বচ্ছ মসলিনকে কী পবিত্র লাগছিল! অথচ এখন তা কীরকম অশ্লীল দেখাচ্ছে।

আব্বু বললেন, ‘ছবিটা চিনতে পারছ? এটি বিক্রি হচ্ছিল। আমি কিনলাম।’

সাত

এরপর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। ঘটনার পরপর আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। আব্বু লন্ডনে নিয়ে এলেন চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসকদের মতে আমি ক্রনিক ডিপ্রেসনে আক্রান্ত। এরপর আর দেশে ফিরিনি। পিকাসোকে এড়িয়ে যাওয়ার সব পন্থাই অবলম্বন করি। কিন্তু আমার জীবন আর আগের মতো থাকেনি। এখলাসের হাতে আমার ছবিটি দেখার ঠিক সেই মুহূর্তটির পর থেকে। সে-সময়টায় আমার ঠিক কেমন অনুভূতি হয়েছিল তা এখনো মনে করতে পারি না। ওটি আমার জন্য একটি ব্ল্যাক-আউট সময়। কিন্তু ক্যানভাসটি নয়। পিকাসো এরপর থেকে হঠাৎ-হঠাৎই আমার স্মৃতিতে ধূপ করে ভেসে উঠত। আমার একা থাকার মুহূর্তগুলোতে এমনটি হলে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। একটা বোবা কান্নার ঘূর্ণিঝড় আমার ভেতরটা বারবার ক্ষতবিক্ষত করেছে। সেই ঘূর্ণিঝড়টা ফিরে এলেই দেখতে পেয়েছি একটি ক্যানভাস। সেখানে আমার ছবি। একটি বিকৃত বিশ্বাস।

পিকাসো আমাকে প্রচণ্ডরকমভাবে মানুষকে ঘৃণা করতে শেখাল। আমি আর এরপর কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনি।

আট

লন্ডনে এসে এ-লেভেল শেষ করে পুরাতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা শেষ করলাম। আব্বুর পছন্দমতো বিয়ের আসরে বসে পড়লাম। লন্ডনে ওদের বিরাট পারিবারিক ব্যবসা। কাঁচা সবজি আমদানি আর রেস্টুরেন্টের। দুই প্রজন্মের ব্যবসা। দ্বিতীয় প্রজন্ম আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। এক-একটা চেকমার্ক দিয়ে গেলে আমার বরের সবই আছে। টাকা, ডিগ্রি, চেহারা-সুরত — সব। কিন্তু নীরবে যে ব্যাপারটা একটা মানুষকে গড়ে তোলে তা হচ্ছে সেই চিরাচরিত পরিবেশ। আমাদের দুজনের বেড়ে ওঠার সেই পরিবেশটা খুব ভিন্ন ছিল। সে চেয়েছিল আমি শুধুই মিসেস সবজিওয়ালা হয়ে থাকি। তাতেও আমার খুব একটা আপত্তি ছিল না। আমি তো আর খুব ক্যারিয়ারিস্ট মহিলাদের আশপাশে দেখিনি। দেখেছি মামণির মতো মিসেস হাই, মিসেস রবদেব। তারা সবাই সুন্দর-সুন্দর বাড়িতে থাকে, বাচ্চাদের দেখাশোনা করে আর সময়মতো পার্টি করে। এরকম জীবনের ব্যাপারে আমার তেমন আপত্তি ছিল না। সমস্যাটি ছিল অন্য জায়গায়। তাই আর আমাদের একসঙ্গে থাকা হলো না। সেপারেশনে চলে গেলাম। সরকারি একটা জাদুঘরে কিউরেটরের চাকরি পেয়ে গেলাম। তেমন আহামরি বেতন না — তবে কাজটায় অনেক মজা আছে। অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হওয়া যায়। বিশেষ করে শিল্পীদের সঙ্গে। এই চাকরিতে আমার একার ভালোই

চলে যায়। আবু বিষয়টি একদমই পছন্দ করেননি। ডিভোর্সের আগ দিয়ে মামণি এসে একটা শেষ চেষ্টা করেছিল আমাদের মিলিয়ে দিতে। পারেনি। তবে সেবার মামণির সঙ্গে খুব খোলামেলা আলোচনা হয়। জীবনে প্রথমবারের মতো। হয়তো এটাই শেষ।

‘সাফা, তুই এভাবে চলে আসলি অথচ জামাই এখনো তোর ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। কোনো শর্ত ছাড়াই। কই জামাইয়ের কী বিরাট প্যালেস আর কই তোর এই এক বেডরুমের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট! একেবারে আগরতলা আর জুতোরতলা। এটা কোনো একটা জীবন হলো?’

‘মামণি তুমি বাবুই পাখি আর চডুই পাখির গল্পটা জানো না? এটা হলো আমার বাবুই পাখির জীবন। নিজের তৈরি করা ভুবন। যেমনই থাকি নিজের পছন্দ-অপছন্দ আর মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বাস করার বাধ্যবাধকতা এখানে নেই।’

‘জামাইয়ের কী অপরাধটা শুনি? একবার একটা পুলিশি কেসে নাম জড়াল তো সব শেষ? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি শুধু সুসময়ের বন্ধুর মতো যে, একবার কেউ বিপদে পড়লে তাকে ছেড়ে চলে আসতে হবে?’

‘মামণি, এটি শুধুই একটা পুলিশি কেস নয়। আমি ওর দিকের সাইড টেবিলের ড্রয়ারে একটা ড্রাগের প্যাকেট দেখতে পেয়েছিলাম। তার থেকেও বড় কথা, যখন আমি প্যাকেটটা নিয়ে তোমাদের জামাইকে প্রশ্ন করলাম তখন সে বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করল। আমি অনেক প্রমাণ পেয়েই নিশ্চিত হয়েছি যে, সে এখন ড্রাগের ব্যবসাও শুরু করেছে। তাকে শেষ পর্যন্ত জেলে যেতে হয়নি কারণ ওরা সেটা কোনোভাবে ম্যানেজ করে ফেলেছে। সব লেভেলেই ওদের কানেকশন আছে।’

‘ওরকম সৎ মানুষের বউ হতে চাইলে আমি বলব তুই এখনো রূপকথার রাজ্যে বাস করছিস। তোর বাবার অনেক কিছু মেনে নিয়ে আমি কি তার সঙ্গে সংসার করে যাইনি?’

আরো দশ বছর আগে আবু সম্পর্কে এরকম কিছু বললে আমি সেটি মেনে নিতে পারতাম না। কিন্তু এখন বেশ বুঝে গেছি একই পুরুষের এক বাবা আর আরেক স্বামী হিসেবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি সত্তা থাকতে পারে। কারণ দুটি সত্তাকে দেখা হয় দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাবাও কখনো-কখনো হতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্বামী। আমি জানি, মামণি অনেক কিছুই মেনে নিয়েছে। এই যেমন রমিতা অ্যান্টির ব্যাপারটি। আবুর সঙ্গে মামণির এই নিয়ে অনেক ঝগড়া হতো। কিন্তু মামণি কখনোই সেই চডুই পাখির রাজপ্রাসাদের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে পারেনি। এখানে প্রশ্নটা কে ভুল কে ঠিক তা নিয়ে নয়। সবারই নিজেদের পছন্দ মতো জীবন গড়ে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। আবার স্বাধীনতার সঙ্গে ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি চলে আসে। মামণি আগের প্রজন্মের। তার হয়তো এই ক্ষমতায়ন প্রয়োগের সামর্থ্য ছিল না। আমার আছে। আমি কি তা করব না?

‘মামণি, তুমি তো নানির মতো জীবন কাটাওনি। ক্লাব করেছ, পার্টি করেছ। তোমার নিজেরও একটা হিসাব ছিল। একপাল্লায় ছিল আবুর প্রতি তোমার যত অভিযোগ আর অন্য পাল্লায় ছিল আবুর তৈরি করে দেওয়া স্বাচ্ছন্দ্য আর স্ট্যাটাস। তুমি দ্বিতীয় পাল্লাটি বেছে নিয়েছ। সেটি ছিল তোমার সিদ্ধান্ত, তোমার জীবন। এটি ২০১৩ সাল। আমি তো তোমার জীবনের কার্বনকপি হতে পারি না। ঠিক তুমি যেমনটি হওনি নানির জীবনের। তোমার মতো হিসাব কষার আমারও দুটো পাল্লা আছে। প্রথম পাল্লায় তোমার জামাইয়ের প্রতি অভিযোগের পাশাপাশি আমি আরো চাপাছি স্বাধীনতাবোধ, আত্মসম্মানবোধ, এথিক্স। দ্বিতীয় পাল্লার স্ট্যাটাসের থেকে আমার জীবনে প্রথম পাল্লাটা যে অনেক বেশি ভারী মামণি, তাই আমার

সিদ্ধান্তও অন্যরকম। তুমি তোমার জীবনে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তার ব্যাপারে আমি কোনো জাজমেন্টাল হচ্ছি না। আমি শুধু চাইছি আমাকে তোমার জামাইয়ের কাছে ফিরে যেতে আর অনুরোধ করো না।’

মামণি এবার হাল ছেড়ে দিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘কখন আবার বিয়ে করবি? সময় তো চলে যাচ্ছে। কবে আবার মা হবি? বাচ্চাকাচ্চা না হলে বুড়ো বয়সে একা-একা হয়ে পড়বি।’

‘তোমার তো দুটো বাচ্চা ছিল। তারা তোমার একাকিত্ব কাটাতে পারছে? এই আমি তোমার থেকে অনেক দূরে লন্ডনে বসে আছি। ভাইয়া তো ব্যস্ত ব্যবসা নিয়ে। আর ভাবি দোতলা থেকে গুনে-গুনে তিনবার একতলায় নামবে। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনার। সকালে ফ্রুট স্মুদি, দুপুরে চিকেন স্যালাড আর রাতে স্যুপ। সেটার ব্যবস্থা আবার তোমাকেই করে দিতে হয়। সারাদিনে কয়টা কথা বলতে পারো ভাবির সঙ্গে?’

না, এভাবে বলাটা হয়তো আমার ঠিক হলো না। নিজের কাছেই কেমন যেন ননদীয় কুটনামি শোনাল। আর মামণিও খুব আহত হলেন। আমরা এ-যুগের আত্মকেন্দ্রিক সন্তান। আমাদের জন্য ওনাদের কত আত্মত্যাগ ছিল। তার বিনিময়ে কী পেলেন? আগের প্রজন্মকে দেখে আমরা এখন নিজেরা সাবধানি। বাবা-মায়েদের আত্মত্যাগটা তো আসলে এক ধরনের বিনিয়োগ : সন্তানদের দুর্বল সময়ে আমরা ছিলাম, আমাদের দুর্বল সময়ে ওরা থাকবে। জীবনের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে যাওয়াতে আগের সেই বিনিয়োগ সিস্টেমটা এখন প্রায় ভেঙে পড়ার দশা। যারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে তারা খুব ভেবেচিন্তে সন্তান নিচ্ছে। আমাদের এই প্রজন্মের নারীদের খুব স্বার্থপর বলা হয়। কিন্তু আমরাই পারছি বুড়ো বয়সে ওরা আমাদের দেখবে না সেটি মাথায় রেখে সন্তান পালন করতে। সত্যিকারের আত্মত্যাগ এটিই। যারা এই ত্যাগে বিশ্বাসী নয়, তারা সন্তান নেবে না। এ-কথাটি এখন বললে মামণি আরো মন খারাপ করবে। তার থেকে বরং মামণির মন ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করি। মামণির কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, ‘এখন আমরা ডিভোর্স করি সামনের দিনগুলোতে আরো ভালো থাকব বলে, দুঃখ পুষে জীবনটা শেষ করে দেওয়ার জন্য নয়। দেখো তোমার সবজিওয়ালা জামাইও তার মনের মতো বউ পেয়ে যাবে আর আমিও খোঁজ পাব আমার স্বপ্নের পুরুষের।’

মামণি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাসলেন। আমি বললাম, ‘হেসো না মা, বুড়ো বয়সে স্বপ্ন দেখতে নেই? অল্প বয়সের প্রিন্স চার্মিং একটি অলীক ধারণা। এই বয়সেই বরং আমরা সত্যিকারের রক্তমাংসের স্বপ্নপুরুষ রচনা করতে পারি। তুমি শুধু আমার জন্য তোমার শুভকামনা রেখো।’

নয়

এই ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের আমার এই জীবনটা কখনো যে থমকে দাঁড়ায় না তা নয়, তখন নানাভাবেই এই জীবনকে গতিময় করে তুলি। মিটআপ গ্রুপে আমাদের বান্ধবীদের দলটি সুযোগ পেলেই ইউরোপের কোনো দুর্গম অঞ্চলে চলে যাই। গত বছর ঠিক করেছিলাম সবাই মিলে ভারত যাব। পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত। ভারতে মহিলা ট্যুরিস্টদের ওপর যেরকম ধর্ষণের কাহিনি প্রচার পাচ্ছে তাতে আর আমাদের সাহস হয়ে উঠল না। ট্রেসি খুব মজা করে বলে, ‘তোমরা এশিয়ানরা আসলে খুব হিপোক্রট। পশ্চিমাদের খোলামেলা জীবন নিয়ে তোমরা খুব সমালোচনা করো। আর এখন ট্যুরিস্টরাও তোমাদের ওখানে নিরাপদ নয়। না জানি ঘরে-ঘরে কী হয়। তোমাদের শুধু খাবারই অভাব না, সেক্সেরও অভাব। নইলে সবাই এরকম হামলে পড়ে ধর্ষণ করে কেন?’

ট্রেসি আমার খুব ভালো বান্ধবী। আবার সহকর্মীও। এ-বিষয় নিয়ে ওর সঙ্গে আর তর্ক করি না। করলে সেটা হিপোক্রেসি হতো। বাংলাদেশের কথাই ধরি, এখানে মানুষের অভাব নেই, কিন্তু যৌনকাতর মানুষের সংখ্যা অগণিত। একটু ভিড় বা আড়ালের মধ্যে সেসব মানুষের ক্ষুধার্ত হাতগুলো পিপাসা মিটিয়ে নিতে চায়। তবে সমাজের ওপরতলা আর নিচের তলার হিসাব কিছুটা আলাদা। মাঝখানের মানুষজনেরা পড়েছে বেশি বিপদে। চাকরি না হলে তারা বিয়ে করতে পারে না। বিয়ে না করতে পারলে ক্ষুধা মেটাতে পারে না। তাই তাদের চুরি করতে হয় বাসের ভিড়ে, ডাকাতি করতে হয় বাসার দুর্বল কাজের মেয়ের ওপর হামলে পড়ে। বিবাহিত মানুষজনেরাও কি ধোয়া তুলসীপাতা? অপরিতৃপ্ত হৃদয়ও ক্ষুধার্ত রয়ে যায়। যেনতেন রেসিপিতে কার মন ভরে? হাতের কাছে ভরা কলস, তবু তৃষ্ণা মেটে না। না, এসব নিয়ে কথা বলা যাবে না। পুরুষদের থেকেও ভয় নারীকুলের তীব্র সমালোচনা। তারা শুধু মনে করে দশ রকম পদ রেঁধে পুরুষের পেট ভরিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করতে হবে। এর বাইরে আর নতুন কোনো পথের সন্ধান তারা চান না। তবে ট্রেসির সঙ্গে নিজের দেশের সমালোচনা করতে চাই না। কিছুটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বলে উঠি, ‘এখানেও তো ধর্ষণ হচ্ছে। তার কারণ কী?’

‘সব দেশেই কিছু না কিছু সেক্স ম্যানিয়াক থাকে। এখানে সাবওয়েতে তো নিয়মিত চড়ছে। তোমার কি মনে হয়েছে একটু ভিড়-ভাড়া হলেই ছেলেরা মেয়েদের শরীরে হাত বুলাতে চাচ্ছে?’

এজন্যেই ট্রেসির সঙ্গে আমি তর্কটা করতে চাই না। ওর অনেক পড়াশোনা। ওর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও একটা বুকক্লাবের মেম্বর। আমরা অনেক কিছুই একসঙ্গে করি। চাকরির জায়গায় আমাদের

সেই-ই। পিকাসো। মাথায় টাক পড়েনি, একটুও মোটা হয়নি। বয়স কেন মানুষকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে? সময় কেন ঘণার তেজ মিইয়ে দেয়? নাকি আমার মধ্যে দার্শনিক-উদারতা ভর করেছে? সাক্ষাৎকারটা মাঝপথে। উপস্থাপক জিজ্ঞেস করছেন, ‘তারপর আপনার সেই অনুপ্রেরণার সঙ্গে আর দেখা হয়নি? কোনো যোগাযোগ হয়নি?’

‘না, যেভাবে আকস্মিক সে আমার জীবনে এসেছিল ঠিক সেভাবে হঠাৎ করেই সে হারিয়ে যায়। তার বাসায় অনেক চিঠি লিখেছিলাম। কোনো চিঠির উত্তর পাইনি। ফোন করেছিলাম। তার পরিবার থেকে জানিয়েছে, সে আর আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতে চায় না।’

‘তঁার কোনো চিহ্ন নেই?’

‘আমি তার একটাই ছবি এঁকেছিলাম। কিন্তু সে-ছবিটা আমার স্টুডিও থেকে চুরি হয়ে যায়।’

‘আপনি কি তার জন্যই অবিবাহিত থেকে গেছেন?’

‘আসলে উত্তরটা আমি নিজেও জানি না। আমার সংগ্রামের সময়টাতে অনুপস্থিত থেকেও সে আমাকে যেভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, সে-সময় হাত ধরে দুজন পাশাপাশি চললে এর হিতে বিপরীতও হতে পারত। যে-স্পেসটা আমি পেয়েছি সেটি হয়তো পেতাম না। ও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বড় হয়েছে। আমার সেই সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে সে মানিয়ে নাও নিতে পারত।’

‘আর এখন যদি তার দেখা পান?’

‘সে হয়তো এখন বেশ সুখে আছে। হয়তো তার দুটি সন্তান আছে। ওদের কাছে সে আমার থেকেও বেশি জরুরি। আমি শুধু

আমি এখন গ্যালারিতে ছুটছি। আজ পিকাসোর সঙ্গে আমার অনেক বোঝাপড়া আছে। আমার জীবনটা তো একটা সাদামাটা ক্যানভাস হতে পারত – দুলাইনেই যার গল্প শেষ। পিকাসো সেটি হতে দিলো না। বারবার সেখানে সে রঙের আঁচড় বুলিয়েছে।

দুজনের শিফট দুই-একটা বিশেষ দিনে আলাদা হয়ে যায়। যেমন আজকে ওর দিনে আর আমার বিকালের শিফট। কিছুক্ষণ আগে আমাকে সে ফোন করে বলল, প্যারিস থেকে গতকাল যে শিল্পী এসেছেন তার ওপর ট্রেসির ক্র্যাশ হয়েছে। কিছুক্ষণ পর অন-এয়ারে বিবিসি থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচার করা হবে। আমাকে অবশ্য বিকেল থেকেই সে-শিল্পীর সঙ্গে সময় কাটাতে হবে। গ্যালারিতে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর দায়িত্ব আমার।

দশ

সকাল আর দুপুরের খাবারটা আজকে একসঙ্গে প্রস্তুত করে নিলাম। আট আউন্স এলমন্ড দুধের সঙ্গে এক টেবিল চামচ অরগ্যানিক প্রোটিন পাউডার, একটা কলা আর আধ কাপ ওটমিল। সবকিছু একসঙ্গে মিলিয়ে লাই বানিয়ে নিলাম। এখন বেলা ১২টা। রাত ৮টা নাগাদ এই দিয়ে বেশ চলে যাবে। বাসার মধ্যে খুব একটা রান্নাবান্না করা হয় না। উৎসাহও নেই, পারিও না। আমার বিয়েটা না টেকার পেছনে এটাও একটা কারণ ছিল। লন্ডনে জন্ম, লন্ডনে বড় হয়েছে, তারপরও বাঙালি বউ দশ রকম মিষ্টি বানাতে জানে না সেটি তার কাছে একটি বিস্ময় ছিল। আমার পছন্দ গ্রিন টি। গ্রিন টির কথা মনে হতেই মাথার মধ্যে কী জানি ক্লিক করে উঠল। রিমোট বোতাম চেপে চ্যানেল সচল করলাম, যা ভেবেছিলাম তাই।

ওকে একটাই প্রশ্ন করব, আমার কী অপরাধ ছিল?’

সেলফোনটা বেজে উঠল। ট্রেসির ফোন। ধরলাম না। থাক ট্রেসি ওর ক্র্যাশ নিয়ে। আমার কিছুটা সময় একা থাকার দরকার। অনেক বছর ধরে বুকের ভেতর আটকে থাকা এক বোবা কান্নার ঘূর্ণিঝড় দমকা বাতাসের মতো বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভার নেমে গেলে যেরকম হালকা বোধ হয়, আমার সেরকম হচ্ছে। আবু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের বিচ্ছেদ পিকাসোকে শিল্পী বানিয়েছে আর আমি পুতুল থেকে হয়ে গেছি সত্যিকারের মানুষ। এই পিকাসো একদিন আমাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল, আবার আজ এই পিকাসোই আমাকে ক্ষমা করতে শেখাল।

এগারো

আমি এখন গ্যালারিতে ছুটছি। আজ পিকাসোর সঙ্গে আমার অনেক বোঝাপড়া আছে। আমার জীবনটা তো একটা সাদামাটা ক্যানভাস হতে পারত – দুলাইনেই যার গল্প শেষ। পিকাসো সেটি হতে দিলো না। বারবার সেখানে সে রঙের আঁচড় বুলিয়েছে। আমি ভালোবাসতে জানলাম; সাহসী হতে শিখলাম; প্রেম বুঝলাম; ঘৃণা, অবিশ্বাস আর ক্রোধে ফেটে পড়লাম; ক্ষমার মাহাত্ম্য অনুভব করলাম – সব শেষে জানলাম মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। □



খনন

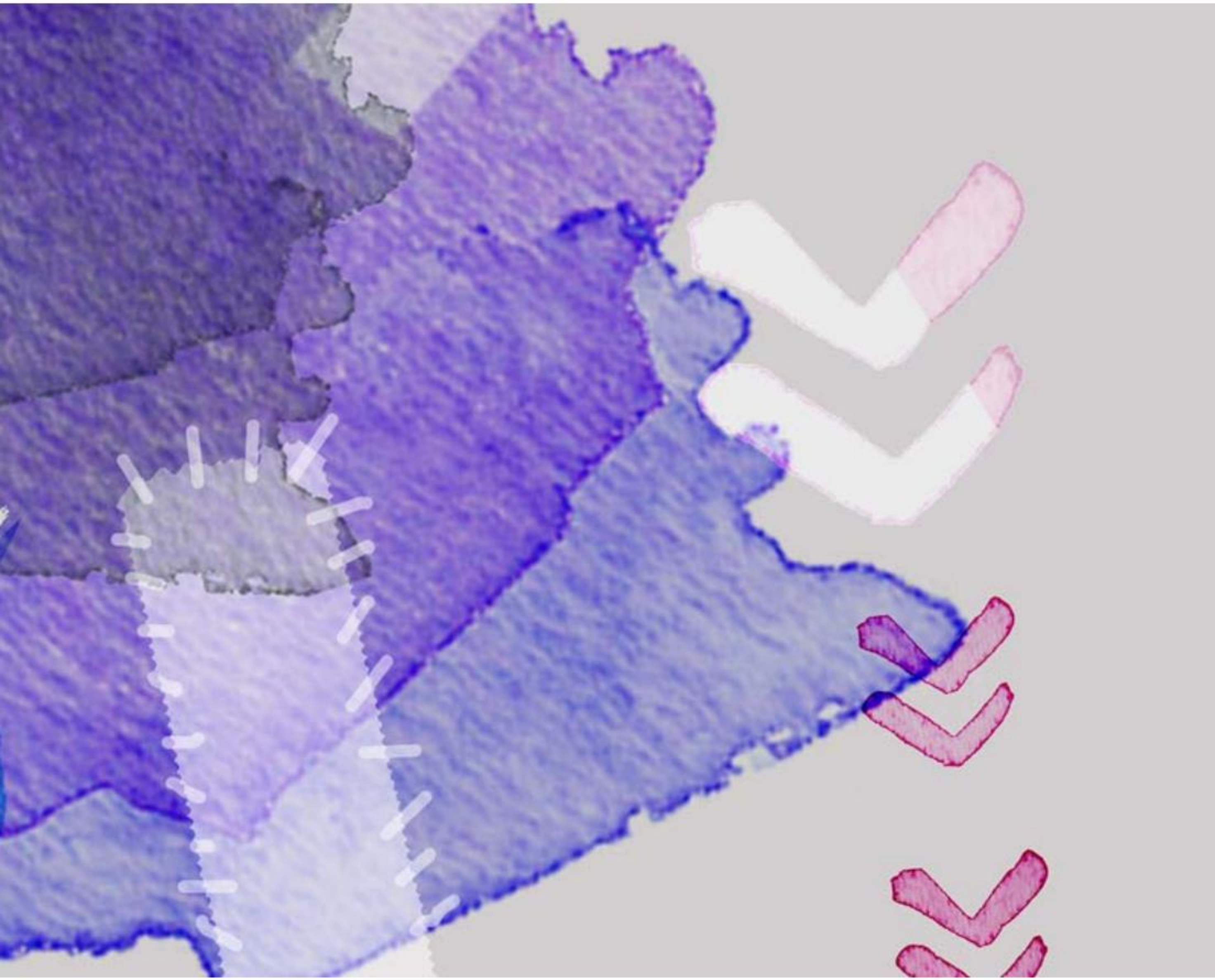
নাসিমা আনিস



ভ্যানে সামনে পা ঝুলিয়ে বসে বাঁয়ের অপূর্ব দৃশ্যাবলি দেখতে-দেখতে মোবাইলে ছবি তোলে আরোহী দুই নারী। শহুরে তারা। রিজার্ভে যাচ্ছে! ভ্যানচালক তাদের প্রফুল্লতায় খানেক ধুমো দিয়ে ভ্যান থামায়, — তোলেন, নেইমে শান্তি কইরে ছবি তোলেন আপা! সালায়ার-কামিজের মহিলারা লাফিয়ে নামে। বসন্তমেদুর আকাশের নিচে কী অপূর্ব দেশ, তাই দেখে। সবুজ আর সবুজ। পিচঢালা রাস্তার গা-ঘেঁষে ঠোট নাচিয়ে উদ্ভাসিত ভাঁটের হাসি, আহা মরি মরি!

টাপা ভ্যানে চড়ে ওরা ফিরছে আট কবর থেকে দুপুরের একটু আগে। আট কবর নামেই পরিচিত স্মৃতিসৌধটা। সম্মুখ সমরে তাঁরা শহিদ হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে, তাঁরা তখন কিশোর ছিলেন, দুরন্ত বয়সে প্রাণ দিয়েছিলেন দেশ বজ্জাতমুক্ত করতে, মুক্তদেশে সুস্থভাবে বাঁচতে।

ভ্যানে উঠতে গিয়ে দেখে দুজন পর্দানশিন মহিলা ভেতরে চুপটি করে বসে আছে, একে ঘাপটিও



অলংকরণ : আবু হাসান

বলা চলে। একটুখানি ছইয়ের ভেতর জায়গা অল্প, তাতেই বহাল আছে তারা।
ভ্যানওয়ালা তাদের নিতেই চায়নি,

— এরা শহুরে মানুষ রাগ করবে গো, তোমরা অন্য ভ্যানে আসগে!
— অল্প একটু বাবা, ভ্যান তো পাইচি নে, দুপুরবেলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি!
অগত্যা...

ভ্যানে উঠতে গিয়ে অবাক, অসুস্থ বলে ওঠে একজন — এরা এলে কোথা থেকে!

ইতস্তত করে ভ্যানচালক,

— এটুখানি যাবে, তুইলে নিলাম আপা! সামনেই নেইমে যাবে! ভ্যান পাচ্ছে নাকো!

হাসিতেই জয় করে নিল চালক। গুঁতিয়ে-গাতিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢোকে একজন।
বসতে গিয়ে দেখে বসার জায়গাও দখলে নিয়েছে একটা ছোট বস্তা। বস্তায় হাত দিয়ে বলে, কী ওতে, নারকেল?

ঘোমটার তল থেকে বলে ওঠেন — না, বাতবিনেবু।

— বাপরে, এত বড়!

— আপনি একটা নেবেন? নেন।

— নিতে পারি যদি দাম নেন। ভ্যান চলতে থাকে। শহুরে মহিলা একজন জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছেন? মহিলা ঘোমটা অর্ধেক ফেলে প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখ

টাপা ভ্যানে চড়ে ওরা ফিরছে
আট কবর থেকে দুপুরের একটু
আগে। আট কবর নামেই পরিচিত
স্মৃতিসৌধটা। সম্মুখ সমরে তাঁরা
শহিদ হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে, তাঁরা
তখন কিশোর ছিলেন, দুরন্ত বয়সে
প্রাণ দিয়েছিলেন দেশ বজ্জাতমুক্ত
করতে, মুক্তদেশে সুস্থভাবে
বাঁচতে।

বের করে বলে, মেয়ের বাড়ি, নাতিটা নৌকাডুবিতে বেঁচে গেছে, তারে দেখতি যাচ্ছি।

- কোথায়?
- রসিকপুরে, বাগোয়ান। আপনি কিন্তু একটা বাতাবি নেবেন!
- আমি তো নেবই, নাতির বয়স কত?
- আশ্বিন মাসে দশ বছর হবে।
- সাঁতার জানত না?

— না, জানত না, জানবে কেমন কইরে, দেশে কি এতকাল পানি ছিল? টিউবওয়েলের লাল বিতিকিচ্ছিরি পানি, তাও চোত-বোশেখে অন্যের টিউবওয়েলে যেতে হয়, পাইপ পানির নাগাল পায় নাকো। বর্ষায়ও পুকুরে একফোঁটা পানি নেইকো, পুকুরের মধ্যখানে জঙ্গল হয়ে মেছোবাঘ থাকার দশা, এবার যে কতকাল পর পানি দেখলাম! অন্যবার নদীতে ভরা বর্ষায় মাঝখানটায় একটু প্যাক থাকে, সাঁতার কেমনে শিখবে, প্যাকে কি সাঁতার কাটা যায়! আপনারা এদিকপানে কই যাবেন আপা?

— মুজিবনগর।

এতক্ষণ অন্য মহিলা কথা বলেননি। বিশাল ঘোমটার আড়ালে মুখটাও দেখতে দেয়নি। এখনো আড়াল থেকেই তিনি অনুযোগের কণ্ঠে বলে উঠলেন, ভৈরবে পানি হয়ে কী লাভ হলু, আরেটু হলি তো নাতিন ছাওয়ালটা ভেসে যেত। আবার পাড় কাইটে নদী চওড়া করতেছে, লোকে পাড়ের গাছগাছালি কাইটে সুমুর কইরে দিচ্ছে!

— দুটো মেয়ে মারা গেছে না এই নৌকাডুবিতে?

— আহা, সন্ধ্যা বেলা নদীর পাড় ভাইঙে মানুষ দৌড়িয়ে ছিল লাশ উঠাবার সময়, কেউ আশা কইরে ছিল বাঁচে নাকি থাকতেও পারে!

— চোন্দো-পনেরো ঘণ্টা পর! কীভাবে?

— আশা করতি অসুবিধা কী? নেহাত দুর্ঘটনা তো নয়! এই যে এত পানি, এতকাল পর, সেইটাই বা কিসের ইশারা! বোঝা দায়।

সত্যি কথা এবার নদীতে পানি, শুধু পানি কেন, রীতিমতো জোয়ার-ভাটা দেখে বিস্মিত মানুষ। মরা নদীটা কোনো এক জাদুবলে প্রাণ ফিরে পেল! কিন্তু অনেকেই ভেবে পেল না, নদী ড্রেজিং করতে পাড় কাটবে কেন, ভয়ে তাই আগেভাগে গাছ কেটে ফেলছে পাড়ের লোকেরা। বলা তো যায় না পাড়ের সঙ্গে গাছও কেটে নিয়ে যায় কি না!

পথে মহিলাদ্বয় নেমে পড়ল। বাতাবিনেবুর টাকা দিতে গেলে আত্মপ্রত্যয়ী স্বর, দশ টাকার বেশি নেব না কিন্তুক, টাকা না নিলি জিনিস নেবেন না, তাই নিলাম। গাছের জিনিস এমনি লোকে কত চায়ে নিয়ে যায়, না বলার অভ্যেস নেই কো..., কাউকে না বলি না!

বিশাল এক নেবুর বিনিময় এত কম দাম হয় কেমন করে, ভাবতে-ভাবতে একজন বলে ওঠে, গুলশানে এর দাম একশ তো হবেই! নিনা, এক কাজ করি চল, ঢাকায় গিয়া গুলশানে উহাকে বেচিয়া দিয়া ফরমালিনসমৃদ্ধ এক কেজি পেয়ারা কিনিয়া লইব, বাহির পানে টসটসে, ভিতরপানে বিগুচ্ছ... পদ্মার চর!

— সবুজের আঁচ লাগলে সত্যি কথা নেচে ওঠে, না!... হা হা হা। সবুজের পানে...।

একই দুর্ঘটনায় মহিলার নাতির বেঁচে যাওয়া আর দুদিন আগের ভৈরবে মেয়েদুটোর মৃত্যু মনে এলো ভ্যান কদারগঞ্জ হয়ে মুজিবনগর মোড় নেওয়ার আগে। মাত্র দুদিন আগের কথা, পত্রিকায় পড়েছে—

— ‘মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার রসিকপুর খেয়াঘাটে নৌকাডুবিতে দুই স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার, সোমবার সকাল সাড়ে সাতটায় ডুবুরি বেদলাল হোসেন ঘাটের অদূর নদী থেকে রসিকপুর গ্রামের ববিতা খাতুন ও তানিয়া খাতুনকে মৃত উদ্ধার করে, তারা বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। নৌকা রোববার বিকেলে ডোবে, অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই নৌকা ডোবার কারণ বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের মত... মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, নিখোঁজের সঙ্গে-সঙ্গে উদ্ধার অভিযান চলে, রাতে বন্ধ থাকে, সকালে আবার অভিযান শুরু হয়... সকালে...।’

দুই

বিকলে নৌকা ডোবার সময় শ্যামল কেবল মাছ বিক্রি করে ক্যারিয়ারে হাঁড়ি-বাঁধা সাইকেলটা নারকেল গাছে হেলান দিয়েছে কি দেয় নাই, তখনি হইহই রব। না, ফেরার পথে মেঘের ছায়াও গায়ে পড়ে নাই কো, এক টুকরো ওড়া মেঘও তো দেখেনি টুপলার বিল পেরোতে! তো কী হলো ঝড় বই!

— শ্যামলা কীভাবে উঠাবে গো! ও তো ডুবুয়ে-ডুবুয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছে!

— আমি চুল ধইরে প্রায় তুইলেই ফেললাম জল থেইকে কিন্তুক নিচ থেকে টাইনে ধরে রাখছে, আমি তার সঙ্গে পারব কেমনে! বলেন, কেউ কি তা পারে?

হালদারের কথা কয়টা ঘিরে ধরে গ্রামবাসী।

শেষ পর্যন্ত ডুবুরিরাও অকৃতকার্য!

কে একজন বলে ওঠে, তেনার ইচ্ছা কী? তিনি ইচ্ছা করলেই দুটো আবিস্যন্তা মেয়েরে পানির তলে আটকে রাখতে পারেন না! সরকার নদী কেইটে যে অবিচার কইরেছেন, তিনিও তেমন অবিচার করতে পারেন না!

সরকার আর অদৃশ্য শক্তি, দুইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যায় বাগোয়ান রসিকপুরে মানুষ হতবিস্ত্রল। ঝঞ্ঝাপীড়িত এক উপদ্রুত লোকালয় যেন। ঝড় থেমে যাওয়ার পর তাগুবে মানুষ যেমন অভিভূত তেমন।

অমাবস্যারাতে মারেফ মণ্ডলের উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্যামল হালদার সন্ধ্যার কথা কয়টা ফের বলে ঈশ্বরের উদ্দেশে বুক কপালে হাত ছোঁয়ায়। মাছ ধরা বেচা হালদারের পেশা, পিতৃপুরুষদের ধর্ম পালটে গেলেও পদবি কি পেশা এখনো মজুদ আছে। ছোটখাটো মজবুত গঠন। পঞ্চাশের অল্প কিছু বেশি বয়স। সেও আজ ডুবুরিদের সঙ্গে নেমেছিল পানিতে আশা নিয়ে, কিছু করে দেখাবে। কিন্তু অনভ্যাসবশত পাড়েই সে চেষ্টা চালিয়েছে নিজের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে। ভৈরবের কিঞ্চিৎ রূপ দেখেছে বইকি ছেলে বয়সে। নৌকায় চড়ে বাপের সঙ্গে মাছ ধরেছে ভৈরবে, সাঁতারে দারুণ পটু ছিল একদা। এখন হাঁড়িতে করে চাষের জ্যাস্ত মাছ বেচে।

শ্যামলের কথাটা কারো-কারো কানে নির্মম লাগে কিন্তু শোকাতুররা চুপ থাকে। ফিসফিস সামান্য, তানার ভাব আমরা কি বুঝি!

ঘোর কেটে গেলে শ্যামল অন্ধকারে যেন পালাতে চায় যাবতীয় কথা থেকে, এসব সে বিশ্বাস করে না, কোনোকালে করতও না; কিন্তু সত্যি তো নিচের থেকে কে প্রবল শক্তিতে টেনে ধরে ছিল! প্রাণপণ চেষ্টা বৃথা গেছে। কয়টা চুল ছিঁড়ে হাতে উঠে এসেছিলও তো!

শ্যামল বলে, সকালে তো ডুবুরিরা আবার নামবে তখন কী হয় দেখি!

— কী হবে? মরা লাশ পাবানে গো, মরা লাশ পাবানে!

— ডুবুরিরাও তো অজায়গায় ডুবুয়ে-ডুবুয়ে রাত করলু, বললু, সকালে আলো ফুটলে চেষ্টা করবেন, বলি মেয়েদুটো কি জলের তলে পাতালের রাজপারসাদে হাসিখেলা করে কাটাচ্ছু!

অন্ধকারের দিকে মুখ করে সিগারেট ফোঁকা মারেফ মণ্ডল ঘুরে তাকায় কথা কটা বলে। পকেট থেকে খিলাল বের করে নিবিড় হাতে দাঁত খোঁচায়। খাসির মাংসটা আজ ভালো রান্না হয়েছিল। পোলট্রি সে খায় না কোনোকালেই, নাকে বাস লাগে। থুথু ফেলে মুখ ভোচকায়, সাজানো দাড়িতে হাত বোলায়। তারপর বলে, ত্রিশ বছর যে-নদীতে পানি নেই কো, সেথায় পানির ধারার দরকার কী পড়ল? কারে খুশি করতে? পাড়ের গাছ কাটল লোকে বাধ্য হয়ে, পাড় কাটে ফেললে গাছ না কাইটে কী করবে? এখন এই যে মেয়েদুটো হারাল নৌকা উল্টে, তার দায় তো কাউকে নিতে হবি, নাকি?

— কে কোনকালে কার দায় নিছে? ওই যে খবরে কবানে, একলাক টাকা করে দিব পরিবারকে, খুশি থাক, খুশি না থাকে যাবে কুতায়!

— খবরে বেরোবে লাক। হাতে পাবে কপাল ভালো থাকলে দশ কি পনারো, পাঁচও হতি পারে, এর বেশি নয় কো!

— নদী কেন কাটবে? নদী হলো গিয়ে আল্লার দান, তিনি দেবেন

তিনি নেবেন, এখানে হাত লাগানো মানে তো খোদার ওপরে খোদকারি। মারেফ মণ্ডলের জ্ঞানী বয়ান।

থুথু ফেলে ফের মারেফ মণ্ডল বলে, ভারত যে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে রাখল, তারে কিছু কতে পারল না! খালি আমাদের ভোগান্তি! গাঙের মাটি কাটা ভালো কথা নয়। মেয়েদুটোর এখন কী হবে, শেখের বেটি আসুক, পানি থেকে ওদের তুলে আনে দেখাক কেমন সে পারে! আমরা কিছু চাই না কো আর। নারী হওয়া নারীর মান তিনি রাখুন!

ঘাটের কাছে ছাতিমগাছের নিচে দাঁড়ানো বিবিতার ছোটখালা সাবেরা বেগম তেনার কথা ভাবছেন, তেনার তো অনেক শক্তি, তো তিনি ইচ্ছা করলে কাল সকালেও তাদের জীবন্ত ফিরিয়ে দিতে পারেন, এখানে হাসিনা কি খালেদার ভূমিকা কী সে ভেবে পায় না। শ্যামল তো বলেই দিয়েছে তিনি নিচ থেকে টেনে রেখেছেন! পানির তলে শুনেছে খিজির আলাইহে সাল্লামের ঘরবাড়ি আছে! সেথায় কী হচ্ছে কে জানে! আর একটা কথা, বারবার নদী কাটার কথা হচ্ছে, তো নদী কাটবে, কাটছে, পাড় কাটার কথা তো হচ্ছে না! অথচ সারা গায়ে মারেফের লোকজন বলে বেড়াচ্ছে, সরকার পাড় কাটবে, গাছ কাইটে ফেল! মানুষ পাগলের মতো গাছ কাইটে যাচ্ছে। সত্যিই কি তবে প্রাণ পাওয়া নদী প্রাণ চায় তরুণীর, কিশোরীর কিংবা বালকের! নতুন করে খনন করার জন্য তার পাওনা! কত গল্প শুনেছে ছেলেবেলায় এমন, প্রাণ না দিলি দিঘিতে পানি উঠবে নাকো! এখন তো গল্পও নেই, গল্পের সময় সিরিয়াল গিলে নিয়েছে! গায়ে রাস্তায়ও সিরিয়াল কি গুঁড়া সাবানের অ্যাডভারটাইস!

অমাবস্যার রাতে নদীর কালো টলমল পানি বয়ে যায় বহু বছর পর। নদীর মাঝখানে এতকাল ধানের বীজতলা হয়েছে। এমনকি ভরা বর্ষায়ও পাট ভেজাতে পারেনি নদীতে। এখন শ্রোত, ঘূর্ণিপ্রোত নৌকা উল্টায়, ভৈরব নদ তরুণী চায়! যেসব প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রী ছিল, তারা এখন নীরব। নৌকা ডুবতে না দেখা লোকেরাই বরং বেশি বলে, একটা ঘূর্ণি দিয়ে নাবিয়ে নিয়েছে গো! শ্রোতখানা দেখবেন না! এইটেই তো চাওয়া হয়েছিল, হলো!

তবে দ্বিমত করার লোকও আছে বইকি! দারিয়াপুর মোনাখালির ব্রিজ এতকাল খালি-খালি খটখটে নদীর ওপর অকম্মার মতো বাস-ট্রাক বকে নিয়ে চলেছে। নদী না ছাই! নদীর পানে চাইতেই ইচ্ছে করেনি, কি ছিরি... খুব বেশি হলে চোখে মিলবে রসশূন্য হাড়-জিরজিরে ল্যালব্যালা ধানের বীজতলা। এখন নদী কি ব্রিজ নিশ্চয় খুশি থাকবে, নিচপানে তাকানো লোকগুলো যখন বলে উঠবে, ওরে বাসরে, চায়ে দেখ, কী শ্রোত!

— খাল কেটে কুমির আনেছে! কে যেন বলে ওঠে।

মারেফ মণ্ডল সায় দেয়, পাড় কাটবে আবার পাড়ে ভাঙন লাগবে, তবে না জনগণে বাঁশখান ঠিকমতো দেওয়া যায়। পারে তো খালি ফাঁসির দড়িগাছা লইয়া...

চারপাশে তাকিয়ে কী কারণে থেমে যায়। হয় তার কথা বোঝার লোক ধারেকাছে নেই অথবা ব্যবসার মৌসুমে চুপ থাকাই বুদ্ধির কাজ।

হিসাব মুন্সি কাতর ছিল নিজ স্কুলের কন্যাদের জন্য। অন্ধকারে ঘাটের অদূরে দাঁড়িয়ে স্বজনের মতো নদীর পানে তাকিয়ে থাকে। যদি কন্যারা ভেসে ওঠে! নদীপানে চেয়ে ভাবে তারও তো কথা আছে! বলতে চায়, খাল কেটে কুমির তো কত জনাই আনে! তাই বলে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে মানুষ! জনশ্রুতির কথাই যদি ধরি তো এই বাগোয়ানেই তো গোয়ালা চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতি করতে এসেছিল বর্গিনেতা রঘুজি ভোঁসালা, ত্রাসের ত্রাস! পথ দেখিয়ে এনেছিল গোয়ালা চৌধুরীর নিজ তৈরি যথকিঞ্চিৎ রাস্তাঘাটই! ভূতলে আশ্রয় নিয়েও প্রাণে বাঁচেনি বোচারা রাজা গোয়ালা চৌধুরী। সভ্যতা মানেই তো রাস্তা, পথ! তা তৈরি করবে না! আহা! তাঁরও তো সাধ ছিল বাঁচার! গল্পটা বলতে চায় মুন্সি, বৃদ্ধ আলীবর্দী খাঁ মারাঠা নেতা রঘুজি ভোঁসালার সঙ্গে লড়তে-লড়তে সীমাহীন ক্রান্ত, শেষমেশ সিদ্ধান্ত নেন আপসরফায়। সেই সামান্য সুখের সময়ে আসেন মৃগয়ায়, এই বাগোয়ানের গহিন জঙ্গলে, গোটা তিনেক জাহাজ নিয়ে। জলঙ্গী নদী বয়ে সরস্বতী খাল হয়ে এই বিশাল ভৈরবে জাহাজ থামে। ফাল্গুনের মনোহর প্রকৃতি। বিশাল বাহিনী নিয়ে ভরা দুপুরে শিকার ধরার আশায় চারিদিক থেকে কেবল জমিয়ে

এনেছেন শিকার। ঠিক তখন কোনোরকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই গভীর অরণ্যে প্রবল শীলাবৃষ্টির কবলে পড়েন নবাব। নবাবের বেহাল অবস্থায় মাসিক আট টাকা বেতনের খেদমতগাররা দিঘিদিক ছোটোছুটি করে খুঁজে পান জঙ্গলাকীর্ণ এক পরিত্যক্ত ভগ্নদশা প্রাসাদ। তাতে কয়েক ঘর জুড়ে স্বাস্থ্যবান গাভি আর বাছুর। সবচেয়ে ছোট ঘরটিতে এক তরুণী কি যুবতী বিধবা, এক কিশোর পুত্রসহ ভয়ে কাঁপছেন। ভাবনা ছিল, নির্ঘাত মারাঠাদের আক্রমণ!

মাতাপুত্র আশ্বস্ত হলে নবাবকে আপ্যায়নে লেগে পড়েন রাজু গোয়ালিনী। প্রথমে দেন তাঁর বানানো দই, ছানার সন্দেশ আর ক্ষীর। এতদধ্বলে রাজু গোয়ালিনীর দই-সন্দেশ আর ক্ষীর বিখ্যাত। দরিদ্রলোক এর আশ্বাদ পেত না, পেতেন কেবল বাগোয়ান পরগনার জমিদাররা। বিকেলে পাতে দিলেন ঘি-মিশ্রিত অন্ন আর ঘরের ছাগলের মাংস। সজনেউঁটা আর চালকুমড়ার বড়ির অপূর্ব ঝোল। নবাবের মুখে অনাশ্বাদিত স্বাদ! এসব যে খাবার, এখানে না এলে তিনি জীবনে জানতেই পারতেন না! শেষ পাতে আবার মিষ্টান্ন। নিজ হাতে তিনি খাবার পরিবেশন করলেন, আতিথেয়তা যাকে বলে! রাজু সৌন্দর্যে যেমন অপক্লপা, তেমনি গুণেও তুলনারহিত। গোত্রহীন এই বিধবা, খুবসম্ভব স্বামীর সহমরণের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে এসেছিলেন এখানে শিশুপুত্র কোলে। পরিত্যক্ত সাপখোপ-সমৃদ্ধ জঙ্গল-মহল নিজগুণেই গড়ে তুলেছেন স্বর্গ। কোথা থেকে একটি গাভি পেয়েছিলেন, গোপনে বাপেরই পাঠানো কিনা, কিংবা কোনো জমিদার (!) কে জানে, এক-দুটি গাভি থেকেই হয়তো তাঁকে ঘর ভরিয়ে দিয়েছে ঈশ্বর!

আতিথেয়তায় মুগ্ধ এই নবাব বিধবাকে দান করেন বাগোয়ান মৌজা, পুত্রকে উপহার দেন রাজা উপাধি। রাজা গোপাল চৌধুরী বড় হয়ে রাস্তাঘাট তৈরি করেন জনগণের খেদমতে। এতেই পড়েন মহাসংকটে! কিন্তু মায়ের মতো তিনিও সৃষ্টিশীল মানুষ ছিলেন, বাঁচার মতো বাঁচতে চেয়েছিলেন বইকি! কাঁটার ভয়ে গোলাপকে হেলা করতে শেখেনি যে একেবারে!

এই নদী দিয়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে মেহেরপুরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে একদা। ইংরেজ পাদ্রিরা যেমন আসে দারিদ্র্যের সুযোগে অন্ত্যাজ শ্রেণি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে, গড়ে তুলেছে খ্রিষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান, তেমনি নীলচাষ করিয়ে প্রজাকুলকে সর্বস্বান্ত করতে সে-জাতিই সৃষ্টি করেছে কালো ইতিহাস। কালের সাক্ষী হয়ে নীলকরদের নীলকুঠি এই ভৈরব নদীতীরবর্তী গ্রামগুলোতে আজো আছে। আবার একান্তরে ভরা বর্ষায় প্রমত্তা এই নদীই সেদিন পাকিস্তানিদের আত্মসী যাত্রা রুখে দিয়েছে, যেন-বা মায়ের আঁচল, বিপুল জলরাশি দিয়ে বাঁচিয়েছে গ্রামবাসীকে। প্রাকৃতিক প্রতিরোধ, দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

সকালে আলো ফোটার বহু আগেই ভৈরব পাড়ে সমুৎসুক মানুষ। ‘ডুবুরি আসে না কেন কিংবা শ্যামলও তো এখন নেবে এটু চেষ্টা করতে পারে!’ মাঝনদী বরাবর শ্রোতরাশি ঘূর্ণি দিয়ে-দিয়ে চলে যায়, জোয়ারের সময়। বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখে, এত পানি! পাড়-ছুঁছুঁই পানি। পাড়ের গাছ কেটে উজাড় করেছে, গোড়া হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে আছে। কদারগঞ্জে ট্রাকে লোড হচ্ছে গুঁড়ি, কড়াই, মেহগনি, সেগুন, বাবলা, নিম অল্প কিছু শিশু। চুরানব্বইয়ে বেশিরভাগ শিশু অজানা রোগে মারা পড়েছিল যে! অভিজ্ঞরা আর বপন করেনি। পানির দামে কেনা গাছ, শহরে গিয়ে সোনা হবে। মারেফ মণ্ডলের কাঠের আড়তের কাজ বন্ধ করে শ্রমিকরা এখন এসব নিয়েই মহাব্যস্ত গ্রামে। ক্ষমতায় থাকারা জোর-কদমে গুরুর আগে যতটা সম্ভব দ্রুত কাজ সেরে ফেলতে হবে। কোনো-কোনো পাড়ে তারাও নাকি বৈদ্যুতিক করাত নিয়ে এসেছে। কোথা থেকে কখন কী হয়ে যায়, তো তাড়াতাড়ি গাছকাটার কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে!

রসিকপুরের খেয়াঘাটে ভোরেই ডুবুরি নামে শ্রাবণের ভরা নদীতে। পাড়ের খুব কাছেই ছিল তারা, ছিল দুজন গলাগলি করে। উঠিয়ে খুব কষ্টে তাদের ছাড়ানো গেল।

তরুণী চাওয়া পূর্ণপ্রোত পাওয়া ভৈরবের বদনাম আর যে করে করুক, হিসাব মুন্সি করতে নারাজ। □



মান-সম্মান

ফারুক মঈনউদ্দীন



লি

ফটের সামনে অনেক লম্বা সারি। একেকবার লিফট নেমে এলে পিলপিল করে লোক চুকে পড়ছে, ঠেলেঠেলে শেষ লোকটি ওঠার পর লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে আবার নাট্যমঞ্চের পর্দার মতো দুপাশে খুলে যায়। তখন ভেতরে টুলে বসা লোকটা বিরজিতে উঠে দাঁড়ায়, এই যে লাস্টে কে উঠসেন, নাইমা যান, ওয়েট বেশি। সবশেষে ওঠা লোকটি তার আশপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে খোঁজার ভান করে কে উঠেছে তার পরে। কয়েকজন লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে, এই যে ভাই আপনি লাস্টে উঠসেন, নাইমা যান। লোকটা বিকারহীন দাঁড়িয়ে থাকলে লিফটম্যান বলে, থাকেন তয়, লিফটও যাইব না। তখন ভেতরে দাঁড়ানো যাত্রীরা সমস্বরে, কী, কথা কানে যায় না? আজব মাল তো? এসব কথা বলে লোকটিকে প্রায় ঠেলে বের করে দিলে লিফটের দরজা যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধ হয়। অপেক্ষমাণ



অলংকরণ : নির্ঝর নৈশন্দা

মানুষের সারির বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রেহানউদ্দীন আর নাজের আলী কয়েক দফা এরকম কায়-কারবার দেখে আপনমনে হাসে। দুজনই প্রায় একসঙ্গে মজা পেয়ে হাসে বলে কেউ কাউকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করে না।

এ মুহূর্তে ওদের হাতে করার মতো তেমন কোনো কাজ নেই। এই বিল্ডিংয়ের ছয় তলায় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে এসেছিল ওরা। ওদের গ্রামের ছেলে মনিরুল মন্ত্রণালয়ের সচিবের পিয়ন। ওর কাছেই আসা, সচিব সায়েবকে ধরে ওদের দুজনেরই ছেলের জন্য কিছু একটা চাকরির ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে আশ্বাস দিয়েছিল মনিরুল। সরকারি অফিসের চাকরি পাওয়ার পর ছুটিছাটায় গ্রামে গেলে মনিরুল বেশ ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গত ইলেকশনে সরকার পরিবর্তনের পর মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে কাজ করে বলে মনিরুলের ভাব আরো বাড়ে। সেবার বেশ কদিন পরে গ্রামের বাড়িতে এসে বলে, মুক্তিযুদ্ধের সরকার আসিছে ক্ষমতায়, আমাদের মন্ত্রণালয়ের কাজকামও মেলা বাইড়ে গেছে। বারেকের চায়ের দোকানে বসে গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের নিজের অফিসের গল্প শোনায়, এ্যাহন যে-সচিবসাব আইসে বুইছিস, খান সেনার সাথে যুদ্ধ করা মানুষ। একলা থাকলে আমরা ডাইকে নে যুদ্ধের গল্প শোনায়। বলে, যুদ্ধ কইরে দেশ স্বাধীন করলাম মনিরুল, এত বছর অয়ে গেল, এ্যাহনো অনেক কাজ বাকি। দেশের সোপালে যদি সৎ থাকে, তাহলি আমরা আরো উন্নতি করতি পারতাম। আরেকদিন কলো, আমরা যদি যুদ্ধ না করতাম, আমি আর সচিব হতি

রেহানউদ্দীন অনেকটা আপন মনেই বলে, অই যে মুক্তিযোদ্ধার কোটার কতা কচ্ছিল না মনিরুল? ওসব কতা ভাবিছি কহনো? কিছু পাওয়া যাবে ইসব চিন্তা কইরে যুদ্ধে যাইনি তো।

পারতাম না, তুমি মনিরুল সরকারি চাকরি পায়ে দুডো পয়সার মুখ দেখতি পাইরতে না, তোমারে গ্রামে বইসে লাঙ্গল ঠেলতি অতো।

কে একজন ফোড়ন কাটে, উরি বাবা, তোর সাথে সচিবসায়ের অত কতা কয়?

মনিরুল একথার সরাসরি জবাব দেয় না, বলে, শোন, সচিবসায়ের আমারে কিরাম ভালবাসে জানিস না তো!

— শুদু তোরে ভালবাসে ক্যান? আর কেউরে পছন্দ করে না?

— ফালতু কতা কচ্ছিস ক্যান? আমি বলিসি যে শুদু আমারে পছন্দ করে? ওরাম মাটির মানুষ সোপালরেই পছন্দ করে।

— ও আচ্ছা, আমি ভাবলাম শুদু তোরে পছন্দ করে।

মনিরুলের কথাবার্তা শুনে নিজেদের দীর্ঘ লালিত অথচ প্রায়বিস্মৃত যুদ্ধকালীন ভূমিকার কথা স্মরণে এলে রেহানউদ্দীন আর নাজের আলী পরস্পরের মধ্যে স্বপ্নমাখা দৃষ্টিবিনিময় করে। গ্রামের ছেলে মনিরুলের বড়সায়ের মুক্তিযোদ্ধা জেনে অপরিচিত সফল মানুষটির সঙ্গে এক ধরনের একাত্মতা অনুভব করে দুজনই। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের সচিবের খাস লোক বলে ক্ষণেকের জন্য মনিরুলও যেন তাদের কাছে গ্রামের ছেলের অধিক আপন হয়ে ওঠে। মনিরুলের কথাগুলো কিংবা ওর বন্ধুদের ঠাট্টা-ইয়ার্কি ওদের কান পর্যন্ত পৌঁছয় না। উনিশ-বিশ বছরের যুবা বয়সে ওরা দুজন যখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আরো কয়েকজনের সঙ্গে একরাতে বাড়ি ছাড়ে, তখন এমনকি তাদের চোখে দূরগত কোনো স্বপ্নও ছিল না, কোনো হিসাব ছিল না চাওয়া-পাওয়ার। পাকসেনাদের নির্বিচার হত্যা আর নির্যাতনের বদলা নেওয়াই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর সেটা করতে গিয়ে আস্ত এক বিশাল দেশের পরিচয় বদলে ফেলতে যাচ্ছে সেটুকুও বোধকরি তাদের কল্পনায় ছিল না।

এত বছর পর যুদ্ধের দিনগুলোর কথা যখন বহুদূর থেকে শুনতে পাওয়া ধ্বনির মতো হয়ে এসেছিল, তখন মনিরুলের বড়সায়ের সফল জীবন কিংবা যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আক্ষেপের কথা তাদের ভেতরের মলিন আবরণ সরিয়ে তুলে আনে যুদ্ধদিনের স্মৃতি।

মনিরুলের বন্ধুরা ওকে খুঁচিয়ে যখন প্রায় কোণঠাসা করে ফেলে তখন রেহানউদ্দীনের ডাকে যেন কূল পায় ছেলেটা, অ মনিরুল, কোন সেক্টরে যুদ্ধ করিসিল তোর সায়েব, জানিস?

এই দুই বয়স্ক মানুষের মনোযোগ পেয়ে মনিরুলের মিয়োনো ভাব আবার জেগে ওঠে। নিজের জায়গা ছেড়ে ওদের সামনের বেঞ্চে গিয়ে বসে বলে, তা তো জানিনে কাহা। ইবার যায়ে জিজ্ঞেস করবানে। বড় সায়েবরে অত কতা জিজ্ঞেস করা যায়, কনদি?

পেছন থেকে কে যেন ফোড়ন কাটে, তোরে অত ভালোবাসে গল্পো দিলি, অত কতা জিজ্ঞেস করলি অসুবিধে কি?

মনিরুল খিঁচিয়ে ওঠে, শালা আঙুল দিচ্ছো না? আরে শালা বিটা, খামোখা জিজ্ঞেস করতি যাব কোন সেক্টরে যুদ্ধ করিছিল?

ছেলেগুলো হ্যা হ্যা করে হাসে।

রেহানউদ্দীন ওদের বলে, মিছেমিছি ওরে খ্যাপাচ্ছিস ক্যান? অ মনিরুল, তোর সায়েবরে কয়ে আমার ছাওয়ালডার একটা কিছু ব্যবস্থা কইরে দিতি পারিস বাপ?

মনিরুল এই নতুন আবদারে একটু থমকে যায় কিছুক্ষণের জন্য, তারপর সামলে নিয়ে বলে, সায়েবরে কবানে যায়ে। ইন্টার পাশ করিসে না আপনার ছাওয়াল?

— হ, বি কম তো ভর্তি অলো।

নাজের আলী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এরডা হলি পর আমারডার কিছু একটা করা যায় কি না দেহিস ক্যানে। গার্মেন্ট কারখানায় কাজের কোনো ভবিষ্যৎ আছে নিহি?

মনিরুল চেহারায় দু-দুটো তদবিরের গাঙ্গীর্থ, যেন চাকরি তো দেওয়াই যায়, কোথায় পোস্টিং দেবে সেটাই ভাবনার বিষয়।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে, ও আপনাগের জন্যি তো মুক্তিযোদ্ধার কোটা আছে। আমি অফিসে যায়ে আলাপ কইরে জানাবানে। আমারে মাঝে-মাঝে মনে করায় দিতি অবৈ কলাম, ঢাকা গেলে কাজের ঠেলায় মনে নাও থাকতি পারে।

সেদিন মনিরুলের মোবাইল ফোন নম্বর নিয়ে রেখেছিল ওরা, যাতে মনে করিয়ে দিতে পারে।

এর পর মনিরুল ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে যায়, বলে, যাই গো কাহা, মেলা কাম পইড়ে আছে।

সেদিনের পর কয়েক মাস কেটে গেলেও মনিরুলের কাছ থেকে কোনো নির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায় না। ফোন করলে নানান ঝামেলা, সচিবসায়েরকে কায়দামতো ধরা যায়নি — এসব ছাড়া নতুন কোনো খবর দিতে পারে না ও। নাজের আলী রেহানউদ্দীনকে বলে, এ বিটা ঢপ দিচ্ছে নাতো?

— কিডা কবে? আমরা ওর ধারে টাহা-পয়সা দিয়ে ঠেইকে পড়িসি নিহি? হলি হবি, আমরা তো আর জোরাজুরি কত্তি কচ্ছিনে।

বারেকের দোকানে বসে দুজন গুনগুন করে কথা বলে। মনিরুলের বন্ধুদের কেউ-কেউ ওদের দেখে বলে, ও কাহা, আপনার ছাওয়ালের কিছু অলো? মনিরুল যে খুব ভাব দেহায়ে গেল?

রেহানউদ্দীন নাকি নাজের আলী বলে, এহনো অয়নি, ও কিছু করতি পারবে মনে অয় না। গ্রামের ছাওয়াল, না পারলিও দোষের কিছু নেই। ও তো আমাগের কাছ থে টাহা-পয়সা নিচ্ছে না। আর পারলিও ইসব কি আর ওয়ান টুর মদি অয়?

একথার জবাব হয় না বলে ওরা চুপ করে যায়।

রেহানউদ্দীন অনেকটা আপন মনেই বলে, অই যে মুক্তিযোদ্ধার কোটার কতা কচ্ছিল না মনিরুল? ওসব কতা ভাবিছি কহনো? কিছু পাওয়া যাবে ইসব চিন্তা কইরে যুদ্ধে যাইনি তো। এই যে নাজের আলী পাঞ্জাবিগের সাথে যুদ্ধে গুলি খায়ে পইড়ে গেল, ওরে বাঁচাতি যায়ে আমি মরতি পারতাম, নিজের জানের কতা ভাবিসি? ওরে উঠোয়ে নে ভাইগে আসিছি না?

নাজের আলী ওঁর রান্না করা নুডলসের মতো দাড়ির ফাঁকে হাসে কৃতজ্ঞতার সলজ্জ হাসি, চোখের নিচের বলিরেখাগুলো বর্ষার খালের মতো উপচে ওঠে। ও কেবল বলতে পারে, ও সেদিন আমারে উঠোয়ে না নিলে পইড়ে থাকতাম, ধইরে নে মাইরে ফেলাইতো পাঞ্জাবিরা। দোকানে খন্দের ধরে রাখার জন্যই হোক কিংবা মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার জন্যই হোক, কাউন্টারের পেছন থেকে বারেক গলা তুলে বলে, কী হয়েছিল কন-দি। মেলা আগে একবার গুনিছিলাম, অত মনে নেই। এহনকার ছাওয়াল-পাওয়াল ইসব কিছই জানে না।

রেহানউদ্দীন বলে, আগেও বলিছি বহুবার। একবার খবর পালাম হাই স্কুলের মাঠে বড় কইরে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান করবে শান্তি কমিটি। স্কুলের মধ্য আর্মি ক্যাম্প, মাঠে অবৈ অনুষ্ঠান। তাহলি মিলিটারির বড় অফিসার থাকবে, রাজাকার লিডার, জামায়াতে ইসলামী আর মুসলিম লীগের নেতারাও থাকবে। খবর পায়ে দফায়-দফায় মিটিং করল কমান্ডার আমাগের নিয়ে, ঠিক অলো এই অনুষ্ঠান বানচাল করতি অবৈ। অনুষ্ঠান করতি দেওয়া যাবে না নে।

এটুকু বলে রেহানউদ্দীন থামে। তার চোখ অতীতে ফিরে যায়। কিছুক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বসে থাকে চুপ করে। নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলে ও, কী মারাত্মক বিপদ মাথার কইরে ইরহম একটা অপারেশন চাললাম আমরা, ভাবলি পর এহনো গায়ের পশম দাঁড়ায়ে যায়।

রেহানউদ্দীন বলে চলে, কীভাবে অন্য ক্যাম্প থেকে আরেক দলকে এনে বড় করা হয়েছিল আক্রমণকারী দল। দলের প্রত্যেককে কয়েকবার করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, কারা কোন দিক থেকে স্কুলের

কাছাকাছি পজিশন নেবে। তিন দিকে থাকবে মুজিবাহিনী, শুধু খালের দিকটা খোলা রাখা হবে, পালানোর জন্য কেউ নৌকায় উঠলে সহজ হবে টার্গেট। কমান্ডার বলে দিয়েছিল, শত্রুপক্ষের কাউকে ফেলে দেওয়া না গেলেও দুটো কথা মনে রাখতে হবে, নিজেদের কেউ যাতে জখম না হয়। মারতে পারলে তো ভালো, কিন্তু একটা ভারি আক্রমণ হলে আর যা-ই হোক অনুষ্ঠান করার সাহস পাবে না ওরা। তবে আচমকা আক্রমণে দু-চারটা লাশ তো পড়বেই। ঠিক হয় স্কুলের পাশের মসজিদ থেকে ফজরের আজান শেষ হওয়া মাত্রই একসঙ্গে আক্রমণ শুরু করতে হবে, এটাই হবে সংকেত। ওদের হাতে অটেল গোলাবারুদ নেই, তাই সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র একটা হামলা শেষ করে নিরাপদে দূরে সরে পড়তে হবে তাড়াতাড়ি। হামলা শেষ হওয়ার সংকেত দেওয়ার জন্য কমান্ডার দারুণ এক বুদ্ধি বের করে। আজানের পর নামাজ শুরু হওয়ার আগে যে পনেরো মিনিট সময় থাকে তার মধ্যে হামলা শেষ করতে হবে। কমান্ডার নিজেই মসজিদের মাইকে যখন বলবে, ভাইসব ভারতীয় দালাল দুষ্টকারীরা আমাদের ওপর হামলা করেছে, আপনারা ভয় পাবেন না, আল্লাহ্ আকবর, ঠিক তখনই হামলা বন্ধ করে দ্রুত সরে পড়তে হবে। ব্যাপারটায় ঝুঁকি আছে, কিন্তু এটা এমনই নতুন কায়দা, ঘুম ভাঙা চোখে হঠাৎ হামলায় ওরা এতই দিশাহারা থাকবে যে, ওদের মাথায় আসবে না কিছু। গোলাগুলি শুরু হলে মসজিদে মুসল্লিদের কেউই আসবে না। তারপর তিন দল তিন দিক থেকে হটে যাবে, খালের পাড় ধরে দুদিকে দুদল, আরেক দল যাবে বাজারের ঘন ঘরগুলোর ভেতরের অলিগলি ধরে। সবাই মাথায় টুপি পরে নেবে, যাতে কেউ দেখলে ভাবে মুসল্লি ফজরের নামাজে যাচ্ছে, অস্ত্র আড়াল করে রাখতে হবে যতদূর সম্ভব।

— সব ঠিকঠাক চলল, দূর থেইকে ক্রলিং কইরে গিয়ে আমরা পজিশন নিয়ে বইসে আছি, মশা কামড়ায় শরীর ছঁাদা করে দিচ্ছে, চাপড় মারা যাবে না, শব্দ আর নড়াচড়া যত কম করা যায়। তারপর শুরু অলো আজান, আস সালাতো খায়রুম্মিনাল্লাউম, আল্লাহ্ আকবরের পর লাইলা হা ইল্লাল্লা শেষ হওয়ার সাথে-সাথে শুরু অয়ে গেল, ব্রাশফায়ার আর থ্রেনেড। ইকটু পরে ওপাশ থেইকেও শুরু অলো গুলি। ভেতর থেইকে নানান রহমের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, কি হচ্ছিল কিছু বোঝা যায় না। পোরথমে মোনে অলো কেয়ামত শুরু হয়েসে। আমরা থাইমে-থাইমে গুলি করতিসি, আর ইকটু-ইকটু কইরে পেছুয়ে যাচ্ছি। পনরো মিনিট শেষ অয়না যেন। আমাগের গুলি শেষ অয়ে যাবে তাই ফায়ার কমায়ে দিলাম। আমার পাশে নাজের আলী, কলো, এহন কাইটে পড়া উচিত। শেষ থ্রেনেডটা মাইরে কাটা গাছের মতো মাটিতি পড়ার আগেই গুলি আইসে লাগল ওর কাঁধের মাংসে। ভয় পায়ে গেলাম। নাজের আলী তো কাঁইদে ফেলাইল, কয়, আমরা ফেলায়ে যাইসনে যেন। আমিও চিন্তা করলাম ওরে ফেলায়ে রাহা যাবে না নে। ধরা পড়লি সব শেষ, অত্যাচার কইরে কতা বাইর কইরে নেবে সব। ওর গামছা দে ভাল কইরে বাঁইধে দিলাম কাঁধের জখমি। তহন মাইকে কমান্ডারের গলা শোনা গেল। ওরে নিয়ি ক্রলিং কইরে খাল পাড়ের দিকে যায়ে পোরথমে হাতের অস্ত্র ঢুকোয়ে দিলাম কেয়াঝোপের মধ্যি, তারপর এক গড়ান দিয়ে পড়লাম পানিতে। ধল পহর শুরু অয়নি তহনো। আমাগের পক্ষের গোলাগুলি বন্ধ, কিন্তু ক্যাম্পের ভেতরখে আন্দাজের ওপর ভর কইরে ধুমায়ে গুলি চালায়ে যাচ্ছে পাগলের মতোন। আর আমরা ভাইগে যাচ্ছি। আমাগের গলা পর্যন্ত পানির নিচে, অন্ধকারে মাথা জাগায়ে এরে ধইরে হাঁটতি থাকি ভাটির দিকে। খেয়াল রাখতি হচ্ছিল পানি যান বেশি না নড়ে। আল্লারে ডাকতিসি, ক্যাল মোনে হচ্ছিল পেছন থেইকে গুলি আইসে লাগবে মাথায়। কখন খাল পারোয়ে ওপারে

উইঠে আসিছি মোনে নেই, তহন বুঝতি পারলাম যান বাঁইচে আছি। নাজের আলী এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, এই সেদিন আমরা ফেলায়ে গেলি ধরা পইড়ে যাতাম ওগের হাতে। এরপর কী যে অতো আল্লা মালুম। হাজার শোকর গুলিডা মাংস ছিড়ে বারোয়ে গিইলো। ওর খালার বাড়িতে আমরা লুকোয়ে রাইখে ডাক্তারের ধারে গেল ও। রাতের বেলা ডাক্তার আইসে দেইখে কলো ভয়ের কিছু নেই গুলি বারোয়ে গেছে। তাবাদে পরিষ্কার কইরে ব্যাভেজ বাঁইদে দিলো।

রেহানউদ্দীন ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আরে খালার বাড়ি মানে খালার শউর বাড়ি, তারা থাকে ঢাকায়। এরে পুহুরি পাড়ে জোঙ্গলের মদ্যি বসায়ে গেলাম বাড়ির ভেতর। বুড়ি দরজা খোলে না ভয়ে, জোরে কতা কওয়াও যাচ্ছে না, যত বলি, আমি রেহান গো নানী, সে ক্যাল বলে, কিডা। বহুত কষ্টে তারে বোজাই আমি কিডা। বুড়ির বুদ্ধি আছে, ওয়ান টুর মদ্যি বুইঝে ফেলাইসে। তারপরে এরে নিয়ে ঢুকোয়ে দিলাম বুড়ির ঘরে।

একজন জিজ্ঞেস করে, কেউ দ্যাহেনি তোমাগের?

— বরাতজোরে বাঁইচে গেছি। আর তহন তো ইরহম গায়ে গা লাগানো বাড়িঘর ওডেনি। আমরা যহন চাষের জমির ওপর দে হাঁইটে যাতাম ইদিক-ওদিক, মাইলের পর মাইল জনমনিষ্যির দ্যাহা মিলত না।

— সেদিন ইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠান হয়েছিল?

— মিলিটারি মরিসিল কয়ডা?

— আমরা তো কদিন আর ধারে-কাছে যাইনি, পরে শুনিসি ওরা লাশ আর জখমি মিলিটারি নে এমন দৌড়োদৌড়িতে ছিল, চোদ্দেই অগাস্ট চাঙ্গে উইঠেসিল। কতোজন মারা গিইলো কেউ ঠিকঠাক কতি পারেনি, কেউ বলিসে পাঁচজন, কেউ বলিসে আটজন।

বারেকের ইচ্ছে পূরণ করেই হয়তো দোকানে বহু খন্দের জমে যায় সেদিন।

কয়েকদিন পর মনিরুলকে ফোন করে রেহানউদ্দীন, না, নতুন কোনো খবর দিতে পারে না ও। রেহানউদ্দীন তবু বলে, ইটু দ্যাহিস ক্যানে বাপ।

মনিরুল বলে, ইবার সায়েব দেশে ফিরলিই কবানে। আগামী মাসে ফোন দিয়েন দি একবার। সায়েব আসলে খুব ব্যস্ত, তারে মোডে একলা পাওয়াই যায় না।

পরের মাসে ফোন করলে মনিরুল বলে, কাহা এমন কইরে অবৈ নানে। আপনারা চইলে আসেন দি, আপনাগের সাথে নিয়ি সায়েবেরে ধরবানে।

ঢাকা যাওয়ার কথা শুনে রেহানউদ্দীন দোনোমোনো করে, ঢাকায় যায়ে থাকবানে কোয়ানে? নাজের আলী বলে, ছাওয়ালের ওহানে গেলি পর ব্যবস্থা অয়ে যাবেনে।

সেই ফোনের কথাতেই ওদের ঢাকা আসা। তা নাজের আলীর ছেলে ব্যবস্থা করেছিল। ওর শোয়ার জায়গায় বাপ আর রেহানউদ্দীনের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে ও পাশের ঘরে আরেক জনের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে কয়েকদিনের জন্য।

প্রথম দিন ঢাকা শহরের ভাব চক্কর বুঝতে, উত্তর দক্ষিণ ঠাওর করতেই কেটে যায় তাদের। পরদিন মিরপুর থেকে ছেলের বাতলানো পথে বাসে করে প্রেসক্লাবের সামনে নামতেই পিলপিল করে ছোট্ট অফিসযাত্রীদের মিছিলের মধ্যে পড়ে খেই হারিয়ে ফেলে নাজের আলী। রেহানউদ্দীন ওর পাঞ্জাবির খুঁট ধরে রাখায় হারিয়ে যায়নি কেউ। তারপর একে ওকে জিজ্ঞেস করে এসে পৌছে মনিরুলের অফিসে। ওর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল বলে ও নিচে নেমে এসে ওদেরকে লিফটে তুলে ওপরে নিয়ে যায়। যাওয়ার পথে বেশ ভাব নিয়ে লিফটে উঠে কত তলায় এসে নামতে হবে, তারপর কোনটা

কোন সায়েবের রুম এসব দেখাতে থাকে। রেহানউদ্দীন অধৈর্য হয়ে বলে, তোর বড় সায়েবের সঙ্গে দ্যাখা করবানে কহন?

মনিরুল বলে, অত তাড়াহুড়ো করলি চলবে না নে। সায়েব আসেনি এখনো। আর আসলিও ওয়ান-টুর মদি দেহা অয়ে যাবে মোনে করিছ? সায়েবের ম্যালা কাজ, ম্যালা মিটিং।

রেহানউদ্দীন নাকি নাজের আলী কে যেন বলে ওঠে, তাহলি আমাগের আসতি বললি যে? মনিরুল একটু গলা খাটো করে বলে, আরে সে জন্যই তো আসতি বলিছি। এহানে দুয়েকদিন ঘোরাঘুরি করলি মওকা মিলে যাতি পারে। তোমাগের তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট কইরে দেখা করানো যাবে না নে।

রেহানউদ্দীন উদ্ভ্রান্ত চোখে ওর দিকে তাকায়, তাহলি এহানে কদিন বইসে থাখা লাগবি আমাগের?

মনিরুল বলে, বইসে থাখা লাগবি ক্যান। এহানে ওহানে ঘুইরে ফিরে থাকবা। কাছে বায়তুল মোকাররম মসজিদ আছে, দেইখে আসতি পারো, নামাজ পড়তি পারো। স্টেডিয়াম, গুলিস্তান ঘুইরে দেখতি পারো। পাশে প্রেসক্লাব, খোদার তিনশ পঁয়ষট্টি দিন কিছু না কিছু একটা লাইগেই আছে, দেখতি-দেখতি সোমায় কাইটে যাবেনে, মোডে টেরই পাবানা।

পানের পিক দাগানো দেয়ালের কোণ ঘেঁষে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে ওরা বোঝার চেষ্টা করে, মনিরুল সত্যিই পারবে কি না ওদের দেখা করাতে। তবে কেউ কোনো কথা বলে না। নিচে নেমে নাজের আলী বলে, এ বিটা ঢপ দিচ্ছে না তো আমাগের? রেহানউদ্দীন সান্ত্বনা দেওয়ার মতো বলে, আইসেই পড়িছি যখন দুই-চার দিন দেইখে যাই। কিছু না হলি পর চইলে যাবানে।

ওরা অলস অনিশ্চিত পায়ে প্রেসক্লাবের সামনে চলে আসে। ওখানে ফুটপাতে ব্যানার টানিয়ে কারা যেন হাতে হাত ধরে লাইন ধরে দাঁড়ানো। ওরা এসবের আগ-মাথা কিছু বোঝে না। ফুটপাতের দোকান থেকে চায়ের ভেতর বনরুটি ডুবিয়ে খেতে-খেতে ওরা বাসের তীব্র শব্দ, রিকশার অন্তহীন সারি আর দলা পাকানো মানুষের ভিড়ের ভেতর অনাহৃত অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। এসময় মানববন্ধন করা মানুষের পেছন থেকে মাইকে স্লোগানের বিকট শব্দ হলে ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। নাজের আলী বলে, কি কচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রেহানউদ্দীন মাইকের আওয়াজের ভেতর থেকে গলা তুলে বলে, কিডা কবে? মনিরুল কলো না, এহানে কিছু না কিছু একটা লাইগেই থাকে সারা বোচ্ছর?

এ মুহূর্তে কিছু করার নেই ওদের। মনিরুলের কাছে গিয়ে ওর বড় সায়েব এলেন কি না, এলে দেখা করা হবে কি না, এই খোঁজ নিতেও মন চায় না আর। তাই উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায়। হাইকোর্টের গেটের পাশে পাকুড় গাছটার নিচে কিছু সময় বসে। আবার রাস্তার ধার ঘেঁষে হেঁটে-হেঁটে বাতাসে এলোমেলো উড়ে যাওয়া কাগজের টুকরোর মতো এদিক-সেদিক যায়। ওসমানী উদ্যানের ভেতর পুকুর পাড়ে বসে থাকে চুপচাপ। পুকুরের নোংরা পানিতে হাড় জিরজিরে ঘোড়াদের গোসল করাতে দেখে নাজের আলীর নিজ বাড়ির কথা, বাড়ির পুকুরের পানিতে নামিয়ে গরুর গা ধুইয়ে দেবার কথা মনে পড়ে। হঠাৎ বলে ওঠে, এহানে পইড়ে থাহার দরকার আছে আর? চল রেহান ভাই, আইজ রাতের কোচে উইঠে পড়ি। রেহানউদ্দীন বলে, আরে আমি কি বলিছি এহানে থাইকে যাব। কলাম না? আইসি যখন দুডো দিন দেইখে যাই। এর মদি কিছু না হলি চইলে যাবানে।

দুদিন ভাবলেও আরো তিনদিন ধরে এখানে সেখানে আনাগোনা করতে করতে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের অফিস, বারান্দা আর গেটের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায় ওরা। ওদের ইতস্তত অনিশ্চিত ঘোরাফেরা দেখে সেদিন একজন এগিয়ে আসে কাছে, বলে, চাচা, সমস্যা আছে কোনো? মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট লাগবনি? শস্তায় করাই দিমু। রেহানউদ্দীন লোকটার ধূর্ত চেহারা দেখে সাবধান হয়, না ভাইডি,

আমাগের কোনো সমস্যা নেই, বলে এগিয়ে যেতে চায়। লোকটা পিছু ছাড়ে না, বলে, কিছু কাম থাকলে কন, আমার মানুষ আছে মন্ত্রণালয়ে। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা করাইবেন? রেহানউদ্দীন লোকটাকে কাটানোর জন্য বলে, আমাগেরও মানুষ আছে। কিছু লাগবে না নে। তবুও এঁটুলির মতো কিছুক্ষণ ওদের পেছন-পেছন লেগে থাকে সে। লোকটার ভাবগতিক সুবিধার মনে হয় না ওদের, তাই দ্রুত হেঁটে রাস্তায় চলে আসে দুজন।

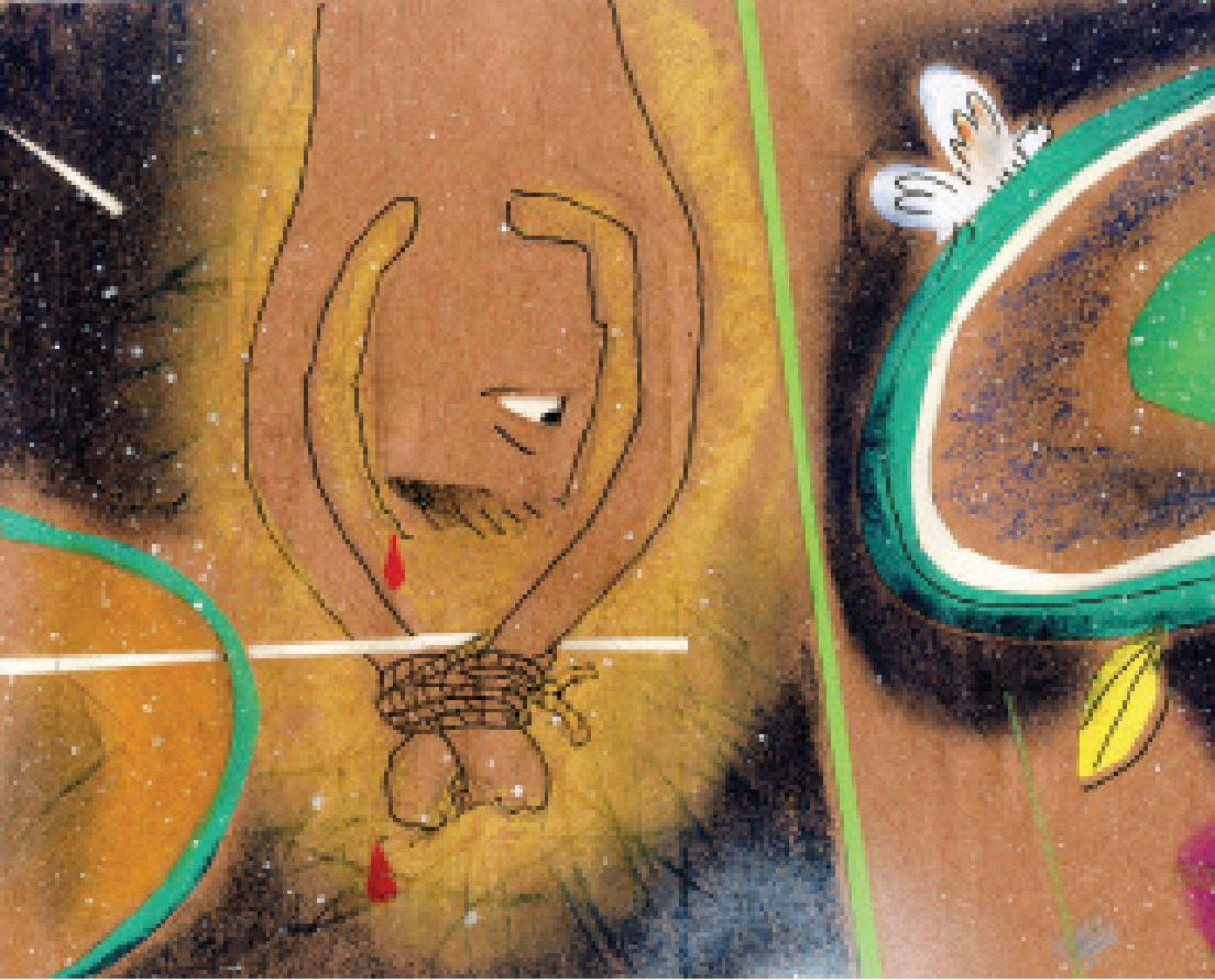
এভাবে এদিক সেদিক উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে মনিরুলের কাছে গেলেই বলে সায়েব তো মিটিং-এ, সায়েব পিএম অফিসে, কখনো বলে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। অফিসে থাকলে বলে, অপেক্ষা কর দেহি, সায়েবেরে ফ্রি পাই নাকি। কিন্তু মনিরুল কোনোভাবেই সায়েবের সঙ্গে দেখা করাতে পারে না।

সেদিন ফিরে যাওয়ার মনস্থির করে সকালে ছোট রোঁয়া-ওঠা ব্যাগট্যাগ নিয়ে ওরা মনিরুলের অফিসে চলে যায়, কিছু না হলে এখান থেকেই বাড়ির পথ ধরবে। উঁচু বিল্ডিংটার গেটের কাছে জটলা দেখে থমকে যায় ওরা। ক্যামেরা হাতে লোকজনের ভিড়ে গেট পর্যন্ত পৌঁছানো যায় না। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না আনসার বাহিনী। ওরা বোঁচকা-কাঁধে ভিড় বাঁচিয়ে দূরে দাঁড়ায়, যদি মনিরুলের দেখা পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বুঝে উঠতে পারে না কিছু। সাংবাদিকরা ভেতরে ঢুকতে চাইলে গেটের আনসারের গলা শোনা যায়, ওপরের অর্ডার।

এ সময় দেখা হয়ে যায় মনিরুলের পরিচিত আরেক জনের সঙ্গে। পর পর কয়েকদিন এই অফিসে যাওয়ার সুবাদে ওদের চেনে ছেলেটা, কী কারণে ঘোরাঘুরি করছে এই কদিন, তাও জানে। ওকে দেখে যেন হালে পানি পায় ওরা, বলে, এ বাবা, আমাগের ঢুকতে দিচ্ছে না ক্যান? ছেলেটা বলে, কাউরেই ঢুকতে দিতাসে না। নিষেধ আছে।

রেহানউদ্দীন বলে, ক্যান কতি পারো? ছেলেটা গলা নামিয়ে বলে, আপনারা চইলা যান। ঢুকতে পারলেও লাভ নাই। সচিব সায়েব ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দিয়া চাকরি করতছিল এতদিন, এতদিন পর ধরা খাইসে। উনার আরো বহুত কিছু বারাইয়া আইতাসে। স্যারেরে ওএসডি করা হবে। এটুকু বলে ছেলেটা ব্যস্ত হয়ে ভেতরের দিকে চলে যায়। নাজের আলী বোকার মতো বলে, কী করা হবে কলো? রেহানউদ্দীন সেখান থেকে সরে এসে বলে, কিডা কবে? রাস্তায় নেমে এসে হাঁটতে থাকে দুজন, কেউ কিছু বলে না। কড়া রোদের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে বড় শিল কড়ই গাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। নাজের আলী কিছু না বলে রেহানউদ্দীনের মুখের দিকে তাকায়। সেখানে ক্রোধ বা হতাশা কিছুই বোঝা যায় না। হঠাৎ করে রেহানউদ্দীন হাসতে শুরু করে, দ্রুত তপ্ত হয়ে ওঠা সকালের তেজি রোদের আলোর নিচে এলোমেলো হেঁটে যাওয়া ব্যস্ত জনারণ্যের মাঝে সে হাসি বেমক্কা মানে হয় নাজের আলীর কাছে, পাশ দিয়ে হেঁটে-যাওয়া কেউ-কেউ এমন হাসির শব্দে কৌতূহলে একঝলক তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। নাজের আলী অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলে রেহানউদ্দীন আচমকা হাসি থামিয়ে থম ধরা গলায় বলে, আল্লা যা করে ভালোর জন্যি করে, ঠিক না? আমরা দুই আসল মুক্তিযোদ্ধা আইছিলাম এক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার কাছে তদবির করতি। মানীর মান আল্লায় রাহে, কী কও নাজের মিয়া। ইরহম দুনম্বরী মানঘির ধারে ভিক্ষা চাইতি আইছিলাম আমরা ছাওয়ালের চাকরির জন্যি? অলো না চাকরি, সম্মান বাঁচিসে, এডাই শান্তি। লাখি মারি ওরহম চাকরির মুহি। লও, বাড়ি যাই।

নাজের আলী কিছু বলে না, রেহানউদ্দীনের চেহারার দিকে তাকিয়ে কিছু বলার সাহস পায় না। তারপর উলটোদিকে গিয়ে বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকশ মানুষের তুচ্ছ একাংশ হয়ে ওরা অপেক্ষা করে পরবর্তী বাসের জন্য। □

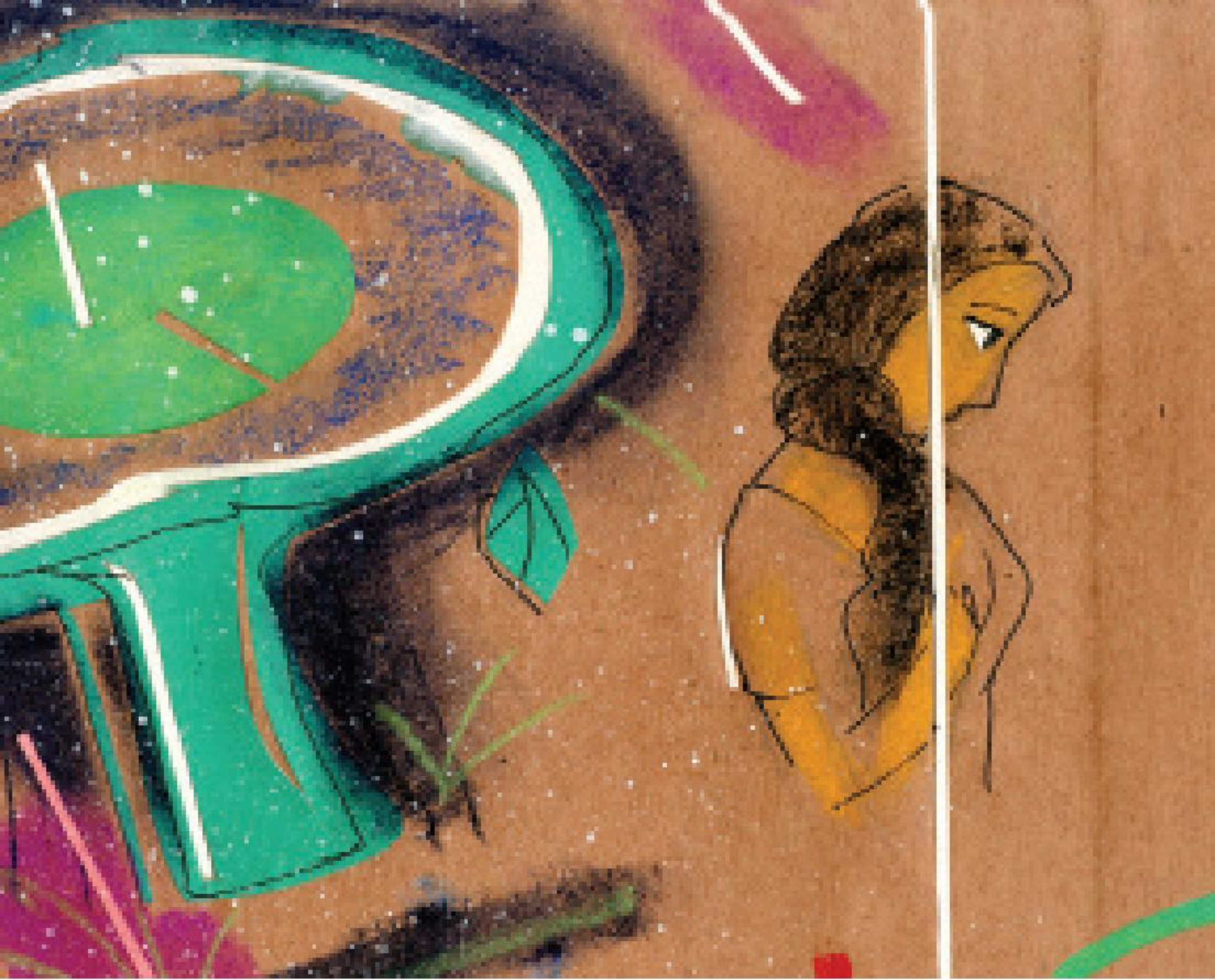


কলুঞ্চাল

মুর্শিদা জামান



শেষবার চোখ বুজে আসার আগে আয়েত্রির মুখটা ভেসে উঠল জাফরের মানসপটে — এরপর নিটোল অন্ধকার। গাঢ় কালো রঙের ভেতর ডুবতে-ডুবতে তীব্র বেগুনির ঝলকানিতেই যেন-বা মস্তিষ্ক সজাগ হলো ওর। ফের বাস্তবে ফিরে আসার প্রবল আলোড়ন অস্তিত্ব জুড়ে। কানের লতি বেয়ে টপ-টপ করে রক্ত মাটিতে পড়ছে, সেই শব্দটুকুও শুনতে পেল সহসা। এর চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যেন আর কিছুই নেই এই মুহূর্তে। কার্যত জাফরের মাথাটা ঝুলছে জমিন থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চির দূরত্বে। সারসার আমবাগানের ভেতর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ক্রমাগত লাঠির প্রহারে যখন ওর শরীর ফেটে ছিঁড়ে যাচ্ছে তখনো ক্ষীণ আশার শ্রোত বয়ে যাচ্ছিল বুকের ভেতর। এই বুঝি থেমে যাবে লাঠির আঘাত। এই বুঝি আকবার আগমন ঘটবে রক্তাক্ত দৃশ্যপটে। কিন্তু



অলংকরণ : রেজাউন নবী

তখনো আঘাতের পর আঘাত শরীর ভেদ করে হাড়ে প্রবেশ করছে।

বড় ভাইজানের লাঠির বাড়িটা আলাদা করতে পেরেছিল জাফর। একটু যেন কম লেগেছিল ব্যথা। কিন্তু মেজভাইজানের লাঠির সঙ্গে-সঙ্গে মুখেও চলছিল গালাগাল। নিমিষেই পাঁজরের হাড় গুঁড়া-গুঁড়া হয়ে যাচ্ছিল। নাকি হৃদয়ের ভেতর তীব্র হলাহলে নীলাভ হয়ে যাচ্ছিল জাফর, আঁধারে বোঝা গেল না। এক পর্যায়ে বড়ভাইজানের বিক্ষুব্ধ স্বরে চিৎকার থাক, বুলুক এখানে ইবলিশটা সারা রাত! প্রায় শব্দহীন তিন জোড়া পা আমবাগান ছেড়ে গৃহের দিকে নিশ্চিন্তে চলে যায়। চৈত্রমাসের সংক্ষিপ্ত জ্যেষ্ঠমাসের রাত। রাতের শেষ অর্ধাংশই কেবল জাফরের অতীত-বর্তমান। আয়েত্রি যেন গাইছে —

তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইবো কোথা,
বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী ...

স্মৃতির অভ্যন্তরে সুরের মূর্ছনা যতই জাগুক আমাদের মুখটাও তেতো হয়ে উঠেছিল যখন আয়েত্রির কথা জানায় ও। বাড়িসুদ্ধ লোক মুখ ফেরাবে জানত তাই বলে আমরাও! কত অদৃশ্য শত্রুর চিন্তায় আমাদের সুরা পড়া ফুঁ ওর শরীর জুড়ে। সেই শরীর তো এখন ভাইদের হিংস্র আক্রমণে রক্ত ঝাড়াচ্ছে। জাফরের কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। আমরা, আমরা গো একটু পানি খাব বলে প্রাণটা ডেকে ওঠে। প্রায় নিস্তেজ হয়ে আসা গলা দিয়ে আওয়াজ বেশিদূর পৌঁছায় না।

কত অদৃশ্য শত্রুর চিন্তায় আমাদের
সুরা পড়া ফুঁ ওর শরীর জুড়ে।
সেই শরীর তো এখন ভাইদের
হিংস্র আক্রমণে রক্ত ঝাড়াচ্ছে।
জাফরের কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে।
আমরা, আমরা গো একটু পানি খাব
বলে প্রাণটা ডেকে ওঠে। প্রায়
নিস্তেজ হয়ে আসা গলা দিয়ে
আওয়াজ বেশিদূর পৌঁছায় না।

ডেকে ওঠে। প্রায় নিশ্বেজ হয়ে আসা গলা দিয়ে আওয়াজ বেশিদূর পৌঁছায় না।

ভীষণ রোমান্টিক স্বভাবের ছিল ও ছেলেবেলা থেকেই। কলেজ ছাড়ার পরই ভর্তি হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। কিন্তু ওর মন পড়ে থাকত সর্বদা সংগীতে আর চিত্রকলায়। কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আয়েত্রির গান প্রথম যেদিন শোনে —

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।

পরমুহূর্তেই জাফরের শরীরে আকুল ধারায় তীব্র আনন্দ প্রবাহিত হয়ে বলেছিল, এই তোমার অর্ধাংশ। এবার তুমি পূর্ণাঙ্গ হলে। জগতের এই অচেনা মাধুরী জীবনের গতিপথে আনল এক অদ্ভুত স্থিরতা। শান্ত আর মায়াময় আয়েত্রিকে মনের কথা জানানোর এত তাড়া ছিল না জাফরের। কিন্তু বন্ধুদের সমন্বিত কলরোলে গোপন কথা চাপা থাকল না। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য *শাপমোচনের* খণ্ড আয়েত্রির হাতে তুলে দিয়ে কেবল চুপ করে তাকিয়ে ছিল জাফর। সেই মুহূর্তেই আয়েত্রিও প্রবেশ করেছিল জাফরের হালকা বাদামি রঙের চোখের ভেতর।

দুই

পরিবহন সমিতির ধর্মঘাটে উড়িপুরের যোগাযোগব্যবস্থা স্থবির। খুব ভুল হয়ে গেছে ময়ান সরদারের এভাবে না জেনে বাড়ি থেকে সদরে আসা। নির্বাচনের যত পোস্টার, ব্যানার সবকিছু সদর থেকে আনা-নেওয়ার কাজ বড় ছেলের হাতে। এ-বছর হাওয়া বেশ মন্দা। প্রতিপক্ষ চতুর শেয়ালের মতো চারপাশে ওঁৎ পেতে আছে। লোকবল যেমন মজবুত, তেমন অর্থও অটেল ময়ান সরদারের। তবে এবার ইউনিয়ন নির্বাচনের ডামাডোলে ইতোমধ্যে দুজন কর্মী রক্তাক্ত হয়ে সদর হাসপাতালে। মানুষজন দিন-দিন অসহিষ্ণু আর উন্মত্ততার দিকে ছুটছে। সবদিক ভেবেচিন্তে ময়ান সরদার পল্লি বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের আড়ালে হাসপাতালেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। গত পরশু পাশের গ্রামের এক নির্বাচন-প্রার্থীর ওপর হামলা হয়েছে দিনদুপুরে। শোরগোল যা হয়েছে সব মুহূর্তে নীরব। যেন কিছুই ঘটেনি।

পরিস্থিতি তো তারও বেশ খারাপ। দুপুরে যদিও শাসিয়ে এসেছে ছোট ছেলে জাফরকে। কিন্তু বড় ছেলের ওপর ভরসা করা কি ঠিক হলো? না না, ওরা পারবে, বেশ ভালোই বোঝাতে পারবে ছোট ভাইকে। ভুলটা তো সে তখনই করেছিল যখন বাড়ির গিল্লির কথা শুনে ছেলেকে ঢাকায় পড়তে দিয়েছিল। চেয়ারম্যানের ছেলেদের বলশালী হলেই হয়। ডিগ্রি পাশই কি যথেষ্ট ছিল না! এখন এই মুসিবত সামাল দেবে নাকি ভোটের তদারকি করবে বাড়িবাড়ি। উথালপাথাল চিন্তা ময়ান সরদারের শক্তি ক্ষয় করে দিচ্ছে ক্রমশ। গ্রামের মানুষের কানে কথাটা প্রবেশ করা মাত্র বেঁধে যাবে লংকাকাণ্ড। তার ওপর এ-বছর নির্বাচনে জিতলে হজ করার মনস্থ তার। সমস্তই এখন রসাতলে যাওয়ার উপক্রম। হাসপাতালের কোনো রোগী মারা গেল মনে হয়। সমন্বিত কান্নার ধ্বনি ময়ান সরদারের হাড়ের ভেতর অচেনা কাঁপন তুলল যেন-বা। এত ভীতু কি সে! এখনো বাড়ির সবচেয়ে শক্তিমত্তা ঘাঁড়ের শিং বাগিয়ে গলায় রশি পরাতে সেই পারে। তবু কি এক শীতল ফাটল শরীরের অভ্যন্তরে দাগ টেনে গেল। মৃত্যু তাকে ভয় দেখাতে পারে না, কোনোভাবেই না। হাসপাতাল মানেই তো জন্ম-মৃত্যু। এখানে এটাই ঘটে। মনকে প্রবোধ দিতে লাগল সে। বুকের পশম ভিজে ওঠে তবু। মৃত রোগীর স্বজনদের আহাজারি ভয় ছড়াতে থাকে রাতের পলে-পলে। আর ময়ান সরদার শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চারণ করতে থাকে নাউজুবিল্লাহ! যেন ছোট ছেলের গর্হিত অপরাধে এখনই আজরাইল ছুটে আসবে তাঁর দিকে।

তিন

প্রশস্ত অঙ্কার ক্রমে ক্ষয়ে আসছে। বাদুরের ডানার তরঙ্গ আমবাগানের সীমা ছাড়িয়ে গেল। টিউবওয়েলের পাম্প করার শব্দই প্রথম আঘাত করল জাফরের মস্তিষ্কে। প্রচণ্ড গতিতে কেউ যেন ওকেই পাম্প করছে প্রথমটায় তাই বোধ হলো। কিন্তু না, পরমুহূর্তেই টের পেল নিজের ঝুলন্ত শরীরের অস্তিত্ব। যে-আমবাগানে ভাইদের সঙ্গে খেলে বড় হয়েছে ও, সেখানেই এমন প্রহার কেবল আয়েত্রিকে বিয়ে করেছে বলে! নাকি অন্যকিছু আছে এর ভেতর। ওর ভালো পড়াশোনা, ঢাকায় থাকা, আবার ইলেকশন থেকে ওর দূরে থাকা এসবই কি ভাইদের মনে ধীরে-ধীরে রোপণ করে দিয়েছে ঈর্ষার বীজ! আঝা না হয় একটু শাসিয়েছে দুপুরে খেতে বসে। একটু না হয় রাগ দেখিয়ে বলেছে মাকে রাতে খাবার না দিতে! সে জানলে এভাবে গাছে ঝুলিয়ে পেটাতে দিত কি? গলা শুকিয়ে কাঠ, একটু যে চিৎকার দিয়ে আন্মাকে ডাকবে তাও পারছে না ও। পানি একটু পানি হলে প্রাণটা বাঁচে এ-যাত্রা। তীব্র আশা নিয়ে বাড়ির দিকে কান পাতল; কিন্তু না, কেউ জাগেনি এখনো। ভোরের প্রথম আজানেই তো আঝা উঠে মসজিদে যান; কিন্তু সেই প্রথম আজানের এত দেরি কেন! এত প্রতীক্ষিত হয়ে কোনোদিনই আজান কামনা করেনি জাফর। আয়েত্রির নিষেধ সত্ত্বেও বাড়ি এসেছিল। জাফরের বিশ্বাস ছিল, মা অন্তত মেনে নেবে এই বিয়ে। কিন্তু আয়েত্রি জানত এখন কত বিপন্ন সময়। তাই বারবার ওর হাত মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরে ছিল। গত কয়েক মাসে অনেকগুলো হত্যার ঘটনায় আয়েত্রির মন ভেঙে আসছিল। দেশের বাইরে চলে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে এরই ভেতর। আয়েত্রির বিবিসির জবটা পাকা হয়ে গেলেও কোথাও যেন কাঁটা বিঁধে ছিল ওর মনে। কিছুতেই আর এই দেশে থাকতে চাইছিল না। জাফরের স্বপ্ন ছিল দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে গ্রামে একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করার। বসার ঘরের দেয়ালভর্তি বইগুলো তাই সঙ্গে করে এনেছিল। প্রথমে মা ভেবেছিল ছেলে বুঝি ঘরে ফিরল। কিন্তু আয়েত্রির কথা পাড়তেই গোটা আবহাওয়া মুহূর্তে থমথম।

কী ভুল? আয়েত্রি খ্রিষ্টান সেটাই, নাকি না জানিয়ে বিয়ে? কোনটা? বড়ভাইজানের বুদ্ধিমত্তা বাকি দুই ভাইও পালা করে মারল কেবল খ্রিষ্টান মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে। জাহান্নামের আগুনে পোড়ার ভয়ে নাকি বেহেশতের হ্রপরি দেখার লিঙ্গা, কোন অভিপ্রায়ে ভাইয়েরা ওকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলো আজ। বাস্পময় চোখে ও দেখতে পেল আয়েত্রি যেন প্রজাপতি হয়ে উঠল। উড়ছে, সে-প্রজাপতি উড়ছে। উড়তে-উড়তে এত উঁচুতে উঠে গেল যে, জাফর নাগাল পেল না। অমোঘ সময়-উত্তীর্ণ। আজানের মোলায়েম ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল আচমকা নিস্তব্ধ ভূচরে। হাজার-হাজার প্রজাপতি যেন ঘিরে ধরল জাফরকে সহসা। গোলাপের গন্ধে মোড়া বাতাস যেন-বা ওর সমস্ত চেতনাকে ছুঁয়ে গেল। যাবতীয় আচ্ছন্নতার ভেতর থেকে তবু ওর কণ্ঠ পানি-পানি বলে মরিয়া হয়ে উঠল — কিন্তু আকুল সে-ধ্বনি চুষে নিল আজানের শেষ পঙ্ক্তি —

আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার

লা-ইলাহা, ইল্লাল্লাহ...

চার

এরপর সময় গড়িয়ে নয় বরং ধাই-ধাই করে উড়তে থাকে। টানা তিন মাস সরদারবাড়ি হয়ে উঠল লঙ্গরখানা। পেঁয়াজ-রসুনের আর মাংসভর্তি খিচুড়ির গন্ধ মৃত্যুর গন্ধকে অনেক দূরে সরিয়ে দিলো। গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ময়ান সরদারের স্ততিকথা। নির্বাচনের ফাঁড়াটা এবারের মতো কাটিয়ে ওঠা গেছে বটে। কিন্তু গুচ্ছের টাকাও ঢালতে হয়েছে জলের মতো। বংশ, মান, মর্যাদা ঠেকিয়ে রাখতে তিন ছেলে রাগের বশে একটা ভুল করেছে বটে, কিন্তু তাই বলে তাঁদের জেলের অনু তো বাবা হয়ে খাওয়াতে পারেন না

তিনি। আইনের সবকটা ছিদ্রেই টাকা গুঁজে দিয়েছেন ময়ান সরদার। গ্রামে আরো একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আর কি! পুত্রশোক কাটিয়ে ওঠার জন্য মনস্থ করেছেন ছেলেদের মাকে নেবেন হজযাত্রায়। স্থানীয় সংবাদকর্মীকে হঠাৎ সাইকেল ছেড়ে মোটরবাইকে চড়ে ঘুরতে দেখে গ্রামের লোক খানিকটা অবাক হয়েছে আর ভেবেছে তাঁদের ছেলেকেও সাংবাদিক বানাবেন।

এদিকে মর্জিনা খাতুনের সন্দেহ কেবল পোক্ত হতে থাকে দিনদিন স্বামীর প্রতি। ছোট ছেলের ইয়া মোটা-মোটা বইগুলোর ধুলো মুছতে-মুছতে কেবল ভাবেন, আর ভাবেন। পাপ! বড় পাপ! কিন্তু তার ভাবনা বেশিদূর এগোতে পারে না। সংসারের কাজ আর নাতি-পুতিদের কান্না তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আষাঢ় মাসের মধ্যবর্তী সময়, তবু একফোঁটা বৃষ্টি নেই। প্রকৃতির এরূপ নির্মমতায় বয়োবৃদ্ধরা হাহাকার করে উঠে বলতে থাকেন — কলিকাল! এ হলো ঘোরতর কলিকাল! তারা চাপাস্বরে এ-ও বলাবলি করেন নিমজ্জিত সন্ধ্যায় — আহা বড়ই বিদ্বান ছেলে ছিল জাফর! কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু অধিক গভীরে প্রবেশ করে না। তগু হাওয়ার দাপট তাঁদের হাতের চালিত তালপাখাকে বরং আরো দ্রুত ঘূর্ণায়মান করে। অদৃশ্য এক ভয় গোটা উড়িপুর ইউনিয়নের মানুষকে এই ভাবতেই সাহায্য করে যে — বেঁচে থাকাই মোদাকথা। ন্যায়-অন্যায় নিয়ে লাঠালাঠির দিন উবে গেছে। পরিবারের কুণ্ডলীর ভেতর ক্রমান্বয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ডানা মেলার অভ্যাস বিসর্জন দিতে থাকে।

পাঁচ

একরাশ জলজ মেঘ বুকে নিয়ে আয়েত্রি রোজারিও বিদেশবিভূঁইয়ে যেদিন চলে গেল সেই দিনটি ছিল ওদের বিবাহবার্ষিকী। স্বপ্নেরা মুহূর্মুহু আছড়ে পড়ায় আয়েত্রি ভুলেই গিয়েছিল দিনটির কথা। বন্ধুরা সি-অফ করতে এসে কদমের তোড়া এগিয়ে দিতেই স্মৃতির নীপগন্ধময় হয়ে উঠেছিল আয়েত্রির বেদনাক্লান্ত মনে। বেলি আর কদমে ওদের ইক্ষটনের ছোট বাসা বছরদুয়েক আগে ঠিক এদিনে স্বর্গ হয়ে উঠেছিল যেন। পরস্পর বাহুবন্ধ হয়ে ওরা দুজনে গিয়েছিল —

মোরে আরও আরও দাঁও প্রাণ
সুধা হারিয়ে...

ছয়

মর্জিনা খাতুনের চোখ আরো তির্যক হতে থাকে। সে পাপের সমুদ্রে, নাকি পুণ্যের সমুদ্রে কিছুতেই বোধ করে উঠতে পারে না। ছেলেরা তখন তাকে বেহেশতের স্বর্ণমহল দেখায় এবং তিনি তো বুঝি একদিন পরিষ্কার দেখতেও পান। শুধু মাঝরাতে ঘুম না পেলে ছোট ছেলের বইগুলো উইপোকা খাবে এই চিন্তায় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন সুবহে সাদিক অবধি। বেশিদিন তাকে এই চিন্তা করতে হলো না। প্রকৃতি এক আশ্চর্য উপায়ে ঝড়সমেত বৃষ্টির তাণ্ডবে ময়ান সরদারের বাড়ির ঠিক সেই আমগাছটি মাটি হতে বিচ্যুত করে দিলো, যেখানে জাফরের রক্তাক্ত শরীর পানি-পানি করে ত্যাগ করেছিল প্রাণবায়ু। ঝড়ের আক্রোশে উড়িপুর গ্রামের শস্যক্ষেত, গাছপালা সবই কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু মানুষ খুশি তবু। খুশি বুঝি সরদারবাড়ির তিন ছেলেও। বাড়ির বাচ্চারা বাগানে যেতে এতদিন ভয় পেত। এখন সেই অবসরটুকুও থাকল না।

এদিকে ময়ান সরদারও তার বিদ্বান ছেলের বই রাখার পাকা বন্দোবস্ত পেয়ে গেল হাতে। লোক ডেকে গাছ কেটে তক্তা বানিয়ে রোদে দেওয়া থেকে শুরু করে সিন্দুক বানানো ও বইয়ের বাউল ঢোকানো সবই করলেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এবং চমৎকার একটি কাপড় দিয়ে সিন্দুকটি ঢেকে দিলেন। ওপরে রাখলেন বেশকিছু ধর্মীয় কেতাব। এখন থেকে এই ঘরেই তিনি রাজনৈতিক বৈঠক করবেন ভাবলেন।

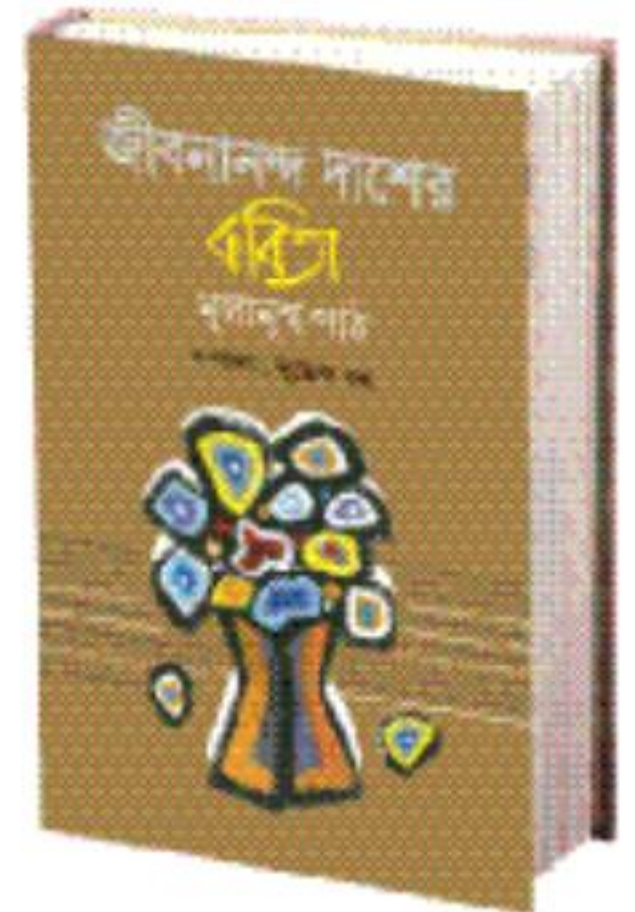
আসন্ন হজযাত্রার বেশ কিছুদিন আগে থেকে আত্মীয়-পরিজন এলেন দেখা করতে এবং তারা সিন্দুকভর্তি কেতাবের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এতসব আয়োজন ভেদ করেও ময়ান সরদার মনশ্চকুতে কনিষ্ঠপুত্রের মুখাবয়ব দেখতে পান। বুকের কঠিন মাংসপিণ্ড ভেদ করে সবার অগোচরে প্রলম্বিত একটি দীর্ঘশ্বাসের পতন ঘটে সহসা। আত্মীয়-পরিজনদের সমন্বিত কলরোলে বিয়োগব্যথার সে-দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে যায় একেবারে। □

**কবি জীবনানন্দ দাশের
নির্ভুল ও মূলানুগ পাঠ
নিয়ে বেঙ্গল পাবলিকেশন্স
থেকে বেরোলো দুখণ্ডে
ভূমিকা ও কবিতা**

সম্পাদনা ও টীকা : ভূমেন্দ্র গুহ



বেঙ্গল পাবলিকেশন্স
ফ্লট ২, সিভিল এজিটেশন, সিডি এক্সপোর্ট প্রভ
কিনোলাক, ওল্ড-১২২৯, বারুইচক
ফোন : ০১৫৫১৯৬১১১, ০১৫৫১৯৬১০০০
www.bengalpublications.com /bengalpublications



প্রতিস্থাপন :



বেঙ্গল পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড
Bengal Publications Private Ltd





নিশি

মাহবুব আজীজ



শচীনবাবু স্যার তিন-চারদিন আগে আমাদের একজনের কাছে টেলিফোন করেন; আমরা, বছর দশেক আগে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অস্থায়ী ভিত্তিতে এক বেসরকারি সংস্থার হয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজে দেশের নানান অঞ্চলে যাই — প্রকৃতপক্ষে যা ছিল আমাদের পার্টটাইম চাকরি; আর ওই কাজে আমরা তিন বন্ধু যাই বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে, সেখানেই তখন কালীবাড়ি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজির শিক্ষক শচীন্দ্র চন্দ্র আইচ বাবুর সাক্ষাৎ পাই; সংগ্রহ করি মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর ও তাঁর পরিবার-প্রতিবেশীদের মর্মস্বন্দ অভিজ্ঞতা; শচীনবাবু স্যার অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, তাঁর বয়ান আমাদের ছুঁয়ে যায়; ধর্মকে ঘিরে গড়ে ওঠা পাকিস্তানে ধর্মের অপব্যবহার আর পাকিস্তানিদের নির্মম আচরণের শিকার এদেশি সাধারণ মানুষ — শচীনবাবুর বর্ণনায় আমরা নিখুঁত হয়ে উঠতে দেখি; শচীনবাবুর সঙ্গে আমাদের হৃদয়তা গড়ে ওঠে, পরবর্তীকালেও কয়েকবছর তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে; তবে সর্বশেষ চার কি



আলাদাভাবে : নির্জিত নৈশালয়

পাঁচ বছর হয় যোগাযোগ অনিয়মিত হয়ে যায়; আচমকা তিন-চারদিন আগে এক সকালে শচীনবাবু আমাদের ফোন করেন ও তাঁর গুরুতর বিপদের কথা জানিয়ে ব্যাকুল স্বরে বলতে থাকেন, ‘বাবারা, একটু সময় নিয়া আসো তোমরা; আমি ভয় পাইতেছি!’ — আমরা বুঝতে পারি, শচীন স্যার গুছিয়ে কথা বলতে পারছেন না; তবে বুঝতে পারি, তিনি সত্যিই বিপদগ্রস্ত, সিদ্ধান্ত নিই, কয়েকদিন সময় হাতে নিয়ে শচীন স্যারের পাশে দাঁড়াবো; আমরা, একদার পার্টটাইম চাকুরে তিন বন্ধু — কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনটি আলাদা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় মাঝারি পর্যায়ের কর্মকর্তা; এর মধ্যে একজন আরিফ তার স্ত্রীর অসুস্থতায় ময়মনসিংহ যেতে অপারগতা প্রকাশ করে; আমি আর কাইয়ুম — দুজনের আপিসেরই শাখা কার্যালয় আছে ময়মনসিংহে; আপিস থেকে সেখানকার কিছু কাজ বরাদ্দ নিয়ে মহাখালী বাসস্ট্যান্ড থেকে রওনা দিই ভোর-ভোর।

ময়মনসিংহ শহরে প্রেসক্লাব পেরিয়ে ছায়াবাণী সিনেমা হল ছাড়িয়ে বাঁদিকে যে রাস্তাটি মেডিক্যাল কলেজের দিকে যায়, সে-পথে কিছুদূর এগোলে হাতের বাঁয়ের গলিতে আটতলা বাড়ির চারতলায় শচীন্দ্র চন্দ্র আইচের ফ্ল্যাট; বুঝতে পারি, আজকাল ময়মনসিংহ শহরেও ঢাকার মতো উঁচু-উঁচু ভবন তৈরি হয় ও তা খণ্ড-খণ্ড করে নানা মাপের ফ্ল্যাট আকারে কেনাবেচা চলে; যখন শচীনবাবুর সঙ্গে আমাদের সর্বশেষ দেখা, তখন তিনি কালীবাড়ি স্কুলের পাশে ভাড়াবাসায় সপরিবারে থাকেন; আমাদের ভালো লাগে যে, শচীন স্যার নিজের একখানা ফ্ল্যাটে অতঃপর বসবাস

অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো হাসে
নিশি; স্নিগ্ধ মুখে বিদ্যুটে ও
আচমকা হাসি থামিয়ে বলতে
থাকে নিশি — ‘কেন? একজন
আমাকে তুলে নিয়ে তিনদিন
পর আবার বাড়িতে রেখে
গেলে আমি আর আপনাদের
সহযোগিতা পাবো না?’

করেন; আমরা ভোরে রওনা দিয়ে সকাল দুপুর হওয়ার আগেই তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাই।

এক হাজার স্কয়ার ফিটের ছিমছাম দুই বেড, ড্রইং-ডাইনিং; স্ত্রী শান্তিবালাসহ শচীনবাবু থাকেন এ-ফ্ল্যাটে, পুত্র যুক্তরাজ্যবাসী, কন্যা বিয়ে হওয়ার পর থেকে আছে খুলনায় ফরেস্ট অফিসার স্বামীর সঙ্গে; শচীন স্যার আমাদের দেখে জড়িয়ে ধরে রীতিমতো কাঁদতে শুরু করেন; বুঝতে পারি, আশি উত্তীর্ণ শচীনবাবুর শরীর ভেঙে গেছে, হাড়িসার দেহে কোনোরকমে ধুতি-গেঞ্জি জড়ানো — সহজেই আবেগি হয়ে পড়েন; তাঁর পাশে বসে কাঁদেন তাঁর রুগ্ন স্ত্রী — আমাদের শান্তি মাসি — আমরা তাঁদের নিজেদের সামলে নেওয়ার মতো অবসর দিই ও একসময়ে শচীনবাবুর পাশের চেয়ারে বসে বলতে থাকি —

‘শান্ত হোন স্যার। টেলিফোনে যতদূর বুঝলাম, আপনার বিধবা বোনের মেয়েকে নিয়ে সমস্যায় আছেন।’ — কথা বলতে শুরু করি শচীনবাবুর সঙ্গে।

শচীনবাবু ততক্ষণে দম নিয়ে নিয়েছেন, বোঝা যায়, অনেকের কাছে তাঁকে প্রসঙ্গগুলো বলতে হয়েছে; তিনি তাড়াহুড়া করে একের পর এক প্রসঙ্গ তুলতে থাকেন; তবে সারমর্ম এই, ভাটিকেশের বিধবা বোনের কলেজপড়ুয়া কন্যা নিশিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে কিছু মাস্তান; থানা-পুলিশ, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতা, সাংবাদিক ইত্যাদির সঙ্গে প্রচুর কথা বলেও শচীনবাবু কোনো সুরাহা করতে পারেননি। দিন-দিন পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপ হতে থাকে; কয়েকমাস পর নিশির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, সে বাসা থেকেই একপর্যায়ে বেরোতে পারে না; ভাটিকেশের মায়ের বাসা বা মেডিক্যাল গেটে মামার বাসা — সব জায়গায় একই পরিস্থিতি!

কথা বলতে-বলতে আবাবো কাঁদতে শুরু করেন শচীনবাবু; আমরা আচমকা দেখি, ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হলুদ-নীল কম্বিনেশনের জামা-পাজামা-ওড়না পরা এক তরুণী; ছিপছিপে লম্বা শ্যামবর্ণ মেয়েটির বড়-বড় চোখ — এ-ধরনের চোখকেই সম্ভবত ডাগর আঁখি বলা হয়, একমাথা চুল কোমর ছাপিয়ে যেন পায়ে ঠেকেছে; মেয়েটির মধ্যে বাড়তি কোনো সংকোচ দেখি না আমরা, বরং তার হাঁটাচলায় একধরনের মুগ্ধকর স্বচ্ছন্দ্য চোখে পড়ে; বুঝতে পারি, এই তরুণীর নামই নিশি; শচীনবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলে — ‘মামা, এভাবে কান্নাকাটি করবেন না, প্লিজ। কাঁদার মতো কিছুই হয়নি এখনো। আঙ্কেলদের বলুন আমাকে ঢাকার একটি কলেজে ভর্তি করার ব্যাপারে হেল্প করতে। আমি ঢাকায় মেয়েদের একটা হোস্টেলে থাকতে চাই। আর মাকে আপনি এই বাসায় এনে রেখে দেবেন।’

‘মা রে, আইএ পাশ করিস নাই। পরীক্ষার আগে তোকে কোন কলেজ নেবে?’

‘সেজেন্যেই তো উনাদের সাহায্য লাগবে। বোর্ড অফিসে আঙ্কেলরা যোগাযোগ করে দেবেন।’

বলতে-বলতে এবার নিশি আমাদের দিকে তাকায়, ‘আঙ্কেল, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আমিই মামাকে বলেছি। আপনাদের কথা অনেক শুনি মামার কাছে। এখানে আমি আর থাকতে পারবো না। ঢাকায় আমার আইএ পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন আপনারা, প্লিজ।’

শচীনবাবুর বাসা হয়ে আমরা — আমি আর কাইয়ুম — যার-যার আপিস যাই ও কাজ সেরে চলে আসি ব্রহ্মপুত্রের পাশে নিরিবিলি হোটেলের ৪০৪ নম্বর কক্ষে; ময়মনসিংহে এলে এই হোটেল আমাদের পছন্দ; নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা হোটেলটির রুমগুলো প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন; একটি বড় ঘরে দুটি বিছানা, আমরা দুই বন্ধু পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে শচীন স্যারের ভাগ্নি নিশির বিপদমুক্তির ব্যাপারে পরামর্শ করতে থাকি, যার-যার আপিসসূত্র ব্যবহার করে আমরা ইতিমধ্যে কয়েকজনের কথা জানতে পারি, যাদের মাধ্যমে ভাটিকেশের গভীরে যেতে পারবো; আমরা দুজনেই প্রতাপশালী এক লোক ভুট্টোর কথা জানতে পারি, ভাটিকেশের জুলফিকার আলী ভুট্টোর ওষুধের একটি বড় দোকান আছে, সে স্থানীয় প্রভাবশালী মানুষ, জানতে

পারি, তার কথায় প্রচুর মানুষ উঠে আর বসে।

‘দূর! শচীন স্যার খামোখাই বেশি কান্দে! ইভটিজিং আজকাল কোনো ব্যাপার নাকি! মেয়ে দেইখা রাস্তায় আওয়াজ দিচ্ছে, এই নিয়া তিনি কানতাছেন; আর আমরা সেটা নিয়া লাফাচ্ছি’ — কাইয়ুম বিরক্তির সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলে।

‘এসব কী কথা রে কাইয়ুম? তুই এটা কী বললি! একটা মেয়ের এরকম বিপদ? আমরা কিছই করবো না! ইভটিজিং থেকে আত্মহত্যার কতগুলো ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেছে? শচীন স্যারের ভাগ্নি না হলেও তো যে কারো নিশির পাশে দাঁড়ানো উচিত’ — আমি বলতে থাকি।

‘তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু নিশি আমাদের আঙ্কেল বললো কেন? সে তো শচীন স্যারের ভাগ্নি। আমাদের ভাগ্নি তো না। আমার আর তোর বয়স কি ৮০? আমাদের আঙ্কেল বললো কেন?’ — কাইয়ুমের কণ্ঠ রীতিমতো অভিমানী।

‘আহা-হা! তোর বয়স যে ১৮; সেটা নিশি বোঝে নাই। কি দুঃখ!’

‘১৮ না হলেও এখনো ঠিকমতো ৪০ পার হয় নাই। আঙ্কেল বলবে কেন?’

‘নিশি কাজটা মোটেই ঠিক করে নাই। হুম।’ আমি গম্ভীর স্বরে বলি।

‘যেভাবে নিশি বলে ডাকছিস মনে হয়, যুগ-যুগ ধরে চিনিস! দেখলি তো মাত্র কয়েক মিনিট। তাতেই এই অবস্থা —’

আমরা বিষয়টি নিয়ে আরেকটু ঠাট্টা, মজা করি; এমনকি একে অপরের বউয়ের কাছে নালিশ জানানোর হুমকি পর্যন্ত দিতে থাকি যে, পরমাসুন্দরী তরুণী দেখে আপনার স্বামীর মাথা ঘুরেছে; এবং সন্ধ্যার পর রিকশা নিয়ে ভাটিকেশের ভুট্টোর ওষুধের দোকানে আসি।

সৌজন্যমূলক কথাবার্তা ও নাম-পরিচয় বিনিময়ের পর ভুট্টোকে জানাই, তার কথা আমরা দুজনেই আপিস কলিগদের কাছে জেনেছি, তার সঙ্গে আমরা ভালো একটি রেস্টুরেন্টে চা খেতে চাই; পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স, মাথার সামনে মস্ত টাক, পানখাওয়া হলুদ দাঁত, মোটাসোটা শরীর, দশাসই ভুঁড়ির জুলফিকার আলী ভুট্টো খানিকটা অবাক হলেও সহজে রাজি হয়ে যায়, সম্ভবত প্রায়শ তাকে নানাধরনের পরামর্শ দিতে হয়, বোঝা যায়, এ-নিয়ে ভুট্টো যথেষ্ট পরিমাণে গর্বিত; তার চোখ দেখে বুঝি, আমাদের ঝকঝকে চেহারা-পোশাক ও কথার ধরন দেখে একটু চমকে ওঠেন শুরুতে; অবশ্য দ্রুত পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে সহাস্য আপ্যায়ন করতে শুরু করেন; আমরা একটি রেস্টুরেন্টে তিনজনে বসি ও ভুট্টোর কাছে আমাদের সঙ্গে শচীন স্যারের দীর্ঘ সম্পর্কের বর্ণনা দিয়ে নিশি প্রসঙ্গ তুলে এ-ব্যাপারে কী বিহিত হতে পারে, জানতে চাই এবং মেয়েটির ভালোর জন্যে আমরা সবাই মিলে কী করতে পারি — তার পরামর্শও চাই। ভুট্টো কিছুক্ষণ চুপ থেকে ঠোঁট উলটে হতাশ স্বরে বলেন, ‘আফনেরা এই বিষয়ে কথা কইবেন, ভাববার পারি নাই। নষ্টা মেয়েছেলে!’

হতবাক হয়ে ভুট্টোর দিকে তাকিয়ে থাকি; একটি ১৮ বছরের কলেজপড়ুয়া মেয়ে, আমাদের শচীন স্যারের ভাগ্নি; তাকে এভাবে —

‘হাক কইরা তাকানোর কিছই নাই। শচীন স্যারের ভাগ্নি বইলা এহনো মাইয়াটা বাড়িত আছে! নইলে ওরে কবে আমি নিজেই তুইলা নিয়া আসতাম...’

‘তার অপরাধটা কী?’ আমি বলি।

‘অপরাধের শেষ আছেন? পুলাপানের মাথা ঘুরাইয়া দেওয়া হইলো ওর একমাত্র কাম। এতো হাইসা কথা কওয়ার কী আছে!... না হয় বুঝলাম হিন্দু পরিবারের মেয়ে; তাই বইলা পর্দা-টর্দা থাকবো না, নাকি!’

আমরা নিশুপ, রেগে ওঠা-কথার তুফানতোলা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সামনে বসে থাকি; সে একনাগাড়ে কথা বলে চলে, ‘ভাটিকেশের রাস্তায় খাড়াইয়া মাইয়ালোক মাথাত উড়না না দিয়া কথা কইবো; হাইসা গড়ায় পড়বো... এইতা হইতো না! আজ এই অনুষ্ঠান, কাইল হেই অনুষ্ঠান — পুলাপান লয়া নাচন-কোদন! গান গাইয়া, নাইচা সবার মাথা নষ্ট করছে নিশি!’

কাইয়ুম কি আমি; কেউই কথা বলি না; নিশুপ শুনে চলি। ভুট্টো

একমনে বলে চলে, ‘জানুইননা তো কিচ্ছু, মাসকান্দার শামসু উকিলের পোলা মকসুদ সঙ্গী-সাথি লয়া তুইলা লয়া গেছিল নিশিরে; তিনদিন কোনো খবর ছিল না। দিন পনেরো আগের কথা। তিনদিন পর ফিরাই দিয়া গেছে! হের পরেই তো কান্দাকাটি শুরু হইছে শচীন পণ্ডিত আর হের বইনের! নিশির ফটর-ফটর তো এহনো কমে নাই হুন্ছি।’

আমরা ভুট্টোর বিবরণ ও বর্ণনার সময় তার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি ও অশালীনতার ধরনে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

‘তার মানে নিশি এখানে থাকতে পারবে না? পরীক্ষা দিতে পারবে না?’ — কাইয়ুম প্রশ্ন করে।

‘হেইডা আমি কী জানি!’ শুরু হাসে ভুট্টো — ‘আপনেরা অপিসের কামে আইছেন। হেইডা নিয়া থাকুইন। নিশির ব্যাপারে কথা কইলে বিপদ হইতে পারে!’

আমি বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হতে থাকি, এইটুকু একটা মেয়ে; নাচ-গানের জন্যেই তবে সমস্যায় পড়লো? মকসুদ নামের ছেলেটি দলবলসহ নিশিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল; মানে কি; কাইয়ুমকে বলি — ‘চল, থানায় যাই।’

‘কী শুরু করলি! শার্লক হোমস হওয়ার দরকার নাই। দেখি, কথা বলে ঢাকায় কোথাও নিশিরে ভর্তি করা যায় কিনা!’ — কাইয়ুম বলে চলে; আসলে ভুট্টোর কথা শুনে আমি এতোটাই মুষড়ে পড়ি যে, কাইয়ুম কী বলে, বুঝি না; আমি একাই থানায় যাই, ওসি ইয়াহিয়া মীর্জার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। ওসি সাহেব মধ্যবয়স্ক, ভারী শরীর, চুল উলটিয়ে আঁচড়ানো, পানখাওয়া হাসিমুখ; তার বাজে অভ্যাস হলো কথা বলার ফাঁকে নাকের লোম ছিঁড়তে শুরু করেন নিজের হাতে —

‘একটি তরুণীকে তুলে নিয়ে গেল মকসুদ নামের মাস্তান, সদলবলে। আপনারা কী করলেন?’

‘ছিঃছিঃ। ভাইজান। এইসব কী বলেন? এটা বাংলা সিনেমা নাকি! কে বলছে আপনাকে এইসব কথা?’

‘নিশি মেয়েটাকে শামসু উকিলের ছেলে সদলবলে কয়েকটি মোটরসাইকেল নিয়ে এসে তুলে নিয়ে যায়নি? তিনদিন পর আবার ফেরত দিয়ে গেছে। দিন পনেরো আগের ঘটনা?’

‘এইগুলো গুজব। আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ দায়ের হয় নাই। শচীন স্যার এলাকার মান্যগণ্য মানুষ। এই ঘটনা ঘটলে তিনি ছাড়তেন নাকি কাউরে?’ বলেন আর মধুর হাসি হাসেন ওসি ইয়াহিয়া।

বিভ্রান্ত হতে থাকি; ঘটনাটি কোন পর্যায়ে আছে প্রকৃতপক্ষে, শচীনবাবু গুরুতররূপে ভয়াবহ-বিচলিত, নিশিকে দেখে অতোটা বোঝার উপায় নেই, আবার ভুট্টো কি থানার ওসি, এদের সঙ্গে কথা বলে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি হয় — না, নিশির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে; আমি শচীনবাবুর বাসার উদ্দেশে রিকশা নিই ও ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে শচীনবাবুর বাসার গেটে পৌঁছে দেখি, কাইয়ুম সেই বাসার গেট থেকে মাথা নিচু করে বের হয়ে আসছে।

আমরা দুজন দুজনের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকাই; কাইয়ুম একটু হাসে, আমিও হাসি ও কাইয়ুমকে পাশ কাটিয়ে শচীনবাবুর ফ্ল্যাটে চলে আসি।

শচীনবাবু ততক্ষণে খেয়ে শুয়ে পড়েছেন, শান্তি মাসিও বসবার ঘরে নেই; নিশি আমাকে দেখে মোটেও অবাক হয় না, চোখ দেখে মনে হতে থাকে; ও জানতোই আমি আসবো; নিশির শান্ত চোখ দুটো দিঘির অতল জলের মতো টলমল করে — তাকিয়ে থাকতে পারি না, মাথা বিম্বিম করে ওঠে; আমি সোফায় বসে মাথা নিচু করে রাখি; নিশি জলের গ্লাস এনে আমার হাতে দিয়ে বলে — ‘মকসুদ আমাকে তুলে নিয়ে গেছিল কিনা, জানতে এসেছেন? মকসুদ আর তার দলবল? তাই না?’

আমি কথা বলি না। অন্যদিকে তাকানোর চেষ্টা করি; পারি না, আমার মাথা নিচু হয়ে আসে।

‘তিনদিন পর আমাকে বাড়িতে ফেলে গেছে কিনা... জানতে চাইছেন, তাই তো!’

এবার আমি নিজেকে বলতে শুনি, ‘না, তুমি যেভাবে ভাবছো; সেভাবে জানতে চাইছি না। জানতে চাইছি যে, আসলে কী ঘটেছিল?’

মকসুদ নামের মাস্তান সত্যি তোমাকে নিয়ে গেছিল?’

অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো হাসে নিশি; স্লিঙ্ক মুখে বিদ্যুটে ও আচমকা হাসি থামিয়ে বলতে থাকে নিশি — ‘কেন? একজন আমাকে তুলে নিয়ে তিনদিন পর আবার বাড়িতে রেখে গেলে আমি আর আপনাদের সহযোগিতা পাবো না? আমাকে এখানকার কলেজ বা ঢাকার একটা কলেজে যাওয়ার জন্যে আর সাহায্য করবেন না? আমি পড়াশোনা করতে পারবো না? আমার জীবন এখানেই শেষ!’

‘না, তা হবে কেন? সহযোগিতার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?’ আমি বলি।

‘তাহলে পড়িমরি করে আপনার বন্ধু, আপনি সব ছুটে-ছুটে এসে কেন জিজ্ঞেস করছেন, গুজবটা সত্যি কিনা! আমার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এই গুজব সত্য বা মিথ্যা কিনা; সেটা কেন আপনাদের জানা দরকার, সেইটা আমারও জানা জরুরি।’

মনে হতে থাকে, ভুট্টোর কাছে শুনেই কাইয়ুম এখানে দৌড়ে এসে নিশিকে উলটাপালটা প্রশ্ন করে রাগিয়ে তুলেছে; আমি দুঃখ প্রকাশ করি নিশির কাছে, বোঝাতে চেষ্টা করি — বিষয়টা আসলে যেভাবে দেখছে নিশি, তা নয়; পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝার জন্যেই জিজ্ঞেস করা যে, সত্যিই তোমাকে ওরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল কিনা!

আমার দীর্ঘ বয়ান শুনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আন্তে-আন্তে বলতে থাকে নিশি, ‘একটা মেয়ে। সে ঘর থেকে একমুহূর্তের জন্যে বের হতে পারে না। পড়াশোনা বন্ধ। নিজের বাড়িতে পর্যন্ত থাকতে পারে না। রাস্তায় বেরোলে অকথ্য গালাগাল, বাজে কথা। পুলিশ-থানাওয়ালারা এগুলোকে তাদের দেখার বিষয় বলেই মনে করে না। মেয়েটি নিজের এলাকা ছাড়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।... এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়, পরিস্থিতি কতটা গুরুতর বোঝার জন্য! নাকি মেয়েটিকে তুলে না নেওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি গুরুতর মনে হয় না’ — বলে আর কাঁদতে থাকে নিশি; ‘নিজেকে আমার আর মানুষ মনে হয় না ভাই। একটা পশু মনে হয়। বুঝলেন ভাই, একটা পশু। যাকে তুলে নেওয়া যায়, আবার ফেলে রেখেও আসা যায়।’

‘আঙ্কেল থেকে ভাই বলছো নিশি!’ — আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে একটু হাসি।

স্বাভাবিকতার পথেই যায় না নিশি; তীক্ষ্ণস্বরে বলে — ‘আপনার বন্ধু কাইয়ুমই তো রীতিমতো গায়ে-মাথায় হাত দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে বললো, তার বয়স খুবই কম, আমি তাকে যেন আঙ্কেল না বলি। ভাইয়া বলতে বললো। আপনারও তো বয়স কম; তাই না!’

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি; নিশি বলতে থাকে — ‘একবার যাকে তুলে নিয়ে তিনদিন পর ফেলে রেখে যায় কেউ; তাকে তো সবাই সান্ত্বনার নামে তার মুখ ধরবে, ঠোঁট চেপে ধরবে... তাই না! চোখের পানি মুছে দেবে! আপনি আর বসে আছেন কেন? আমাকে সান্ত্বনা দেবেন না?’ — বলে আর ঝরঝর করে কাঁদে নিশি।

আমি কথা না বলে বাইরে বেরিয়ে আসি; হাঁটতে থাকি সুনসান রাস্তায়, ব্রহ্মপুত্রের পাশ বরাবর রাস্তা ধরে, চৈত্ররাতের স্লিঙ্ক বাতাস; এমনই এক হাওয়ার রাতে নিশির মামা শচীন্দ্র চন্দ্র আইচ বাবুর কাছে আমরা কয়েকজন প্রথমবারের মতো আসি; শচীন বাবু শুনিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময়কার তাঁর অভিজ্ঞতা — একান্তরে পণ্ডিতপাড়ায় যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতেন শচীনবাবু; তার বাড়িওয়ালার ১৮ বছরের তরুণী মেয়েটিকে পাকিস্তানি আর্মি মেজরের পছন্দ হয় ও মেজর একরাতে মেয়েটিকে তুলে নিতে সাদ্‌পাঙ্গসহ জিপ পাঠায় সে-বাড়িতে! মেয়েটির বাবা — বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আর উপায় খুঁজে না পেয়ে নিজের মেয়েকে মেজরের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেয় আর্মিদের কাছে; অসহায় সেই বাবা নিজের মেয়েকে আর্মি জিপে তুলে দেয়...

শচীনবাবু একান্তরের যে-মেয়েটির কাহিনি আমাদের বলেছেন; তার নাম যেন কী ছিল! তাকে কদিন পর যেন পাকিস্তানি আর্মিরা ফেরত দিয়ে যায়? তিনদিন; তিনদিন পর ফেলে রেখে যায়। কী নাম যেন ছিল মেয়েটির? নিশি। একান্তরের ওই মেয়েটির নাম ছিল নিশি। □



শেষ ওভার

সাজ্জাদ মারুফ

এ

ধরনের পরিস্থিতি তার কাছে নতুন কিছু নয়। বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতার পর স্কুল ক্রিকেট থেকে শুরু করে পেশাদার লীগের খেলায় প্রায়ই তাকে বুকের মাঝে শ্বাস চেপে ধরা টানটান উত্তেজনার সেই অস্বস্তিকর মুহূর্তটির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

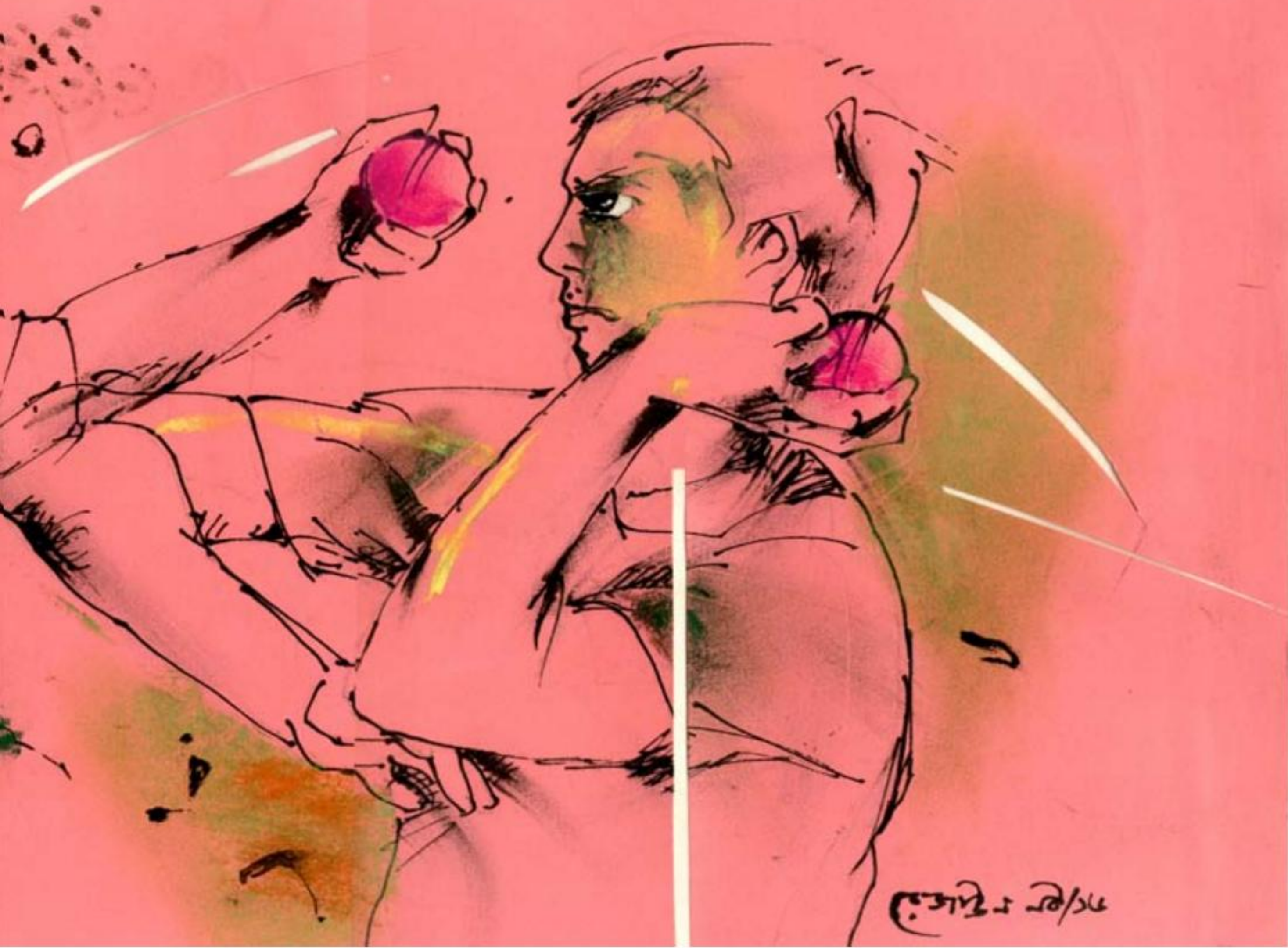
‘তবু আজকের দিনটি কি একটু অন্যরকম হতে পারে?’ — ভাবতে থাকে

আনিস।

হয়তো বিক্ষিপ্ত জীবনের মাঝে কিছু সময়কে বিশেষ আর অনন্য কিছুর সূত্র ধরে ভালোবাসার ঠুনকো মানবিক রোমান্টিসিজম থেকেই তার ওই চিন্তার আবির্ভাব। তবু দীর্ঘ ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় তার চিন্তাটাকে এক্ষেত্রে একটু গুরুত্ব দেওয়াই যায়।

হতাশা, আক্ষেপ আর দুঃখমিশ্রিত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষ ওভারের আগে বাউন্ডারি লাইনের





অলংকরণ : রেজাউন নবী

এক প্রাপ্ত থেকে অন্যদিকে ধীর বিষণ্ণ ভঙ্গিতে স্থান পরিবর্তন করতে-করতে ভাবছিল সে —

— ‘আর কতদিন? এই খেলাটাই বা তাকে কি দিলো?’

অথচ এরকম তো কখনো হওয়ার কথা ছিল না। এই তো বছর পনেরো আগে যখন বয়সভিত্তিক দলের নেট থেকে লীগের এক দলের কর্তা তাকে ডেকে নিয়ে যায়, তখন তার কোনোভাবেই সেরকম মনে হয়নি। বুক ফুলিয়ে মাকে জানিয়েছিল সে, ‘আনিসের কোনো বাবা-চাচা লাগে না।’

যদিও ছবির ফ্রেমে স্থায়ী হয়ে যাওয়া বাবার ওপর নির্ভরহীনতার অভ্যাস তার বহুদিনের। মা এবং বোনের সঙ্গেই ছোটকাল থেকে জীবনের অধিকাংশ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে আনিসকে।

শরতের দিগন্তজোড়া পটে নীল সমুদ্রের ঠেউয়ে টুকরো মেঘের সঙ্গে ভেসে যাওয়া নিঃসঙ্গ ঘুড়ির হঠাৎ ভোকাটার মতো দোলা খেয়ে তার অবচেতন ভাব কেটে যায় ‘আনিসভাই, বোলিংয়ে আসেন’ ডাক শুনে।

বাড্ডা ইয়ুথ ক্লাবের ক্যাপ্টেন ইফতেখার মামুন বোলিং ক্রিজ থেকে তাকেই ইশারা করছে দেখে হস্তদস্ত হয়ে ছুটে চলে আনিস সেদিকে। কেউ খেয়াল না করলেও আনিসের একটু চমকানো ভাবটা চোখ এড়ায় না রবিউলের।

সাত বছর ধরে আনিসের সঙ্গে বাড্ডা ইয়ুথ ক্লাবে একসঙ্গে খেলে

ক্ষমাহীন পেশাদারি সংস্কৃতিতে
আবদ্ধ ক্রিকেট তাকে আর কোনো
সুযোগ দেয়নি উঁচুজাতের মাঝে।
ভাঙা হৃদয় আর ফিকে স্বপ্ন নিয়ে
পরের বছর থেকে সেই যে দ্বিতীয়
বিভাগে খেলা শুরু করতে থাকে
আনিস, আরেকবার আরেকটি
সুযোগের অপেক্ষায়, তা
শুধু লক্ষ্যই থেকে যায়।

আসছে রবিউল। ‘আনিসভাই’য়ের ভীষণ অনুরক্ত রবিউল তার খামখেয়ালিপনা আর নির্বুদ্ধিতার সঙ্গেও বহুল পরিচিত। দ্বিতীয় বিভাগের লীগে খেলে পেশাদার খেলোয়াড়ির স্বপ্ন দেখে না সে আনিসের মতো। খেলা শেষ করে পৈতৃক ভিডিও দোকানের তদারকি করতে যাওয়ার জন্য ছুটতে গিয়ে তার সেই স্বপ্ন দেখার অবকাশটিও নেই। তবু এই খেলাটিকে ভীষণ ভালোবাসে রবিউল। মাঝেমধ্যেই এদিক-ওদিক থেকে খ্যাপ খেলার ডাক পড়লে একটুও ভাবতে দেরি করে না।

কিন্তু এই অলস পড়ন্ত বিকেলে খেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দলের ধুঁকে-ধুঁকে টিকে থাকা এক দ্বিতীয় সারির বুড়ো বোলারকে ডাকার সিদ্ধান্ত তার মনে ক্রান্ত শিখার মতো নিভুনিভু করতে থাকা অনেকদিনের সন্দেহকে বাতাসের মৃদু পরশ দিয়ে যায় বইকি।

অবশ্য, অবাক আনিসও একটু হয়েছিল। চৌত্রিশ বছর বয়সে বলে আগের মতো ধার নেই তার। আর তার সঙ্গে, সেরকমভাবে খেলায় মনোযোগও দিতে পারে না আগের মতো। কোথায় যেন এলোমেলো হয়ে যেতে চায় তার সবকিছুই।

সেই যে মেঘের ভেলায় ভাসতে থাকে তার ভোকাট্টা মনঘুড়িটা। প্রায়ই চলে যায় সে কাকার দেওয়া প্রথম ব্যাট-বল দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার মুহূর্তে। ক্ষণেই মনে পড়ে যায় বল করতে গিয়ে পিছলে পড়ে পা ভাঙার সেই অসহ্য যন্ত্রণার কথা। আবার মনে হয় এই তো সেদিনও সে কল্পনা করত ইডেন গার্ডেনে বল করছে কপিল দেবের মতো, পরমুহূর্তেই লর্ডস ময়দানে তার দুরন্ত গতির বাউন্সারের ঝাঁঝে মুগ্ধ হয়ে দর্শকরা মুহূর্তেই বাহবা দিচ্ছে।

ইফতেখারের উদ্ভতভরা জড়ানো গলার ‘কী করবেন? কোথায় ফিল্ডার দেব?’ শুনে ঘোর অবস্থাটা এবারের মতো কেটে যায় আনিসের। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে আসতে হয় তাকে মর্তে। সম্মিত ফিরে পেয়ে সে দ্রুতই মনোযোগ দেয় মাঠে।

পুরনো ঘুণে ধরা কাঠের স্কোরবোর্ডে লেখা আছে — শেষ ওভার। কাকলি ক্রিকেটারস অ্যাসোসিয়েশনের দরকার আর মাত্র ৮ রান। ছয় বলে আটটি রান। হাতে পাঁচটি উইকেট যার তেমন কোনো গুরুত্ব যে নেই তা সবাই বোঝে।

ব্যাটিংয়ে দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেটে বছরের সবচেয়ে বেশি রান করা বাইশ বছরের বকঝকে তরুণ সরোয়ার অপরাজিত আটশি রানে। সবাই জানে, সে পরের বছরই প্রথম বিভাগের গোপীবাগ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে খেলতে যাচ্ছে। এ বছরেই চারটি সেঞ্চুরি করে খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে স্পটলাইটের নিচে নিয়ে এসেছে সরোয়ার। ক্লাসিক স্টাইলে ব্যাটিং করেও সরোয়ারের অফসাইডে মেরে খেলার প্রচণ্ড সামর্থ্যের কথা সর্বজনবিদিত।

মুখে চুইংগাম চিবোতে-চিবোতে খুবই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অফসাইডে পাঁচ আর অনসাইডে চারজন ফিল্ডার রেখে ইফতেখার খুব আয়েশি ভঙ্গিতে আনিসকে বলে, ‘ভাই বল মিডলে রাইখেন, অফে করলে ফাটায় ফেলবে।’

কিন্তু নিজের অজান্তেই আনিস কেন জানি আজ দাঁত চেপে বলে ওঠে, ‘আমি অফেই বল করব।’

একটু অবাক হলেও অতিরিক্ত একজন ফিল্ডারকে অফসাইডে যাওয়ার আদেশ দিয়ে নিজের পজিশনে যাওয়ার আগে ইফতেখার একটু মুচকি হেসে ভাবে, ‘বুঝবি মজা আজকে, হাহ, অফে বল করব।’

জয়ী হওয়ার স্বাভাবিক তাড়না যে ইফতেখারের মধ্যে কম তা কিন্তু সত্যি নয় মোটেও; অথচ বুড়ো ঘোড়াদের সঙ্গে নিয়ে খেলতে তার ঘোর আপত্তি। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই দলের অধিনায়ক হয়ে মূল ক্ষমতা সে নিজের হাতে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। সে আধুনিক

খেলায় বিশ্বাস করে, দলে তরুণ খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ চায় আরো বেশি, আর বুড়োদের ওপর ছড়ি ঘুরাতেও তার যে খুব অস্বস্তি বোধহয় তাও হয়তো আনিসকে অপছন্দ করার আরেকটি কারণ।

দলের কোচ মুকুল দত্তও কিন্তু সব কর্তৃত্ব ইফতেখারের কাছেই ছেড়ে দিয়েছে। আর দেবে নাই বা কেন? ইফতেখারের বাবা ক্লাবের বড় কর্তা। কর্তাদের ছেলেরা এখানে প্রায়ই খেলতে আসে। যতদিন ভালো লাগে খেলে, মন উঠে গেলে আবার চলে যায়, তার শূন্যস্থান অন্য কোনো কেউকেটা দ্রুত কেড়ে নেয়। এইসব মুকুল খুব ভালো করেই জানে তার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে। জীবনসাম্রাজ্যে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে। সবার মন খুশি করে রুটিবাজির ব্যবস্থা হলেই সে সন্তুষ্ট।

কিন্তু তার অনেক পোড়-খাওয়া সচেতন মন ঠিকই বুঝতে পারে আনিসকে এখন বল দেওয়ার আসল কারণ। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সরোয়ার আনিসের বলকে খুব হেলা করেই ছিড়েখুঁড়ে ফেলতে পারবে আর সেইসঙ্গে ইফতেখারও পেয়ে যাবে আনিসকে দল থেকে ছুড়ে ফেলার অজুহাত। কর্মকর্তাদের ছেলেদের কিছু বলতে নেই, তারা আসবে-যাবে; কিন্তু মুকুলের জীবন ঠিক যেমনটি চলছে, তেমনি চলতে থাকবে।

মেপে-মেপে উইকেট থেকে ঠিক পনেরো গজ দূরে এসে একপলক মাঠের চারপাশে তাকিয়ে আনমনে ট্রাউজারে হালকাভাবে বল ঘষতে থাকে আনিস। কোথা থেকে যেন সেই পুরনো ভয় আবার তাকে এসে ঘিরে ধরে। কেমন যেন অদ্ভুত এক অশরীরী অনুভূতির পরশ শীতের কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে যায় তার সমস্ত শরীরে। দুরূ-দুরূ বৃকে দৌড় শুরু করে আনিস। পপিং ক্রিজের কাছে এসে সমস্ত জোর দিয়ে অফস্টাম্পের সামান্য বাইরে লক্ষ করে বল ছুড়ে মারে।

ওপারে প্রস্তুত সরোয়ার দেহটাকে সামান্য পিছে মুচড়ে নিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় সজোরে ড্রাইভ করে। মুহূর্তেই বল ছুটতে থাকে এক্সট্রা কাভার বাউন্সারির দিকে। ডিপ মিডঅফ থেকে মুরাদ ছুটে এসে বল ছুড়ে ফেরত পাঠানোর আগেই ২ রান নেওয়া শেষ করে ব্যাটসম্যানরা।

হতাশায় হাঁটু মুড়ে আসতে থাকে আনিসের। সেই ভয়ংকর মুহূর্তকাল আবার ফিরে এসেছে, ঠিক যেন সেই দিনটির মতো। জীবনের প্রথম প্রিমিয়ার বিভাগ লীগের ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে সে। শীতের ভোরে কাকডাকার সঙ্গে-সঙ্গে তড়াক করে ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিয়েছিল সেদিন আনিস। নাস্তা মুখে পুরে খেতে-খেতেই মাকে সালাম করে নেয় সে। অন্য ঘর থেকে ঘুম-জড়ানো গলায় তার বোন রোজি বলে ওঠে ‘খুব ভালো করে খেলিস ভাই’।

কিন্তু সেই ভালো খেলাটা তার আর হয়ে ওঠেনি ওইদিন। উত্তরা স্পোর্টিং লিমিটেডের ব্যাটসম্যানরা যেন ছিন্নভিন্ন করে দেয় তার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন একদিনেই। এক জাভেদই তার বলে হাঁকায় দশটি বাউন্সারি। আট ওভার বল করে সত্তর রান দেয় সেদিন কোনো উইকেট ছাড়া। এরপর তার আর সুযোগ হয়নি প্রিমিয়ার ডিভিশনের কোনো খেলায় বল করার।

ক্ষমাহীন পেশাদারি সংস্কৃতিতে আবদ্ধ ক্রিকেট তাকে আর কোনো সুযোগ দেয়নি উঁচুজাতের মাঝে। ভাঙা হৃদয় আর ফিকে স্বপ্ন নিয়ে পরের বছর থেকে সেই যে দ্বিতীয় বিভাগে খেলা শুরু করতে থাকে আনিস, আরেকবার আরেকটি সুযোগের অপেক্ষায়, তা শুধু লক্ষ্যই থেকে যায়। সেরাদের মাঝে তার আর ফেরা হয় না।

মিডঅন থেকে ছুটে আসা রবিউলের ‘আনিসভাই’ চিৎকার শুনে বাঁভঙ্গস আঠালো আতঙ্কের জাল থেকে জেগে ওঠে আনিস।

‘আমি সরি আনিসভাই’ বলে রবিউল। কিন্তু আনিসের বুঝতে

কষ্ট হয়। সঙ্গে-সঙ্গেই বলে ওঠে রবিউল ‘বোঝেন না? কেন আপনাকে আনলো! ইফতেখার চায় না আপনি আর থাকেন।’

হালকা শ্রাগ করে ‘উঁহু! আমি দলের সবচেয়ে সিনিয়র বোলার। আমি এখন বল করব না তো আর কে করবে’ বলে পনেরো গজ দূরে তার দাগের কাছে আবার ফিরে যায় আনিস। ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে রবিউলও বিরক্ত ইফতেখারের নির্দেশমতো মিডঅন থেকে দূরের লংলেগে নতুন জায়গায় ফিরে যায় মাথা নাড়তে-নাড়তে।

আবার দৌড় শুরু করে আনিস।

অনেক মনোযোগ দিয়ে অফস্টাম্পের দিকে তাকিয়ে ইয়র্কার লেহুে বল ছুড়ে দেয় আনিস। কিন্তু সে-বল ইয়র্কার লেহুের অনেক আগেই মাটিতে পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে যায় সরোয়ারের ব্যাট। প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে আবারো অফের দিকে বল ঠেলে দেয় সে। বল প্রচণ্ডবেগে মাটি কামড়ে মিড অফের পাশ দিয়ে ছুটে যায় কিন্তু ভাগ্য এবারো ভালো আনিসের। লংঅফ থেকে জিয়া ঠিকই বাউন্ডারিতে পৌঁছানোর আগেই বলটা তুলে নেয়। সরোয়ার আর রনি এর মাঝে আরো ২ রান নিয়ে নেয়।

ভেঙে পড়তে থাকে আনিস। আর এক বা দুই বলের মধ্যেই খেলা শেষ হয়ে যাবে। আবারও এই শেষ ওভারটা ঠিকমতো করা হবে না তার, যেমনি হয়নি করা তার জীবনের অনেক কিছুই।

মাকে তার আর কখনো বুক উঁচিয়ে কিছু বলা হয়নি প্রিমিয়ার বিভাগের ব্যর্থতার পর। বোনের বিয়ে নিয়ে তার অনেক পরিকল্পনা থাকলেও অভাবের দরুন কিছুই করা হয়নি তার। যে-পাড়ায় একসময় কলার উঁচিয়ে দর্পে চলাফেরা করত, সেখানে রাতের আঁধারে মুখ লুকিয়ে ঢুকতে হয় তাকে। বন্ধুদের আর ক্রিকেট নিয়ে বড়াই করে গল্প করাও হয়নি তার কোনোদিন। জীবনের বাকি নীরস খেলাগুলোর মতো আজকের খেলাও শেষ হয়ে যাবে। হয়তো আর মাত্র দুই বল।

হঠাৎ দূর থেকে রবিউলের চিৎকার ভেসে আসে তার কানে — ‘সাবাস আনিসভাই, আপনি পারবেন।’

হ্যাঁ। পারতেই হবে আজ আনিসকে। হারতে-হারতে জীবনে অনেকে জিততে শেখে। আনিস কি পারবে না? ভাবতে থাকে সে।

ধীরে-ধীরে গ্রহণের অন্তকালের মতন ভয়ের মেঘ কেটে একটু আশার আলো জাগতে থাকে আনিসের মনে। ফিরে যেতে থাকে সে তার দৌড় শুরু করার স্থানে।

দৌড় শুরু হতেই মনে প্রতিধ্বনিত হয় প্রথম জীবনের পাড়ার ক্লাবের কোচ টিপুভাইয়ের কথা

— ‘কক্ষনো ভয় করবি না ব্যাটসম্যানকে। একটা মারলেও তোর ঠিকই সুযোগ থাকবে আরেকবার। চিন্তা করবি ব্যাটসম্যান কী ভাবছে। কী আশা করছে তোর কাছ থেকে। তাকে চমকে দিবি। কপিল দেব, ইমরান খান শুধু বল করেই চ্যাম্পিয়ন হননি। তাঁরা চিন্তা করতে জেনেছেন। ব্যাটসম্যানকে পড়তে পেরেছেন, বুঝতে শিখেছেন।’

মাথার মধ্যে হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে যায় আনিসের। ‘সরোয়ারকে আচমকা স্লো ডেলিভারি দিলে কেমন হয়?’

কোর্টনি ওয়ালসের অদ্ভুত স্লো ডেলিভারির কথা তার মনে ভেসে ওঠে। বল ছুড়ে দেওয়ার শেষ মুহূর্তে হাতের চেটোর আলতো ধাক্কা বলের হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার দৃশ্য সে কল্পনা করে। অনেক চেষ্টা করেও সে কখনো এরকমটা করতে পারেনি। বয়স প্রতিযোগিতার টুর্নামেন্টে দিপুভাই কজির মোচড়ে বল স্লো করে দেওয়ার টেকনিকটা দেখানোর পর সেটাই সে করে এসেছে এতদিন। কিন্তু আজকে আনিস তার প্রিয় বোলার কোর্টনি ওয়ালসের বলটাই করবে। করতেই হবে তাকে কারণ এখন যে শেষ ওভার।

দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এক নতুন খেলোয়াড়ের উদ্যম নিয়ে এবার দৌড় শুরু করে আনিস। কিপার মঞ্জু থেকে শুরু করে বাকিরাও তার দৌড়ে নতুন চাঞ্চল্য দেখে অবাক হয়। মসৃণগতিতে বোলিং ক্রিকে

এসে সর্বশক্তিতে বল ছুড়ে দেবার শেষ মুহূর্তে ঠিক ঠিক চেটো দিয়ে আলতো ধাক্কা দেয় এবার আনিস। বল কিছু দূর বাতাসে ভেসে আলতো ভাবেঝুলে পড়তে মাটিতে। কোন কিছু বোঝার আগেই সরোয়ারের ব্যাট অনেক আগেইঘুরে যায়।

অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে সরোয়ার দেখতে থাকে যে বল তার ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে অফস্টাম্পের মাত্র এক ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেছে। কিপার মঞ্জু বল ধরেই চিৎকার দিয়ে ওঠে। কিন্তু আনিস এর কোনো কিছুই শুনতে পায় না। তার মনে আজ শুধুই ভেসে উঠছে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা।

নিজের অজান্তে আজ সে প্রাপ্তি, প্রয়াস আর না পাওয়ার অসম সমীকরণের সমাধান খুঁজছে।

সরোয়ারের একটু বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় শেষ বলটি খেলে। এরকম অদ্ভুত স্লো বল এর আগে সে খেলেনি। টিভিতে দেখেছে ঠিকই, কিন্তু আজই প্রথম বুড়ো আনিস তাকে এভাবে তাক লাগিয়ে দিলো।

আনিসকে সে দুই-তিন বছর ধরে চেনে। মিষ্টভাষী খামখেয়ালি খেলোয়াড় হিসেবেই চেনে তাকে সরোয়ার। কিন্তু তেমন মনে রাখার মতো কোনো কিছু মনে করতে পারে না সরোয়ার। এরকম চেপে থাকা ভাঙ্গা স্বপ্ন নিয়ে ক্রিকেট খেলে যাচ্ছে কত শত-শত যুবক। হিসাব মেলাতে না পারার খামখেয়ালিপনাতেই তাদের মুক্তি।

কিন্তু এবার খুব সতর্ক হয়ে ওঠে সরোয়ার। আর তিন বলে চার রান তাকে করতেই হবে। সামনের বছর প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেলার আগেই চৌকস খেলোয়াড় হিসেবে নাম কামাতে চায় সে।

অন্যদিকে আনিস এক দৃঢ় পদক্ষেপে এক ঘোরময় মস্তচালিত মানুষের মতো ফিরে যেতে থাকে তার বোলিং মার্কে। তার মনে ভাসতে থাকে, আয়নার সামনে কপিল দেবের মতো ভঙ্গি করে কল্পনার মিয়াদাদকে ছুড়ে দেওয়া সেই বলের কথা। মনে হতে থাকে স্কুলক্রিকেটের কথা। কী চমৎকার বল করে ও উইকেট তুলে নিয়েছিল সে। আবার বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রচণ্ড জোরে ইয়র্কার ছুড়ে উইকেট ভেঙে ফেলেছিল; কিন্তু এই তেরো বছরের পেশাদার খেলার কিছুই তার মনে পড়ছে না।

জীবনের প্রথম পেশাদার খেলাতেই জাভেদ কি সুনিপুণভাবেই না ধ্বংসের বীজ বুনে দিয়েছিল তার জীবনে।

আবার ছুটতে থাকে আনিস। ‘এবারো কি সে ব্যর্থ হবে?’ ভাবে সে। সেই ছোটবেলা থেকে তার যে ছুটে চলা তা আজো থামেনি। ব্যর্থ হতে হতে জয়ী হওয়ার খোয়াবটাও যেন ভুলতে বসেছে সে।

পনেরো গজ ছুটে এসে এবার বাতাসে ভাসিয়ে দেয় সে বলটিকে যেন তার জীবনের জরা যন্ত্রণাগুলোকে চিরবিদায়ের বিসর্জনের পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। পুরনো বলটি সাপের মতো হিস-হিস শব্দ তুলে হঠাৎ গোঙা খেয়ে দিক পরিবর্তন করে উইকেটের দিকে ঘুরে আসতে থাকে।

সরোয়ার কিন্তু ব্যাট ঠিক বলের লাইনেই চালিয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ বাতাসের সঙ্গে বলের যোগসাজশের এই প্রতারণা বুঝতে পেরে তার সারাশরীর স্তব্ধ হয়ে ওঠে। এবার অবশ্য বল লেগ স্টাম্পের অনেক বাইরে দিয়েই চলে যায় সরোয়ারের ব্যাট-প্যাড সবকিছুকে ফাঁকি দিয়ে।

‘ওহ-আহ্’ ধরনের শব্দে কিছুক্ষণের জন্য চারদিক কেঁপে ওঠে। এর মাঝেই রবিউলের উল্লসিত কণ্ঠ সব থেকে জোরে শোনা যায় ‘সাবাস আনিসভাই, সাবাস।’

অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ইফতেখারকে বিভ্রিড় করতে শোনা যায় ‘এরকম সুন্দর রিভার্সসুইং আমি আগে কক্ষনো মাঠে দেখিনি।’ কোনো দৈবিক কারণে পুরো দলের মধ্যেই তরঙ্গের মতন ঢেউ খেলে যেতে থাকে। অনেক দিন পর আজ ইফতেখারও নিজেকে বুঝতে শিখে। হারতে সেও কিন্তু চায় না। সবার সাথে এভাবে ছলচাতুরী করে এতদিন সে আসলে নিজেকেই যে নিজে প্রতারণা করছে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা।

দৌড়ে যায় সে ঘোরমগ্ন আনিসের দিকে।

ইফতেখারের 'আনিসভাই, আপনি পারবেন, আনিসভাই আপনাকে পারতেই হবে' শুনে নতুন করে উদ্যম খুঁজে পাওয়া আনিস আবার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। কিছু না বলে হালকা করে মাথা নেড়ে সে আবার ফিরে যায় তার দৌড় গুরু স্থানে।

মসৃণ গতিতে ছুটে চলেছে আনিস।

আজ আবার তার ছুটে চলার মাঝে এক অদ্ভুত সংকল্প দেখা যায় অনেকদিন পর। যেন হঠাৎ করেই জীবন উপভোগ করা শুরু করেছে এক কিশোর ছেলে। ক্রিকেট এসে বল ছাড়ার শেষ মুহূর্তে চোয়াল শক্ত করে প্রচণ্ড জোরে মাঝ পিচে আছড়ে দেয় সে বলটিকে।

আবারো সরোয়ারকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে হিংস্র বাউন্সারটি তার মাথার দিকে ছুটে আসতে থাকে। চোখ বুজে নিজেকে বাঁচানোর শেষ আশ্রয় হিসেবে ব্যাট দিয়ে মুখ ঢেকে দেয় সরোয়ার। কিছুক্ষণের জন্যে অসাড় হয়ে যায় তার সমস্ত অনুভূতি-চেতনা।

কোথা থেকে তার কানে বেজে-ওঠা 'দৌড়া, দৌড়া' শুনে যান্ত্রিকভাবেই সরোয়ার দৌড় শুরু করে আর উলটোদিকে চোখের আড়াল দিয়ে তাকিয়ে দেখে কাকতালীয়ভাবে তার ব্যাটে লেগে বল কিপারের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বাউন্সারির দড়ির দিকে।

হতাশ আনিস লক্ষ করে, প্রচণ্ড গতিতে লংলেগ থেকে জীবনপণ বাজি রাখার মতো ভয়ংকর বেগে ছুটে আসছে রবিউল। বল যখন বাউন্সারির দড়ি ছুঁইছুঁই, তখন ছুড়ে দেয় সে নিজেকে বলের দিকে। আনিস বিশ্বাস করতে পারে না কীভাবে রবিউল ছুটে এলো আর কীভাবেই সে চার রান বাঁচিয়ে দিলো।

রবিউলের দৈবিক প্রচেষ্টায় অবিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে একই সঙ্গে নিজেকেও ভাগ্যের কাছে প্রতারিত মনে হতে থাকে আনিসের। এত ভালো বল করেও তো কোনো লাভ হলো না। জীবনের আর সব অবিচারের কথা ভেসে আসে তার কাছে — 'কই, সে তো অন্যদের মতো শৈশব পায়নি।'

স্বামীহারা মায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই চলেছে তারও স্বপ্নের সংগ্রাম। কতবার শুনেছে তাকে ক্রিকেট বড়লোকদের খেলা। তার মতো অভাবীদের এর পেছনে ছুটে চলতে নেই। ব্যাট-বলের টাকা না থাকার কারণে কতবার বন্ধুরা তাকে অগ্রাহ্য করেছে। সংগ্রাম করে ঠিকই সে উঠছিল তার অভীষ্ট লক্ষ্যে; কিন্তু একটি সুযোগের বেশি তো পায়নি সে নিজেকে প্রমাণের জন্য। ছুড়ে দিয়েছে সবাই তাকে অন্য জীবনে, যেখানের জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠতে পারেনি সে।

চোখ তার আর্দ্র হয়ে ওঠে। দূরে স্কোরবোর্ডে নতুন করে লেখা ভেসে ওঠে ২ রান প্রয়োজন।

শেষ বলে কাকলি ক্রিকেটারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজন আর ২ রান।

মাঠের বিভিন্ন প্রান্তে গোটা দশেক দর্শক একটু নড়েচড়ে ওঠেন।

জলে ভেজা চোখ নিয়ে ছুটে চলে আনিস। আজ তার শেষ ওভার। আজ তার শেষ বল। আজকেই সে তার জীবনের চেষ্টা আর প্রাপ্তির শেষ ফলাফল জানতে পারবে। আজকে তাকে সেই স্কুলজীবনের মতো বল ছুড়ে উইকেট ভাঙতে হবে। এই শৃঙ্খল থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে।

বাতাসের বারণ অমান্য করে ঠিক পনেরো গজ দৌড়ে এসে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে উইকেটের দিকে ছুড়ে দেয় সে বলকে। ভেজা চোখে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে আনিস দেখতে পায়, সরোয়ারের স্থানে জাভেদ ব্যাটিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর মৃদু সরসর শব্দ তুলে তার দিকে ছুটে চলেছে লাল রঙের ক্রিকেট বলটি। □



**বাঙালি সংস্কৃতি, তার নানামুখী বিকাশ,
সাহিত্যসাধক ও চিত্রশিল্পীদের নিয়ে
প্রবন্ধের বই বেরোচ্ছে। বিষয়ের
বৈচিত্র্য, তথ্যের বিপুলতায়, ভাষার
প্রাঞ্জলতায় ও আলোচনার সরলতায়
প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো বিশিষ্ট**



বেঙ্গল সেন্টার

প্লট-২, সিভিল এজিয়েশন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড,
শিল্পক্ষেত্র, ঢাকা-১২২৯, বাংলাদেশ
ফোন : ০৯৬৬৬৭৭৩৩১১, ০১৫৫১৮৮১১১

www.bengalpublications.com /bengalpublications

প্রতিস্থান :  বেঙ্গল গ্যালারি অফ ফাইন আর্ট
Bengal Gallery of Fine Arts



অনলাইনে অর্ডার করুন :  বুকসারি ই-বুক : 